বাংলা নাট্য-সমালোচনার ভূমিকা

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বসু, এম্-এ

নাট্য-সমালোচনার কথা তুলিতে গেলেই বাংলা সাহিত্যে উহার দৈন্তের বিষয়ই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাব সমালোচনা-সাহিত্যেব পরিসর যে কত ক্ষুদ্র তাহা সকলেই জানেন। উহার মধ্যে নাটক সম্পর্কিত অংশ একেবারেই নগণ্য।

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র ইহার জন্ত অংশতঃ দায়ী। জাতি হিসাবে বাঙ্গালী স্বভাবতঃই মৃদু চিত্ত, ভাব-প্রবণ; গীতি-কবিতাই উহার সাহিত্য-সৃষ্টির স্বভাব-সুলভ অভিব্যক্তি। এইজন্তই ভারতীয়, এমন কি অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষাব তুলনায় বাংলাব গীতি-কবিতা অনেক বেশী সমৃদ্ধ। নাটককে যদি জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, জাতীয় জীবনেব নানাভিমুখী কর্ম্ম ও ঘটনাপরম্পরার উপর নাটকেব উৎপত্তি ও উন্নতি অনেকাংশ নির্ভর করে। যে জাতি যে সময়ে জাতীয় জীবনে নূতন উন্মাদনা ও বিচিত্র কর্ম্ম-প্রেরণা অনুভব করিয়াছে, তাহার সে প্রাণ-স্পন্দন কবিতা অপেক্ষা নাটকেই অধিকতব স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। নাটক কর্ম্ম-চঞ্চল জীবনের প্রতিরূপ, কবিতা ভাব-প্রবণ জীবনের বহির্বিকাশ। তাই কর্ম্ম-কুণ্ঠ স্বপ্ন-বিলাসী বাঙ্গালীর সাহিত্যে কবিতার তুলনায় নাটকের স্বল্পতা দৈন্তের পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে।

তাঁহারা আবও বলেন, ভাব-প্রবণ জাতির মস্তিষ্ক সাধারণতঃ synthetic বা গঠন-মুখী, analytic বা বিশ্লেষণ-মুখী নয়। তাই বাঙ্গালী সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ে যেমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সাহিত্য-সমালোচনায় তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারে নাই। সমালোচনার সময় বাঙ্গালী সাধারণতঃ স্বকীয় চিন্তা ও কল্পনা সহায়ে একটী নিজস্ব মতবাদ সৃষ্টি করিয়া বসে; রাশি রাশি তথ্যের মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে সেগুলি বিচাব করিয়া উহাদের সহায়ে এক সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহার স্বভাবেব প্রতিকূল। সমালোচনা ক্ষেত্রে কল্পনাব মূল্য অস্বীকার করা যায় না সত্য, কিন্তু উহার জন্ত পূর্ব্বোক্তরূপ তথ্য বিচারের প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী।

এই শ্রেণীব চিন্তকদিগেব কথাগুলির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকাব কবা যায় না। অনেকদিক দিয়া আমাদের জাতীয় জীবন অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকায় জীবন্ত নাট্য-সৃষ্টির পথে অন্তরায় রহিয়াছে, এ কথাও অংশতঃ মানিতে হইবে। কিন্তু ভাব ও কল্পনাব প্রাচুর্য্যের জন্ত বাঙ্গালী নাট্য-সৃষ্টিতে সহজ পটুতা দেখাইতে পারিতেছে না, এ কথা মানিয়া লওয়া কঠিন। সাহিত্য-রসিক মাত্রেই জানেন, কেবলমাত্র মস্তিষ্ক-সহায়ে নাটক-সৃষ্টি সম্ভবপর নয়,—অন্ততঃ তাহা সৎসাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। উহাব জন্ত ভাব ও কল্পনা অপরিহার্য্য। তাহা না হইলে সে নাটক পাঠক বা দর্শকের চিত্তে কোনও রূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না—মনের কোনও ভাব-কেন্দ্র উত্তেজিত করিতে পারিবে না। নাট্যকার কেবল আপন বাস্তব-চেতন কল্পনা সহায়ে তাঁহার পরিকল্পিত জীবন-চিত্রে এক বাস্তবতার মায়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং বাঙ্গালীর জীবন যখন ভাব ও কল্পনা সম্পদে সমৃদ্ধ, এবং তাহার মস্তিষ্কও

যখন কোন অংশেই অন্তজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তখন নাট্য-সৃষ্টি বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অল্প হইবার কারণ কি ?

আমার মনে হয়, এই স্বল্পতাকে আমরা অনাবশ্যক প্রাধান্য দান করিয়াছি। কারণ, অন্যান্য ভারতীয় জাতিসমূহের সহিত তুলনায় বাঙ্গালীর নাট্য-সাহিত্য কোন অংশেই দীন নহে ; বরং উহা সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। তবে ইংরাজ, জার্ম্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ প্রভৃতি কয়েকটী ইউরোপীয় জাতির নাট্য সাহিত্যের সহিত তুলনায় আমাদের বাংলা নাট্য-সাহিত্য অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালীর নাট্য-প্রতিভা যে আশানুরূপ পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার কারণ, আমাদের জাতীয় জীবনের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। দীর্ঘকাল পরাধীনতা, শিক্ষার অভাব, নানারূপ সামাজিক বন্ধনের কঠোরতা, কুসংস্কার, অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা, অস্বাভাবিক চাকুরি-প্রিয়তা ও শ্রম-বিমুখতা প্রভৃতি ব্যাপার জাতীয় জীবনকে এরূপভাবে অবসাদ-খিন্ন ও দুর্দ্দশা-জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহার মধ্যে নাট্য-সৃষ্টির প্রয়াস অনেকাংশে ব্যর্থ না হইয়া পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুস্থ ও সবল জাতীয় জীবনই নাট্যাকারে আত্মপ্রকাশ করে। ক্লিষ্ট পীড়িত জীবন ব্যথার কবিতায় রূপ গ্রহণ করে ; তাই বাংলার কাব্য-সাহিত্যে দুঃখবাদের চিহ্ন এত প্রকট।

এই হিসাবে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাট্য-পরিপন্থী পরিবেশের মধ্যে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাবান নাট্যকারের অভ্যুদয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী নবাগত পাশ্চাত্য-সভ্যতার বৈদ্যুতিক স্পর্শে বহু দিনের জড়তা পরিহার করিয়া নবজীবনের প্রচণ্ড স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। সমগ্র বাংলার জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সমাজে, এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাত দুঃসহ উন্মাদনা সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। দুঃসহ এইজন্য যে, উহার ফলে অনেকেই জাতীয় আদর্শের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থির থাকিতে পারেন নাই, স্রোতে বাহিত হইয়া অধঃপতন ও সর্ব্বনাশের পথে ধাবিত হইয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে এই যে নবজাগ্রত আলোড়ন, এই যে মহাশক্তির উন্মেষ, ইহার মূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মহাপুরুষগণের অমিত প্রভাবও অনিবার্য্যরূপে কার্য্য করিতেছিল। বিপুল বলে তাঁহারা নবসুপ্তোত্থিত উদ্‌ভ্রান্ত জাতির উন্মার্গগমনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং উহার উদ্দাম শক্তিকে সনাতন জাতীয় ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিলেন। এই সময়কার জাতীয় জীবনে বলিষ্ঠ প্রচণ্ড জীবনোন্মেষ গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে।

বাংলার নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে যাহা নাই তাহার সম্বন্ধেই সকল কথা বলিতে হয়। যাহা আছে, তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহা লইয়া গৌরব করিতে যাওয়াও অগৌরবের। আমি এখানে সংক্ষেপে নাট্য সমালোচনার অভাব-ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করিয়া উপযুক্ত পন্থা নির্দ্দেশের প্রয়াস পাইব।

এক কথায় এই ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে বলিতে হয়, আমাদের নাট্য-সমালোচনার মধ্যে নাটক বা নাট্যকার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অভাব রহিয়াছে। কোন নাটক বা নাট্যকারকে বহুদিক দিয়া বহু বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা এবং তাহার ফলে এক সুচিন্তিত গঠন-মূলক সমালোচনা-সাহিত্য সৃজন করা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। অবশ্য সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "গিরিশচন্দ্র" ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহা-

শয়ের "গিরিশ-প্রতিভা" এদিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মতিলাল মহাশয়ের "দেশ" পত্রিকায় ক্রম-প্রকাশ্য "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" নামক মূল্যবান সমালোচনা সম্পূর্ণ হইলে নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যের এই দিক্‌কার অভাব অন্ততঃ গিরিশচন্দ্রের দিক দিয়া কতকটা দূর হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিলে, বিশেষ করিয়া ইউরোপের Shakespeare সংক্রান্ত সমালোচনার সহিত তুলনা করিলে, এগুলিকে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় নাট্যকারের পক্ষে আদৌ পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। বিশেষতঃ একজন প্রতিভাবান নাট্য-শিল্পীকে যত দিক দিয়া যতভাবে বিচার করা প্রয়োজন, তাহা ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে নাই। ইহা ব্যতীত দীনবন্ধু মিত্র বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাট্যকারগণের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়াস আদৌ দৃষ্টি-গোচর হয় না। তবু এইটুকু সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে গত ১৩৩৮ সালের পৌষমাসে "শনিবারের চিঠি" এক বিশেষ সংখ্যায় দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী সমালোচনা প্রকাশ করিয়া এই বিস্মৃত প্রায় শক্তিশালী নাট্যকারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছে। কিন্তু জীবনানুগ নাট্য-সৃষ্টির প্রথম প্রবর্ত্তক দীনবন্ধু সম্বন্ধে এই আলোচনাই কি যথেষ্ট? ইঁহারা ব্যতীত অন্য নাট্যকারদিগের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা নাই বলিলেই হয়। মাসিক পত্রের মারফৎ আমাদের নিকট যে প্রচলিত নাটকের সমালোচনা পরিবেশিত হয়, তাহাকে সমালোচনা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। কতকগুলি নিতান্ত অগভীর শব্দাড়ম্বর সৃষ্টি করা যদি সমালোচনা হইত, তাহা হইলে দুঃখ করিবার কিছুই ছিল না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আধুনিক নাট্যকারদিগের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় নাই, সুতরাং তাঁহারা বিশদ সমালোচনা দাবী করিতে পারেন না। আধুনিক নাট্য সাহিত্য যে এতই নিকৃষ্ট, তাহা আমি স্বীকার করি না। তথাপি যদি তাঁহাদের কথাই মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় আমাদের নাট্য-সমালোচনা কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যকারগণের প্রতিও অবিচার করিয়াছে। আমাদের নাট্য-সাহিত্য সংস্কৃত নাটকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। সুতরাং বাঙ্গালা নাট্যকারগণের উপর সংস্কৃত নাট্যকারগণের প্রভাব বিচার করিবার উদ্দেশ্যেও কালিদাস, ভাস, বিশাখ দত্ত প্রভৃতি প্রাচীন নাট্য-শিল্পিগণের বিস্তৃত সমালোচনা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রাচীন সাহিত্যে" এবং দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ অপর কোন কোন সাহিত্যিক তাঁহাদের গ্রন্থে সংস্কৃত কবি বা নাট্যকার সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ইংরাজীর appreciation পর্য্যায়ভুক্ত, সমালোচনা হিসাবে তাহার ব্যাপকতা অতি সামান্য।

বিবেক-ভারতী সাহিত্য সংসদের নাট্য-মণ্ডলের কার্য্য পরিচালনকালে বাংলা নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যের যে ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

(১) কোন নাটক-সৃষ্টি এক অসংলগ্ন আকস্মিক ব্যাপার নহে। উহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী এবং সমসাময়িক ব্যাপারের সহিত উহার নিগূঢ় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। কোন নাটকের সমালোচনা-কালে এই পূর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া উক্ত নাটক কোন্ কোন প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নতুবা ঠিক ঠিক সেই নাটকের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হইবে না। অনেকে নাটকে সমসাময়িক রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম্ম সংক্রান্ত চিন্তার ছায়া খুঁজিয়া থাকেন; সেই সঙ্গে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী চিন্তাধারার সম্পর্ক বিচার করিতে হইবে।

(২) নিপুণ নাট্যশিল্পী নাটকের মধ্যে

সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিবার প্রয়াস করেন। কিন্তু এই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সফল হয় না; লেখকের অলক্ষ্যে তাঁহার স্বভাব ও চিন্তার ছাপ গ্রন্থের স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর আত্মপ্রকাশ করে। নাট্য-সমালোচনাকালে সমালোচক নাট্যকারের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া গ্রন্থকারের কোন সময়ের কোন মানসিক অবস্থার মধ্যে নাটকের জন্ম তাহা নির্ণয় করিবেন এবং নাটকান্তর্গত পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন-সাহায্যে উহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন।

(৩) বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি যে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য হইতে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা হ্রাস পাইবার পর আধুনিককালের বাংলা নাটকগুলি অনেকাংশে ইংরাজি ও ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই ইংরাজি শিক্ষিত, Shakespeare, Jonson, Molliere, Ibsen, Maeterlinck প্রভৃতি বৈদেশিক নাট্য শিল্পিগণের সহিত অল্পাধিক সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহাদের নাটক যে অধুনা প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে নাট্য-সমালোচকের সম্মুখে বিপুল শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সমালোচনাকালে কোন এক বিশেষ নাট্যকারের গ্রন্থাবলী বা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নাটক লইয়া উহার মধ্যে উক্ত সংস্কৃত ও বৈদেশিক প্রভাব কি ভাবে ও কি পরিমাণে কার্য্য করিতেছে, তাহা গবেষণা সহায়ে তুলনামূলক সমালোচনা-দ্বারা বিশদরূপে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিবেন। এইরূপে ইউরোপীয় ও সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের নিকট বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত না হইলে নাট্য-জগতে বাংলার নিজস্ব দানের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না।

(৪) নাটকের গঠন-শিল্প (technique) সম্বন্ধেও আলোচনার বিশেষ অভাব রহিয়াছে। নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি ও সংরক্ষণ-কৌশল, ঘটনা-সংস্থান; দৈব ও অপরিহার্য্য ঘটনা-সমূহের মূল্য নির্ণয়; চরিত্র-সংঘাত; নাটকের গতি ও পরিণতি; পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন ও সুসঙ্গত বাচন প্রয়োগ; ইত্যাদি নানা দিক দিয়া নাটকের মূল্য যাচাই করিবার প্রয়োজন আছে। নাট্যকারের কল্পনা ও চিন্তা যদি উপযুক্ত গঠন-শিল্পের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে নাটক আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। আধুনিক নাট্য-সমালোচকগণ এদিকেও আবশ্যক মত মনোযোগ দিতেছেন না।

(৫) নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর চরিত্র সমালোচনা কালে কোন একটী বিশেষ চরিত্র লইয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কোনও নাট্যকারের কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর চরিত্র লইয়া শ্রেণীগত ভাবে আলোচনার অভাব রহিয়াছে। Shakespeareএর রাজা, দুর্ব্বৃত্ত, বিদূষক প্রভৃতি এক এক বিশেষ শ্রেণীর চরিত্র লইয়া তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু প্রভৃতির সৃষ্ট চরিত্রগুলির সম্বন্ধেও শ্রেণীগত সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

(৬) বিশেষ বিশেষ নাট্যকারের বিশেষ বিশেষ রস-সৃষ্টির কৌশল লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং কোন্ কোন্ উপাদানের উপর উক্ত রস-সৃষ্টির সাফল্য নির্ভর করিতেছে, তাহা বিশেষ যত্নের সহিত বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একই রস-সৃষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন নাট্যকার কিরূপ বিভিন্নরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনামূলক সমালোচনা বিশেষ উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ,

হাস্যরসের সৃষ্টিতে দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তুলনাদ্বারা অতি চমৎকার ভাবে দেখানো যাইতে পারে।

নাট্য-সমালোচনা সাহিত্যে এইরূপ দৈন্য ও ত্রুটি-বাহুল্যের কারণ কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ একজন্য বাঙ্গালী মস্তিষ্ককে দায়ী করেন। কিন্তু সত্যই কি বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক কেবলমাত্র Synthetic—analytic নহে? আমার মনে হয়, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ যথেষ্ট নাই। সূক্ষ্ম রসানুভূতি, সাহিত্য-রসোপলব্ধি প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালী বোধ হয় জগতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। রূপ ও রসের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব বিস্ময়কর। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, অসামান্য বিশ্লেষক শক্তি না থাকিলে ইহা কখনই সম্ভবপর হইত না। সুতরাং বাঙ্গালী মস্তিষ্ক analytic নহে,—এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। Synthetic ও analytic, উভয়বিধ শক্তিই পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত আছে বলিয়াই বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ক্রমশঃ বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছে।

আমার মতে নাট্য-সমালোচনা বা সাহিত্য-সমালোচনার দৈন্যের দুইটী প্রধান কারণ আছে, তাহার মধ্যে একটী গৌণ, অপরটী মুখ্য। প্রথম কারণ, বাঙ্গালীর স্বাভাবিক শ্রমবিমুখতা। উচ্চ শ্রেণীর সমালোচনার জন্য যেরূপ প্রচুর অধ্যয়ন এবং সুগভীর ও সুবিন্যস্ত চিন্তার প্রয়োজন, তদনুরূপ কষ্ট ও আয়াস স্বীকার অনেক সাহিত্য-রসিকই করিতে চাহেন না। ফলে তাঁহাদের সমালোচনা লঘু, হীন-সম্পদ ও নিতান্ত "তৃতীয় শ্রেণীর" হইয়া দাঁড়ায়। ফাঁকি দিয়া অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া হয়ত সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করা যায়; কিন্তু বিশেষজ্ঞের নিকট তাহার মূল্য কিছুই নয়।

কিন্তু ইহাও প্রধান কারণ নয়। আমার মতে এই দৈন্যের মূলীভূত কারণ, ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি সীমাতিরিক্ত শ্রদ্ধা এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি অযথা অনাদর। আমাদের দেশের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকগণ Shelly, Keats, Shakespeare, Spencer প্রভৃতির সমালোচনায় যে পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বৈদিশিক সুধীবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে সমালোচনায় বাঙ্গালীর স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই পণ্ডিত ও সারস্বতবর্গের নিকট তাঁহাদের মাতৃভাষা একেবারেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কদের চিন্তা সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশের সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকায় বাংলা-সাহিত্য সমালোচনা অধিকাংশক্ষেত্রে অযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখন প্রয়োজন, ইয়োরোপীয় সমালোচনার প্রথা ও প্রণালী অনুসারে বঙ্গ-সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সুচিন্তিত বহুমুখী সমালোচনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় যেরূপ ভাবে Maeterlinckএর নাটক লইয়া বিশেষ যত্নে বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই ভাবে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" "রক্তকরবী" প্রভৃতির অন্তর্গত symbolismএর বিচার আরও বিশদ ভাবে হওয়া উচিত ছিল, অত্যন্ত আধুনিক হইলেও Oscar Wildeএর পন্থানুবর্ত্তী মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটিকাগুলিরও এই প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আপন সাহিত্যের প্রতি এই অনাদর বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির অনেকখানি অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। তবে আশার কথা এই যে, অধুনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অবিনাশ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু ও শ্রীশবাবু গিরিশ-নাট্য সম্বন্ধে যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী নিজের সম্পদকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছে। আশাকরি, এই শ্রদ্ধা দিন দিন বিবর্দ্ধিত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত বাংলার সুধী অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টিও যে সম্প্রতি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশেষ আশা ও আনন্দের বিষয়। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তবে বাংলার সমালোচনা-সাহিত্য যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সম্পদ বিস্মিত বিশ্বের চক্ষের সমুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

---

* সরিষা বিবেক-ভারতী সাহিত্য সংসদে পঠিত।

যোগশাস্ত্রে দেহের বিভূতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বিগত জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪এ আমরা বিভূতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি, এক্ষণে দেহের বিভিন্ন স্থানে ধারণার দ্বারা যে সব সূক্ষ্ম জিনিষের অনুভব হয় তা পাতঞ্জল থেকে উদ্ধার করে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে—

নাভিচক্রে সংযমের দ্বারা কায়ব্যূহ জ্ঞান হয়। শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ্ এই ত্রিদোষ এবং পর পর ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু আছে। যার দ্বারা চিত্তবিকারাদি হেতু স্নায়ুবিকার হয় তাকে বলে বায়ু, রক্তসঞ্চারক বিকারহেতু পিত্ত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রবাহ শরীরের স্থিতিশীলতার বিধান করে, উহাদের বিকারের হেতু কফ্। সুশ্রুত উহাদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণজাত বলেন। কণ্ঠকূপে সংযম করলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। ব্যাস বলেন, "জিহ্বার অধোভাগে তন্তু (Vocal cords), তার নীচেয় কণ্ঠ (Larynx), তার নীচেয় কূপ (trachea)। এখান হতে ক্ষুৎপিপাসা হেতু যে নাড়ীর (Oesophagus tube) উত্তেজনা হয় তাকে আয়ত্ত করা যায়। কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম করলে শরীর কাষ্ঠবৎ স্থির করা যায়। ব্যাস বলেন, "কূপের নীচেয় বক্ষে কূর্ম্মাকারা নাড়ী (Bronchial tube) আছে, এখানে সংযমের দ্বারা সর্প এবং গোধারা নিজেদের শরীর স্থির করে। মূর্দ্ধজ্যোতিঃতে মনস্থির করলে সিদ্ধ দর্শন হয়। ব্যাস বলেন, "শিরঃ কপালের অন্তর মধ্যে যে ছিদ্র, তার ভেতর প্রকৃষ্টরূপে ভাস্বর জ্যোতিঃ আছে, সেখানে সংযম করলে স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালচারী সিদ্ধগণের দর্শন হয়।"

প্রাতিভ নামক তারক জ্ঞান, যা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বে উপস্থিত হয়, যেমন ভাস্কর উদয়ের পূর্ব্বে প্রভা—তা হতে সব জানা যায়। বিবেকজ জ্ঞান পরে বলা হবে। ব্রহ্মপুর নামক এই শরীরে যে দহর বা ক্ষুদ্রাকার পুণ্ডরীক বা পদ্মাকার গৃহ আছে, সেখানে বিজ্ঞান বা বুদ্ধির বসতি। সেখানে চিত্ত সংযম করলে চিত্তের সংবিৎ বা হ্লাদযুক্ত জ্ঞান এবং চিত্তবৃত্তি সকলেরও বিজ্ঞান জন্মে।

সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি এবং পুরুষ অত্যন্ত অসংকীর্ণ অর্থাৎ অমিশ্র বা অত্যন্ত ভিন্ন। এই দুটি বিভিন্ন প্রত্যয় যখন অবিশেষ বা একাকার হয়ে যায়, তখনই দৃশ্যরূপ ভোগের উৎপত্তি হয়। এই দৃশ্যরূপ ভোগ্যবস্থ চিৎ (পুরুষ) এবং অচিৎ (বুদ্ধি) মিশ্রণে উৎপত্তি হয় বলে এ পরার্থ। কারণ যা কিছু মিশ্র পদার্থ দেখা যায় তা সবই দ্রষ্টার নিমিত্ত কল্পিত হয়ে থাকে। পুরুষ স্বীয় স্বরূপ অবিবেক বশতঃ বিস্মৃত হযে বুদ্ধি-পরিণাম দৃশ্যেতেই স্বার্থবোধ করেন, অর্থাৎ বুদ্ধি-পরিণাম—সুখদুঃখাদিকে স্বীয় পরিণাম বলে বোধ করেন। কিন্তু তার যথার্থ স্বার্থ হচ্ছে,—তিনি চিত্ত সত্তা হতে সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী, শুদ্ধ, অন্য, চিতি-মাত্র-রূপ। এই স্বার্থে চিত্ত সংযম (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) করলে পুরুষজ্ঞান হয়। অধিকাংশ বিভূতিতে সমাধি বা চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পুরুষজ্ঞানে চিত্তলয়ের সম্পূর্ণতার প্রয়োজন।

ব্যাস বলেন, "এই পুরুষজ্ঞান হতে আপনা আপনি—(১) প্রাতিভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীত ও অনাগত জ্ঞান, (২) শ্রাবণ

অর্থাৎ শব্দ সংবিৎ বা যে কোনও শব্দের অর্থজ্ঞান, (যেমন শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী বিভিন্নভাষী ভক্তগণ যে কোনও ভাষায় কথা বললে বুঝতে পারতেন), (৩) বেদনা অর্থাৎ দিব্য স্পর্শ বোধ, (৪) অস্পর্শ হতে দিব্য রূপ সংবিৎ, (৫) আস্বাদ হতে দিব্য রস-সংবিৎ, এবং (৬) বার্ত্তা অর্থাৎ দিব্য গন্ধ-বিজ্ঞান নিত্যই বোধ হয়।" ইহার দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-সূত্রের বিভূতি-পাদের ৩৮ সূত্রে বলেন—উপর্যুক্ত বিভূতি সকল সমাধির উপসর্গ, অন্তরায় বা বিঘ্নস্বরূপ কিন্তু অবিবেক-হেতু ব্যুত্থান বা জাগ্রৎ অবস্থায় সিদ্ধিস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরাণী, মুক্তি-লাভেচ্ছুর পক্ষে বিভূতি সকল অত্যন্ত হেয় উপদেশ করলেও, তাঁদের জীবনে, শাস্ত্রমর্য্যাদা, শাস্ত্রপ্রমাণ ও লোককল্যাণের নিমিত্ত পাতঞ্জলোক্ত প্রায় সমস্ত বিভূতিই মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়ত।

সমস্ত অন্তঃকরণ বাসনা বশে স্থূল শরীরে বদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সমাধি-বলে সেই কর্ম্মবন্ধনের কারণ শৈথিল্যহেতু চিত্তবৃত্তি কিভাবে দেহে সঞ্চরণ করে তার জ্ঞান হয়। তখন চিত্তের পর শরীরে আবেশ বা ভর সিদ্ধ হয়। তখন সঙ্গে সঙ্গে মধুকররাজের সহিত যেমন মক্ষিকারা উড়ে যায়, তেমনি ইন্দ্রিয়েরাও চিত্তের অনুসরণ করে।

উদান বায়ু জয় হলে জল, পঙ্ক ও কণ্টকের উপর দিয়ে অসঙ্গবৎ অর্থাৎ যেন অস্পর্শিত ভাবে চলা যায় এবং স্বেচ্ছামাত্র উৎক্রান্তি বা দেহত্যাগ সিদ্ধ হয়। প্রাণ বায়ু মুখ্যভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শরীরে আছেন। (১) প্রাণ—মুখ-নাসিকা-হৃদয়-বৃত্তি, (২) সমান—হৃদয় হতে নাভি-বৃত্তি, (৩) অপান—নাভি হতে আপাদতলবৃত্তি, (৪) উদান—ঊর্দ্ধগমন-শিরোবৃত্তি এবং (৫) ব্যান—সর্ব্ব-শরীরবৃত্তি। সমান বা উদরস্থ পরিপাক প্রাণশক্তি জয় হলে দেহে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। একে সাদা ভাষায় বলে ছটা, যা দেবদেবীর শিরোভাগে আঁকা হয়। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বলতেন যে, যখন ঠাকুরকে তিনি তেল মাখাতেন তখন এইরূপ জ্যোতিঃ তিনি দেখতে পেতেন। পাশ্চাত্য যোগীরা একে বলেন, Odyle বা Aura—এর অপর সংস্কৃত নাম ব্রহ্মবর্চ্চস। শরীরে সাত্ত্বিক ভাব, সাত্ত্বিক আহার, পরিপাক, স্বাস্থ্য ও সৌমনস্য সমান বায়ুতে মনস্থিরের লক্ষণ, তখন ঐ সকলের ফলস্বরূপ শরীরে ছটার আবির্ভাব হয়।

শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধস্থানে সংযম করলে দিব্য-শ্রোত্র লাভ হয়। আকাশ অতি সূক্ষ্ম অবকাশ পদার্থ; এর গুণ শব্দ। আকাশে স্পন্দ বা কম্পন সৃষ্টি হয়, তা থেকে শব্দের উদ্ভব। এই শব্দ স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব হেতু শ্রুত ও অশ্রুত। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থকে আশ্রয় করে এই শব্দের তীব্রতা বাড়ে। একটা ধাতুতে যে শব্দ শোনা যায়, সেটা হচ্ছে ধাতুর পরমাণুর মধ্যবর্ত্তী অবকাশে কম্পনজাত-শব্দে পরমাণুর সংঘর্ষ সৃষ্টির দ্বারা বর্দ্ধিত হয় মাত্র। কর্ণপটাহ (Ossicles) অবকাশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল বায়বীয় পদার্থে কম্পিত হয় বলে বাহ্য আকাশস্থ কম্পন ধ্বনিরূপে আমরা শুনি। আকাশে যে শব্দের উদ্ভব হয় তা বায়ুমণ্ডলদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দ্রব্যের পরমাণু যত ঘন বা density যত বেশী হবে শব্দও তত বৃদ্ধি পাবে। শব্দমান পদার্থ থেকে বেরিয়ে শব্দতরঙ্গ ক্রমে সূক্ষ্ম হতে থাকে, অতি সূক্ষ্ম হলে আর আমরা কানে শুনতে পাই না। রেডিও যন্ত্রের এ্যামপ্লিফায়ার (amplifier) দ্বারা সেই ম্রিয়মান শব্দতরঙ্গকে বিবৃদ্ধ করে দিলেই জোরে শোনা যায়। আকাশ স্পন্দনে তাপেরও উদ্ভব। আমাদের শাস্ত্রে তাপ বা আলোক কণিকার স্পন্দনেরও হেতু ঈশ্বরেচ্ছা বলা হয়েছে। জড় আলোককণিকা বা বিদ্যুতিনের কম্পন কখনও স্বয়ং জাত হতে পারে না। বিশ্ব-তাপ-নৃত্যের (Cosmic heat) মূলেও রয়েছে

ঈশ্বরেচ্ছা। সেটাকে spontaneous electronic dance বললে কোনও অর্থ হয় না। যেমন বাক্য-হেতু কণ্ঠ তন্ত্র কম্পনের যে ধ্বনি তার মূলে রয়েছে মনাকাশে জীবেচ্ছা-স্পন্দ, যা জড় পৈশিক-শক্তি-কম্পনরূপে পরিণত হয় (will to muscular power)। যোগীরা বলেন, দেবস্তরের শব্দ-কম্পন আরও সূক্ষ্ম। সংযমদ্বারা তাও শোনা যেতে পারে। আকাশ অরূপ ও স্পর্শাদিগুণ রহিত। কারণ শব্দ গুণের দ্বারা মাত্র একটি এমন দ্রব্যের জ্ঞান হয় যার স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নেই। কাজে কাজেই শব্দও আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহ মাত্র।

কায় ও আকাশের সম্বন্ধস্থানে সংযম হতে এবং তুলা হতে পরমাণু পর্য্যন্ত দ্রব্যের লঘুত্বে চিত্তসংযম করলে, আকাশগমন সিদ্ধ হয়। যোগীরা বলেন, "বুদ্ধি যেরূপ জগৎ দেখাচ্চে, আমরা জগৎকে ঠিক সেই ভাবেই দেখি। শরীরটাকে আমরা স্থূল ও ঘনরূপে দেখি বলেই তার গুরুত্ব আমাদের কাছে উপলব্ধ হয়। কিন্তু আকাশ ও দেহ সম্বন্ধ-স্থানে সংযম সিদ্ধ হলে, দেহের অন্তর্বর্ত্তী পরমাণুসমূহের পারিপার্শ্বিক আকাশও প্রত্যক্ষ হয়, কাজেকাজেই দেহের যে ঘনত্ব সাধারণ জ্ঞানভূমিতে আমরা অনুভব করি, তা তখন অনুভূত হয় না, কাজেকাজেই দেহ তখন এত লঘু উপলব্ধি হয় যে আকাশগমন সিদ্ধ হয়। অথবা তুলা হতে পরমাণু পর্য্যন্ত লঘু ও সূক্ষ্ম দ্রব্যের লঘুত্বে চিত্ত সংযমের দ্বারা জল, মাকড়সার জাল, সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতিতে গতি লাভ করা যায়।

বাহিরে (আকাশাদিতে) অকল্পিতা বৃত্তিকে (আমি আছি এইরূপ ধারণাকে) মহাবিদেহ বলে। এইরূপ ধারণায় সিদ্ধ হলে আত্মপ্রকাশের আবরণ যে দেহভাব ক্ষয় হয়ে যায়। শরীরে এবং বাহিরে উভয়তঃ যখন চিত্ত থাকে, তখন তাকে কল্পিতা বিদেহধারণা বলে।

ভূত সকলের পাঁচটি রূপ আছে, যথা—(১) স্থূল, (২) স্বরূপ, (৩) সূক্ষ্ম, (৪) অন্বয় ও (৫) অর্থবত্ত্ব। এই সকলে সংযম করলে ভূত জয় হয়। (১) স্থূল হচ্চে ভূতের প্রথম দৃষ্ট ও বিশেষরূপ, যথা—শব্দাদি এবং আকারাদি। (২) স্বরূপ হচ্চে ভূতের সামান্যরূপ, যেমন ভূমির কাঠিন্য, জলের স্নেহ, বহ্নির উষ্ণতা, বায়ুর সঞ্চারণ, আকাশের ব্যাপিতা। তাই ন্যায় শাস্ত্র বলেন, "এক জাতি-সমন্বিতানামেষাং ধর্ম্মমাত্র ব্যাবৃত্তি।"—এক জাতি পৃথিব্যাদির বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা ব্যাবৃত্তি বা ভেদ জ্ঞান হয়ে থাকে। সাংখ্যমতে সামান্য বা সমূহ (whole) দ্বিবিধ—(ক) যেখানে অবয়ব ভেদ নেই, যেমন মনুষ্য, বৃক্ষ ; (খ) যেখানে শব্দ বা নাম দ্বারা অবয়ব ভেদ আছে, যেমন বৃক্ষ-লতা-উদ্ভিদ। অথবা (ক) ভেদবিবক্ষিত—যেমন, আমের মুকুল, (খ) অভেদ বিবক্ষিত যেমন আম বাগান। অথবা (ক) যুত সিদ্ধাবয়ব—যথা, বন, গোষ্ঠী, সংঘ (collective), (খ) অযুত সিদ্ধাবয়ব (organism)—যথা, শরীর, বৃক্ষ, পরমাণু। (৩) তন্মাত্রই সূক্ষ্মরূপ, উহা এক-অবয়ব বা পরমাণু। (৪) অন্বয় হচ্চে চতুর্থরূপ এবং তিন ভাগে বিভক্ত—(ক) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যা সর্ব্বভূতে অন্বিত। (৫) অর্থবত্ত্ব বা পরার্থতা অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধক।

পূর্ব্বোক্ত ভূতরূপ জ্ঞান হতে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ ও তার ধর্ম্মের অনভিঘাত (অপ্রতিহত স্বভাব) সিদ্ধ হয়। অষ্ট ঐশ্বর্য্য যথা—(১) অণিমা=অনুবৎ হওয়া, (২) লঘিমা=লঘু হওয়া, (৩) প্রাপ্তি=যে কোনও স্থান হস্তদ্বারা স্পর্শ করা (৪) প্রাকাম্য=যে কোনও বস্তুর ইচ্ছামাত্র উপস্থিত করণ, (৫) মহিমা=যে কোনও বস্তুর ভেতর দিয়ে গতি সম্পন্ন হওয়া, (৬) বশিত্ব=সমস্ত বস্তু বশ করা, (৭) ঈশিতৃত্ব=সর্ব্বভূতের প্রভব, অপ্যয় ও ব্যূহের উপর আধিপত্য করা, (৮) যত্রকামাবসায়িত্ব= ভূত প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী সংস্থান। অবশ্য যোগীর

এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য হিরণ্যগর্ভেশ্বরের (Cosmic Intelligence) ইচ্ছার অধীন। যোগীর এই সব ঐশ্বর্য্য তাঁরই অপার ঐশ্বর্য্যের অংশমাত্র। এ সম্বন্ধে বেদব্যাস তাঁর ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।৭) বলচেন, "মুক্ত পুরুষেরা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার বলে সৃজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য অণিমাদি লাভ করতে পারেন। জগদ্ব্যাপার সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কার্য্য, সে কার্য্যে জীব অনধিকৃত ও অসন্নিহিত (অনেক দূরে অবস্থিত)।" কারণ ঈশ্বর কৃপায় জীব ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব যদি জীবের থাকত, তা হলে সৃষ্টি শৃঙ্খলায় গোল (পদার্থ-বিপর্য্যাস) বেধে যেত, যেজন্য সাংখ্যের প্রকৃতিলীনদের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি (জন্যেশ্বর) সিদ্ধ হয় না। কারণ একজনের যখন সৃষ্টি ইচ্ছা উঠচে, আর একজনের তখন লয় ইচ্ছা উঠলে কি হবে?

কায়ধর্ম্মের অনভিঘাৎ মানে শারীর ধর্ম্ম জল, অগ্নি, অস্ত্রের দ্বারা বিপর্য্যস্ত না হওয়া এবং কোনও স্থূলভূতই তাঁদের শরীরের ক্রিয়ার বাধা উৎপত্তি করতে পারে না। রূপ, লাবণ্য, বল, বজ্রসদৃশ দেহ হলো কায়-সম্পৎ—যা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে ছিল।

পূর্ব্বে ভূত সকলের পাঁচটি রূপের কথা বলা হয়েচে, এক্ষণে ইন্দ্রিয় সকলের পাঁচটি রূপ এবং তাতে সংযমের ফল বলা হচ্চে—(১) গ্রহণ= বিশেষ (শব্দাদি) এবং সামান্য (কাঠিন্যাদি) বিষয় হচ্চে গ্রাহ্য। এই গ্রাহ্যেতে যে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিপ্রবাহ, তাই হলো গ্রহণ। (২) স্বরূপ= ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ হচ্চে—প্রকাশশীল বুদ্ধি সত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ব্যূহ বা সংস্থান। ইন্দ্রিয় হচ্চে Organic bodyর (অঙ্গম বা অযুত-সিদ্ধ-অবয়ব) এক একটা অংশ। সমস্ত দেহটা হচ্চে সমূহ (whole), এতে ইন্দ্রিয়াদি রূপ স্বগত ভেদ অনুগত রয়েচে—একটা গাছের যেমন ডালপালা। প্রত্যেক শরীর দ্রব্যই একটা Organism (অযুতসিদ্ধ অবয়ব বিশিষ্ট এবং এর মধ্যে স্বগত ভেদ বর্ত্তমান। নিম্বার্কের ব্রহ্মে স্বগত ভেদ—জীব ও জগৎ—বর্ত্তমান। কিন্তু রামানুজের ব্রহ্মে—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিনটি, একই নাম ব্রহ্মে, বিজাতীয় অংশরূপে বর্ত্তমান; একে যুত সিদ্ধাবয়ব (collective) বলা যেতে পারে। ভাষ্যকার ব্যাসের মতে রামানুজের নাম মাত্র ব্রহ্মকে একটা দ্রব্য বলা যেতে পারে না, কারণ উহা সমূহ বটে এবং উহাতে বিজাতীয় ভেদও অনুগত বটে, কিন্তু উহা অযুতসিদ্ধ অবয়ব নয়, উহা যুত-সিদ্ধ-অবয়ব। ব্যাস বলচেন—"অযুত-সিদ্ধ-অবয়ব ভেদানুগত সমূহই দ্রব্য।" (৩) অস্মিতা=ইন্দ্রিয়ের এই তৃতীয়রূপ অস্মিতা বা অহংকারই হচ্চে ইন্দ্রিয় সকলের উপাদান কারণ। অহংকার যখন এক একটা বিশিষ্ট জ্ঞান প্রবাহের বহির্মুখ অধিকরণ হয় তখনই তাকে ইন্দ্রিয় বলে। (৪) অন্বয়= ইন্দ্রিয়ের এই চতুর্থরূপ অন্বয় তিন ভাগে বিভক্ত—ব্যবসায়াত্মক (১) প্রকাশ (জানা), (২) ক্রিয়া (প্রবর্ত্তন) এবং (৩) স্থিতি (শক্তিরূপ সংস্কার বা ধারণ) —এই তিনটি গুণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অন্বিত। (৫) অর্থবত্ত্ব =ইন্দ্রিয়গণও ভূতসকলের ন্যায় অর্থবত্ত্ব বা পদার্থ। অর্থাৎ ভূত সকল যেমন পুরুষের ভোগ্য, তেমনি ইন্দ্রিয় সকল পুরুষের ভোগ প্রাপ্তির বহিঃকরণ। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করলে ইন্দ্রিয় জয় হয়।

ইন্দ্রিয়জয় হতে—(১) মনোজবিত্ব=মনের ন্যায় অনুত্তম গতি, (২) বিকরণ=স্থূলদেহের সম্পর্ক রহিত অভিপ্রেত দেশ-কাল-বিষয়-অপেক্ষ-বৃত্তি বা উৎকৃষ্ট লোক সকলের সাক্ষাৎ দর্শন সামর্থ্য এবং (৩) প্রধানজয়=প্রকৃতি ও তার বিকৃতি সকলের উপর আধিপত্য লাভ হয়। যোগশাস্ত্রে এই ত্রিবিধ সিদ্ধিকে মধুপ্রতীক বলে। এইজন্য শ্রুতি বলচেন—"স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি সংকল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। অথ যদি মাতৃলোক কামো ভবতি" ইত্যাদি। (ছা উ, ৮।২)।

পরমবশীকার সংজ্ঞাবস্থায় রজস্তমোমলশূন্য

বুদ্ধি সত্ত্বের সাহায্যে বৈশারদী প্রজ্ঞাদ্বারা সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি (ভেদজ্ঞান) হলে, সাধক যে কোনও ভাব বা দৃশ্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব (আত্মস্বরূপত্ব) এবং সমস্ত দ্রব্যের শান্ত (লীন), উদিত (বর্ত্তমান ধার্ম্মিক কালিক ও দৈশিক জ্ঞাত পরিণাম) ও অব্যপদেশ্য (সংস্কার শক্তিরূপে অবস্থান) পরিণামের যুগপৎ জ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ করেন। প্রথমটি হচ্ছে (১) জ্ঞানরূপা সিদ্ধি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে (২) ক্রিয়ারূপা সিদ্ধি। সেইজন্য শ্রুতি বলচেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।' (বৃ উ, ৪।৫।৬)। এই সিদ্ধিদ্বয়ের নাম বিশোকা। যোগী তখন সর্ব্বজ্ঞ, ক্ষীণক্লেশ বন্ধন এবং বশী হন। এই বিশোকা-সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হলে দোষবীজ ক্ষয় হওয়ায় কৈবল্য হয়। এ অবস্থায় বুদ্ধি দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্ম্মা হয়। সর্ব্বজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যের অতীত তুরীয় পুরুষ তত্ত্বকে শান্ত আত্মা বলে। যাঁরা বলেন, 'চিদ্রূপ আত্মায় ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠায় আত্মতত্ত্ব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।' একথা ভুল, কারণ অদ্বৈতবাদের কার্য্যব্রহ্ম বিবর্ত্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে শান্ত আত্মা তার দ্বারা ত্রিকালে কিছু মাত্র দুষ্ট হন না।

যোগী চার প্রকার—(১) প্রথম কল্পিক—অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের যাঁরা প্রবর্ত্তক, (২) মধুভূমিক—যাঁদের নির্ব্বিচার সমাধির দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ হয়েচে। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অপর নাম বৈশারদী-মধুমতী—এখানে অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ হয়। (৩) প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ—এখানে যোগী ভূত এবং ইন্দ্রিয়জয়ী বিশোকা সিদ্ধি লাভ করে কৈবল্য লাভে সচেষ্ট; এবং (৪) অতিক্রান্ত ভাবনীয়—এখানে যোগীর চিত্তবিলয় হচ্চে এবং সপ্তবিধ প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞা লাভ হয়েচে। মধুমতী ভূমিতে স্থানীরা (দেবতারা) যোগীদের প্রলুব্ধ করবার জন্য বলেন—"ভোরিহ আস্যতাম্, ইহ রম্যতাং, কমনীয়ঃ অয়ং ভোগঃ, কমনীয়া ইয়ং কন্যা, রসায়নং ইদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সং ইদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যামন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ব্বং ইদং উপার্জ্জিতম্, আয়ুষ্মতা প্রতিপদ্যতাম্ ইদম্ অক্ষয়ং অজরং অমর স্থানং দেবানাং প্রিয়ম্।" তখন যোগী সঙ্গদোষ ভাবনা করে বলেন—"ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া জনন-মরণান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন কথঞ্চিৎ আসাদিতঃ, ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ তস্য তে তৃষ্ণা যোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, স খলু অহং লব্ধালোকঃ কথং অনয়া বিষয়-মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিত তস্য এব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নেঃ আত্মানাম্ ইন্ধনী কুর্য্যাম্। স্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কৃপণজন প্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্যঃ।" তাই পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রের বিভূতি পাদের ৫২ সূত্রে বলচেন—স্থানীদের (দেবতা) দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁহাদের সঙ্গ করা বা স্ময় অর্থাৎ 'ওঃ, দেবতারা আমায় ডাকচেন' বলে আত্মপ্রশংসা করা উচিত নয়, কারণ তা থেকে আবার সংসাররূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ হবে।

পূর্ব্বে প্রাতিভ বা তারক-জ্ঞানের পর বিবেক-জ্ঞান আসে বলা হয়েচে। এক্ষণে সেই বিবেকজ্ঞান কী, তাই বলা হচ্চে। ক্ষণ এবং তার ক্রমগুলিতে সংযম করলেও বিবেকজ্ঞান হতে পারে। ব্যাস বলচেন, "অপকর্ষ পর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ"—সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্রব্যই পরমাণু। এবং "অপকর্ষ-পর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ"—সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কালই ক্ষণ। একদেশাবচ্ছিন্ন পরমাণুর অপর দেশ প্রাপ্তির বুদ্ধি কল্পিত কালকেই ক্ষণ (atomic epoch) বলে। পরমাণু না থাকলে কাল থাকে না, যেমন খাদ্য না থাকলে খাওয়া থাকে না। ব্যাস বলচেন, "ক্ষণস্তু বস্তু-পতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চঃ ক্ষণান্তর্য্যাত্মা"—পরমাণুর পরপর দে। পরিবর্ত্তনের ক্রম থেকে ক্ষণেরও ক্রম

জ্ঞান হয়। বাস্তবিক ক্ষণের সহিত ক্রমের কোনও সম্বন্ধ নেই, কারণ এক ক্ষণ পরক্ষণে থাকে না। সেইজন্য ক্রমও কাল্পনিক। অবশ্য বর্ত্তমান ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীতে পূর্ব্ব ক্ষণাবচ্ছিন্ন ও আগামী ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের শক্তিভাব থাকে। পরন্তু বর্ত্তমান ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীর উদয়ে পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীর ক্ষণ লয় পায়, কারণ ক্ষণগুলি পরিণামের সহিত একটা কাল্পনিক পরিমাপ। পূর্ব্বক্ষণ বা ভবিষ্যৎ ক্ষণ প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হয় না, হলেই তা বর্ত্তমান—সমস্ত জ্ঞানারূঢ় বিশ্ব এই বর্ত্তমানে আরূঢ়। ক্রম-কল্পনা থেকেই সেকেণ্ড, মিনিট, পল, বিপল, দিবা, রাত্র প্রভৃতি চিত্তের বিকল্প জ্ঞান হয়। সেইজন্য ব্যাস কালের সংজ্ঞা দিচ্ছেন—"বস্তু শূন্যঃ, বুদ্ধি নির্ম্মাণঃ, শব্দ জ্ঞানানুপাতী, লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তু স্বরূপঃ ইব অবভাসতে।"—কাল কোনও বস্তু নয়, কাল ব্যবহারিক জগৎ বোঝবার উপযোগী একটা বুদ্ধির কল্পনা, শব্দ ছাড়া এর জ্ঞান সম্ভব নয়, লৌকিক ব্যুত্থিত দর্শন অর্থাৎ যারা জাগ্রৎ ভূমিতে অবস্থান করে, তাদের কাছেই এটা একটা বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।

বিবেকজ জ্ঞান থেকে আর একটা বিভূতি জন্মে। দুটি বস্তু তুল্যরূপ প্রতীয়মান হয় কেন, না তাদের জাতি লক্ষণ ও দেশের অন্যতা-অনবচ্ছেদহেতু অর্থাৎ সাদৃশ্য হেতু। কিন্তু বিবেক-জ্ঞানে সেই তুল্য বস্তুর সূক্ষ্ম ভেদ-জ্ঞান সিদ্ধ হয়। ধরুন একটা আমলকীর জায়গায় আর একটি একইরূপ আমলকী রাখলে চেনা খুব কঠিন, কারণ তারা সদৃশ্য জাতি, লক্ষণ ও দেশ বিশিষ্ট। কিন্তু যাঁদের ক্ষণ ও ক্রমজ্ঞান সিদ্ধ হয়েছে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ দুটি তুল্য দৃষ্ট পদার্থের শরীর সংস্থান (মূর্ত্তি) ও আকৃতি (ব্যবধি) ক্ষণিক সূক্ষ্ম ভেদ-জ্ঞান দ্বারা তাদের বাহ্য ভেদও অবগত হতে পারেন। নিকটস্থ তুল্যদ্রব্য আমরা কতকটা অণুবীক্ষণ সাহায্যে ধরতে পারি। একই কারণে আকাশের একটা তারার সহিত আর একটা তারাকে আমরা গুলিয়ে ফেলি, সেটা খানিকটা পরিষ্কার হয় দূরবীক্ষণ সাহায্যে। কিন্তু যাঁরা সমাধি-সিদ্ধ তাঁরা প্রজ্ঞালোকের দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ অবগত হতে পারেন।

এই বিবেকজ-জ্ঞান—(১) তারক, (২) সর্ব্ব-বিষয়, (৩) সর্ব্বথাবিষয় এবং (৪) অক্রম। (১) তারক স্বপ্রতিভা হতে জাত (Intuition), উপদিষ্ট নয়। (২) সর্ব্ববিষয় তার আয়ত্ত। (৩) সর্ব্বথা-বিষয়=ত্রৈকালিক। (৪) অক্রম=যা একই ক্ষণে বুদ্ধি উপরূঢ় সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থের বহুবাক্য একসঙ্গে পড়তেন। কিন্তু এসব বিভূতি মাত্র, কৈবল্য জ্ঞানের একমাত্র উপায় সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের (আত্মা) শুদ্ধি ও সাম্য। রজস্তমোমল-শুদ্ধ বিবেকখ্যাতি-মাত্র-বুদ্ধি পুরুষের সহিত সাম্য অবস্থা লাভ করে, এরই নাম কৈবল্য।

দ্বৈতবাদীদের মতে সাম্য=সাদৃশ্য, পরন্তু অদ্বৈতবাদীদের মতে সাম্য অর্থে ঐক্য। ঐক্য অর্থ গ্রহণ করলেই তবে কেবল বা এক-জ্ঞান সিদ্ধ হয় আর ৬৩ সাংখ্যকারিকাও বলছেন, "বিমোচযতি এক রূপেণ।" আর বুদ্ধি বা প্রকৃতি জ্ঞানোদয়ে অন্তর্দ্ধান হন সে সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর কারিকায় অলঙ্কার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন—

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে
মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ণ দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥
৬১ কারিকা॥

আমার বোধ হয় যে প্রকৃতির ন্যায় সুকুমারতর আর কিছু নেই, কারণ, 'পুরুষ আমায় দর্শন করেছেন' ভেবে, তিনি আর কখনও পুরুষের দর্শনে পড়েন না। এরই দার্শনিক ভাষা হচ্চে—শুক্তি-গ্রহ হলে আর রজত জ্ঞান থাকে না। রজতের পৃথক সত্তা থাকলে তো সমাধিতেও দৃশ্যভূত হয়ে থাকত। আর নইলে বলতে হয় সমাধি একটা পুরুষের সুষুপ্তির মত অচৈতন্য-অবস্থা, যার জন্য দৃশ্য সত্তা থাকলেও তা পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় না। অথবা কৈবল্য একটা অমনোযোগ অবস্থা, যখন চিত্ত একদিকে ধাবিত হয় বলে দৃশ্য সত্তা স্মরণ হয় না, কিন্তু তা হলে এ অবস্থা থেকে ব্যুত্থানও খুব স্বাভাবিক। কাজে কাজেই বলতে হয়, কৈবল্য সমাধিকালে দৃশ্যরূপ যে পুরুষের কল্পনাজাল তা আত্যন্তিক ভাবেই বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পনা উপাধির বৈচিত্র্য দ্বারা একাত্মাকে যে বহু পুরুষরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল তাও বিলয় প্রাপ্ত হয়ে, "একরূপে মুক্তিলাভ করে"।

মাতৃভাবের সাধক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

ঈশ্বরের যেমন অনন্ত ভাব ও অনন্তরূপ, তাঁহার সাধনার মত ও পথ তেমনি অনন্ত। যে সাধক যে ভাবে তাঁহার উপাসনা ও যেরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইতে অভিলাষী হন, তিনি তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে ও সেইরূপেই দেখা দিয়া থাকেন। কারণ, "উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।" সাধকের সাধনার সৌকর্য্যার্থ ব্রহ্ম রূপপরিগ্রহ করেন। ঐ অপ্রাকৃত রূপ তোমার আমার দেওয়া কাঠের, মৃত্তিকার বা পাষাণের জড়মূর্ত্তি নহে। উহা চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও নিরাকার। যাঁহাকে ভগবান্ ব্যাসদেব সমাধিযোগে দর্শন করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবতে বলিয়াছেন, "স্বেচ্ছোপাত্তবিগ্রহ", অর্থাৎ স্ব, কিনা ভক্তের ইচ্ছানুরূপ রূপধারী। ফলতঃ ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বস্তু থাকিলেও উহা যেমন সকলের সমভাবে রুচিকর হয় না, তেমনি ব্যবহারিক জীবের সাধনার পথও সকলের নিকট সমান সহজ সুগম ও তৃপ্তিকর হইতে পারে না। কেন না মানবের রুচিভেদের উপর আইনের শাসন চলে না। উহা সম্পূর্ণ প্রাক্তন সংস্কার ও স্বভাব-সাপেক্ষ। বৈষ্ণবসাধক চূড়ামণি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "এষা রসস্থিতিঃ", অর্থাৎ কাহারও প্রতি কাহারও স্বাভাবিক প্রীতি কিংবা অপ্রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই; যেহেতু উহা রস বা অনুরাগের স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্ম। সাধনার নিয়ামক অনুরাগ। যিনি যেভাবের ও যেরূপের বিশেষ অনুরক্ত, তিনি সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সেইরূপেই উপাসনা করেন। ঈশ্বরের ভাব ও রূপ অনন্ত হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে ভগবানের মাতৃরূপটী সকলেরই সুখগ্রাহ্য ও সহজোপলভ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের খ্যাতনামা মাতৃসাধক ভক্ত নীলকণ্ঠ গাহিয়াছেন ;—

"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপসার।
সর্ব্বলীলা প্রকাশিলা প্রসবিলা ত্রিসংসার॥"

বলা বাহুল্য, সর্ব্বংসহা ভূতধাত্রী বসুমতীর ন্যায় ত্রিজগতপ্রসবিত্রী বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি, মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি যদি মূল প্রকৃতিরূপে অনন্ত কোটি জীবের জননী, ধাত্রী ও পালয়িত্রীরূপে এ জগতের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অনুস্যূত না থাকিতেন, তাহা হইলে অরক্ষিত ও অসহায় জীবের অস্তিত্বই সম্ভবপর হইত না। ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার পঞ্চম বেদ স্থানীয় মহাভারতে দুরূহ মাতৃতত্ত্বের পরিচয়ে সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন,—

"গর্ভসন্ধারণাদ্ধাত্রী জননাজ্জননী মতা।
অঙ্গানাং বর্দ্ধনাদম্বা বীরসূত্বেন বীরসূঃ॥"

'মা গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া "ধাত্রী" জন্মের হেতু বলিয়া "জননী", লালন পালন সাহায্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধন করায় "অম্বা", এবং বীরপুত্র প্রসব করেন বলিয়া "বীরসূ" নামে অভিহিত হন।' এই সংজ্ঞার্থটী আমরা স্বদেশমাতৃকা অর্থেও গ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, আমরা সকলেই মাতা বসুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি, বসুমতী আমাদের সকলের জন্মক্ষেত্র, মাতা বসুন্ধরার ফলে জলে, শস্যরসে, তাপে ও আলোকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরিপুষ্ট হয়; এবং স্বদেশ মাতৃকার অমোঘ আশীর্ব্বাদেই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং আমরা গর্ভাবস্থা হইতেই করুণাময়ী জননীর

অশেষ দয়া, সদ্‌গুণ ও শক্তির সহিত অনেকটা পরিচিত হই। বিশ্বরূপিণী ঈশ্বরী মাতৃশক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রতিমা নিজ নিজ প্রসূতিকে আজন্ম নয়ন-গোচর করি ও তাঁহার অপার স্নেহমমতায় জীবনধারণ করিতে সমর্থ হই। মাতৃভাবের সাধনসহায়ে আমরা যেমন অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেও নির্ভয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারি, অন্যত্র ঠিক তেমনটী পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ কলিযুগে শক্তি সাধনার পথ সুপ্রশস্ত। ইহাকে আধুনিক বা উদ্ভট মনে করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। বেদবেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরাণতন্ত্রের শক্তি একই বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ। জড়বাদের অভ্যুদয়কাল এই তামসযুগে মায়াশক্তিকে সাধনার দ্বারা সুপ্রসন্ন করিতে না পারিলে জপ পূজাদি সমস্তই বৃথা। তন্ত্রের বিধান :—

"বৃথা ন্যাসো বৃথা পূজা বৃথা জপো বৃথা স্তুতিঃ।
বৃথা স্যাদ্দক্ষিণা হোমঃ সত্যঃ প্রীতিকরঃস্ত্রিয়ঃ॥"

তাৎপর্য্য, শ্রীভগবানের মায়াশক্তি (স্ত্রীজাতিকে) স্বকর্ম্মদ্বারা প্রীত করিতে না পারিলে এই যুগের জপ হোমাদি সকল সাধনাই বৃথা। তন্ত্রের এই উক্তি শুনিয়া বর্ত্তমান নাস্তিকতার যুগে অনেকেরই হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু স্ত্রীমাত্রেই ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত্তপ্রতীক, এই ভাবে সাধনার নামই মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা। শক্তির উপাসনা না করিলে জড় দেহাধারে সুপ্ত আত্মশক্তি উদ্বোধিত হন না। আত্মশক্তির উন্মেষ বা চৈতন্য শক্তি ক্রিয়াশীলা না হইলে জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ সুদূরপরাহত। উপনিষদের ঘোষণা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" চৈতন্য শক্তি আমাদের অন্তর্নিহিত থাকিলেও ঘর্ষণ ব্যতিরেকে অনলোৎপত্তির ন্যায় উপাসনা ব্যতিরেকে কার্য্যকরী হন না।

এখন ঈশ্বরকে মাতৃশক্তিরূপে উপাসনা করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে শক্তিভক্ত স্যার জন্ উড্রফ্‌এর সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ গ্রন্থ 'শক্তি ও শাক্ত' হইতে প্রমাণস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—"God is worshipped as the Great Mother, because in this aspect God is active, and produces, nourishes and maintains all. But this is for worship God is no more female than male or neuter God is beyond sex The power or the active aspect of God, immanent is called Sakti"—এই কথাগুলির সার মর্ম্মই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব সক্রিয় ব্রহ্মের বিভূতি রূপে স্ত্রীমাত্রেই মাতৃ-ভাবের বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারাই এই সাধনার পরাকাষ্ঠা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ মহান্ তত্ত্ব অভ্যাসের দ্বারা কিরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, উহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই সাধনার প্রথম ও প্রধান স্তর সাধকের দৃষ্টিপথ হইতে স্ত্রীপুরুষ ভেদবুদ্ধির বিলোপ সাধন। কারণ আমাদের আত্মা অলিঙ্গ সুতরাং স্ত্রীপুরুষ ভেদবিবর্জ্জিত। অবশ্য কথাটা শুনিতে যেমন কঠিন কার্য্যতঃ তেমনই দুঃসাধ্য। স্ত্রীচিহ্ন ও পুরুষচিহ্নটী গর্ভে অবস্থানকালে সাধারণতঃ ষষ্ঠ মাসে (গর্ভোপনিষৎ) দেহে সংযুক্ত হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানমতে অবৈধ ভাবে নিহত শিশুর শবব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রাপ্ত চিহ্নানুসারে উহার বয়স ও স্ত্রী পুরুষ জাতি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক লঘুগুরু দণ্ডের ব্যবস্থা আর্য্যজ্ঞানপ্রসূত গর্ভোপনিষদুক্ত সত্যেরই পূরাপুরি সমর্থন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রামাণিক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আত্মার অলিঙ্গত্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। যথা—

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥" ৫।১০

অর্থাৎ অণ্ডজ জীবের (পক্ষিসর্পাদির) অণ্ডের ভিতর সুরক্ষিত ডিম্বাণু (Ovum)র মত স্ত্রী পুরুষ বা ক্লীব যে যে শরীরে এই আত্মা আশ্রিত বা উপহিত হন, তিনি সেই সেই নামে (স্ত্রী পুরুষাদি শব্দে) আখ্যাত হন। প্রকৃতপক্ষে আত্মা স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক কিছুই নহেন। অনাম, অরূপ আকাশ যেমন তত্তৎ উপাধি ভেদে গৃহাকাশ, ঘটাকাশ, দেহাকাশাদি কল্পিত নাম ও রূপে বিশেষিত হইয়া থাকে, নিরাকার, নিরবয়ব আত্মার স্ত্রী পুরুষাদি নামরূপ তদ্রূপ নিছক কল্পনা। ব্যবহার ক্ষেত্রে দেহোপহিত আত্মার স্ত্রীপুরুষভাবে বিচরণ ছায়া শরীরের গমন, শয়ন ও উপবেশন তুল্য। ফলতঃ বাল্যে আমরা যেমন জুজুর ভয়ে জড়সড় হই, কিন্তু বয়োবৃদ্ধিসহকারে জ্ঞানের উন্মেষে উহাকে অতি তুচ্ছ মনে করি, সেইরূপ কামকিঙ্কর সংসারী অবস্থাতেই স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধি আমাদের নরাকার পশু করিয়া রাখে। এই মিথ্যা পশু-ভাব মোচনার্থে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের জন্য মধুর মাতৃভাবের সাধনার সুদৃঢ় স্বর্ণ-সোপান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সরস ও মনোহর সাধনার একটী নিগূঢ় ইঙ্গিতও আছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জ্ঞান-মন্দির "বিবেকচূড়ামণি" গ্রন্থে আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,

"অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ॥" ৪৪৬

'যেমন অত্যন্ত কামার্ত্ত ব্যক্তিরও কামলালসা মাতৃ-বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়, তদ্রূপ পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদিত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও সকল বিষয়-বাসনা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।' এই সুদুর্ল্লভ তত্ত্বোপদেশগুলি সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসি-শিরোমণির কেবল 'কথার কথা' কিংবা বাগাড়ম্বর নহে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যোপাখ্যান গ্রন্থে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে। একদা অতি শৈশবে পরিত্যক্ত জনৈক ইংরাজ বালক যুবাবয়সে অসচ্চরিত্র বন্ধুবর্গের সহিত কোন বারবনিতা গৃহে উপস্থিত হইয়া বয়স্যবর্গকর্ত্তৃক ঐ রমণীর সহিত রহস্যালাপাদি করিতে পুনঃ পুনঃ উপরুদ্ধ হইয়াও বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল। অনন্তর সে সলজ্জভাবে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিল যে, ঐ পতিতা রমণীই তাহার জননী!

উদ্ধৃত তত্ত্বোপদেশের প্রতি বর্ণাংশ সত্যের অমৃতরসে সিক্ত। 'জল শীতল', 'মধু মধুর', এই সনাতন সত্য ততক্ষণ বা ততদিন উপলব্ধির পথে আসিবে না, যতক্ষণ বা যতদিন আমি পিপাসিত ও ক্ষুধিত হইয়া উহাদের আস্বাদ গ্রহণ করিতে না শিখিব। সেইরূপ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের উপদিষ্ট, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষীকৃত "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু", 'সকল জগতের সকল স্ত্রী আমি', দেবী ভগবতীর মুখপদ্মনির্গত এই মধুময় হিতোপদেশ শুম্ভ নিশুম্ভের ন্যায় আসুরী প্রকৃতি-বিমূঢ় আমরা সাধনা বলে যতদিন রণক্ষেত্রে মহাদেবীর দিব্যাঙ্গে সাম্মিলিত অনন্ত দেবীর মত জগতের যাবতীয় স্ত্রীদেহে স্নেহঝলমল আনন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তির সূক্ষ্ম সন্ধান না পাইব, ততদিন পশুসুলভ কাম দাসত্বেই দুর্লভ মানবজীবন বৃথা ক্ষয় করিব। এই দুশ্ছেদ্য মোহময় পশুপাশচ্ছেদনের জন্যই দয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার অসি মাতৃভাবের সাধনা। এখন চাই আমাদের সেই উদার দৃষ্টি ও সুনির্ম্মল জ্ঞান, যাহার প্রভাবে আমরা তাঁহার সাধনার পথটি চিনিয়া দৃঢ় ও দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারি।

অন্যান্য যুগের সাধকগণ সাধনা ক্ষেত্রে মাতৃ-জাতিকে যেরূপ বিভীষিকাময়—প্রতিবন্ধক ভাবিয়া দূরে দূরে ছিলেন, মাতৃভক্ত সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই আরাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিপ্রবর বন্দ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য যেমন নারী-জাতির প্রতি "দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী" বলিয়া সুতীব্র কটাক্ষ হানিয়াছেন, তাঁহার বহু পরবর্ত্তী

বিপত্নীক সাধক তুলসীদাস ভয়বিজড়িত কণ্ঠে নারীকে তেমন ধিক্কার দিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রোক্ত সাধকেরা যাহাদিগকে দেখিয়া সিংহী ব্যাঘ্রী বোধে মূর্চ্ছা যাইতেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক তাহাদের সাহায্যে দুরূহ সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পূজনীয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুপদেবরণ করাই এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ।

তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"তুমি আমাকে কেমন দেখিয়া থাক?" ঠাকুরের উত্তর—মন্দিরে যে মা বিরাজ করিতেছেন, নহবৎ ঘরে যে মা (জননী) বসিয়া আছেন, আমি তোমাকে ঠিক সেইরূপই দেখিয়া থাকি। আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসী অনেকে হয়ত ইহা বিশ্বাস করিতে সাহসী হইবেন না, প্রত্যুত ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সন্দিহান হইবেন। কিন্তু ইহাতে কিছু যায় আসে না। অন্ধ সূর্য্য চন্দ্রকে গালি দিলে বা মলিন বলিলে ঐ গালিদাতার চক্ষুর দোষ ও বুদ্ধির অভাবই প্রকাশ পায়। উহাতে জগজ্জ্যোতি সূর্য্য চন্দ্রের কোনই হানি হয় না। যাঁহার অহেতুক কৃপায় তাঁহাকে চিনিবার মত চক্ষু ও বুঝিবার মত বুদ্ধি পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রের ঋষি, মহাপ্রভাব বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—যে জীবন হইতে সমগ্র বিষয়াসক্তি নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছিল, সেই জীবনের পবিত্রতার বিষয় স্থিরচিত্তে অনুধাবন কর। যিনি নিজকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত ও স্ত্রীভাবে বিভাবিত করিয়া প্রত্যেক স্ত্রীকে এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বদন-কমল উঁহার নিষ্কলুষ দৃষ্টিপথে রূপান্তরিত হইয়া সমগ্র মানবজাতির পালয়িত্রী দেবী ভগবতীর আনন্দময় ও জ্যোতির্ম্ময়রূপে নিরন্তর প্রতিভাত হইত। ভারতে এখন আমরা এই ভাবের সাধনারই পূর্ণপ্রভাব দেখিতে চাই।

উপসংহারে বক্তব্য, এটা প্রগতির যুগ। প্রগতির ঠিক অর্থ বোধহয় উন্নয়ন বা উন্নতি। অবনতি কিংবা হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উচ্চতর অবস্থা লাভ উন্নতি পদবাচ্য। লেখকের সান্ত্ববিশ্বাস দীনবন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত মাতৃভাবের অধ্যাত্ম সাধনার পবিত্র পথে ভারতীয় নরনারীগণ যতদিন একযোগে ও সমভাবে অগ্রসর হইতে না শিখিবেন, ততদিন তাঁহাদের তথাকথিত প্রগতি অধোগতির প্রকারভেদ মাত্র থাকিবে।

হিমালয়ের বাণী

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

সার্ব্বভৌমভাবসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট বিশ্ব সবাক্‌। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ব্যতীত অন্য কেহ বিশ্বের বাণী শুনিতে পাবে না। এই ঋষিগণই পার্থিব সুখভোগেব অনিত্যতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া পবম শান্তি ও আনন্দেব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাবা পার্থিব সুখ পবিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ফলে তাঁহাদের বহুত্বের মধ্যে একত্বেব পরিদৃশ্যমান্‌ জগতেব মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত এক বিরাট পুরুষের—প্রত্যক্ষানুভূতি হইল। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণই সর্ব্বপ্রথম হিমালয়েব বাণী শুনিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন।

যে সকল সাধাবণ ব্যক্তিব দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেব বাহিবে কখনও প্রসারিত হয় না তাহাবা স্বতঃই জানিতে উৎসুক, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ কিরূপে এবং কেন এই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। ভাবতে হিমালয় কি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—এই সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান নাই একমাত্র তাহারাই এই সকল প্রশ্ন সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা কবিয়া থাকে। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে ভাবতবর্ষ ও হিমালয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে ভাবতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও অসাধারণ দেশ। সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও ভারতবর্ষের ন্যায় দ্বিতীয় আর একটি দেশ কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। জল ও স্থলের বিচিত্র বিভাগসমূহ এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। জলবায়ু, কৃষিজ, বনজ, খনিজ প্রভৃতি সম্পদের তুলনা আর কোথাও মিলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ভারতেই সেই সকলের অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এইজন্যই ভারতবর্ষকে 'ছোট খাট' পৃথিবী বলা হইয়াছে।

উত্তরে চিরতুষারাবৃত উত্তুঙ্গ হিমালয় প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং অন্যান্যদিকে সাগর ও মহাসাগব দ্বাবা পরিবেষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষ বাহিরেব জগতের সকল সম্পর্ক হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। এইরূপে ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতেই স্বয়ং প্রকৃতিদেবীর বম্য লীলা-নিকেতন। বাহ্যজগতের কোলাহল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া ভারতের মনীষা অন্তর্মুখী হইয়া অন্তর্প্রকৃতিব বহস্যোদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইল। ফলে ভাবতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, দর্শন, নীতি বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, কলা ও সাহিত্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিল। ভারতবর্ষ এমন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব কৃষ্টি ও সভ্যতাব কেন্দ্রস্থল হইল যে, এখান হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি আবব, মিশর ও আসিরিয়ার মধ্য দিয়া সুদূব ইউবোপ খণ্ডেব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। ভারত গৌবব ও মহিমমণ্ডিত হইল। কিন্তু ভারতের হিমালয়ই এই গৌববের যথার্থ অধিকারী। হিমালয়কে বাদ দিলে ভারত মুকুটমণিহীনা রাণীর ন্যায় পরিগণিত হইবে। হিমালয় ব্যতীত অন্য কিছুর নিকটই ভাবত তাহার সৌন্দর্য্য, সম্পদ, ও আকর্ষণের জন্য এত অধিক ঋণী নহে।

ভারতীয়গণ হিমালয়কে শুধু প্রস্তরপুঞ্জ অথবা পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়াই দেখে না। তাহারা নিঃসঙ্কোচে ও সশ্রদ্ধভাবে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত একমত না হইয়া হিমালয়কে অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে দেখিতে চায়।

যে সকল বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া শ্রীভগবান রহিয়াছেন, সেই সমস্ত বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য জানিতে উৎসুক হইয়া গীতায় অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"কথং বিদ্যামহং যোগিন্ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্। কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥" গীতা ১০।১৭॥ অর্থাৎ, হে যোগিন্! আমি অতি স্থূলমতি! আর তুমি দেবগণেরও জ্ঞানাতীত। সর্ব্বদা কিরূপে তোমাকে ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ ভাবে আমি তোমায় ধ্যান করিব? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রধান প্রধান দিব্যবিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥" ১০।২৫ গীতা। অর্থাৎ মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর ওঁকার আমি, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ আমি এবং স্থাবরের মধ্যে হিমালয় আমি। অতএব পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় ও পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়কে হিন্দুগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশরূপে দেখিয়া থাকেন।

ভারত তাহার সম্পদ, জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তের জন্যই হিমালয়ের নিকট ঋণী। ইহা হইতেই দেবতাত্মা হিমালয়ের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয়।

বিন্ধ্যগিরি হিমালয়ের সহিত সমান্তরালভাবে ভারতের মধ্যভাগে অবস্থিত আছে। দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতদ্বয়ের ভিত্তিভূমিরূপে বিন্ধ্যাচল দণ্ডায়মান। ভূতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইবে যে, এই সকল পর্ব্বত ভূগর্ভস্থ স্তরে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। পর্ব্বতের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'ভূধর'। হিমালয় হইতে পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্য্যন্ত পর্ব্বতমালা সাগর ও মহাসাগরের গ্রাস হইতে ভারতবর্ষকে ধারণ করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, হিমালয় স্নেহময় পিতার ন্যায় আপন প্রিয়তমা দুহিতা ভারতকে ভারতমহাসাগরের অতল গর্ভে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিতেছে।

সমুদ্র হইতে সর্ব্বদা বাষ্প উত্থিত হইয়া যে মেঘমালার সৃষ্টি হয়, উহারা তিব্বতের মালভূমি বা রুশিয়ার সমতল ক্ষেত্রে বিতাড়িত হইতে পারে না। অভ্রভেদী হিমালয়ের গাত্রে প্রতিহত হইয়া মেঘমালা ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর বারি বর্ষণ করে। ফলে নদনদী সকল জলপূর্ণ ও ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা বশতঃ প্রচুর শস্য, ফল, ফুল, তৃণগুল্ম ও শাকসবজী জন্মে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ 'রসানাং রসতমঃ' অর্থাৎ সর্ব্বরসের রস সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে প্রাণিজগৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বলিয়াছেন, "এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসোঽপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্রসো বাচ ঋগ্রস ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথো রসঃ। স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ১।২ ৩ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। অর্থাৎ সর্ব্বভূতের রস পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস ওঙ্কার। এই ওঙ্কার সর্ব্বরসের রস এবং পরমাত্মার উপযুক্ত অধিষ্ঠান। সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যায়, হিমালয় উদ্ভিদ্ জগতের প্রধান কারণ হইয়া যে কেবল খাদ্যই সরবরাহ করিতেছে তাহা নহে, উপরন্তু হিমগিরি ভারতের অন্যান্য বিপুল সম্পদেরও মূলীভূত কারণ।

এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের একটি বিশিষ্ট বাণী আছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এই বাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতের অচলত্ব ও অপরিবর্ত্তনশীলতা চরমসত্যের প্রতিই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

চরম সত্য সদা অপবিবর্ত্তনীয়। ইহা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে একরূপ।

চিবধবল অনন্ত তুষাবরেখা পবিত্রতাব প্রতীক। এতদ্ব্যতীত সর্ব্ব বর্ণের সমাবেশ দ্বাবা একত্ব বা বিশ্বজনীনতা জ্ঞাপিত হয়। এইরূপে চবমসত্য বিশ্বজনীন। চরমসত্যকে কোনও এক বিশেষ ধর্ম্ম বা মতবাদের সহিত একীভূত কবা যায় না, ইহা সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বমতবাদের মিলনভূমি।

অসংখ্য উত্তুঙ্গ তুষাব-ধবল শৃঙ্গরাজি সুদূব শূন্যমার্গে শুভ্র ধ্বজাব ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া পৃথিবীব যুধ্যমান জাতিসঙ্ঘেব নিকট শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচাব কবিতেছে। ইহাবা পৃথিবীব অত্যাচাব, উৎপীড়ন ও দুষ্কৃতিব বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, বড বড কথা বলিয়া এবং তৎসঙ্গে যুদ্ধেব আয়োজন কবিয়া পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পাবে না; একমাত্র পাবস্পবিক প্রেম, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা দ্বাবাই প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে।

হিমালয়েব বিভিন্ন অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া নদী সকল নানা প্রদেশেব মধ্য দিয়া সমুদ্রে পতিত হইতেছে—ইহারা নির্দ্দেশ কবিতেছে যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন ধর্ম্মমত শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবাব বিভিন্ন পথ ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীভগবান্‌কে কেন্দ্র কবিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমত তাঁহাব দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

হিমালয়ের অসংখ্য গভীব কন্দর ও গহন কানন ধ্যানী ও যোগিদের তপস্যা স্থান। এই হিমগিরিতেই ভারতের বালকগণ জীবন প্রভাতে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত হইবাব জন্য গমন কবিত। এখানেই বিদ্যার্থীসকল অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের সম্যক্‌ বিকাশেব সহায়ক প্রকৃত শিক্ষা (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভ কবিবাব জন্য গমন কবিতেন। হিমালয়ের এই সকল নিভৃত কন্দর ও গহন কাননই শান্তি ও জ্ঞানপিপাসু যুবক-বৃদ্ধ সকলের সাধন ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান ছিল। এই সকল তপস্যাপূত স্থানই কালে তীর্থস্থানে পবিণত হইল।

হিমালয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুনি-ঋষি, তপস্বী যোগিদের সাধনপীঠ। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরেই তাঁহারা ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, ধ্যান এবং একনিষ্ঠ সাধনার জীবন যাপন করিয়া অনেক আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। এই সকল সত্যই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকলের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এথানে সম্ভবপব নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিথানা বেদ আছে। ঋক্‌বেদে ২১ খানা, যজুর্বেদে ১০৯ খানা, সামবেদে ১০০০ খানা এবং অথর্ব্ববেদে ৫০ খানা গ্রন্থ আছে। ইহাদেব প্রত্যেকখানায় আবার একখানা উপনিষদ আছে। সর্ব্বসাকল্যে, ১১৮০ খানা উপনিষদ আছে। ইহাদের মধ্যে ১০৮ খানা প্রধান উপনিষদ শ্রীবামচন্দ্র রামদূতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বেদের পর স্মৃতি ও পুবাণ প্রামাণ্য। ইহারা শ্রুতির প্রামাণ্যের উপব নির্ভর কবে।

ভারতবর্ষ বড় বড় মনীষীর জন্মস্থান। তাঁহাদের চিন্তার ধাবা হিমালয়েব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দ্বারা বহুল পরিমাণে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংরেজ কবি সেক্ষপিয়র প্রধানতঃ মনীষাব রাজ্যে বিচবণ করিতেন। তিনিও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানুষ নাগরিক কোলাহল হইতে দূরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গভীব নির্জ্জনতার মধ্যে বৃক্ষ, স্রোতস্বতী, প্রস্তর ও প্রকৃতির অন্যান্য লীলা-বৈচিত্র্যেব নিকট অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারে। ভারতীয় ঋষিগণ গভীর তপস্যার ফলে যে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য হইতে অপূর্ব্ব প্রেরণা লাভ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার স্থান কোথায়? এই জন্যই ভারতীয়

ঋষিগণ সেই অমৃতত্বের সন্ধান পাইয়া বলিয়াছিলেন —"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (হে সৌম্য, প্রথমে সেই একমেবাদ্বিতীয় চৈতন্যই ছিলেন)। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" (সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, ঋষিগণ ইহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন)।

যদি আমরা চারি বেদের চারিটি মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম), 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই), এবং 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (সেই আত্মাই ব্রহ্ম) বিচার করি, তবে দেখিতে পাই যে এই সকলের মধ্যে একই সত্য নিহিত আছে। যদি 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যটি বিচার করা যায়, তবে ইহাতে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বমসি মহাবাক্যটি নিম্নলিখিতভাবে প্রায় সকল বিভক্তিতে বিশ্লেষণ করা যায় :—

(১) তৎ ত্বং অসি (তুমি সেই)
(২) তেন ত্বং অসি (তাঁহার দ্বারা তুমি)
(৩) তস্মৈ ত্বং অসি (তাঁহার জন্য তুমি)
(৪) তস্মাৎ ত্বং অসি (তাঁহা হইতে তুমি)
(৫) তস্য ত্বং অসি (তাঁহার তুমি)
(৬) তস্মিন্ ত্বং অসি (তাঁহাতে তুমি)

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, দ্বৈতবাদী মধ্ব এবং বল্লভ—শুধু তাঁহারা নহেন, ভারতের সকল দার্শনিকই তাঁহাদের নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই মহাবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

এইরূপে হিমালয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের জন্মস্থান হইয়াছিল। ভিন্ন মত পোষণ করিলেও এই সকল দার্শনিক মতবাদকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈত। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়াছিল—"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" অর্থাৎ কোটি কোটি ধর্মগ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে উহাই অর্দ্ধশ্লোকে ব্যক্ত করিব —ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহই নয়। ইহা কি সমস্ত দর্শনের চূড়ান্ত নয়? আর এই দার্শনিকতত্ত্বটিই সর্ব্বপ্রথম হিমালয়ের বক্ষে আবিষ্কৃত ও অনুভূত হইয়াছিল।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিমালয়ের বাণী শুধু ভারতের জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য। কারণ ভারত হইতেই যুগে যুগে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী সমগ্র পৃথিবীতে বিঘোষিত হইয়াছে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সম্রাট ও রাজন্যবর্গের যুদ্ধবিগ্রহের —ইতিহাস নহে—ইহা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় উৎসৃষ্টপ্রাণ মুনি-ঋষিগণের জীবনকথার ইতিবৃত্ত। জগতের ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে সমগ্র পৃথিবী হিমালয়ের বাণী অনুসরণ করুক্। আসন্ন বিনাশ হইতে উদ্ধার পাইবার ইহাই একমাত্র রক্ষাকবচ। কারণ হিমালয় বিশ্ববাসীকে বস্তুতান্ত্রিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞানলাভের জন্য আহ্বান করিতেছে।*

---

* কোলাপুর রাজারাম কলেজে (বম্বে) প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীরমণীকুমার দত্ত-গুপ্ত, বি-এল, সাহিত্য-রত্ন কর্তৃক অনূদিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি

কৃপালাভ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

দিব্যই হউক বা যাহাই হউক, যাহা একদিনের ক্ষণকালের অনুভূতি মাত্র, তাহাকে সংসার-সমুদ্রের ধ্রুবতারাস্বরূপ গণ্য করা বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সুদূর কৈশোর হইতে আজ এই বার্দ্ধক্যের প্রায় শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার অন্তরাকাশে তাহার উজ্জ্বল স্মৃতি ধ্রুবতারারই মত একই ভাবে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এই দীর্ঘ জীবন-যাত্রা পথে অনেক উত্থান পতন সুখ দুঃখের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এমন কতবার কত দুর্দ্দিন আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছে, যখন জ্ঞানবুদ্ধির হস্তে পরাস্ত হইয়া বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি এবং বিশ্বাস ভক্তি বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণ আশ্রয়শূন্য অবস্থায় চারিদিক অন্ধকার দেখিয়াছি। কিন্তু তখন কোথা হইতে চকিতে সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া সেই দিব্য অনুভূতির উজ্জ্বল স্মৃতি আমার মানসপট আলোকিত করিয়া দেখা দিয়াছে এবং দিকভ্রান্ত সমুদ্রাশ্রয়ী নাবিক যেমন সহসা ধ্রুবতারা দর্শনে পুনরায় আপনার লক্ষ্য পথের আভাস প্রাপ্ত হইয়া কতকটা স্থিরচিত্ত হয়, তেমনি আমিও পুনরায় সেই দিব্য অনু-ভূতির কথা স্মরণে আশ্বস্ত হইয়াছি। ভাবিয়াছি, তাইত মনুষ্য জীবন যদি সত্যই এমন সত্যহীন, উদ্দেশ্যবিহীন, লক্ষ্যশূন্য, চার্ব্বাকাদি অনীশ্বরবাদীর মতানুযায়ী ভূতসমষ্টির মিথ্যা মায়ার খেলা মাত্র হয়, তাহা হইলে কিসের জন্য সেদিন পরমহংসদেবের ক্ষণিক করস্পর্শে জাগতিক সকল জ্ঞান হারাইয়াও আমার অন্তরাত্মা কাহার বিরহে বা কোন্ বস্তুর অভাবে আপনার অপূর্ণতা অনুভব করিয়া অমন মর্ম্মাহত ব্যাকুলতায় সেই সর্ব্বগ্রাসী মহাশূন্যে হাহাকার করিয়া বেড়াইয়াছিল, ইহা কি কেবল ক্ষণিকের ভাববিহ্বলতা মাত্র, না ইহাও সেই মিথ্যা মায়ার জৃম্ভণ? আমি ত কেবল ভাব লইয়া তাঁহার কাছে যাই নাই বা সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যে তাঁহার সহিত এমন কোন বিষয়ের আলোচনাও হয় নাই যাহাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন অদ্ভুত ভাবাবেশ আমাতে ঘটিতে পারে। না, জীবন কখনই সত্যশূন্য নয়। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় সত্যনিহিত আছে। তাই সেদিন সেই সত্যসংকল্প নিত্যচিন্ময় ভাগবত-তনুর দিব্যস্পর্শে সেই গুহ্যতম সত্যের চেতনার আভাস প্রাপ্তিমাত্রেই আমার অন্তর্নিহিত চিৎশক্তি জাগরিতা হইয়া নিজ প্রত্যক্ষভূত জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতে যাহাতে মিথ্যা যুক্তি কল্পনা জল্পনারূপ জ্ঞান-বুদ্ধিনাশী অন্ধকার রাশির মধ্যেও ধ্রুবতারা দর্শনে দিকহারা নাবিকেরই মত সত্যাভিমুখে জীবনের লক্ষ্যপথ নির্ণয় করিয়া লইতে সক্ষম হয়, ইহারই জন্য সেদিনকার সেই দিব্যানুভূতি এবং অহৈতুকী অপার করুণাময় ভব-সমুদ্রত্রাণকারী অচিন্ত্য-লীলাময় যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দিব্য স্পর্শ। আধ্যাত্মিক জগতে এ যে কত বড় দান তাহা যাঁহারা সেই অপার্থিব কৃপা লাভে একদিন ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্মার্থ কতকটা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। শুধু ভাষার দ্বারা অপরকে তাহা বুঝান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যে অল্প বয়সে আমি প্রভুর এই কৃপা লাভে

ধন্য হইয়াছিলাম তখন ইহার মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে শুধু নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আমার অন্তরে যে একটি বিচিত্র ভাব বোধের উদয় হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অন্য কোন যুক্তি বা বিচার বুদ্ধির দ্বারা ইহার কোন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করি নাই এবং করিবার মত তেমন সামর্থ্যও আমার ছিল না। পরে বাইবেলে মহাত্মা যিশু খৃষ্টের ও তাঁহার কয়জন বিশিষ্ট শিষ্যের ঐরূপ স্পর্শের দ্বারা পবিত্র আত্মার ব্যাপ্টাইজ করার কথা পাঠ করিয়া ও পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গেও এইরূপ মাত্র স্পর্শের দ্বারা অপরে শক্তিসঞ্চার করিবার কথা, সিদ্ধপুরুষ বা আধিকারিক পুরুষগণের দ্বারা কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে তন্ত্রোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি যেরূপ বুঝাইয়াছেন তাহাতে ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিজ বিচার বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, এইরূপ কতকটা ধারণা হইলেও ইহার যথার্থ মর্ম্মার্থ বোধ সম্বন্ধে এখনও স্থির নিশ্চিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই নিজ জীবনেরই পূর্ব্বোক্ত একটি ঘটনার কথা পুনরুক্তি করিতেছি, তাহাতেই পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই অচিন্ত্য লীলাময়ের অপার রহস্যের কোন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা একটি স্থির সত্যে উপনীত হওয়া কতদূর সুকঠিন ও সুদূর-পরাহত। ঠাকুরের সহিত আমার সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যার সময়ের ঘটনাটি স্মরণ করিয়া দেখুন, যদিও ইহার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে কয়বার দর্শন করিয়াছি কিন্তু তথাপি তিনি যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই ইহা তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকালীন কথা হইতেই বুঝা যায়। কেন না তিনি আমায় দেখিবামাত্র বলিয়াছিলেন, "তুই এতদিন কোথায় ছিলি?" তখনো পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে কোনরূপই জানা শুনা ছিল না, তত্রাচ সেদিন সেই সন্ধ্যার সময় অকারণে কোথা হইতে সেই অভূতপূর্ব্ব হৃদয় আপ্লুতকারী আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস আসিয়া আমাকে একেবারে অমন আত্মহারা করিয়া দিয়াছিল। প্রথম সাক্ষাৎ দিনে যাঁহার করস্পর্শে আমার এই দিব্য অনুভূতির উদয় হইয়াছিল, এদিনকার এই ভাব প্রেরণাও যে সেই অচিন্ত্য লীলাময়েরই বিচিত্র শক্তির খেলা, সে বিষয়ে অন্ততঃ আমার তো কোন সংশয়ই নাই, কারণ ঠিক তাহার পরবর্ত্তী দিনেই পূর্ব্বোক্ত সারদা বাবু হঠাৎ আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাকে পরমহংসদেবের দর্শনের জন্য ডাকিয়া লইয়া যান। মনে পড়ে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক পূজ্যপাদ ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করায় তিনিও ঠিক এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখেছ, তাঁর সবই কেমন রহস্যময় (mysterious), বিচার বুদ্ধির দ্বারা কিছুই বোঝা যায় না। কোথায় তিনি—কোথায় তুমি, মাঝখান থেকে একি রহস্যময় খেলা বল দেখি?" বলা বাহুল্য, একথা শুনিয়া তাঁহারও ঠিক ধারণাই হইয়াছিল যে, এ খেলাও ঠাকুরেরই। যেদিন ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হই, ঠিক তার আগের দিনের সন্ধ্যা বেলায় সহসা আমার এই আকস্মিক ভাবাবেশের কথা যখনই আমি ভাবিয়া দেখিতাম, কিছুতে ইহার নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারিতাম না, পরন্ত এই মনে করিয়া হাসিতাম যে, বলির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাঁঠাকে যেমন নাওয়াইয়া ধুয়াইয়া সিন্দুরের ফোঁটা পরাইয়া পবিশুদ্ধ করিয়া তবে তাহাকে বলির স্থানে হাজির করা হইয়া থাকে, ইহাও যেন একপ্রকার ঠিক তাই। নইলে ঠিক তার পরের দিনেই এমনতরটা ঘটিবে কেন? এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কিন্তু কাহাকে কাহাকেও এরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে, সেইকালে আমার অন্তরে নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে

আধ্যাত্মিকভাবের বিকাশমুখ অবস্থা হইয়াছিল, তাই কাকতালীয়বৎ এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। যাক্, ঘটাঘটির কথাতো পরের কথা, আধ্যাত্মিকতা বলিতে শাস্ত্রকারেরা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক কথার অর্থে আমরা সোজাসুজি যেরূপ বুঝিয়া থাকি, আমার সম্বন্ধে তাহা ঠিক বলা চলে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যাই, তখন আমার মনে কোনই ধর্ম্মভাবের বিকাশ দেখা যায় নাই। সত্য বলিতে কি, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তাঁহার অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন-বোধ পর্য্যন্তও আমার মনে উদয় হয় নাই। তবে ঈশ্বর একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এইরূপ একটা সাধারণ ধারণা আমার ছিল, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেদিক হইতেও কখনো কোন ঐশ্বরিক ভাব অন্তরে অনুভব করি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার অন্তরের স্বাভাবিক ঝোঁকটা ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকেই এবং তাহাতেই বিমলানন্দ অনুভব করিতাম, তখন তাহাই ছিল জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে কেমন করিয়া বলা যায় যে, তখন আমার অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশোন্মুখ অবস্থা। যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে আমি খুব জোরের সহিতই বলিতে পারি যে, উক্ত ঘটনার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র এরূপ ভাবের কোন লক্ষণ আমার মধ্যে ছিল না। সেদিন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, গাছের মাথায় অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণ আভাসটুকুও মিলাইয়া আসিতেছে। এক একবার সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলাম ও বারবাড়ীর রকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে যেন কিসের বাতাস বহিয়া আসিয়া সমস্ত প্রাণটাকে কেমন উদাস করিয়া দিল, যন্ত্রচালিতবৎ নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িলাম এবং পরক্ষণেই নববিধান মন্দিরে পূর্ব্বের শোনা একখানি গান মনে পড়ায় ধীরে ধীরে সেই গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে সহসা অশ্রুপুলকাদি যেরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, এ সমস্ত কথাই পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার অন্তরে আধ্যাত্মিকভাবের বিকাশোন্মুখ অবস্থার লক্ষণ কোথায়, বুদ্ধি বিচার জ্ঞানের দ্বারা তাহার কোন সন্ধানই পাই নাই। তথাপি মানুষের বুদ্ধির অহঙ্কার এত বেশি যে, কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও যেমন করিয়া হোক্ একটা মনগড়া কারণ সে খাড়া করিবেই। না করিয়াই বা মানুষ করে কি, এই জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া তাহার যে গত্যন্তরও নাই। শুনিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঠাকুরের কাছে যান, তখন প্রথমেই তিনি ঠাকুরের এইরূপ নানাবিধ দিব্যশক্তির পরিচয় পান, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, এ কি যাদুবিদ্যা? শিশুসম সরল ঠাকুরের দিকে চাহিয়া ইহাতে তাঁহার মন সায় দেয় নাই। কোন স্থির মীমাংসা না করিতে পারিয়া "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy" এই বাণী স্মরণে তখনকার মত মনকে শান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কথার সঙ্গে সাধারণের তুলনা হয় না, তিনি যেভাবে সত্যকে সবদিক হইতে বুঝিতে ও জানিতে চাহিতেন, সে শক্তিই বা কয়জনের আছে? আবার শুধু শক্তি নয়, সত্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল, তাহার এক বিন্দুও কয়জন লোকে দেখিতে পাওয়া যায়? মতানৈক্য লইয়া তর্কবিতর্ক যাহাই হউক না কেন, ঠাকুরকে দর্শনাবধি মুহূর্ত্তের জন্যও কোনরূপ শ্রদ্ধার অভাব তাঁহাতে দেখা যায় নাই। ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন, "যার নিন্দে করতো বলে তাকে বলেছিলুম, যা শালা

তোর আর মুখ দেখতে চাইনে। তারপর মাস ভোর কতবার যাওয়া আসা করেছে, দেখলে মুখ ফিরিয়ে থাকতুম, কথা পর্য্যন্ত কইনি, তবু আসতে ছাড়েনি, একভাবেই যাওয়া আসা করেছে।" এখন মনে পড়ে, কতদিন ওখানে যাতায়াত করেছি সেই অল্প বয়সে, বুঝি বা না বুঝি এই দুইটি ছবি কিন্তু সর্ব্বদা আমার মনে জাগরিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিয়া মনে হইত যে, সত্যকে পূর্ণভাবে লাভ করার জন্যই যেন এই শান্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব স্থির প্রশান্ত আনন্দময় মূর্ত্তি, আর স্বামিজীর প্রতি চাহিলেই মনে হইত যে, তিনি যেন সত্যকে লাভ করিবার জন্য এক দুর্জ্জয় ইচ্ছা-শক্তির প্রতীক। তাঁহার চোখ মুখের ভিতর দিয়া যেমন বিদ্যুৎপ্রভা প্রকাশ পাইত তেমনটি কখন আর কাহারও মুখে দেখি নাই। দেখিতাম আর বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সেই মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম, আহা একেই বলে সত্যের পিপাসা। আমাদের মধ্যে যদিও বা সে পিপাসা সময় সময় একটু আধটু দেখা দেয়, তাহা হইলেও সে যেন কেমন যাচ্ছি যাবো ভাব। তখন আমার পড়াশুনা তেমন ছিলনা। অনর্গল উচ্ছ্বসিত স্রোতধারার ন্যায় তাঁহার মুখ হইতে সে সময় কি ইউরোপীয় কি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের যে সকল গভীর তত্ত্বসমূহের অপূর্ব্ব মীমাংসা বাণী দিনরাত্রি শুনিতে পাইতাম, পররর্ত্তী জীবনে সেই সকল দর্শন শাস্ত্র যখনই নাড়িয়া চাড়িয়া একটু আধটু দেখিয়াছি, তখনই স্বামিজীর সেই সকল বাণী স্মরণপথে উদয় হওয়ায় আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছি, এই সকল জটিল সমস্যার নিগূঢ় সত্য তিনি তখন কত সরল সহজ কথাতেই না আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তব্য বিষয়ের সহিত এসকল কথার কোন বিশেষ যোগাযোগ না থাকিলেও স্বামিজী সম্বন্ধে এরূপ দুএকটী কথা বলায় আশা করি, পাঠকবর্গ কোন ক্রটিবোধ করিবেন না। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আজ এই পুণ্যস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি, সে স্মৃতির খাতায় এই মহাপুরুষও এমনিভাবেই জড়িত হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহার কথা না বলিয়া থাকা সম্ভবপর নহে।

ঠাকুরের দিব্য শক্তি সম্বন্ধে তখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলেও আমার পরবর্ত্তী জীবনের কোন একটি ঘটনা ও ঠাকুরের নিজ মুখের কোন একটু কথার দ্বারা এক্ষণে সে সম্বন্ধে যতটুকু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে যে বিমল আনন্দের অনুভূতি হয়, তাহাও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের একেবারে বহির্বিষয় নয় বরং তাহারই অন্তর্বর্ত্তী। সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার ভাবপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ইহাই যে মূলীভূত কারণ তাহা বলা চলে না, কেননা ইহা তো আমার আজীবনের সংস্কার। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কখন এরূপ অনুভব করি নাই। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজ মুখের বাক্যের দ্বারা আংশিকভাবে যতটুকু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই বলিতেছি। ঠাকুর তাঁহার পার্শ্বচর অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য বহিরঙ্গ সাধারণ ভক্তগণ সম্বন্ধে অনেক স্থলে বলিয়াছেন, "দেখ, এ যেন কলমি শাকের দল, একটা ধরে টান দিলেই একেবারে পট্ পট্ করে সবগুলো উপ্‌ড়ে আসে।" কিন্তু এই যে টান অথবা আকর্ষণ, ইহা যে কোন দুর্জ্ঞেয় শক্তির বিচীত্র লীলা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগে সকল দিকে বৈজ্ঞানিক মতেরই প্রাধান্য, যাহা যুক্তি বিচার বুদ্ধি বা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারা যায়, এমন কিছুই সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া গণ্য নয়। বাহ্যিক দুর্জ্ঞেয় শক্তির কার্য্যকে কেহ সত্য বলিয়া মানিতে রাজি নন্। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুগে যুগে এই দুর্জ্ঞেয় শক্তির অবতারবিশেষ মহাত্মা-গণের রহস্যলীলার অদ্ভুত পরিচয় লাভে জগৎ আজ পর্য্যন্তও বঞ্চিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্তও শত শত নরনারী সেই মহাত্মগণ নির্দ্দেশিত পথেই সত্যান্বেষী হইয়া যে প্রত্যক্ষভাবে সত্য দর্শন করিয়া চির শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন, ইহাও এখন একেবারে অস্বীকার করিবার যো নাই। তাই আজ পর্য্যন্তও জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে যুগে যুগে এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবনের চরম স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

পুরুষত্রয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথমেই গীতা বেদান্তের অনুসরণ করিয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চের বর্ণনা দিয়াছে।* এই বিশ্ব-বৃক্ষের দেশে বা কালে আদি নাই অন্ত নাই, কারণ ইহা শাশ্বত এবং অবিনাশী, অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। দেহধারী মানবের জড় জগতে ইহার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি হয় না। আর এখানে ইহার কোন স্থায়ী ভিত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা হইতেছে এক অনন্ত গতিপ্রবাহ এবং ইহার ভিত্তি রহিয়াছে ঊর্দ্ধে অনন্তের পরম পদের মধ্যে। ইহার মূল তত্ত্ব হইতেছে পুরাণী চিরন্তনী কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহা চিরকাল সকল সৃষ্টির আদি পুরুষ হইতে নিঃসৃত, তাহার আরম্ভ নাই, শেষ নাই, আদ্যম্ পুরুষম্ যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতাঃ পুরাণী। অতএব ইহার আদি মূল রহিয়াছে কালের ঊর্দ্ধে শাশ্বতের মধ্যে, কিন্তু ইহার শাখা সকল নীচের দিকে বিস্তৃত এবং ইহার অন্যান্য শিকড়গুলিকে ইহা এখানে নীচের দিকে মনুষ্য লোকে প্রসারিত ও অনুপ্রবিষ্ট করিতেছে, এইসব শিকড় হইতেছে সুদৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য আসক্তি ও কামনা এবং তাহাদের ফলস্বরূপ আরও অধিক কামনা এবং অন্তহীন ক্রমবর্দ্ধমান কর্ম্মধারা। বেদের ছন্দ সকল ইহার পত্রনিচয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে এবং যে মনুষ্য এই বিশ্ববৃক্ষকে জানে সেই বেদবিৎ। আমরা বেদ সম্বন্ধে, অন্ততঃ বেদবাদ সম্বন্ধে যে নিন্দাসূচক মতবাদ প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে। কারণ বেদ আমাদিগকে যে জ্ঞান দেয় তাহা হইতেছে দেবতাদের সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বের তত্ত্ব ও শক্তি সকলের জ্ঞান, এবং ইহার ফল হইতেছে কামনার সহিত যে যজ্ঞ করা যায় তাহারই ফল, ত্রিভুবনে, মর্ত্ত্যে, স্বর্গে ও মধ্যলোকে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যরূপ ফল। এই বিশ্ববৃক্ষের শাখা সকল ঊর্দ্ধে ও নিম্নে উভয়-দিকেই বিস্তৃত, নিম্নে জড়জগতের মধ্যে, ঊর্দ্ধে অতিভৌতিক লোকসকলের মধ্যে; তাহারা প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কারণ গুণত্রয়ই বেদের সমগ্র বিষয়বস্তু, ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ বেদাঃ। বেদের ছন্দ সকল হইতেছে পত্রনিচয় এবং বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা যে ভোগ্য বিষয় সকল পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা হইতেছে নিত্যমঞ্জরিত নবপল্লব। অতএব যতদিন মানুষ গুণসকলের ক্রিয়া উপভোগ করে এবং বাসনাতে আসক্ত থাকে, ততদিন সে প্রবৃত্তির জালে, জন্ম ও কর্ম্মের চক্রে আবদ্ধ থাকে, অনবরত পৃথিবী ও মধ্যলোক ও স্বর্গলোকে এই সবের মধ্যেই ঘুরিতে থাকে, পরন্তু তাহার পরম অধ্যাত্ম অনন্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ঋষিগণ ইহা

---

* ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূল—
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা॥ ১৫ ১-৩

উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের জন্য তাঁহারা ধরিয়াছিলেন নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ আদি কর্ম্মপ্রেরণার বিরতি, এবং এই নিবৃত্তিমার্গের পরিণতি হইতেছে জন্মেরই অবসান এবং শাশ্বতের উচ্চতম বিশ্বাতীত পদের মধ্যে লোকোত্তর গতি লাভ। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে, দৃঢ় অনাসক্তি অসির দ্বারা এই সকল সুদৃঢ় বাসনা মূলকে ছেদন করা এবং তাহার পর সেই পরমপদ অন্বেষণ করা, যে পদ একবার লাভ করিতে পারিলে পুনরায় আর মর্ত্ত্যজীবনের মধ্যে ফিরিবার কোনই বাধ্যতা থাকে না। এই নীচের মায়ার মোহ হইতে মুক্ত হওয়া, অহংভাবশূন্য হওয়া, আসক্তিরূপ মহাদোষকে জয় করা, সকল কামনাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত করা, সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব বর্জ্জন করা, শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনায় সর্ব্বদা দৃঢ়নিষ্ঠ থাকা,—এই সকল ধাপই সেই পরম অনন্তের মধ্যে যাইবার পন্থা। সেখানে আমরা পাই সেই কালাতীত সত্তাকে যাহা সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নির দ্বারা উদ্ভাসিত নহে, পরন্তু নিজেই শাশ্বত পুরুষের জ্যোতি। বেদান্তের কথা,—আমি ফিরিয়া চলিয়াছি শুধু সেই আদিপুরুষের সন্ধান করিতে এবং মহান্ পন্থায় তাঁহাকে লাভ করিতে। ঐটিই পুরুষোত্তমের উচ্চতম পদ, তাঁহার বিশ্বাতীত স্থিতি।

কিন্তু মনে হইতে পারে যে, ইহা সন্ন্যাসের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই বেশ লাভ করা যায়, এমন কি উৎকৃষ্টভাবে, বিশিষ্টভাবে, সাক্ষাৎভাবেই লাভ করা যায়। অক্ষরের পথই ইহার নির্দ্দিষ্ট পথ বলিয়া মনে হয়, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্ম ও জীবন পরিত্যাগ, সন্ন্যাসীর নির্জ্জনতা, সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয়তা। এখানে কর্ম্মের আদেশ দিবার স্থান কোথায়, অন্ততঃ তাহার প্রেরণা কোথায়, প্রয়োজন কোথায়? আর এ-সবের সহিত লোক-সংগ্রহ, কুরুক্ষেত্রের রক্তপাত, কালপুরুষের প্রবৃত্তি, লক্ষ শরীর বিশ্বপুরুষ এবং তাঁহার উদাত্ত আদেশ,—"উঠ, শত্রুগণকে জয় কর, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর"—এ-সবের কি সম্বন্ধ? আর প্রকৃতির মধ্যে যে পুরুষ ইনিই বা কি? এই যে পুরুষ, এই ক্ষর, আমাদের পরিবর্ত্তনময় জীবনের ভোক্তা—ইনিও পুরুষোত্তম, ইনি হইতেছেন তিনিই, তাঁহারই শাশ্বত বহুরূপে পুরুষোত্তম, ইহাই গীতার উত্তর। "আমারই সনাতন অংশ জীব-লোকে জীবরূপে আবির্ভূত হয়।" * এই কথাটি, এই বিশেষণটি সাতিশয় অর্থপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক সত্তা তাহার অধ্যাত্ম সত্যে স্বয়ং ভগবানই, প্রকৃতির মধ্যে তাহার দ্বারা ভগবানের প্রকাশ বস্তুতঃ যতই আংশিক হউক না কেন। আর কথার যদি কোনও অর্থ থাকে তাহা হইলে ইহার দ্বারা আরও বুঝায় যে, প্রত্যেক প্রকাশশীল পুরুষ, বহু জীবের প্রত্যেক জীবই হইতেছে এক একটি শাশ্বত ব্যক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার এক শাশ্বত, অজাত, অমৃত শক্তি। এই প্রকাশশীল পুরুষকে আমরা জীব নামে অভিহিত করি, কারণ ইহা এখানে এই জীবজগতে একটি জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীয়মান হয় এবং মানুষের মধ্যে এই আত্মাকে আমরা মানবাত্মা বলিয়া থাকি এবং তাহার মানব-ধর্ম্মটিই অনুধাবন করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ইহার আপাতদৃশ্য রূপ হইতে মহত্তর বস্তু এবং ইহার মানবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অতীতে ইহার প্রকাশ মানুষ অপেক্ষাও ন্যূন ছিল, ভবিষ্যতে ইহা মননশীল মানুষ অপেক্ষা অনেক বড় কিছু হইতে পারে। আর যখন এই জীবসকল অজ্ঞানের সীমার উপরে উঠে, তখন সে তাহার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহার মানবত্ব ঐ দিব্য প্রকৃতির কেবল সাময়িক আচ্ছাদন, উহার সার্থকতা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। ব্যষ্টিগত জীব ঊর্দ্ধে শাশ্বতের মধ্যে আছে এবং চিরদিনই ছিল, কারণ উহা নিজে

* মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥১৫।৭

সনাতন। এই জন্যই গীতা এমন কোন কথা কোথাও বলে নাই যাহা হইতে আদৌ মনে হইতে পারে যে, জীব সম্পূর্ণভাবে লয়প্রাপ্ত হয়, পরন্তু গীতা বলিয়াছে, জীবের পক্ষে পরম পদ হইতেছে পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করা, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতা যখন সর্ব্বভূতের এক আত্মার কথা বলিতেছে তখন মনে হইতে পারে যে, গীতা অদ্বৈতবাদের ভাষা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু শাশ্বত জীবের [মমৈবাংশঃ সনাতনঃ] নিত্য সত্য তাহাতে এমন একটি বিশেষণ যোগ করিয়া দিতেছে, মনে হয়, গীতা প্রায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই স্বীকার করিতেছে,—তবে ইহা হইতেই একেবারে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না যে, কেবল এইটিই হইতেছে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব, অথবা ইহা পরবর্ত্তী রামানুজ মতের সহিত এক। তথাপি এইটুকু খুবই স্পষ্ট যে, এক অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যেই একটি বহুত্বের তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা শুধু মায়া নহে, তাহা শাশ্বত ও সত্য।

সনাতন জীব ভাগবত পুরুষ হইতে অন্য কিছু নহে অথবা তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথকও নহে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার একত্বের অন্তর্নিহিত শাশ্বত বহুত্বের দ্বারা [সকল সৃষ্টিই কি অনন্তের এই সত্যেরই প্রকাশ নহে ?] আমাদের মধ্যে অমর আত্মারূপে চিরবিরাজমান রহিয়াছেন, এই দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং যখন এই অস্থায়ী গৃহ পরিত্যক্ত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তখন এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। মন ও ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়সমূহ উপভোগ করিবার জন্য তিনি প্রকৃতির আন্তরিক শক্তি মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছেন, এবং তাহাদের বিকাশ করিতেছেন, * এবং যাইবার সময়েও বায়ু যেমন পুষ্পপাত্র হইতে গন্ধকে লইয়া যায় সেইরূপ সেই সবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরিবর্ত্তনময়ী প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর ও জীবের অভিন্নতা আমাদের কাছে বাহ্যদৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং প্রকৃতির গতিশীল ভ্রান্তিসকলের ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়। আর যাহারা প্রকৃতির রূপসকলের দ্বারা, মানবতা বা অন্য কোন রূপের দ্বারা নিজেদিগকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেয়, তাহারা কখনই ইহাকে দেখিতে পাইবে না, তাহারা উপেক্ষা করিবে, মানবতনু আশ্রিত ভগবানকে অবজ্ঞা করিবে। তিনি যখন আসিতেছেন বা যাইতেছেন অথবা অবস্থান করিতেছেন, ভোগ করিতেছেন, গুণান্বিত হইতেছেন, তখন তাহাদের অজ্ঞান তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, কেবল দেখিবে সেখানে মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর কি রহিয়াছে, সেই মহত্তর সত্যকে দেখিতে পাইবে না যাহা শুধু জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই পরিলক্ষিত হইতে পারে।* তাহারা কখনও তাঁহার দর্শন পাইবে না, সে জন্য যত্ন করিলেও দর্শন পাইবে না, যতক্ষণ না তাহারা বাহ্য চৈতন্যের প্রতিবন্ধক সকলকে দূর করিয়া দিতেছে এবং নিজেদের মধ্যে অধ্যাত্মসত্তাকে গড়িয়া তুলিতেছে, নিজেদের প্রকৃতির মধ্যেই যেন তাহার জন্য রূপ সৃষ্টি করিতেছে। নিজেকে জানিতে হইলে মানুষকে হইতে হইবে কৃতাত্মা, অধ্যাত্ম ছাঁচে নির্ম্মিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হইবে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে জ্ঞানময় হইতে হইবে। আমরা স্বরূপতঃ যে ভাগবত পুরুষ, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন যোগিগণ নিজেদের অন্তহীন সত্তার মধ্যে, নিজেদের আত্মার আনন্ত্যের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান। জ্ঞানালোকিত তাঁহারা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখিতে পান এবং স্থূল

* শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥১৫।৮,৯

* উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১৫।১০,১১

ভৌতিক রূপের বন্ধন হইতে, মানস ব্যক্তিত্বের রূপ হইতে, অনিত্য প্রাণের রূপ হইতে মুক্ত হন; তাঁহারা আত্মার সত্যে অমর হইয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে শুধু নিজেদের মধ্যেই দেখেন না, পরন্তু সকল বিশ্বের মধ্যে দেখেন। যে সূর্য্যের জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করিতেছে তাহার মধ্যে তাঁহারা আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানেরই জ্যোতি দেখিতে পান, চন্দ্রে যে জ্যোতি, অগ্নিতে যে জ্যোতি তাহা ভগবানেরই জ্যোতি।* ভগবানই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই ইহার জড় শক্তির আত্মা এবং তাঁহার শক্তির দ্বারা যাবতীয় বস্তু সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ভগবানই সোম-দেবতা, তিনি ধরিত্রীমাতার রসের দ্বারা লতাবৃক্ষকে পুষ্ট করিতেছেন এবং তাহাকে শস্যশ্যামলা করিতে-ছেন। যে প্রাণ বহ্নি প্রাণিগণের স্থূল ভৌতিক শরীরকে রক্ষা করিতেছে এবং ইহার খাদ্যকে পরিপাক করিয়া তাহাদের প্রাণশক্তিকে পুষ্ট করিতেছে, তাহা ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, বিচার বিতর্ক। তিনিই সেই বস্তু যাহাকে সকল বেদের দ্বারা এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞানের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তিনিই বেদের কর্ত্তা, তিনিই বেদান্তের রচয়িতা। অন্য কথায়, ভগবান একই সঙ্গে জড়ের আত্মা, প্রাণের আত্মা, মনের আত্মা, আবার যে অতিমানস বিজ্ঞান জ্যোতি মন ও সীমাবদ্ধ তর্কবুদ্ধির অতীত তিনি তাহারও আত্মা।

এই ভাবে ভগবান তাঁহার যুগ্ম আত্মারূপ রহস্যে, যুগ্ম শক্তিরূপে অবিভূর্ত, দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ; একই সঙ্গে তিনি এই পরিবর্ত্তনময় সর্ব্বভূতের আত্মাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, আবার যে অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা তাঁহার শাশ্বত নীরবতা ও শান্তির অক্ষুব্ধ অচলতার উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছে তাহাকেও ধরিয়া রহিয়াছেন* মানুষের মন ও হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে তাহারই শক্তিতে ইহারা এই দুই পুরুষের দ্বারা বিভিন্ন দিকে প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়, মনে হয় যেন এই আকর্ষণ পরস্পরের বিরোধী ও বিসদৃশ, পরস্পরকে বিনষ্ট করিতেই চাহিতেছে; কিন্তু ভগবান কেবলই ক্ষর নহেন, কেবলই অক্ষরও নহেন। তিনি অক্ষর আত্মা হইতে মহত্তর আবার পরিবর্ত্তনশীল জিনিষসকলের আত্মা হইতে আরও বেশী মহত্তর। তিনি যে একই সঙ্গে দুইই হইতে পারেন তাহার কারণ তিনি তাহাদের হইতে ভিন্ন, অন্য, তিনি সকল বিশ্বের উর্দ্ধে পুরুষোত্তম, অথচ তিনি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, বেদে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, আত্মজ্ঞানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, বিশ্ব উপলব্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। আর যে এইভাবে তাঁহাকে

---

* যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥১৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥১৫

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥১৯

পুরুষোত্তম বলিয়া জানে ও দেখে, সে আর জগতের বাহ্য দৃশ্যে বা এই দুইটি আপাত বিরোধী সত্তার পৃথক আকর্ষণে বিমূঢ় হইয়া পড়ে না। সেই জ্ঞানীর মধ্যে এই দুইটি প্রথমে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, একটি বিশ্বকর্ম্মের প্রবৃত্তিরূপে, আর একটি আত্মার মধ্যে নিবৃত্তিরূপে, কোন কর্ম্মের সহিত এই আত্মার কোন সম্পর্ক নাই, সকল কর্ম্ম প্রকৃতির অজ্ঞানের, অথবা শুধু এইরূপ বলিয়াই মনে হয়। অথবা তাহারা তাঁহার চৈতন্যের সম্মুখে বিরোধী দাবি লইয়া উপস্থিত হয়, একটি শুদ্ধ অনির্দ্দেশ্য, অবিচল, শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ সৎরূপে, আর একটি ইহার বিপরীত অসৎরূপে—ক্ষণস্থায়ী গঠন ও সম্বন্ধ ভাব ও রূপ, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সম্ভূতি ও সৃজন এবং লয়কারী কর্ম্ম ও বিবর্ত্তনের জাল, জন্ম ও মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব এই সবের জগৎ রূপে। তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অতিক্রম করেন, তাহাদের বিরোধের সমন্বয় করেন এবং বিশ্ববেত্তা সর্ব্ববিদ্ হন। তিনি আত্মা ও ভূতসকলের সমুদয় অর্থটি দেখিতে পান, তিনি ভগবানের অখণ্ড সত্তাকে, সমগ্রম্ মাম্, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি ক্ষর ও অক্ষরকে পুরুষোত্তমের মধ্যে মিলিত করেন। যিনি তাঁহার ও সর্ব্বভূতের পরম আত্মা, তাঁহার ও সকল শক্তির এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর, জগতের মধ্যে ও বাহিরে নিকট ও দূর শাশ্বত সত্তা, তাঁহাকে তিনি ভালবাসেন, পূজা করেন, দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করেন, ভজনা করেন। আর তিনি ইহা করেন তাঁহার শুধু কোন একটি দিক বা অংশের দ্বারা নহে, কেবল অধ্যাত্মভাবাপন্ন মনের দ্বারাই নহে, কেবল প্রগাঢ় কিন্তু অনুদার হৃদয়ের প্রখর আলোকেই নহে, অথবা কেবল কর্ম্মের ভিতর সঙ্কল্পের অভীপ্সার দ্বারাই নহে, পরন্তু তাঁহার সত্তা ও তাঁহার সম্ভূতির, তাঁহার আত্মা ও তাঁহার প্রকৃতির সমস্ত পূর্ণ সম্বদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার অবিচল স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার সমতায় তিনি ভাগবত, এবং সকল বস্তু, সকল জীবের সহিত এক; তিনি সেই সীমাহীন সমতাকে, সেই গভীর ঐক্যকে তাঁহার মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের মধ্যে নামাইয়া আনেন, এবং তাহার উপরে দিব্য প্রেম, দিব্য কর্ম্ম, দিব্য জ্ঞান এই ত্রি-সত্তাকে অবিভাজ্য সমগ্রতার প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই গীতা-প্রদর্শিত মুক্তির পন্থা।—

আর বস্তুতঃ এইটিই কি প্রকৃত অদ্বৈত নহে, যাহা এক অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে এতটুকুও বিভেদ করে না? এই যে আত্যন্তিক ভেদশূন্য অদ্বৈতবাদ, ইহা প্রকৃতির বহুর মধ্যেই সকল ভাবে এককে এক বলিয়াই দেখে, যে পরম সত্য বিশ্বাতীত সত্তা আত্মার মূল এবং বিশ্বের সত্য তাহার মধ্যে যেমন এককে এক বলিয়া দেখে তেমনিই আত্মার সত্তায় এবং বিশ্বের সত্তার মধ্যেও দেখে, এবং কি বিশ্ব প্রবৃত্তি, কি বিশ্বের নিবৃত্তি বা পরম নিবৃত্তি কিছুরই দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। অন্ততঃ ইহাই হইতেছে গীতার অদ্বৈত। গুরু অর্জ্জুনকে বলিলেন, এইটিই গুহ্যতম শাস্ত্র, এইটিই পরম শিক্ষা ও বিদ্যা, ইহাই আমাদিগকে উচ্চতম জগৎ রহস্যের অন্তঃস্থলে লইয়া যাইতে পারে।* এইটিকে পূর্ণভাবে অবগত হওয়া, জ্ঞানে অনুভবে শক্তিতে উপলব্ধিতে ইহাকে অধিকার করা—ইহাই হইতেছে রূপান্তরিত বুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করা, হৃদয়ে দিব্যভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া, এবং ইহাই হইতেছে সকল সঙ্কল্প, ক্রিয়া ও কর্ম্মের পরম অর্থ ও লক্ষ্যে কৃতকার্য্য হওয়া। অমৃতত্ত্ব লাভ করিবার, উচ্চতম ভাগবত প্রকৃতির অভিমুখে উঠিবার, শাশ্বত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইহাই পন্থা।

---

* ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(শঙ্কা) ভাল, এক একটি ভূত কি প্রকাবে পাঁচ পাঁচ প্রকাবেব হইবে ? তদুত্তবে বলিতেছেন ঃ-

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীযাংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চপঞ্চ তে ॥২৭

অন্বয়—একৈকম্ দ্বিধা বিধায়, পুনঃ চ প্রথমম্ চতুর্ধা (বিধায়) স্বস্বেতবদ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাৎ তে পঞ্চ পঞ্চ ॥

অনুবাদ—পঞ্চভূতেব প্রত্যেকটিকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত কবিবে। তদনন্তব প্রথম প্রথম অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বাব চাবি চাবি ভাগে বিভক্ত কবিবে। তাহাব পব প্রত্যেক ভূতেব প্রথমার্দ্ধেব এক এক চতুর্থাংশকে অপব ভূতেব দ্বিতীয়ার্দ্ধেব সহিত সম্মিলিত করিলে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইবে।

টীকা—আকাশাদিব "একৈকম্"—এক একটিকে, "দ্বিধা বিধায়"—দুই দুইভাগে বিভক্ত কবিয়া, এস্থলে 'দ্বিধা' শব্দ অনেকার্থ প্রয়োজনে উচ্চাবিত হইয়াছে, (সেই হেতু ইহাব অর্থ কেবল মাত্র 'দুই', না হইয়া 'দুই দুই' এইরূপ হইল) প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগ বিশিষ্ট কবিয়া, "পুনঃ চ"—আবাব, "প্রথমং চতুর্ধা (বিধায়)"—প্রথম প্রথম ভাগকে চাবি চাবি ভাগযুক্ত করিয়া, "স্বস্বেতব দ্বিতীয়াংশৈঃ"—আপনা আপনা হইতে অপব বা ভিন্ন চাবিটি ভূতেব যে যে দ্বিতীয় স্থূলভাগ আছে, তাহাব তাহাব সহিত প্রথম প্রথম ভাগেব চাবি চাবি অংশেব মধ্য হইতে এক এক অংশেব, "যোজনাৎ"—মিশ্রণ কবিলে, আকাশাদি এক একটি পাঁচ পাঁচরূপ হয়। (মূল শ্লোকের অন্তর্গত 'প্রথম' শব্দ, 'চতুর্ধা' শব্দ এবং 'দ্বিতীয়' শব্দও 'দ্বিধা' শব্দের ন্যায় অনেকার্থ-প্রযোজনে উচ্চাবিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদেবও আবৃত্তি কবিতে হইবে। ২৭)

ক্ষিতি — ॥০	অপ — ॥০	তেজ— ॥০
অপ— ৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০
তেজ— ৵০	তেজ—৵০	অপ্ — ৵০
মরুৎ— ৵০	মরুৎ—৵০	মরুৎ— ৵০
ব্যোম— ৵০	ব্যোম —৵০	ব্যোম —৵০
স্থূল ক্ষিতি ১৲	স্থূল অপ্ ১৲	স্থূল তেজ ১৲

মরুৎ— ॥০	ব্যোম— ॥০
ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০
অপ্— ৵০	অপ্ — ৵০
তেজ— ৵০	তেজ— ৵০
ব্যোম—৵০	মরুৎ— ৵০
স্থূল মরুৎ ১৲	স্থূল ব্যোম ১৲

ইহাতে মোট

২য় ভাগ　　　১ম ভাগ

ক্ষিতি—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

অপ— ॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

তেজ— ॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

মরুৎ— ॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

ব্যোম—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

ক্ষিতি পাঁচ প্রকাব যথা ঃ—

১। ক্ষিতিপ্রধান ক্ষিতি
২। অপ্প্রধান ক্ষিতি
৩। তেজঃপ্রধান ক্ষিতি

৪। মরুৎপ্রধান ক্ষিতি

৫। ব্যোমপ্রধান ক্ষিতি

এইরূপ অপর চারিটিতে।

এইরূপে পঞ্চীকরণের বর্ণনা করিলেন, তদনন্তর সেই সকল ভূতধারা উৎপাদ্য কার্য্যসমূহ দেখাইতেছেন :—

তৈরণ্ডস্তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।
তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ ॥২৮

অন্বয়—তৈঃ অণ্ডঃ (উৎপদ্যতে), তত্র ভুবন-ভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ; অস্মিন্ স্থূলে দেহে (বর্ত্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ, তৈজসাঃ দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ বিশ্বতাম্ যাতাঃ।

অনুবাদ—সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবন, ভোগ্যবস্তু ও স্থূল শরীরের উৎপত্তিও (পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতেই) হইয়া থাকে। এই সমষ্টিরূপ স্থূল দেহের অভিমানী হইয়া অর্থাৎ স্থূলদেহ-সমষ্টিতে 'আমি' এইরূপ জ্ঞান করিয়া, হিরণ্যগর্ভই বৈশ্বানর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৈজস জীবগণেই এক একটি স্থূলদেহের অভিমানী হইয়া দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে 'বিশ্ব' সংজ্ঞা পাইয়া থাকে।

টীকা—"তৈঃ অণ্ডঃ"—সেই পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চক উপাদান কারণ হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। "তত্র"—সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর "ভুবনভোগ্য ভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ"—পৃথিবী হইতে উপরি উপরি-ভাগে বর্ত্তমান পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক এবং পৃথিবীর নীচে অবস্থিত অতল হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল পর্য্যন্ত সপ্তলোক (ভুবন); সেই চতুর্দ্দশ ভুবনে নিজ নিজ প্রাণিগণদ্বারা ভোগের যোগ্য অন্নাদি এবং সেই সেই ভুবনের যোগ্য শরীর, সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক দ্বারাই ঈশ্বরের আজ্ঞায় অর্থাৎ ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্থূলদেহের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়া, সেই স্থূল শরীরে অভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের 'বৈশ্বানর' নাম প্রাপ্তি, আর এক একটি স্থূল শরীরের অভিমানী ব্যষ্টিরূপ তৈজস জীবগণের 'বিশ্ব'-নাম প্রাপ্তি হয়—এই কথাই দুইটি শ্লোকার্দ্ধ-দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—"অস্মিন্ স্থূলে দেহে (বর্ত্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ" এবং "তৈজসাঃ বিশ্বতাং যাতাঃ"—সেই স্থূলদেহে বর্ত্তমান তৈজস জীবগণই 'বিশ্ব' হয়। (সূক্ষ্মদেহের অভিমান ত্যাগ না করিয়াই বিশেষ বিশেষ স্থূল শরীরে 'আমি' এইরূপ অভিমানযুক্ত হইলে জাগ্রদভিমানী জীবকেই 'বিশ্ব' বলে এবং 'বিশ্ব' অর্থাৎ সকল, 'নর' অর্থাৎ প্রাণী—সকল প্রাণীতে 'আমি' এইরূপে অভিমানী ঈশ্বরের নাম বৈশ্বানর। তাঁহারই নামান্তর 'বিরাট্' —কেননা তিনি বিবিধ প্রকারে 'রাজতে' প্রকাশ-মান্ হন।) সেই বিশ্বনামক জীবসমূহের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন—'দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ"—দেবতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি। ২৮

এক্ষণে সেই বিশ্বসংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবগণ, তত্ত্ব-জ্ঞানরহিত বলিয়া কি প্রকারে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া দুই শ্লোকে বুঝাইতেছেন :—

তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রত্যোক্তত্ত্ববোধ বিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥২৯
নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নিবৃতিম্ ॥৩০

অন্বয়—তে পরাগ্দর্শিনঃ, প্রত্যোক্তত্ত্ববোধ বিব-র্জ্জিতাঃ ভোগায় কর্ম্মে কুর্ব্বতে কর্ম্মে কর্ত্তুং ভুঞ্জতে চ; তে নদ্যাং কীটাঃ আশু আবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরম্ ইব জন্মনঃ জন্ম, ব্রজন্তঃ নিবৃতিং নৈব লভন্তে।

অনুবাদ—দেবতা প্রভৃতি 'বিশ্ব'-নামক জীবগণ বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ (অন্তর্দৃষ্টিশূন্য) ও আত্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত; তাহারা ভোগের জন্য কর্ম্ম

করিয়া থাকে, আবার কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করিয়া থাকে। যেমন নদীর স্রোতে পতিত কীট অল্পকাল মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে নীত হয়, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, সেই বিশ্বনামক জীবগণও এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

টীকা—"তে"—সেই দেবতা প্রভৃতি, বিশ্ব-নামক জীবগণ "পরাগ্ দর্শিনঃ"—বাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহই দেখিয়া থাকে, প্রত্যক্ আত্মাকে দেখে না, কেন না শ্রুতি (কঠোপনিষৎ ৪।১) বলিতেছেন—"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্," স্বয়ম্ভূ (পরমাত্মা) ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখ করিয়া সৃজন করিলেন; সেই হেতু পুরুষ বাহ্যবস্তু সমূহকেই দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। (শঙ্কা) নৈয়ায়িক প্রভৃতি ('বিশ্ব' নামক জীব) ত আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, যদ্যপি নৈয়ায়িক প্রভৃতি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, তথাপি তাহারা শ্রুতিপ্রতিপাদিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ জানে না, (এই হেতু তাহারা বহির্মুখই বটে।) এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—"প্রত্যক্তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ" সেই সকল জীব, সাক্ষিরূপ আত্মার জ্ঞান রহিত বলিয়া বাহ্যদর্শী হইয়া থাকে। অতএব "ভোগায়" (প্রত্যক্তত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে) সুখাদি ভোগের জন্য মনুষ্য প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়া, "কর্ম্ম কুর্ব্বতে" —সেই সেই শরীরের যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, (এস্থলে 'কর্ম্ম'শব্দ জাতিবাচক বলিয়া এক বচনান্ত, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ভোগের নিমিত্ত সাক্ষাৎ ভোগপ্রদ দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া এবং গৌণভাবে ভোগপ্রদ ধনোপার্জ্জনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।) "কর্ম্ম কর্ত্তুং ভুঞ্জতে চ"—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য (দেবাদিশরীর দ্বারা) সেই সেই কর্ম্মফল ভোগকরে, কেন না ভোগ অর্থাৎ ফলানুভব না হইলে, সেই সেই ফলের সজাতীয় সুখের ইচ্ছা অসম্ভব হয়, এবং সেই সেই সাধনের অনুষ্ঠানও অসম্ভব হয়। "তে"—এইরূপে অবস্থিত জীবগণ, "নদ্যাং কীটাঃ আশু আবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরম্ (ব্রজন্তঃ) ইব"—যেমন নদীর প্রবাহে পতিত কীটসকল অল্প সময় মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্ত প্রাপ্ত হয়, (কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না,) সেইরূপ, "জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ"—একজন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, "নির্বৃতিং ন এব লভন্তে"—কিছুতেই শান্তি পায় না। ২৯,৩০

জীবের যে প্রকারে সংসার প্রাপ্তি ঘটে, তাহা এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া, সেই সংসারের নিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্য, প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

সৎকর্ম্মপরিপাকাত্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।
প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্॥৩১
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোশবিবেকেন, লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্॥৩২

অন্বয়—তে সৎকর্ম্ম পরিপাকাৎ করুণানিধিনা উদ্ধৃতাঃ তীরতরুচ্ছায়াম্ প্রাপ্য যথা সুখং বিশ্রাম্যন্তি। এবং তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ উপদেশং অবাপ্য পঞ্চকোশ বিবেকেন পরাং নির্বৃতিং লভন্তে।

অনুবাদ—সেই নদীপ্রবাহপতিত কীটগণ পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে, কোনও দয়ালুব্যক্তিদ্বারা আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া—নদীতীরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় উপস্থিত হইয়া সুখে বিশ্রাম করে। সেইরূপ জীবগণও পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি ফলোন্মুখ হইলে কোনও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোশ হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া পরম সুখ লাভ করেন।

টীকা—"তে"—সেই (নদীপ্রবাহপতিত) কীটগণ, "সৎকর্ম্ম পরিপাকাৎ"—পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত পুণ্য-কর্ম্মের পরিপাক হেতু, "করুণানিধিনা"—

কোনও কৃপালু পুরুষদ্বারা, "উদ্ধৃতাঃ"—নদী-প্রবাহ হইতে বাহিরে নিষ্কাসিত হইয়া, "তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য যথাসুখং বিশ্রাম্যন্তি"—(নদী-) তীরস্থিত তরুর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে পরম সুখ লাভ হয় সেইরূপে বিশ্রাম করে।

এক্ষণে কীটের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে অর্থসিদ্ধ হইল, সিদ্ধান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন :—"এবম্" উক্ত প্রকারে পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের পরিপাক বশে, "তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ"—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরু হইতে, "উপদেশম অবাপ্য" তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যের, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতারূপ অর্থ উপলব্ধি করিবার সাধন শ্রবণরূপ উপদেশ, যাহা অগ্রে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করিবেন, তাহা পাইয়া, "পঞ্চকোশ বিবেকেন"—অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচার দ্বারা (যাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন, তাহার দ্বারা, ""পরাং নির্বৃতিং লভন্তে"—মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়। ৩১।৩২

এই প্রকারে "বিশ্ব"সংজ্ঞক জীবের সংসার-নির্বৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিলেন।

সেই অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ কি প্রকার? এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া সেই পঞ্চকোশের উপদেশ করিতেছেন :—

অন্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি
পঞ্চতে।
কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা
সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩

অন্বয়—অন্নং প্রাণঃ মনঃ বুদ্ধিঃ আনন্দঃ চ ইতি তে পঞ্চ কোশাঃ। তৈঃ আবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ (দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত থাকে, এইজন্য) এই পাঁচটি সেই কোশ। সেই সকল কোশ দ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা স্বরূপবিস্মৃতি হয় বলিয়া সংসারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা—অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ এই পাঁচটি কোশ। (তন্মধ্যে) বুদ্ধি শব্দের অর্থ বিজ্ঞান, (এই বিজ্ঞানময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া জীবাত্মা আপনাকে জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তা মনে করে, আনন্দময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তা মনে করে, মনোময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া ইচ্ছাশক্তিমান কারণ মনে করে, প্রাণময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপ মনে করে। অন্নময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোগায়তনরূপ মনে করে।) সেই অন্নাদিকে 'কোশ' এই নাম দিবার কারণ বলিতেছেন—"তৈঃ আবৃতঃ"—সেই কোশসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া "স্বাত্মা'—স্বরূপভূত আত্মা, "বিস্মৃত্যা"—নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, "সংসৃতিং ব্রজেৎ"—জন্মাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার পাইয়া থাকে। কোশ যেমন কোশকার নামক কীটের (গুটি-পোকার) আচ্ছাদক বলিয়া ক্লেশের কারণ হয়, সেইরূপ অন্নময়াদিও আত্মার অদ্বয়ত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি বিশেষণের আবরক হইয়া আত্মার ক্লেশের কারণ হয়। এই কারণে অন্নময়াদিকে কোশ বলিয়া থাকে। ইহাই অর্থ।

[অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন আত্মা —সৎ, চিৎ আনন্দ ও অদ্বয় এবং আমরা বিচার দ্বারা জানি দেহ—অসৎ, অচেতন বা জড়, দুঃখ-রূপ এবং সদ্বয় বা বহু। আত্মা ও দেহের যে অধ্যাস, তাহা অন্যোন্যাধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে যেমন দেহের অধ্যাস হয়, সেইরূপ দেহেও আত্মার অধ্যাস হয়। প্রথম অধ্যাসের ফলে, আত্মার আনন্দরূপতা ও অদ্বয়রূপতা এই দুইটি আচ্ছাদিত হইয়া আত্মা দুঃখী ও বহু বলিয়া প্রতীত হন; দ্বিতীয় অধ্যাসের ফলে, দেহের অসত্তা (মিথ্যাত্ব) ও অচেতনতা আচ্ছাদিত হইয়া, দেহ সৎ ও চেতন

বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মা যে পূর্ণ ও নিত্যমুক্ত হইয়াও সেইরূপ বলিয়া প্রতীত হন না, তাহা সেই প্রথমোক্ত অধ্যাসের, অর্থাৎ আত্মাতে দেহাধ্যাসেরই ফল। এইরূপে দেহ বা অন্নময় কোশ দ্বারা আবরণ ঘটে এবং সেই আবরণ দুঃখের কারণ হয়।]

অনন্তর আড়াইটি শ্লোকে, এক একটি করিয়া সেই পঞ্চকোশের স্বরূপ জানাইতেছেন —

স্যাৎ পঞ্চীকৃত ভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্ন সংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণকর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥৩৪

অন্বয়—পঞ্চীকৃত ভূতোত্থঃ স্থূলঃ দেহঃ অন্ন-সংজ্ঞকঃ স্যাৎ। প্রাণঃ তু লিঙ্গে রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ স্যাৎ।

অনুবাদ—পঞ্চীকৃতপাঁচটি ভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহকে অন্ন বা অন্নময় কোশ বলে। আর লিঙ্গদেহের অন্তর্গত রজোগুণসমুৎপন্ন পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ বা প্রাণময়কোশ হয়।

টীকা—"পঞ্চীকৃত ভূতোত্থঃ"—পঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূত হইতে উৎপন্ন, "স্থূলদেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ" স্থূলদেহ অন্ন বা অন্নময় নামক কোশ হইয়া থাকে। "প্রাণঃ তু"—প্রাণময়কোশ কিন্তু, "লিঙ্গে"—লিঙ্গশরীরে বর্তমান, "রাজসৈঃ প্রাণৈঃ"—রজোগুণের কার্য্যরূপ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণবায়ুর সহিত "কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ"—বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত, (মোট দশটি) মিলিত হইয়া, প্রাণময়কোশ হয়।

মাঝি

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

মাঝি দাঁড় টেনে চলে ব্যগ্র ভাবে ভীত সন্তর্পণে,
সম্মুখে অম্বুধি শুধু স্পন্দমান অতন্দ্র-মদির।
দুর্নিরীক্ষ্য তট-পৃষ্ঠ, ফেনময় সমুদ্র অধীর;
শিহরিছে ক্ষুব্ধা-শঙ্কা মোর বক্ষে ঊর্ম্মি-আস্ফালনে,
জীবনের অভিসার উচ্ছ্বসিছে সিন্ধু-আবর্তনে,
ছায়াচ্ছন্ন নভস্তল গাঢ় রাত্রি এ চতুর্দ্দশীর,
অগ্রবর্ত্তী পদ-তরী খোঁজে পথ নেপথ্য-মাটির;
চলার আবর্ত্তে আমি ম্রিয়মান মর্ত্তের ভবনে।

উদ্বেলিত শীতস্পর্শ, এলো ঘূর্ণ্য সমুদ্রের ঝড়;
গুঞ্জরিছে হৃৎ-তন্ত্রী মূর্চ্ছনার উদ্বিগ্ন নিশ্বাসে,
মাঝির তরণীখানি আর্ত্ত-কণ্ঠে করিছে ক্রন্দন
তরঙ্গ-সঙ্কুল-মুখে, কালের দেবতা ব্যঙ্গ হাসে;
কুজ্ঝটি-আচ্ছন্ন-বর্ত্মে করিলাম পথ-অন্বেষণ,
আমার অদৃষ্ট-পটে রেখাঙ্কিত দুর্ভাগ্য দুস্তর।

সমালোচনা

হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প— পরশুরাম বিরচিত। প্রকাশক শ্রীসুধীরকুমার সরকার। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পরশুরামের লেখায় হাসির অফুরন্ত ঝরণা। নানাদুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট বাঙালী পরিবারে তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাগুলি অন্ধকারময় কারাকক্ষে প্রভাত-সূর্য্যের সোণালি আলোর মতই আদরের সামগ্রী। পরশুরামের গড্ডলিকা বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে একটী অতুলনীয় সম্পদ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁহার প্রতিভার অম্লান দীপ্তি দেখিতে পাইলাম। বঙ্গবাণীর মন্দিরে ইহা আর একটী অমূল্য অর্ঘ্য। 'প্রতি সংখ্যায় উনিশটা গল্প, পাঁচটা সোজা প্রেম, দশটা বাঁকা প্রেম, চারটে লোমহর্ষণ।' বর্ত্তমানে ব্যাঙের ছাতার মত প্রতিমাসেই যে সকল মাসিক ও সাপ্তাহিক গজাইয়া আটাশে ছেলের মত অকালে মরিতেছে, তাহাদের স্বরূপ উপরের লাইনটীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রকারের মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গোক্তি একমাত্র পরশুরামের দ্বারাই সম্ভব। নেড়ির মুখে 'কঁতিনতাল অথর'দের 'বিশ্বলুটভাব,' 'দড়িছেঁড়া পিয়াসি বুভুক্ষা,' 'ঔদরিক ঔদার্য', 'পুতির পুলক', 'হৃষ্ট হ্রেষা' ইত্যাদি গুণগুলির প্রশংসা আধুনিক প্রগতিবাদিনীদের মনোভাবের অপূর্ব্ব ছবি। ইহার অপেক্ষা তীব্রতর কষাঘাত যে হইতে পারে আমি ভাবিতে পারি না। পাশ্চাত্য সাহিত্য বুঝি আর না বুঝি, তাহার সম্পর্কে যা-খুসী-তাই মন্তব্য করা যেন ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। "একটী ছোট্ট প্রাণী গুট্‌গুট্ করিয়া ঘরে আসিল। কুত্তা নয়। ইনি সুষেণবাবু জিগীষা দেবীর স্বামী।" অতি আধুনিকাদের এই রকম ব্যঙ্গচিত্রের নমুনা একমাত্র শেষের কবিতার কেটী মিত্রের মধ্যে দেখিয়াছি। ছবি আঁকিতে পরশুরাম সত্যই অদ্বিতীয়। জিগীষাদেবী স্বামীকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'ঈডিয়ট, সেকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউণ্টেন পেনটা আর একশিট কাগজ নিয়ে এস।' পৌরুষহীন স্ত্রৈণস্বামী আর অতি আধুনিকা আলোকপ্রাপ্তা পত্নী—এদুয়ের সম্পর্ক ইহার অপেক্ষা সুন্দরভাবে ফুটাইতে পারা সুকঠিন সন্দেহ নাই। 'সতীসাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখা জোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের চিহ্নস্বরূপ এই গোঁপজোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন।' এক কথায় বলিতে ইচ্ছা করে—চমৎকার।

বালিগঞ্জের খ্বিদং স্বামীর ছবি অপূর্ব্ব। "এখন এমন গুরু চাই যাঁর চেহারা দেখলে মন খুশি হয়, বচন শুনলে প্রাণ আনচান করে।" কথাটার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে। গুরুপুত্তুরের থিয়েটারে আবদালা সাজার মধ্যেও কি মারাত্মক ব্যঙ্গোক্তি। নারীচরিত্র সম্পর্কে হনুমানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠকেরা একমত হইতে পারিবেন কিনা জানি না। কিন্তু লেখক স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে আড়াল হইতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই মুখরোচক।

আমরা পরশুরামের লেখনীকে অভিনন্দিত করি। তাঁহার লেখনীর অমৃতবর্ষণে বঙ্গভাষা উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যশালিনী হউক।

মধুমালা—(কাব্যগ্রন্থ)— —শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ প্রণীত। ১৯২ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—'গ্রন্থনিকেতন' হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানি 'অতিথি, মেনকা মিলন, শকুন্তলা, সাগরিকা প্রভৃতি কতগুলি বড় ও ছোট কবিতার সমাবেশ। কবিতাগুলির সংযত, সবল ভাষা ও ছন্দ আমাদের ভাল লাগিয়াছে। "মিস্টিসিজম্" এর প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া মনে হয় সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাই গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। উপরন্তু সুদৃশ্য বাঁধাই ও সাধারণ মূল্য পুস্তকখানির প্রচারে সাহায্য করিবে।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রতাপসিংহ—গ্রন্থকার ও প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাগ, উকিল, শ্রীহট্ট। ৫৩ পৃষ্ঠা, মূল্য চার আনা।

ভারতমাতার বীরসন্তান প্রতাপসিংহের মত চরিত্র সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করলে আত্মমর্যাদাবোধহীন দুর্বল ভারতসন্তানের অন্তরে আজও প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। ভারত-গৌরব প্রতাপের অমর জীবনীর সহিত দেশের প্রত্যেক নরনারীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা উচিত। বাঙলাতে প্রতাপসিংহের জীবনী কয়েকখানা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাতেই পর্যাপ্ত হয় নি। নানাভাবের পাঠকের জন্য নানাপ্রকার সংস্করণ হওয়া আবশ্যক। বিশেষত ছেলেমেয়েদের উপযোগী নানা আকারের সচিত্র সংস্করণ হওয়া যে খুবই দরকার, তাতে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থকার দশটি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে ছেলেদের উপযোগী করে প্রতাপ সিংহের কাহিনী লেখবার চেষ্টা করেছেন। প্রতাপের জীবনের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনাই তিনি এই পুস্তকখানাতে সন্নিবেশ করেছেন। বর্ণনা সুন্দর ও সরস হয়েছে, কিন্তু ভাষা তেমন সহজ হয় নি। ছেলেমেয়েদের পুস্তকের ভাষা আরও সহজ হওয়া উচিত।

পুস্তকের ছাপা মন্দ নয়, প্রচ্ছদপট অতি চমৎকার হয়েছে। ছোটরা এই পুস্তক পাঠ করে উপকৃত ও আনন্দিত হবে, সন্দেহ নেই।

শ্রীসুদর্শন—ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী বাবাজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে শ্রীনিম্বার্ক মহাসভা, বৃন্দাবন হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪। সম্পাদক শ্রীসুরেশ্বরদাস। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

শ্রীসুদর্শন শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র। ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৪৮ পৃষ্ঠার কাগজ। ইহাতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের পত্রাবলী, জীবনী এবং ধর্ম বিষয়ে নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাখানা ভালই লাগল, কোথাও গোঁড়ামি চোখে পড়ে নি।

শ্রীসুদর্শন পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে আনন্দ দান করবে।

শশাঙ্কশেখর দাস

প্রজ্ঞা-ভাবনা—শ্রীবংশদীপ মহাস্থবির সংকলিত ও অনূদিত। নালন্দা বিদ্যাভবন, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা। ডিমাই ×৮, ৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলেও কালবশে বৌদ্ধধর্ম আজ ভারত হইতে প্রায় বিতাড়িত। কিন্তু বড়ই আনন্দের বিষয় বর্তমানে এদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও মতবাদ আলোচনা করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

আচার্য বুদ্ধঘোষকৃত বিসুদ্ধিমগ্‌গ বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের পরিভাষা রূপেই আলোচ্য পুস্তকখানা বাঙালি পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। পুস্তকে বাঙলা অক্ষরে মূলও দেওয়া হইয়াছে।

অনুবাদ মূলের অনুবর্তী হইয়াছে। পরিভাষা সম্বন্ধে আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। 'কুশলচিত্ত-সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা।' পালি ভাষায় কুসল মানে পুণ্য। কিন্তু বাঙলাতে কুশলশব্দ পুণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না। মাঝে মাঝে এইরূপ হইয়াছে।

বাঙালি পাঠকেরা এই পুস্তকপাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার বহুলপ্রচার কামনা করি।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র, নিউইয়র্ক—গত ২১শে মার্চ এই কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ করা হয়। এতদুপলক্ষে অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ "বর্ত্তমান ভারতের দেবমানব" বিষয়ক একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মনোরঞ্জন বিধান করেন। অতঃপর প্রসাদ বিতরিত হয়। ২৭শে মার্চ্চ এই উৎসব উপলক্ষে একটী ভোজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ইহাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। এই ভোজ-সভায় প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটির স্বামী অখিলানন্দ "মানব জাতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব" এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ব্বজনীনত্ব" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ জোশি বলেন যে, দার্শনিক পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে কার্য্যতঃ তাহা দেখাইয়াছেন। পরিশেষে স্বামী নিখিলানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি" সম্বন্ধে একটী মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। পরদিন প্রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে আহূত একটী সভায় স্বামী অখিলানন্দ "স্বর্গীয় ভক্তির পথ" এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ "উত্তরাধিকার সূত্রে, প্রাপ্ত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পত্তি" সম্বন্ধে পণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। অবশেষে স্বামী নিখিলানন্দ উৎসবের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নবাগত স্বামী সৎপ্রকাশানন্দকে অভিনন্দিত করেন।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্র্যান্সিসকো—গত মে মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরি ক্লাব এবং বেদান্ত সোসাইটিতে প্রতি রবিবার ও বুধবার নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন:—২রা মে, "প্রার্থনা এবং রাহস্যিক অভিজ্ঞতা, ৫ই মে, "স্বর্গীয় মনের প্রকৃতি ও শক্তি; ৯ই মে, "আমরা কি কর্ম্মকে জয় করিতে পারি?" ১২ই মে, "গীতার প্রথম অধ্যায়ের শিক্ষা", ১৬ই মে, "আমাদের 'আমি' কি?" ১৯শে মে, "গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিক্ষা"; ২৩শে মে, "ঈশ্বর সান্নিধ্যের অভ্যাস"; ২৬শে মে, "বুদ্ধের জীবনী ও শিক্ষা", ৩০শে মে, "মন্ত্রশক্তি"।

এতদ্ব্যতীত তিনি সমাগত ভক্তগণকে ধ্যান ধারণাদি ও বেদান্ত-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারুইপুর—গত ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুভ অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে বারুইপুর সহরস্থ শ্রীমতী প্রমোলাবালা দেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম কুটিরে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী মুকুন্দানন্দ ষোড়শোপচারে পূজা হোম ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্বামী অপূর্ব্বানন্দের সুমধুর কালী-কীর্ত্তন ও ভজন-সঙ্গীত সমাগত নরনারীর মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী প্রবোধানন্দ, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, স্বামী করুণানন্দ, স্বামী বশিষ্ঠানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুবোধ গোবিন্দ চৌধুরী, ডি-এস-সি, ডাঃ সত্যপ্রকাশ রায়চৌধুরী, ডি-এস্-সি, ডাঃ, দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী, ডি-এস-সি প্রভৃতি কলিকাতা হইতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় ২০০ শত

নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার পর উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, ভবানীপুর—কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকার সময় তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা নেহ্‌রুকে সঙ্গে লইয়া ভবানীপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দ তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্গে লইয়া প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করাইয়া উহার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। প্রতিষ্ঠানের আউটডোর বিভাগে সন্তানসম্ভবাগণকে পরীক্ষা, উপদেশ ও চিকিৎসাদি দ্বারা যথাসম্ভব সুস্থ ও সবল রাখা, প্রসবকালে প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালে অথবা প্রসূতিদের বাড়ীতে সুশিক্ষিতা ধাত্রী পাঠাইয়া প্রসব ও শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করা এবং নবজাত শিশুকে প্রায় চারি বৎসরকাল ধরিয়া সুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা ও অসহায়া বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা বা কুমারীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী পণ্ডিতজীকে জানান হয়।

পণ্ডিতজী প্রায় আধঘণ্টাকাল প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং অতি আগ্রহের সহিত এই সকল বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন। বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"আমি এই শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া আনন্দিত ও লাভবান হইয়াছি। আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং কঠোর মিতব্যয়িতা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রগুলি যে কিরূপে এরূপ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি সর্ব্বদাই বিস্মিত হই। যথার্থ সেবার ভাবে এই কেন্দ্রগুলি অনুপ্রাণিত। উহাই সকল অভাব পূরণ করিয়া এই সেবাকেন্দ্রগুলিকে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি যে বাস্তবিকই অতি প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসিগণের পক্ষে বরস্বরূপ হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।"

গ্রন্থ-প্রকাশ—বেলুড়মঠের স্বামী অপূর্ব্বানন্দ পূজনীয় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। যাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ মহারাজের লিখিত পত্র বা তাঁহার কথিত উপদেশ আছে, তাঁহাদিগকে উহা পোঃ বেলুড়মঠ (হাওড়া) এই ঠিকানায় উক্ত স্বামীজির নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কার্য্যশেষে উহা মালিকগণের নিকট ফেরৎ পাঠান হইবে।

কর্ম্মজীবনে বেদান্তের আদর্শ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার আচার্য্য, এম্‌-এ, কাব্যমীমাংসাতীর্থ

আমাদের মত গৃহী লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনেরই ধারণা যে, বেদান্তশাস্ত্র কেবলই নীরস যুক্তিতর্কের কঠোরতায় পরিপূর্ণ। অসম্ভাব্য আশামরীচিকার পরিপোষণকারী এই বেদান্তমরুতে বুঝি কোথাও এক বিন্দু জল বা স্বল্পমাত্র মরূদ্যানের স্থান নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা বুঝি সবই উহার উত্তপ্ত মতবাদ রৌদ্রময় দুর্গম যুক্তিবালুকায় বিচরণকারী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েরই একমাত্র উপভোগ্য, আর ভোগের নন্দনকাননে বিচরণকারী গৃহীর একান্ত ভয়ের সামগ্রী। কিন্তু এরূপ বুঝা আমাদের ভ্রম; বাস্তবিক, বেদান্ত-বর্ণিত অবিদ্যা বা মায়া এক্ষেত্রে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; উহা একটী উপচক্ষু বা বহিরাবরণরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে এমন ভাবে আচ্ছাদিত রাখিয়াছে যে, আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহাই ঐ অবিদ্যার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাই, আমরা যাহা কিছু বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি, তাহাই ভ্রান্ত। অবিদ্যার এই জালবন্ধন ছিন্ন করা সহজসাধ্য নহে, অথচ উহা ছিন্ন না হইলে আমরা প্রকৃত সত্য বা বস্তুতত্ত্ব জানিতেই পারিব না। বেদান্তজ্ঞান এই জালবন্ধন ছিন্ন করিবার মহাযন্ত্র, মহামন্ত্র; এজন্যই বেদান্তকে এত কঠোর বলিয়া মনে হয়। মায়ার মোহে সমাচ্ছন্ন আমাদের বিবেক বুদ্ধি, মদমত্তের মত আমরা নিরন্তর কেবল এই মায়ার মদই খুঁজিতেছি; ক্ষণে ক্ষণে বিবেক বলিতে চাহিতেছে, ওঠ, জাগ, কিন্তু এদিকে আমাদের দৃক্‌পাত নাই; "নিরন্তর ভোগই চাই, এমন ধারা কঠোর হ'য়ে এসুখে বঞ্চিত করো না।" এই জন্যই বেদান্তের নীরস যুক্তিতর্ক আমাদের ভাল লাগে না, আমাদের বোধগম্য হয় না এবং কর্ম্মজীবনে তাহা চাই না। বেদান্তের মূর্ত্তপ্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি

ভারতীয় বেদান্তের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন, যিনি বেদান্তধর্ম্মের সুশীতল নীতিবারি বর্ষণে সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, তাঁহারই ইউরোপে প্রদত্ত একটী বক্তৃতার কিয়দংশমাত্র অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের কর্ম্মজীবনে প্রত্যেক কর্ম্মই বেদান্তানুসারী হওয়া প্রয়োজন, এক মুহূর্ত্তও বেদান্তছাড়া আমরা চলিতে পারি না। যে মুহূর্ত্তে মানব বেদান্ত বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই মানবজীবনের সংগ্রামতরী পথচ্যুত এবং অবিদ্যার কঠোর শৈলে প্রতিহত হইয়া অতল কাল-জলধিতলে নিমজ্জিত হইবে।

ধর্ম্ম আমাদের মজ্জাগত, প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। নির্জ্জন অরণ্যবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া কোলাহল-ময় নগরের অধিবাসী পর্য্যন্ত সকলের জন্যই শাস্ত্র-প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল, এবং শাস্ত্রেরই নির্দ্দেশানুসারে সমগ্র হিন্দুজীবনটা গঠিত ছিল। কালের কুটিল গতিতে সেই শাস্ত্রের অনেক কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আজ আমরা সমগ্র শাস্ত্রটাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে প্রত্যেকটী শাস্ত্রবাক্যের মূলেই বেদান্তকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, সকল শাস্ত্র-বিধিই এক বৈদান্তিক চরম লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া গঠিত হইয়াছিল। শুধু, আমরা ব্যবহার ক্ষেত্রে সংসারের মোহজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্মের সিংহাসনে একমাত্র বেদান্তই অবস্থিত, বেদান্তের কার্য্যোপযোগিতা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। "আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে। কারণ, বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তুর সম্বন্ধে উপদেশ করেন—বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন।"

বেদান্ত যদি কেবল ফলমূলাহারী, বল্কলপরিধায়ী নির্জ্জন অরণ্যবাসী মুনিকুলেরই চিন্তাপ্রসূত হইত, তাহা হইলে না হয় উহা কেবল বনবাসীদেরই ব্যবহারোপযোগী হইত, কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নয়; "যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মে ব্যস্ত বলিয়া জানি, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহার প্রণেতা।" ঐহিক বিভবের কুবের, অশেষ প্রকার ভোগের ভোগী, কোলাহলমুখরিত রাজপ্রাসাদের অধিষ্ঠাতা রাজন্যবর্গ এই ব্রহ্মবিদ্যার জন্মদাতা। কার্য্যের বাহুল্য এবং তৎপরতা বলিতে যাহা কিছু, সবই এই রাজপ্রাসাদে বর্ত্তমান; সুতরাং এখানে যাহা প্রণীত হইবে, তাহা কার্য্যোপযোগী না হইয়া পারে না। এই কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তম চিন্তাপ্রসূত এই ব্রহ্মবিদ্যা মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। ইহার উপদেশাবলী এতই সত্যপথপ্রদর্শক যে, ইহা শুধু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর নয়, জগতের সকল ধর্ম্মীরই আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত। স্বামিজী বেদান্তকে রাজপ্রণীত বলিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই, কেননা, উপনিষদ তাঁহার এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে শ্বেতকেতু প্রবহণসংবাদে আছে, আরুণি নামক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু একদা পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি নামক ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পরলোক সম্বন্ধে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্বেতকেতু তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হন এবং ক্ষুন্নমনে পিতার নিকটে ফিরিয়া আসেন। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে শ্বেতকেতু স্বীয় পরাভবের কথা তাঁহার নিকট বলিলেন এবং ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর প্রার্থনা করিলেন। পিতা বলিলেন, "বৎস, আমি ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না,

জানিলে কি সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তাহা তোমাকে শিখাইয়া দিতাম না?" তখন পিতাপুত্রে মিলিত হইয়া পাঞ্চালরাজের নিকটে চলিয়া গেলেন এবং সেই প্রশ্নগুলির উত্তর তাহাদিগকে শিখাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "এই বিদ্যা—এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ব্রাহ্মণেরা কখন ইহা জানিতেন না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রথম এই বিদ্যা লাভ করিতেছ।" এই বলিয়া আরুণি এবং শ্বেতকেতুকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ত শিক্ষা দিলেন। শুধু ইহাই নয়, আমরা জানি যে, মিথিলার রাজর্ষি জনক বহু ব্রাহ্মণকে বেদান্তবিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ঠে দেখিতে পাই, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকাল অতিক্রম করিতে না করিতেই রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের মধ্যে বেদান্তোপদিষ্ট আত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধনিনাদের মধ্যস্থলে দ্বারকারাজ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া সর্ব্বোত্তম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্-ভাগবদ্‌গীতা বহির্গত হইয়াছিল এবং আরও দেখিতে পাই যে, ইহার সমস্ত উপদেশের সার মর্ম্ম—"তীব্র কর্ম্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে অনন্ত শান্ত ভাব।"

এই সকল কারণে ইহাই সতত আমাদের মনে উদিত হয় যে, "এই (বেদান্ত) দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন অবশ্যই সম্ভব।" কর্ম্ম করিতেই হইবে; কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে; কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহার ফলের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বা আকাঙ্ক্ষাশূন্য থাকিতে হইবে; কেননা, কর্ম্মেই আমাদের অধিকার ফলভোগে নহে—"কর্ম্মণ্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহার প্রতি একান্ত আগ্রহ জন্মে না, এবং তজ্জন্য কার্য্যও ততটা করা যায় না, একথা সত্য নহে; আগ্রহ না থাকিলেই আমরা অধিক কার্য্য করিতে পারি, কেননা, কার্য্যের জন্য অধিক আগ্রহান্বিত বা উন্মত্ত হইয়া উঠিলে ঐ নিরর্থক ভাবের আতিশয্যেই অনেক শক্তির অপচয় হইয়া যায়, কার্য্যকরীশক্তি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। "যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা বেশী কাজ করিতে পারে না।" আর কেবল অধিক কার্য্য করিলেই হইল না, সেই সকল কার্য্যই করিতে হইবে, যাহা আদর্শের দিকে, একত্বের দিকে লইয়া যায়। বেদান্ত একটী দর্শনশাস্ত্র, সুতরাং ইহাতে আদর্শসম্বন্ধেই উপদেশলাভ করিবার প্রত্যাশা করা যায়, দুষ্কর্ম্মের স্থান ইহাতে নাই। বেদান্ত বলেন, আদর্শ কর্ম্মী সেই হইবে, যে একমাত্র আদর্শকেই লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কর্ম্ম-জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই আদর্শকে স্মরণ রাখিতে হইবে, দেখিতে হইবে, যে কর্ম্মটী করিতে যাইতেছি, তাহা আদর্শের দিকে লইয়া যায়, না তাহা হইতে দূরে সরাইয়া লয়। যে কর্ম্ম আদর্শকে দূরে রাখে, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, কেননা, তাহাতে অনর্থ-সংঘটন হইবে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বেদান্তের আদর্শ, এবং উহার প্রদর্শক "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য। আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত, শুদ্ধস্বভাব, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র অবস্থিত। সুতরাং আমি মরিব, আমার মৃত্যুভয় হইতেছে, এরূপ ভাবা কুসংস্কার, অপবিত্রতা (অপকর্ম্মকারিতা) ও অজ্ঞতা কুসংস্কার; আমি তুমি নহি, এবং তুমি আমি নহ, এরূপ মনে করা কুসংস্কার। এই আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইলে এমন সব কার্য্য করা আবশ্যক, যাহাতে আদর্শ-স্বভাব নষ্ট না হয়।

আমাদের জীবনের গতি দুই প্রকার, (১) আদর্শকে জীবনোপযোগী করিয়া লওয়া, আর (২) জীবনকে আদর্শোপযোগী করিয়া লওয়া। আমাদের মধ্যে অধিকাংশের জীবনের গতি প্রথম প্রকারের।

বেদান্তের শুষ্ক উপদেশবাক্য যখন আমাদিগকে এই নয়নমনোরঞ্জন সংসার উপবনের সহিত চিরপরিচিত থাকিতে নিষেধ করে, আমাদের চিরাভ্যস্ত প্রিয়-পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, তখন আমরা বলি, না, এরূপ হইতে পারে না ; আমাদের আদর্শ ইহা নয়। আমাদের আদর্শ আমরাই গঠন করিয়া লইব। বিধাতার রাজ্যে যখন জন্ম নিয়াছি, বিধাতা যখন আমাদিগকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া এই ভোগসুখের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন এইগুলির সদ্ব্যবহার না করিলে তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইবে। সুতরাং আমাদের আদর্শ কর্ত্তব্য হইবে, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" বেদান্ত কিন্তু এই ভ্রমকেই অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, ইহাকেই বলিয়াছেন রজ্জুতে সর্পভ্রম। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা এমনই বস্তু যে তাহা সকল পদার্থের স্বরূপ দ্রষ্টার চক্ষু হইতে অন্তরিত রাখে। যিনি একটু ভাল দেখিতে পান, তিনি উহা রজ্জুই দেখেন, কিন্তু অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি শুধু সর্প সর্প বলিয়া চীৎকার করেন, অথচ কিছুতেই বুঝিতে চান না যে ইহা তাঁহার ভ্রম। জগৎটা এরূপই একটা ধাঁধা ; দৈনন্দিন জগতের পরিবর্ত্তন দেখিয়াও আমরা মনে করিতেছি যে ইহা একটী স্থায়ী জিনিষ। আদর্শ যতদিন দূরে থাকিবে, ততদিন কিছুতেই বুঝিনা যে, উহা বাস্তবিক কিছু নয়। যাঁহারা আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চান, জগতের প্রকৃত স্বরূপ এবং রহস্য অবগত হইতে চান, তাঁহাদের জীবনের গতি দ্বিতীয় প্রকারের। তাঁহারা জীবনকেই আদর্শোপযোগী করিয়া গঠন করেন। আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই একটী একটী করিয়া জীবনের সমস্ত ধাঁধা ঘুচিতে থাকে এবং অবশেষে ব্যক্তিগত জীবনটী সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত বা সমষ্টিগত জীবনে পরিণত হয়। "প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে--বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত করিতে হইবে," কেননা, বেদান্তের মূলকথা একত্ব বা অখণ্ড ভাব।

বেদান্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটী সত্য কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি প্রত্যেকের ভিতরেই রহিয়াছে ; কিন্তু আমরা নিজেরাই তাহা চাপা দিয়া রাখিয়াছি, এবং শক্তি নাই, শক্তি নাই বলিয়া চীৎকার করিতেছি। জগতের সকল শক্তির একমাত্র কেন্দ্র আত্মা সকলের মধ্যেই নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। অজ্ঞতার ফলে আমরা সে কথা বার বার ভুলিয়া যাই, আর শক্তি নাই, শক্তি নাই বলিয়া চীৎকার করি। তোমার শক্তিকেন্দ্রকে জানিতে চেষ্টা কর, বুঝিতে পারিবে, তোমার অনন্তশক্তি আছে এবং জগতে তোমার অসাধ্য বলিতে কিছুই নাই। আত্মবিশ্বাস কর, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে শিখ, দেখিবে তোমার ভয় চলিয়া গিয়াছে, অপবিত্রতা বিদূরিত হইয়াছে, সকল বন্ধন শিথিল হইয়াছে আর সমগ্র জগৎ তোমাতেই বিলীন হইয়াছে। বেদান্তমতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস না করাকে নাস্তিকতা বলে না ; "যে ব্যক্তি আপনাকে (ঈশ্বররূপে) বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক।" আপনাকে ঈশ্বর ভাবা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবা, বা আপনাকে ঐ এক ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করা ভ্রান্ত অনুমান বা অবিদ্যার ইন্দ্রজাল। আপনাকে ঈশ্বররূপে ভাবাই বেদান্ত ধর্ম্ম, ইহাতে স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ বা জাতি ধর্ম্ম ভেদ নাই। ভেদজ্ঞান-মাত্রই অজ্ঞতার ফল। "যদি তুমি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমায় পশুগণের সহিত উচ্চতম প্রাণীর পর্য্যন্ত সমতা মানিতে হইবে।" কেননা, এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নহে, কারণ বেদান্ত একত্ববাদ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি

(এক ঈশ্বররূপে) বিশ্বাস, কারণ, তোমরা সকলে শুদ্ধ (পরমাত্ম) স্বরূপ।" আজকাল জড়বিজ্ঞানের যুগ, জড়বিজ্ঞানের প্রতি আমরা অতিমাত্রায় আস্থাবান্; কিন্তু জড়বিজ্ঞান কি বলিতেছে? ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, জড়বিজ্ঞান বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, কেননা- উহাও একত্ববাদই ঘোষণা করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় জড়বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আকাশনামক পদার্থের পরিমাণগত ভেদের ফলেই সমুদায় জড়জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; সকল বস্তুই আকাশ হইতে উৎপন্ন। আকাশকে আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। এই শক্তিপুঞ্জই বেদান্তমতে প্রাণ। ইহাই এক বা সমুদায়রূপে জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কেবল স্পন্দনগত ভেদের ফলে ইহা কোথাও জড়, কোথাও দ্রব, কোথাও বায়ব, আবার কোথাও শক্তিস্বরূপ। এই প্রাণকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, কারণ, ইহাই জগতের উপাদান, ইহাই একমাত্র সত্য বস্তু, ইহাকে ভাঙ্গা-গড়া করিবার উপায় নাই। প্রাণকে জাগতিক কোনও কিছু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান যায় না, জড়-বিজ্ঞানও অণুবীক্ষণে তাহা দেখিতে পান না, ইহা একমাত্র অনুভবগম্য। ঘটকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না, জগৎকে সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করিলে তেমনই প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, মনুষ্য, পশু, কীট, সবই সমান, সবই এক প্রাণ, সবই ঈশ্বর। আপনাকে এবং সমগ্র জগৎকে এক ঈশ্বর বলিয়া ভাব এবং মনে রাখ, 'শক্তি নাই' কথাটী ভুল।

সমগ্র জগৎকে, সমগ্র বিশ্বকে আপন ভাবা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্য কিছু নহে, উহা অবিদ্যার ভিতর দিয়া প্রতি-ফলিত সেই অ-রূপেরই একটা কাল্পনিক রূপমাত্র। ইহাকে ভাল করিয়া জানিবার জন্য, আপনার করিয়া লইবার জন্যই সমগ্র জীবজগৎ সতত প্রয়াসী। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না, আমরা কি চাই; ভুল করিয়া যাহা চাই, তাহা মরীচিকা মাত্র, বাস্তবিক আমরা তাহা চাই না। যে মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের কামনার বস্তু পাইলাম বলিয়া মনে করি, সেই মুহূর্ত্তেই একবার করিয়া অলক্ষ্যে আমাদের ভুল ভাঙ্গে এবং এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারি যে, যাহা পাইয়াছি, বাস্তবিক তাহা চাই নাই; কিন্তু যাহা সত্যই চাই, তাহা এখনও পাই নাই। এইরূপে আমাদের চাওয়ার আর নিবৃত্তি হয় না; যতদিন না আমরা এরূপ চাহিতে চাহিতে —ঠিক্‌ভাবে চাহিতে চাহিতে, চরম লক্ষ্যে গিয়া পৌছাইব, ততদিন ইহার নিবৃত্তি হইবেও না। এরূপ ভাবেই জীব শিব হইতে চায়, কিন্তু অবিদ্যা তাহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করে। জীবের এরূপ প্রগতির চেষ্টা প্রবলভাবে থাকিলেও, অবিদ্যা তাহার সম্মুখে রক্ষণশীলতার একটা ভীষণ বাঁধ নির্ম্মাণ করে। মনুষ্যস্বভাবে এই ভয়ানক রক্ষণ-শীলতা অতিশয় মারাত্মক ব্যাধি; ইহার একমাত্র মহৌষধ আপনার ঈশ্বরত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা আদর্শের দিকে একপদও অগ্রসর হই না, অথচ একে অন্যের নিন্দা করিতে, একে অন্যের সমা-লোচনা করিতে পঞ্চমুখ হইয়া দাঁড়াই; কি ভীষণ পাপপ্রবৃত্তি! ইহাতে লাভ ত হয়ই না, বরং বৃথা শক্তিক্ষয়ই হয়। পক্ষান্তরে, এই শক্তিটুকু সৎপথে চালিত করিলে, যাহাদের সমালোচনা করা হয়, তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া, আপন বলিয়া ভাবিলে আদর্শের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া যাওয়া যায়। বেদান্ত মতে "প্রেম সত্য, কারণ, উহা মিলন-সম্পাদক; ঘৃণা অসত্য, কারণ, উহা বহুত্ব-বিধায়ক—পৃথক্‌কারক।" যাহা ব্যষ্টিবিধায়ক, তাহা জগতে অমঙ্গল আনয়ন করে, তাহা অধর্ম্ম; আর যাহা সমষ্টিবিধায়ক, তাহা জগতে মঙ্গল আনয়ন

করে, তাহাই ধর্ম্ম। প্রেমই ধর্ম্ম; বিশ্বপ্রেমিক হও, তোমার প্রতিবেশীকে, তোমার দেশবাসীকে, তোমার জগৎবাসীকে ভালবাসিতে শিখ, অচিরাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার হইবে, অসংখ্য বন্ধন হইতে তুমি চিরমুক্ত হইবে।

আমরা বলিয়া থাকি, বেদান্তের বর্ণিত আদর্শ বা আত্মা অজ্ঞেয় বস্তু, সুতরাং ইহাকে জানিতে প্রয়াসী হইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করিব কেন? বেদান্ত বলেন, ওহে মোহান্ধ মানব, আত্মা কাহারও অজ্ঞাত নহে। আমরা যত সব বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করি, তার প্রত্যেকটীর সঙ্গে আত্মাকে (আপনাকে) জানিয়া লই। প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই "আমি জানিতেছি" এরূপ একটী অনুব্যবসায় বা জ্ঞানের উদয় হয়। ইহার অন্তর্গত 'আমি' পদার্থটীই আত্মা। জাগতিক সকল বস্তুর জ্ঞানই এই 'আমি'র ভিতর দিয়া হয়। এই 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে, 'আমি'র সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। বুদ্ধির চালনা বা যুক্তির মারপ্যাঁচের দ্বারা ইহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। যদি হৃদয় থাকে, যদি অনুভব করিবার মত ক্ষমতা থাকে, তবেই উহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, কেননা, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মার অস্তিত্ব বুঝা যায়, কিন্তু উহার প্রকৃত শুদ্ধ স্বরূপটি জানিতে হইলেই হৃদয়ের প্রয়োজন। সুতরাং বেদান্ত হইতে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্ব্বজ্ঞ বিভু পরমাত্মার স্বভাব প্রথমে জ্ঞাত হইয়া চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা হৃদয় গঠন করিয়া লইতে হইবে; এই বেদান্তদর্শনের আলোকে আদর্শ জীবন গঠন করিয়া এই ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্রের "অসংখ্য বন্ধন মাঝে"ও "মুক্তির স্বাদ" লাভ করিতে হইবে।

কৃষ্ণাষ্টমী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

দুর্গ দুয়ারে লৌহ কপাট ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে,
শস্ত্রীরা জপে ইষ্টমন্ত্র শঙ্কিত অন্তরে,—
অথচ কোথাও শত্রুর দেখা নাই।
নিকষ নিবিড় আঁধার গগন কৃষ্ণপক্ষনিশি—
গুরু গুরু গুরু বজ্র হাঁকিছে বিদ্যুৎ চমকিয়া,
শিহরিয়া উঠে লতা পল্লব যমুনার নীল বারি,
হাহাহা শব্দে উন্মাদ বায়ু উঠিছে চঞ্চলিয়া;
মথুরার রাজ প্রাসাদ ভিত্তি সহসা কাঁপিয়া উঠে।

কংসের চোখে ঘুম নাই সারারাত—
আশে পাশে যেন কায়াহীন প্রেত অজ্ঞেয় বিভীষিকা,
নাচে বীভৎস বিকট ভঙ্গীমাতে;
কানে তা'র ভেসে আসে—
দক্ষিণ দ্বারে দাঁড়ায়ে রুদ্র রাঙ্গের হাসি হাসে।
আকাশে চক্র ঘর্ ঘর্ ঘর্ বিচ্ছুরি' জ্যোতিঃ-জাল—
উৎপীড়কের কণ্ঠ ছেদিতে ঐ বুঝি ছুটে আসে;
কংস করিছে স্বগত প্রশ্ন ভীরু বক্ষের পাশে—
"কে তুমি দানব? পিশাচ? দেবতা? দূর হও বিভীষিকা?
পারিনা সহিতে দূর হ'য়ে যাও মায়া বহ্নির শিখা!"

আকাশে ফুটিল রুদ্র আস্যে কুটিল ব্যঙ্গ হাসি
ক্রূর হুঙ্কার বায়ু তরঙ্গে ভয়াল অট্ট রোলে
জলদমন্দ্র গম্ভীর সুরে নামিল দৈববাণী—
"সাবধান ওরে মূর্খ দানব ঘৃণিত অত্যাচারী
মৃত্যু আঁধারে সাবধান সাবধান !"

কারার অন্ধকারে—
শান্তিদাতার গর্ভধারিণী দেবকী শৃঙ্খলিতা,
মর্ম্মে জ্বালায়ে প্রতিহিংসার দাউ দাউ দাউ চিতা,
বীরমাতা গাহে কারাগার ভাঙ্গি' জাগো জাগো
নারায়ণ—
লৌহ শিকল অগ্নি আঘাতে বেণু বেণু বেণু করি
এস নিয়ন্তা বিপদ হন্তা শাসন চক্র ধরি'।
নির্য্যাতীতের দেশে—
প্রজাপুঞ্জের আর্ত্ত বিলাপ উঠিছে মর্ম্মভেদী—
কংস নিধন প্রার্থনা করে গড়িয়া যজ্ঞবেদী,—
জ্বালি' লেলিহান হোম হুতাশন শিখা ;
মুক্তির লাগি' হোতা বসুদেব লয়েছে কঠোর ব্রত
তুচ্ছ করিয়া বন্দী জীবন কংসের কারাগারে।
জাগো জাগো নারায়ণ—
জাগো জাগো জাগো বিপ্লবী বীর বিরাট বীর্য্যরূপী,
জাগো হে বিষ্ণু, রুদ্র ভীষণ, শঙ্খচক্রধারী,
রক্তে লুটাক ছিন্নমুণ্ড বর্ব্বর পাপাচারী,
হে মহামানব, এস এস আজ নির্য্যাতীতের দেশে
জাগো দুর্জ্জয় পাষাণ কারায় ভীম ভয়াবহ বেশে।

উদয় তীর্থে রক্তবরণ আগ্নেয় উগ্রতা—
মেলিয়া বিরাট অজাগরী বাহু দিকদিগন্ত ব্যাপি'
ব্যোম্ পথে কোটী সৌরজগৎ সভয়ে উঠিছে
কাঁপি',
অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরি ঐ আসে ভৈরব
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ গুরু গুরু গুরু বাজে ডম্বরু শিঙা
কোটী বজ্রের প্রলয় নিনাদে শাসন-চক্র ঘোরে
চমকিয়া উঠে ঘনীভূত বিদ্যুৎ।

শোণিত পঙ্কে ছট্‌ফট্ করে কংসের কাটা মাথা
কালীয় চানুর কেশী অঘাসুর শাল্ব ও শিশুপাল—
তৃণাবর্ত্ত ও পুতনার সাথে ঘুরিছে কুম্ভীপাকে ;
অন্তরীক্ষে হুঙ্কার ছাড়ি মৃত্যু দেবতা হাঁকে—
ভয় নাই, ভয় নাই—
ভয় নাই ওরে নিপীড়িত প্রাণ ব্যথিত নির্য্যাতীত
আসিয়াছি আমি লৌহ কারার শিকল চূর্ণ করি'।
ভয় নাই আর জননী আমার দেবকী শৃঙ্খলিতা
দিব্যনয়ন মেলিয়া চাহগো অয়ি বন্দিনী মাতা।

অযুত অযুত সূর্য্যের জ্যোতি বিচ্ছুরি মহাকাশে—
কে তুমি আসিলে বিরাট পুরুষ পরম দেবতারূপী ?
নবকোৎসবে মত্ত অসুর তাই কাঁপে বুঝি ত্রাসে
কংসানুচর শস্ত্রীরা তাই কথা কয় চুপি চুপি ?
অত্যাচারীর ভাগ্য আকাশে উড়ে শকুনীর পাখা
অকরুণা ঘোর ঘন রজনীর ভয়াল অঙ্গরাখা।
মৃত্যু-যমুনা উত্তরি' চলে বসুদেব আর শিবা
সন্ত্রাসে ভীত বিশ্ব আকাশ বিস্ময়ে নির্ব্বাক
শিশু দেবতার ছলনা-হাস্যে ভাতিছে দিব্য বিভা
কৃষ্ণাষ্টমী থম্ থম্ থম্ করে।

নমো নমো নারায়ণ,
পাঞ্চজন্য নিনাদ তোমার কোটী গিরি বিদারণ,
প্রলয়োন্মাদ শব্দের মত শুনিয়া বন্দী প্রাণে—
মনে হয় যেন সৃজনের বীণা বাজিছে ধ্বংস গানে ;
যুগে যুগে তব সম্ভব জানি ধর্ম্মের গ্লানি মাঝে
মুখরি' আকাশ ওগো স্বয়ম্ভু অভয়কম্বু বাজে।
নমো নমো নারায়ণ,
মৃতা-শর্ব্বরী-চিতার বহ্নি তোমার জীবনায়ন।

শ্রীমার কথা

স্বামী গিরিজানন্দ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যোগোগ্যানে আসিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি মন্দিরের সেবকের কার্য্যে ব্রতী হই। এখানে আসিয়া জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমা তাঁহাব পিত্রালয় জয়বামবাটী গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। আকুল আগ্রহ প্রাণে লইয়া পত্রযোগে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন জানাইয়া কিঞ্চিৎ পদধূলি প্রার্থনা কবিলাম। মা খামে পূরিয়া তাঁহাব চরণরজঃ পাঠাইয়া দিলেন, আমি ধারণ করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইলাম। মার সাক্ষাৎ চরণ দর্শন করিতে প্রাণে প্রবলতব আগ্রহ হইল।

কয়েক মাস পবে মাব কৃপায় সুযোগ আসিল। আমার বন্ধু বটু বাবুকে লইয়া মার চবণ প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। মা তখন জয়বামবাটীতে ছিলেন। এমনি অদৃষ্ট, পৌছিবা মাত্র মা বলিলেন, "বাবা। বড় বউয়েব (প্রসন্ন মামাব স্ত্রীব) কলেবা হয়েছে, এই দুপুবে বান্না বান্না কবলে, চাকবদেব খাওয়ালে, তার পর থেকে হঠাৎ ভেদ বমি চল্‌ছে। এ বেলা আর কে বান্না কবে, পান্তা ভাত আছে, খাবে?" আমি ও বটুবাবু বেশ তৃপ্তির সহিত সেই পান্তা ভাত খাইলাম। গবমেব দিন, তাতে আবাব পথশ্রম, পান্তা ভাত লাগিল ভাল।

বরদা মামা আমাকে মামীব নিকট লইয়া গেলেন এবং কিসে প্রত্যাং হয় জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমি তখন চিকিৎসা কিংবা সেবাকার্য্য কিছুই শিখি নাই। যেমন স্কুলকলেজের ছেলেবা পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত কোন অভিজ্ঞতা লাভ করেনা, আমিও তদ্রূপ ছিলাম। বলিলাম, "না, বল্‌তে পারি না।"

মামা সাবানের ফেনা তলপেটে লাগাইয়া দিলেন। মামী সেই রাত্রেই মারা গেলেন। প্রায় বার ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার জীবনেব সব শেষ হইয়া গেল। গ্রামে ডাক্তার কবিবাজ নাই, একরূপ বিনা চিকিৎসায়ই মামী মাবা গেলেন। অর্থবল লোক্‌বল যথেষ্ট থাকা সত্বেও পল্লীগ্রামে এরূপ কত লোক অচিকিৎসায় মাবা যায়, কে তাব খোঁজ লয়? বাত্রেই মামীকে সৎকাব কবিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। প্রসন্ন মামাব বড় মেয়ে নলিনী ক্রন্দন কবিয়া গ্রাম তোলপাড় কবিয়া তুলিল। এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি কবিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "তোমরা আমাব মাকে কোথায় নিয়ে গেলে গো।" মাকু তখন ছোট, সে বুঝিতে পারিলনা যে, তাহাকে আদব যত্ন কবিবাব জগতে আব কেহ বহিল না। মাব কনিষ্ঠ ভ্রাতাব মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাব শিশুকন্যা রাধু মাব যত্নে তাঁহাব নিকট লালিত পালিত হইতেছে। এখন আব দুইটী তাঁহাব জুটিল, মাতৃহীনা নলিনী ও মাকু।

আমি দীক্ষা লইবাব আশায় মাব নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু এ অবস্থায় আব কি কবিয়া দীক্ষাব কথা বলি? মনে হইল যাই, আমুড়ে বিশালাক্ষীদেবী দর্শন করিয়া আসি। মাকে এই অভিপ্রায় জানাইতে তিনি বলিলেন, "কত আশা করে এসেছ, স্নান করে এস, যা হয় বলেদি।" মা দীক্ষার ইঙ্গিত করিতেছেন বুঝিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। প্রথম আমার দীক্ষা হইল, পরে মা বটুবাবুকেও ডাকিয়া দিতে বলিলেন, তাঁহার দীক্ষা হইল। মার নিকট হইতে আসিয়া বটুবাবু আমাকে বলিলেন, "কৈ আমিতো মার কাছে দীক্ষা

চাইনি, তবু আমাকে তিনি কৃপা করলেন!" আমি বলিলাম, "ইহার নামই অহৈতুকী করুণা।"

যোগোদ্যানে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এই শোকতাপ পূর্ণ গৃহে আর কি থাকা চলে? মা বলিলেন, "শরৎকে (পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে) সব বল্‌বে আর প্রসন্নকে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের বাসায় গিয়ে বলবে—সে যেন শিগগির বাড়ী রওনা হয়। তার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে, এই কথা বলো, মারা যাবার কথা বলো না, সে যে লোক, হয়তো গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বে।" মার পদধূলি লইয়া রওনা হইলাম।

রাত্রে বেলুড় ষ্টেশনে নামিয়া মঠে আসিলাম। সাধুদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বামুনঠাকুর প্রভাকরের নিকট হইতে রুটী তরকারি লইয়া খাইলাম। শুনিলাম, শরৎ মহারাজ বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে আছেন। পরদিন প্রাতে নৌকায় বাগবাজার আসিলাম এবং মহারাজকে সমস্ত নিবেদন করিয়া মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে মামার বাসায় আসিলাম। মামা বাসায় নাই, একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম, "মামা এলে বল্‌বেন, আজই যেন তিনি বাড়ী রওনা হন, তাঁর স্ত্রীর কলেরা হয়েছে। আজ্‌কের গাড়ীতেই যেন রওনা হন, দেরী না করেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সে আর বল্‌তে হবে না, যখন শুনবে তাঁর স্ত্রীর কলেরা হয়েছে, তখন বুক পিঠে চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটবে'খন।" মা কেন মামাকে মামীর মৃত্যু সংবাদ দিতে মানা করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম। শোকাবেগে আত্মহত্যা করা মামার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও যোগোদ্যানের পৃষ্ঠপোষক গৃহীভক্ত ৺কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের অস্থি সংক্রান্ত ব্যাপার এখন প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যাহার ফলে কুৎসা, নিন্দা, অপবাদ ইত্যাদি মোহন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে অজস্র বর্ষিত হইতেছে এবং তাঁহাকে গদিচ্যুত করিবার চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। এ গোলমালের মধ্যে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেলাম। এই অবস্থায় মার নিকট যাইয়া সকল বিষয় তাঁহাকে বলা আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে হইল। যদি মা আদেশ দেন তাহা হইলে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির) নিকট যাইয়া থাকিব, মনে এই ইচ্ছাও আসিল।

একাই তারকেশ্বর হইয়া তেলোভেলোর মাঠ পার হইয়া জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) আসিলাম; ক্রমে কামারপুকুর হইয়া মার চরণ প্রান্তে পৌছিয়া সব নিবেদন করিলাম। মা বলিলেন, "বাবা, তুমি সাধু, পরনিন্দা পরচর্চ্চার মধ্যে তুমি থেকোনা। যে পরনিন্দা করে, সেই পড়ে যায়। এই দেখনা, নি— নৃ-কে কত বল্‌তো, তুই সাধু হয়ে এমন করলি? দেখ, নৃ—তো উঠে গেল। নি—কিন্তু পড়ে গেল। তুমি ঠাকুরের সেবাপূজা নিয়ে থাক্‌বে আপনার ভাবে, পরনিন্দা পরচর্চ্চার মধ্যে তুমি সাধু থাক্‌বে কেন?" মা তাঁহার একখানা প্রসাদী কাপড় দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের পূজা করবার সময় এখানা পরে পূজা করো।"

গতবার মার নিকট থাকিতে পারি নাই—এবার কিন্তু সে দুঃখ মিটাইয়া লইলাম। আমি ছেলে মানুষ বলিয়া মা কোন সংকোচ করিতেন না। মা কুটনো কুটিতে কুটিতে ঠাকুরের নানা কথা বলিতেন। একদিন মা বলিলেন, "দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হতো, একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙলে বললেন, 'দেখ গা, আমি একদেশে গিছ্‌লাম, সেখানকার লোক সব শাদা শাদা। আহা! তাদের কি ভক্তি! তারা আমার খুব ভক্ত।' তখন কি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, এই অলিবুলরা (আমেরিকান্ মহিলা) সব ভক্ত হবে?

আমি তো ভেবে অবাক, শাদা শাদা মানুষ আবার কি ?”

একদিন মা বলিয়াছিলেন, “দেখ, আমার মা শরৎকে খুব ভালবাস্তেন। শরৎ আমেরিকা যাবে বলে আমার অনুমতি নিতে এসেছে। আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করে বললাম, “কোন ভয় নাই—ঠাকুর তোমাদের সর্ব্বদা রক্ষা কচ্ছেন।” শরৎ চলে গেলে মা আমাকে বল্‌তে লাগলেন, “হ্যাঁ মা সারদা, তুই মা হয়ে কোন্ প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরে পাঠালি ? তোর প্রাণ কি কঠিন।” দিদিমা ভক্তদের বড় ভালবাসিতেন, এই কথা মা অনেককে বলিয়াছেন।

মা পিত্রালয়ে ঠিক পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতন থাকিতেন। এক দিন তিনি মাঠের ক্ষেত হইতে তরকারি আনিতে যান। আমি সাথে চলিলাম। মা কাস্তে দ্বারা খেরো (লাউ জাতীয় তরকারি) কয়েকটি কাটিলেন, আমি কাঁধে করিয়া আনিলাম। কি আনন্দ। মনে হয়, যদি এইরূপ চিরদিন বালক থাকিতাম, তাহা হইলে মার কতই না সেবা করিতে পারিতাম !

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মা বলিয়াছিলেন, “দেখ, এখন অনেকে ঠাকুরকে ভগবান বলে বটে, কিন্তু তিনি থাক্‌তে অনেকেই তাঁকে বুঝতে পারে নি। এই রামলাল-টাল অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করে নি।” সাধন সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, “মনে মনে ঠাকুরকে স্নান করাচ্ছ, খাওয়াচ্ছ, পূজা কচ্ছ, হাওয়া কচ্ছ, এইরূপ চিন্তা করবে।” এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মা, কতবার জপ করবো।” মা বলিলেন, “গুরুর আদিষ্ট ১০৮ বার জপ নিত্য অবশ্য করবে। তার পর তোমরা সাধু—তোমরা সব সময় জপ করবে। তোমাদের তো যথেষ্ট সময় রয়েছে।” একদিন মা আমাকে বলিয়াছিলেন, “বাবা, গুরুগৃহে জপ করতে নাই।” আমি বলিলাম, “১০৮ বার জপও কি তাহলে করবো না” ? তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, “গুরুর আদিষ্ট ১০৮ বার জপ করবে। তার বেশী করো না।”

প্রথমবার মার দেশে আসিয়া বড় মামার স্ত্রীবিয়োগ দেখিয়াছিলাম। এবার আসিয়া তাঁহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ দেখিলাম। মামা একদিন বলিলেন, “চল বাবু, ক’নে দেখে আসি।” গ্রামের কয়েকজন ও আমাকে লইয়া মামা তাঁহার ভাবী পত্নী দেখিতে চলিলেন। কনে দেখা ও বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। বিবাহের দিন মামা বলিলেন, “চল বাবু, বরযাত্রী হবে।” আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, তখন মা বলিলেন, “ও সাধু, ওর গিয়ে কাজ নেই।” আমিও বাঁচিলাম। তখন আমি কাছা দিয়া কাপড় পরিতাম এবং জুতা জামা সব গৃহস্থদের মত ব্যবহার করিতাম। মামা সেইজন্য আমাকে বাবু বলিয়া ডাকিতেন।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় মা বলিলেন, “বাবা, দই দেব কি ? আমি লজ্জাবশতঃ হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছি, “না দরকার নেই।” মা তখন বলিলেন, “এটা বে’র দই—কাজ নেই খেয়ে।” তখন বুঝিলাম, সাধুদের বিবাহ দর্শন ও বিবাহে ভোজনাদি করিতে নাই। মা বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নিষেধ করেছেন, তবে আদ্য শ্রাদ্ধটা বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। যখন যা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন করে খাবে।”

একদিন মাকে বলিয়াছিলাম, “মা ঠাকুরকে দর্শন করতে বড় ইচ্ছা হয়।” মা বলিলেন, “আহা ! ঠাকুর যদি একবার দর্শন দিতেন ! হবে, অন্ততঃ শেষ সময়েও হবে। কোন রকমে এই জীবনটা কাটিয়ে দাও। আর আস্‌তে হবে না, এই শেষ জন্ম।”

প্রায় ১২।১৪ দিন মার ওখানে থাকার পর কোয়ালপাড়ায় যাইব স্থির করিয়াছি, মা বলিলেন, “পাগ্‌লী (রাধুর মা) ক্ষেপেছে, গঙ্গাস্নানে যাবে,

তুমি বাপু, একে কল্‌কাতায় কুসুমের বাড়ী দিয়ে যেও। সাবধানে নিয়ে যেয়ো, দেখো যেন কোন দিকে চলে না যায়।" আমি বালক হইলেও পাগ্‌লী মামীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলাম। মার আদেশ! মাকে প্রণাম করিয়া তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তিনি আমার হাত লইয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি দাঁত দ্বারা ঈষৎ দংশন করিলেন এবং মস্তকে কিঞ্চিৎ মুখামৃত সিঞ্চন করিলেন। আমি আনন্দে ভরপুর হইয়া গেলাম। তাঁহার স্নেহ ভালবাসায় আত্মহারা হইলাম।

সেই রাত্রে কামারপুকুরে ঠাকুরের বাড়ীতে ছিলাম। রামলাল দাদা তখন কামারপুকুরে। দাদা বলিলেন, "ভায়া, তুমি ছেলে মানুষ, ছোট মামীও পাগল, একে নিয়ে যেতে তুমি রাজি হলে কেন?" আমি বলিলাম, "মার আদেশ।" দাদা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

যে কৈকালা তেলোভেলোর মাঠে মা সঙ্গীছাড়া হইয়া ডাকাত বাবার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন পরদিবস আমাকে সেই মাঠ এই পাগলিনীকে লইয়া অতিক্রম করিতে হইবে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর রওনা হইলাম। জাহানাবাদ পার হইলাম, তখন প্রায় ৪॥০ টা হইবে। কিন্তু মামী আর চলিতে পারেন না। পাড়াগেঁয়ে মেয়ের পক্ষে ৮।১০ মাইল চলা কিছু কম নয়। মামী পিছাইয়া পড়িতেছেন; স্থির করিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কোন চটীতে আশ্রয় লইতে হইবে। প্রান্তর মধ্যে একটি চটী পাইয়া উহাতে আশ্রয় লইলাম। পরদিন তারকেশ্বর আসিয়া ট্রেণে চাপিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মামীকে শ্যামবাজারে কুসুম ঠাকুরাণীর বাড়ীতে দিয়া যোগোদ্যানে গেলাম।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমি, খ-মহারাজ ও জি-মহারাজ তিন বন্ধু সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে মার দেশে রওনা হই। সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক ভগবদাশ্রয় করিব, এই আশায় মার নিকট উপস্থিত হইলাম। দুই এক দিন মার নিকট থাকিবার পর একদিন আমাদের অভিলাষ মাকে নিবেদন করিলাম। মা বলিলেন, "ছেলেরা (ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা) সন্ন্যাস দেয়, তাদের নিকট থেকে সন্ন্যাস নিও।" আমি বলিলাম, "দীক্ষার জন্য আপনাকে আশ্রয় করেছি, এখন সন্ন্যাসের জন্য অপরকে আশ্রয় করবো এ অসম্ভব। দুই গুরু কখনো করবো না। যদি আপনি সন্ন্যাস দেন তবেই সন্ন্যাস নেব নচেৎ সাদা কাপড়েই আজীবন কাটাব।" মা বলিলেন, "আচ্ছা এবিষয়ে আমার মতামত তোমাদের কাল জানাবো।"

পরদিন প্রাতে মা বলিলেন, "আজ তোমরা তিনজন মুণ্ডন করিয়া থাক ও বস্ত্রাদি গৈরিক রং করিয়া রাখ, কাল তোমাদের সন্ন্যাস দিব।" পর দিবস ২৯ শে জুলাই সোমবার শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজান্তে মা আমাদের তিনজনের হাতে গৈরিক বহির্বাস ও কৌপীন দান করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো; পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বনজঙ্গলে যেখানে থাকুক না কেন এদের দুটি খেতে দিও।" মার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

মা সাধুদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। "শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে আর তোমাদের কোন অধিকার রইল না, এখন হতে সকলের অন্ন গ্রহণ করতে পারবে। যদি কোন বাগ্‌দীরও মেয়ে এসে ভিক্ষা দেয়, মা আনন্দময়ী দিচ্ছেন মনে করে খাবে।" কথাপ্রসঙ্গে মা যোগীন মহারাজের কথা বলিলেন, "বৃন্দাবনে এক বৈষ্ণবী যোগীনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। যোগীন যখন টের পেলে বৈষ্ণবী জাতিতে তাঁতি, তখন বমি করে আর কি? বামুনের ছেলে, এ সংস্কার তখনো যায় নি কিনা?" শাস্ত্রেও সন্ন্যাসীর অনুরূপ ব্যবস্থা আছে—ভিক্ষাং

আচরেৎ, মধুকরব্রতং আচরেৎ, নান্ন দোষেণ মস্করী।" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিবে। মধুকর যেমন ফুল হইতে অল্প অল্প মধু আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে, সন্ন্যাসী সেইরূপ গৃহস্থের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিবে। সন্ন্যাসীর অন্ন-দোষ হয় না।

জি-মহারাজের ইচ্ছা ছিল পদব্রজে ৺রামেশ্বর দর্শন করেন। আমার ও খ-মহারাজের ইচ্ছা আমরা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে যাইব। মাকে আমাদের অভিপ্রায় জানাইলাম। মা বলিলেন, "রাখাল পুরী থেকে লিখেছে সেখানে কলেরা হচ্ছে, ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। তোমরা তিন জনে ৺কাশী যাও। আমি তারককে লিখে দিচ্ছি, সে তোমাদের সব বন্দোবস্ত করবে।" মার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আমরা পদব্রজে কাশী রওনা হইলাম।

জি মহারাজের গয়ায় পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মার কথানুযায়ী আর পিণ্ডদান করা হইল না। জনৈক পাণ্ডা গয়ায় আমাদিগকে বলিলেন, "সন্ন্যাসীরা পিণ্ডদান করেন না বটে কিন্তু বিষ্ণুপাদপদ্মে ইষ্টমন্ত্র জপ ও সংকল্প দ্বারা পিণ্ডদানের ফললাভ করতে পারেন।" আমরা তদ্রূপ করিয়াছিলাম।

মার আদেশানুযায়ী পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ আমাদের সন্ন্যাস নাম দেন।

প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রগতি

সম্পাদক

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। ভারতের এই মহিমান্বিত ধর্ম্মের আলোকে আজও দূরপ্রাচী উদ্ভাসিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাহিরে যাইয়া যে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। অতীতের কিংবদন্তী পর্য্যন্ত যে যুগের রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম, সেই অন্ধকার যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মধ্য-এশিয়া, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া, তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যাইয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আলোক প্রদান করিয়াছেন। যে দেশে এই মহান্ ধর্ম্ম গিয়াছে, সেই দেশই ইহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে। সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসা-বার্ত্তা প্রচার এবং জীবের দুঃখ-মোচন করা ছিল বৌদ্ধ প্রচারকগণের জীবনাদর্শ। গভীর সহানুভূতি এবং অন্তরের মর্ম্মস্থলোত্থিত করুণার ভাব লইয়া সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়—পরম শান্তির পথ মানুষকে তাঁহারা দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া বৌদ্ধ-অভিযানকারিগণ কোন দেশ নররক্তে অনুরঞ্জিত করেন নাই, ধর্ম্মের আবরণে আবৃত সাম্রাজ্য-বিস্তারের নেশায় বিহ্বল হইয়া পরদেশ বিজয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ কোন জাতিকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করেন নাই, কোন জাতির কৃষি শিল্প বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ আপনার ভোগে নিবেদন করিয়া তাহাকে সর্ব্বহারা ভিখারী সাজান নাই, কোন জাতির বেশ ভূষা ভাষা সংস্কৃতি প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে জাতিহিসাবে উৎসন্নের পথে পাঠান

নাই! "দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল", এই ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকদের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধভিক্ষুগণ দেশ-বিদেশে যাইয়া অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রাণ ঢালিয়া কেবল উচ্চভাব দিয়াছেন, বিনিময়ে কিছু চান নাই, প্রতিদানের কোন আকাঙ্ক্ষাও মনে স্থান দেন নাই। বৌদ্ধ প্রচারকগণ জগতের অনেক অনুন্নত অসভ্য দেশকে নিঃস্বার্থ-ভাবে উন্নত সভ্যতা দিয়াছেন, ভাষা দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি দিয়াছেন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম—যাহা মানুষকে পরম এবং চরম শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম। আমরা এই প্রবন্ধে দূরপ্রাচীর কয়েকটী দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযান এবং হীনযান নামক দুইটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। নেপাল, তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়ায় মহাযান এবং চট্টগ্রাম, ব্রহ্ম, সিংহল ও শ্যাম দেশে হীনযানমত প্রচলিত। মহাযানমত বুদ্ধায়ন, তথাগতায়ন, মহায়ন, বোধিসত্ত্বায়ন এবং হীনযানমত শ্রাব-কায়ন, প্রত্যেক্ বুদ্ধায়ন, হীনায়ন নামেও পরিচিত। মহাযান জীবমাত্রকেই বুদ্ধত্ব বা তথাগতত্বে অধিষ্ঠিত করিতে পারে এবং হীনযান কেবল শ্রাবক বা অরহৎ পর্য্যায়ে উপনীত করিতে সমর্থ বলিয়া মহাযানশাস্ত্র প্রচার করে। বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ তাঁহার সূত্রালঙ্কার গ্রন্থে উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিশ্বমানবের মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মহাযানী ব্যক্তিগত মোক্ষ কামনা করেন না, পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত নির্ব্বাণ লাভই হীনযানীর কাম্য; এজন্য প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের নিকট দ্বিতীয় সম্প্রদায় 'হীন' বিশেষণে বিশেষিত।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সত্যলাভের প্রতিবন্ধক দুইটী আব-রণের উল্লেখ আছে, যথা—ক্লেশাবরণ (অপবিত্রতার আবরণ) এবং জ্ঞানাবরণ (যাহা সত্য জ্ঞানকে আবৃত করিয়া আছে)। ক্লেশাবরণ দূরীকরণদ্বারা কেবল "পুদ্গল শূন্যত্ব" বা ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান অপসারিত হয় এবং জ্ঞানাবরণ বিনষ্ট হইলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও জাগতিক সকল বস্তুর শূন্যত্ব জ্ঞান হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ হয়। মহাযান মতের "জাতক" ও "অবদান"সমূহ শিক্ষা দেয় যে, জীবমাত্রই "পারমিতা" (দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি) সম্যক্ ভাবে পালন করিলে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে। "বোধিসত্ত্ব"লাভ করিতে হইলে "বোধিচিত্ত" হওয়া আবশ্যক। "বোধিচিত্ত" হইয়া জন্মজন্মান্তর "পারমিতা" অভ্যাস করিতে হয়। মহাযানের অন্তর্গত বিভিন্ন মহাসংঘিক সম্প্রদায় বোধিসত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। বুদ্ধের দেবত্ব এবং শূন্যবাদ ইহা হইতেই বিস্তার লাভ করে। মহাসংঘিকগণ লোকোত্তর বুদ্ধের উপাসক। তাঁহারা বলেন, বোধিসত্ত্বগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধারণ মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। "ত্রি-কায়" (আদিবুদ্ধের তিন শরীর), "দশভূমি" (পবিত্রতালাভের দশটী স্তর) ও "অনুৎপত্তিধর্ম্ম-ক্ষান্তি" (ভূতমাত্রেরই উৎপত্তিহীনতা) স্বীকার মহাযানমতের বিশেষত্ব। "প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র" এই মতের বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। মহাযান-মতে এমন অনেক অতীন্দ্রিয় দেব মানবের অস্তিত্ব স্বীকৃত, যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য মানুষকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত। প্রেমের মূর্ত্তপ্রতীক অবলোকিতেশ্বর এবং চৈনিক তি-ছাং ওয়াং জিজু প্রভৃতি এইরূপ দেব-মানবজ্ঞানে সম্মানিত। মহাত্মা জিজু নরককে শূন্য করিয়া সকল জীবকে নির্ব্বাণ মোক্ষের অধিকারী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এজন্য তিনি চীন ও জাপানের মহাযানপন্থীদের হৃদয়দেবতা। "অমিতাভ" এইরূপ একজন বুদ্ধ। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য মানব মাত্রকেই বুদ্ধত্বলাভে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া মহাযানীরা বিশ্বাস করেন। এই মহাত্মগণের মধ্যে কেহ কেহ শাক্যমুনির মত

জীবের প্রতি করুণাবশে কখন কখন দেহধারণ করিয়া সাধন-জীবন ও উপদেশদ্বারা মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, বাহ্যিক ধ্যান বা সিদ্ধ সাধকের কৃপাদ্বারা নির্ব্বাণ মোক্ষের অধিকার জন্মিতে পারে বলিয়া মহাযানীদের বদ্ধমূল ধারণা। মাধ্যমিকপন্থী দার্শনিক ও চৈনিক "চান্"-বাহ্যিক মতাবলম্বী হইতে সাধারণ মহাযানী পর্য্যন্ত মন্ত্রশক্তি ও অমিতাভের কৃপালাভে বিশ্বাসী।

মহাযানী এবং হীনযানী কেহই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের অগণন জনসাধারণের নিকট বুদ্ধ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত। হীনযানীরা বিচারশীল ও পুরুষোত্তম বুদ্ধের উপাসক, এবং মহাযানীরা অলৌকিক বুদ্ধে বিশ্বাসপরায়ণ। মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের বিহারে অনেক দেবদেবী উপাসিত। সিংহলের অনেক বৌদ্ধবিহারে হিন্দুর চতুর্ভুজ বিষ্ণু দ্বারপালভাবে পূজিত হইতে দেখা যায়। এই দ্বীপে কাথরগামা নামক স্থানে একটী মন্দিরে কন্দস্বামী (কার্ত্তিকেয়) বৌদ্ধ পূজারীকর্তৃক অদ্যাবধি পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।* ব্রহ্মদেশের কোন কোন "ফায়া" বা "ফুঙ্গীচঙ্গে"ও (বৌদ্ধমঠ) বৌদ্ধ দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি। নেপালের বিখ্যাত স্বয়ম্ভুনাথ ও মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বৌদ্ধ মন্দির তিব্বতের লামা-পুরোহিতের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই সকল মন্দিরে অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ-দেবদেবী বৌদ্ধনেপালীগণ ও সকল শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। বুদ্ধপ্রচারিত অষ্টপন্থা (সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ ভাবনা ইত্যাদি) ঠিক ঠিক অনুসরণ করিলে অরহত্ব লাভ করা যায় বলিয়া হীনযানপন্থীরা প্রচার করেন। এই সাধনে জন্মজন্মান্তর ব্যাপী দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়াও হীনযানী আপন মোক্ষলাভে বদ্ধপরিকর। বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত "বিনয়" বা নীতি পালন সম্বন্ধে হীনযানী ভিক্ষুদের নিষ্ঠা আজও অসাধারণ। ইঁহারা এক বিশেষ ধরণে কষায় বস্ত্র পরিধান করেন এবং জামা ব্যবহার করেন না। দিবা দ্বিপ্রহরের (১২টার) পর আহার্য্যগ্রহণ হীনযান বিনয় মতে নিষিদ্ধ। সিংহলের হীনযানী ভিক্ষুগণ সঙ্গীত শ্রবণ করেন না। রাস্তায় সঙ্গীত শুনিয়া ইঁহাদিগকে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া যাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গীরা (ভিক্ষু) দলে দলে তথাকার "পোঁয়ে" নাচে যোগদান করেন। মহাযান হীনযান নির্ব্বিশেষে সকল দেশের সকল শ্রেণীর বৌদ্ধগণ জাতিভেদ বর্জ্জিত, এবং মৎস্য মাংস ভক্ষণ ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সার্ব্বজনীন। শ্যাম দেশের হীনযান মত তথাকার রাষ্ট্র-সমর্থনে আজও জাগ্রত, কিন্তু ব্রহ্ম ও সিংহলের হীনযানপন্থিগণ খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী শাসকের অধীনে থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই।

তিব্বতে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে, তখন যুদ্ধপ্রিয় তিব্বতীরা অনার্য্যের স্তরে ছিল এবং আদিম মানব সুলভ ভূত প্রেত ও প্রকৃতির উপাসনা-মূলক "বন"ধর্ম্ম ছিল তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত-সম্রাট স্রো-চন্-গম্বো ক্রমে চীনরাজকন্যা এবং নেপালরাজ আংশুবর্ম্মার কন্যা তারাদেবীকে বিবাহ করেন। এই দুই রাজকন্যাই লাসা নগরীতে দুইটী পৃথক মন্দির স্থাপন করিয়া উহাতে ভগবান বুদ্ধ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই রাজকন্যা-দ্বয়ের প্রভাবে তিব্বত-সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ করিলে "বন"-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারকগণ তিব্বতের প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া "বন"-ধর্ম্মকে ক্রমে উন্নত বৌদ্ধধর্ম্মের কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই "পরিপাক-প্রণালী"ই ইহাকে বিশ্বজয়ী করিয়াছে। এই "উপায়"কে

* লেখকের "সিংহলের কথা" (উদ্বোধন, ৩৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

যোগাচার মত-প্রবর্ত্তক আচার্য্য অসঙ্গ মহাযান মতের মহৎ গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নানা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণকে তিব্বতে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কুমার, নেপাল হইতে শীলমনঞ্জু এবং চীন হইতে মহাদেব তিব্বতে যাইয়া তিব্বতী পণ্ডিত থন-মি ও তাঁহার শিষ্য ধর্ম্মকোষের সাহায্যে তিব্বতী ভাষায় অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ভোট দেশেও এই মহাপুরুষের প্রভাব বর্ত্তমান। ভোটরাজ্যে প্রচলিত চারিটী সম্প্রদায়ই আচার্য্য দীপঙ্করকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। দীপঙ্করের তিব্বতী শিষ্য ডোম তোন-পা একটী প্রভাবশালী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ভোটরাজ স্রোং-দে-চন নালন্দা হইতে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। পরবর্ত্তী কালে এই মহাপুরুষের দ্বারাও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে। তিব্বতের বিখ্যাত প্রাচীন মঠ "সম্—য়ে" ইঁহারই স্থাপিত। খৃষ্টীয় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তিব্বতে মহাযানের অন্তর্গত সহজায়ন মত প্রচার করেন। তিব্বতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের উপরই ধর্ম্মগুরু লামার একচ্ছত্র প্রাধান্য। বর্ত্তমানে তিব্বতবাসীরা মহাযানের অন্তর্গত বহু সম্প্রদায়বিভক্ত তান্ত্রিক মতাবলম্বী বৌদ্ধ। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই পূজার্চ্চনায় মদ্যমাংস ব্যবহার করেন। তিব্বতে তারাদেবী অবতার জ্ঞানে পূজিতা। ধর্ম্মনায়ক দালাই লামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার-জ্ঞানে তিব্বতবাসিগণকর্ত্তৃক সম্মানিত। তিনি তিব্বতের রাষ্ট্রনেতাও বটেন। ইদানীং প্রতি তিন জন তিব্বতীর মধ্যে একজন দালাই লামার সঙ্ঘভুক্ত সন্ন্যাসী। তিব্বতে প্রায় প্রত্যেক সহর ও পল্লীতে ছোট বড় বৌদ্ধমঠ বা সংঘারাম আছে। অনেক স্থানে ভিক্ষুণীদের মঠও বর্ত্তমান। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের ন্যায় তিব্বতেও প্রত্যেক মঠের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দানই এই প্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য। তিব্বতের অসংখ্য শিক্ষায়তনের মধ্যে নিম্নোক্ত চারিটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান, যথা—(১) গন্-দন্, (২) ডে-পুং, (৩) সে-র, (৪) ট-শি-লুন-পো। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ফলে নিরক্ষরতা দূর হইলেও বর্ত্তমান জগতের আবহাওয়ার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আদৌ পরিচয় হয় না। এইরূপে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য জীবন যাপন করার ফলে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম আজ পর্য্যন্তও পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া রাষ্ট্র-সমর্থনে সমৃদ্ধ। অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা এদেশে এ পর্য্যন্তও দেখা দেয় নাই। জানি না, কতদিন তিব্বতীরা বহির্জগতের প্রভাব-বর্জ্জিত হইয়া প্রাচীন ভাবকে আঁকড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কুশানরাজদের সময়ে ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং মধ্যএসিয়ার নানা জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুশানরাজগণ চীন-সম্রাটকে বৌদ্ধগ্রন্থ উপহার দেন। এই সময় হইতে চীনের সঙ্গে বৌদ্ধভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। চৈনিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ৫২২ খৃষ্টাব্দে পুরুষপুর (পেশোয়ার) হইতে জিনগুপ্ত এবং কাথিওয়াড় হইতে ধর্ম্মগুপ্ত চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান। একশ্রেণীর চৈনিক ঐতিহাসিকদের মতে ৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আচার্য্য কাশ্যপ মাতঙ্গের প্রচারের ফলে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। চীনদেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তথাকার এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই বটে কিন্তু বিরাট চীনের

আপামর জনসাধারণ এই ধর্ম্মের প্রতি ক্রমেই বিশেষ অনুরক্ত হয়। বর্ত্তমানে মহাযানমতোক্ত স্বর্গ নরক, দেবদেবীর ধারণা, আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবাদি এবং রাহস্যিক উপাসনা চীনের অধিবাসিবৃন্দের ধর্ম্মজীবন পরিচালন করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম চীন-দেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার প্রচলিত কনফুসে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নীতিশাস্ত্রকে আপন ছাঁচে গড়িয়া তোলে। চীন দেশের সর্ব্বজনসমাদৃত তাওধর্ম্মের উপরও বৌদ্ধপ্রচারকগণ এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে,ইহা কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মেরই রূপান্তর হইয়া দাঁড়ায়। জনৈক চৈনিক পণ্ডিত বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা কিছু ভাল, সকলই তাওধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাওধর্ম্মাবলম্বিগণ সেইজন্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নিকৃষ্ট বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন।" মহাযানীদের জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের প্রভাবে চীনের প্রচলিত কনফুসেধর্ম্ম রাহুগ্রস্ত রবির মত আজ নিষ্প্রভ। ইহার উপর মহাযানসমর্থিত তান্ত্রিকধর্ম্মের জনপ্রিয় রাহস্যিক উপাসনা পদ্ধতি প্রচারের ফলে চৈনিক জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, পরে মাঝে মাঝে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অদ্যাবধিও চীনের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচলিত। চীনদেশে লোয়াং নামক একটী স্থানের নিকট পাহাড় খুঁড়িয়া একটী অপূর্ব্বদর্শন বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। চীনদেশের অধিবাসিগণের মনের উপর এই স্বর্গীয় ভাবোদ্দীপক মূর্ত্তিটীর প্রভাব অসাধারণ। চীনের চাং-রাজবংশের সময় চু-সি প্রবর্ত্তিত "নব্য কনফুসীয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম" (Neo-Confucian Naturalism) এবং ওয়াং-ইয়াং-মিংএর দার্শনিক আদর্শবাদ এই মূর্ত্তিদ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চীনদেশে বৌদ্ধরূপপ্রাপ্ত তাওধর্ম্মের অন্যতম শাখাস্বরূপে "তাও-য়ুয়ান" মতবাদ বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে। চীনদেশের সকল ধর্ম্মের সমন্বয় প্রচার এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। এই সম্প্রদায়ের শাখাস্বরূপ "লাল স্বস্তিক সমিতি" চীনদেশের প্রায় সর্ব্বত্র শাখা স্থাপন করিয়া বিবিধ প্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সেবাকার্য্য পরিচালন করিতেছে।* বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে চৈনিক সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটী দাঁড়াইতে অক্ষম। ধর্ম্মের জাগরণই সংস্কৃতিকে প্রগতির পথে চালাইতে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তাও-য়ুয়াননেতৃবৃন্দ চৈনিক ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া চীন-জাতির মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন।

৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন তাহার উন্নত সংস্কৃতি লইয়া কোরিয়া হইতে জাপানে প্রবেশ করে, তখন জাপান আদিম সভ্যতার স্তরে ছিল। মহাযানধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ করিয়াই রাজধর্ম্মে পরিণত হইবার সুযোগ পাইয়া সমগ্র দেশময় অতি সহজে বিস্তারলাভ করে। চীনদেশে যাইয়া বিস্তারলাভ করিতে বৌদ্ধধর্ম্মকে তথাকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উন্নত প্রাচীন দর্শনের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, জাপানে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তেমন বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। মহাযানমত জাপান দেশে তৎকালে প্রচলিত শিন্তোধর্ম্মের সঙ্গে অতি সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল। মহাযানের উন্নত দর্শন শিন্তোধর্ম্মকে তাহার রাগে রঞ্জিত করিয়া আপনার অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। জাপানী ভাষায় শিন্তোধর্ম্মের অপর নাম "কামি-নো-মিচি" (দেবযান)। জাপানে বর্ত্তমান

* লেখকের "নবীন চীনের নূতন ধর্ম্ম তাও-য়ুয়ান" (উদ্বোধন, ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

কালেও একলক্ষ চৌদ্দহাজার শিন্তোমন্দির বিদ্যমান। শিন্তোধর্ম্মে দেবদেবীর সংখ্যা শতলক্ষ। অনেক হিন্দুদেবদেবী জাপানদেশে শিন্তোধর্ম্মাবলম্বিগণ-কর্ত্তৃক অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। মানুষই এই মতে ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত। মানুষের পূজাই শিন্তোর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। জাপানের সূর্য্যবংশসম্ভূত রাজগণ পুরুষানুক্রমে দেবতাজ্ঞানে এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূজিত। মানুষের পূজার সঙ্গে রাজভক্তির সংমিশ্রণের ফলে "স্বদেশপ্রেমে" এই ধর্ম্মসম্প্রদায় গরীয়ান্ ও মহীয়ান্। জাপানীদের অসাধারণ দেশভক্তির মূলে রহিয়াছে শিন্তোধর্ম্মের এই প্রভাব। মহাযানমতদ্বারা শিন্তোধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়াও স্বদেশপ্রেম আদি অনেক বিষয়ে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অদ্যাবধি অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। জাপানের মহাস্থবির কোবোদৈশী ৭৭৪ খৃষ্টাব্দে "সিঙ্গন" (সত্য জগৎ) নামক এক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন।* রাজসমর্থনে এই ধর্ম্মমত জাপানে এককালে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। "মহাবৈরোচন সূত্র" সিঙ্গন-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্র। এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ (One Supreme Reality) এই মতে "মহাবিরোচন" (আদিবুদ্ধ) নামে উপাসিত। জাপানের "জুডু" ও "শিন্" নামক মহাযান্‌সম্প্রদায়ের "আমিদা" (অমিতাভ) মতবাদ একসময়ে জাপানে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। "নিছিরেণ" নামক মহাযানীসম্প্রদায়কর্ত্তৃক দেশভক্তিই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত। সুদীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ মহাযানমত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সমগ্র জাপানের ধর্ম্মজীবন ও সংস্কৃতি অপ্রতিহত প্রভাবে আজও পরিচালন করিতেছে।

১৯৩৪ সনের ১৮ই ও ২৫শে জুলাই তারিখে জাপানের "বৌদ্ধ যুবক সমিতি" (The Young men's Buddhists' Associations) সমূহকর্ত্তৃক টোকিও সহরের বিখ্যাত "হনগ্যাঞ্জি" মন্দিরে "দ্বিতীয় বিশ্বপ্রশান্ত সম্মেলনের" (The 2nd Pan-Pacific Conference) অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশ হইতেই প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ৮ জন প্রতিনিধি ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের ২৫০০তম জন্মবার্ষিক দিনে এই সম্মেলন আহূত হওয়ায় ইহা বৌদ্ধজগতের—বিশেষ করিয়া জাপানের সর্ব্বসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সকল দেশের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রগতিশীল করা এই মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল। জাপানে এই সভার উদ্দেশ্য সফল হইতে চলিয়াছে। এই সম্মেলনের পর হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মে নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিতরণ এবং বেতারবার্ত্তাযোগে দেশের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করা হইতেছে। জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতি জাপানের জাতীয় জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। এজন্য জাপানের দৃষ্টি ক্রমেই পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত হইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ফলে জাপানী নেতাগণ প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মকেও জাপানী আকার প্রদান (Japanization of Christianity) করিয়া জাপানের জাতীয় জীবনের বিশেষত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। জাপানের শিন্তোধর্ম্মের অন্তর্গত বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে "তেনরিকিয়ো"ও "ওমোটোকিয়ো" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথমোক্ত মতবাদ সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়সমূহের ন্যায় শিন্তো-ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ও দেশবাসীর আকস্মিক সর্ব্বপ্রকার বিপদের সময় সমবেতভাবে সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকে।

* লেখকের "জাপানে সিঙ্গন ধর্ম্ম" (উদ্বোধন, ৩৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধজগৎকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজকে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লইবার উপায় সম্বন্ধে সকল দেশের বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের মধ্যে গবেষণা চলিতেছে। জাপানের "আমিদা" (অমিতাভ) সম্প্রদায় বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে জাপানীদের জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। চীনেও জাপানী দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে বৌদ্ধ বিহার সংস্কার এবং ধর্ম্মপ্রচারক-গণের শিক্ষার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। "বিশ্ব-বৌদ্ধ সঙ্ঘের" বিখ্যাত চৈনিক নায়ক তাই চু বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজকে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চীনদেশে এক ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সিংহলের শিক্ষিত বৌদ্ধগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে "মহাবোধি সোসাইটী" স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কলম্বো সহরে একটী কলেজ (The Oriental Buddhists' College) পরিচালিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধভিক্ষুদের দ্বারা বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে। কিছুদিন হয় ঋষিপত্তন মৃগদাব বা সারনাথে "মহাবোধি সোসাইটীর" উদ্যোগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ "মূলগন্ধ-কুটীবিহার" পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধজগৎ বিখ্যাত "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়" পুনঃ সংস্থাপনের জন্য একটী শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন বিভিন্ন দেশকাল ও পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন আর কোন ধর্ম্মই পারে নাই। এই গুণের জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম আজও বাঁচিয়া থাকিয়া জগতের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আশা করা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, উহার যথাযথ সমাধান অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। ভারতীয় "হিন্দুমহাসভা" বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্যতম শাখারূপে গ্রহণ করিয়া হিন্দুবৌদ্ধের মিলনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মজননায়ক ভিক্ষু উত্তম "হিন্দু মহাসভার" সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় এই মিলন বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের একটী অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করি। বুদ্ধদেব হিন্দুর দশাবতারের এক অবতার জ্ঞানে পূজিত। বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবে আমরা যথার্থ ই গৌরবান্বিত। বৌদ্ধধর্ম্ম অবিলম্বে তাহার সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিয়া আপনার হৃতগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

মানবজীবনের সার্থকতা

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

এই জগতে যত মহাপুরুষ মানবজীবনের চরম সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাঁহারা কেহই যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই চরম সিদ্ধির স্বরূপটী বুঝিয়া লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হন নাই। বস্তুতঃ, বুদ্ধিদ্বারা তৎসম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা করাই সম্ভব নয়। মানববুদ্ধি তাহার Logic বা তর্কশাস্ত্রের কষ্টিপাথরে কষিয়া যে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হউক না কেন, সেটা একটা বিশিষ্ট theory বা মতবাদই হইয়া থাকে। কিন্তু জীব-জগতের চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং মানব-জীবনের চরমসমস্যাসমূহের সমাধান সম্বন্ধে

মানববুদ্ধি এমন কোন theory বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই, যার বিরুদ্ধে সেই বুদ্ধিই আবার নানাবিধ শঙ্কা ও সংশয় উত্থাপন করিতে পারে নাই এবং তাহার বিরোধী অন্য কোন theoryও উপস্থিত করিতে সক্ষম হয় নাই। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এরূপ কোন সর্ব্ববাদিসম্মত মতবাদ যে কখনো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই প্রকার ভরসা পোষণ করিবারও কোন উপযুক্ত হেতু পাওয়া যায় না। সকল সংশয় ও ভ্রান্তির অন্তরালে একটা মহাসত্য বিদ্যমান আছে, এবং সকল কর্ম্মপ্রেরণা ও আশা আকাজ্ক্ষার অন্তরালে একটা চরম আদর্শ লুক্কায়িত আছে, ইহা যেমন সুনিশ্চিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় (যেহেতু তাহা স্বীকার না করিলে সংশয় ও ভ্রান্তির এবং কর্ম্মপ্রেরণা ও আশা আকাজ্ক্ষারই অর্থ থাকে না), সেই মহাসত্যকে ও চরম আদর্শকে মানববুদ্ধি যে আপনার সুস্পষ্ট ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, তাহাও তেমনি সুনিশ্চিত মনে হয়।

অসীমের অনুসন্ধানই চলে, তাহার শেষে পৌঁছান যায় না। বুদ্ধির পাত্রের ভিতরে পুরিতে চেষ্টা করিলেই সে সসীম হইয়া পড়ে, সে একটা বিশিষ্ট আকারে আকারিত হইয়া পড়ে, এবং অন্যান্য সম্ভাবনীয় আকারের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। মানুষ চিরকাল তাহার জীবনের শেষ সীমাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; তাহাতে সেই অশেষের নূতন নূতন রূপ হইয়াছে, বিচিত্রভাবে তাহার বর্ণনা হইয়াছে, তদ্দারা বিচিত্র রসের আস্বাদন হইয়াছে, নানাবিধ সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সেই অশেষের শেষ সীমা যথার্থতঃ কখন নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই হেতুই "বেদা বিভিন্নাং, স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন প্রদর্শিত সেই মহাসত্য ও মহান্ আদর্শের কোন একটা বিশিষ্ট রূপ অবলম্বনে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সেই অশেষের পথে চলাই সাধকমাত্রের পক্ষে আবশ্যক হয়, এবং মানবজগতের সব মহাপুরুষই তাহাই করিয়া জীবনকে সার্থক্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

জীবনের চরম লক্ষ্য কি, এবং সব মানুষেরই জীবনসাধনার চরম লক্ষ্য এক কি না, বুদ্ধি তাহার কোন categoryর মধ্যে ফেলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ নয়; কারণ ইহার উত্তর যাহা হইতে পারে, তাহা বুদ্ধির বিষয় নয়, আস্বাদনের বিষয়। কোন রকম আস্বাদ্য বস্তুর স্বরূপ categories of understanding দ্বারা নিরূপিত হয় না। জীবনের চরম লক্ষ্য জানা ও তা পাওয়া বস্তুতঃ একই কথা। 'আনন্দ', 'পূর্ণতা', 'মোক্ষ', 'ভগবৎ-প্রাপ্তি', 'পরমকল্যাণ', 'পরমসৌন্দর্য্য'—এইরূপ যে কোন নাম দ্বারা তাহার ইঙ্গিত করিতে পারা যায় বটে; কিন্তু এই সব নামের কোনটারই সম্যক্ অর্থ কি বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়? আনন্দের আস্বাদনেই আনন্দ বোঝা যায়, মোক্ষলাভ হইলেই মোক্ষের যথার্থ স্বরূপের সহিত পরিচয় হয়, হৃদয় প্রেমময় হইলেই প্রেমও তদাস্বাদ্য সৌন্দর্য্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, প্রাণ ভাগবত হইলেই ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ প্রকাশিত হয়। এসব স্থলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—subject and object এর সম্বন্ধই এইরূপ যে, জ্ঞাতা বা subject নিজে যেমন আছে তেমনি থাকিয়া শুধু তার logicএর অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া, কিছুতেই জ্ঞেয় বা object-এর সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করিতে পারে না; object-এর একটা অস্পষ্ট আদর্শ অন্তরে ধারণ করিয়া সে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে করিতে object-এর আকারে ক্রমশঃ আকারিত হইতে থাকে, এবং object সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বা আস্বাদনও ক্রমশঃ তদনুরূপ হইতে থাকে। মানুষ আনন্দায়িত হইয়া হইয়া আনন্দকে চেনে, প্রেমায়িত ও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে বোঝে, মুক্ত

হইয়া মুক্তির স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া ভগবানের সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়। সুতরাং আদর্শ সম্বন্ধে একটা অস্ফুট ধারণা লইয়াই জীবনকে এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা আবশ্যক, যাহাতে বুদ্ধি মার্জিত, সংস্কৃত ও সুস্থির হয়, হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি বিলীন হইয়া যায় ও প্রেমমৈত্রী করুণা-মুদিতা উপেক্ষা প্রভৃতি বিকসিত হয়, কর্মশক্তি ভোগের দাসীবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক সপ্রেম সেবা-বৃত্তিতে পরিণত হয়। এই ভাবে চলিতে চলিতে চরম সত্য ও চরম লক্ষ্যের আংশিক আস্বাদন হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ পূর্ণতর আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইতে থাকে।

মানবজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে, মানুষের বাঁচিয়া থাকিবারই আবশ্যকতা কি? বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ক্লেশবহুল সংগ্রামে আত্মনিয়োগ না করিয়া এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত না করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে ক্ষতি কি? বিশেষতঃ, মৃত্যুতেই যখন জীবনের পরিসমাপ্তি, তখন মৃত্যুকে যত শীঘ্র বরণ করিয়া লওয়া যায়, ততই সহজে জীবন-সম্পর্কিত সব গোলমাল মিটিয়া যায়।

জীবন্ত মানুষের পক্ষে এইরূপ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক নয়, সুস্থতার লক্ষণ নয়। প্রথমতঃ, মৃত্যুতেই যে জীবনের পরিসমাপ্তি, মানুষ প্রতিনিয়ত বহু লোককে মরিতে দেখিয়াও এবং মৃত্যুর করাল গ্রাসের সম্মুখে সর্বদা অবস্থিত থাকিয়াও একথা কখনই স্বীকার করে না। একথা স্বীকার করা প্রাণের স্বভাববিরুদ্ধ। প্রাণের স্বভাবই মৃত্যুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করা, চতুর্দিকে মৃত্যুর দূতসমূহকে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে এই সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করা। প্রাণের সহিত মৃত্যুর সংগ্রাম এই জগতের একটি সনাতন বিধান। এই সংগ্রামে কখন মৃত্যুর জয়, কখন প্রাণের জয় পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াই জগতে ক্রমশঃ প্রাণের বিকাশ হইতেছে, জড়ের উপর প্রাণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, প্রাণের অন্তর্নিহিত শক্তি নূতন নূতন আকারে নূতন নূতন সৌন্দর্য মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সহিত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুতরাং মৃত্যুর দিকেই যে প্রাণের গতি, প্রাণ স্বভাবতই ইহা অস্বীকার করে, এবং জগতে প্রাণের স্বাভাবিক সাধনা ইহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে। মৃত্যু যেন প্রাণের আত্মবিকাশের একটি অসাধারণ উপকরণ। প্রাণের সুষ্ঠুতর ও উন্নততর বিকাশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই যেন বিশ্ব-বিধান মৃত্যুকে নিয়োজিত করিয়াছে। বিশ্ববিধানের অভ্যন্তরে মৃত্যুর সহায়তা অবলম্বনে প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠার নীতি বর্তমান থাকাতেই, প্রত্যেক জীব, বিশেষতঃ মানুষ, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ক্রিয়া দর্শন করিয়াও, মরণকে আপনার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে না, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সকল ব্যাপারের ভিতর দিয়া জীবনকেই বিকসিত করিয়া তুলিতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত জীবনে জীবনপ্রবাহের অন্তে মৃত্যুর কোলে বিলীন হওয়া যদি প্রাকৃতিক বিধানই হয়, তথাপি যতদিন বাঁচিয়া আছি, ততদিন 'বাঁচিব কেন' এই প্রশ্নের কোন সার্থকতা নাই। প্রাকৃতিক বিধানে জীবন লাভ করিয়াছি, আবার প্রাকৃতিক বিধানেই মরিয়া যাইব। এই প্রাকৃতিক বিধান নিয়ন্ত্রিত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে হেয় এবং মৃত্যুকে উপাদেয় মনে করিবার কোন হেতু আছে কি? বাঁচিয়া থাকিবার কালে মৃত্যুকে বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, মৃত্যু আর স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত

ঘটনামাত্র থাকে না, সে তখন জীবনের আদর্শ স্থানীয় হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত কারণ থাকা আবশ্যক। মৃত্যু দ্বারা লব্ধব্য অবস্থার সহিত যদি আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিত, এবং সে অবস্থা যদি জীবিতকালীন অবস্থার সহিত তুলনায় অধিকতর আনন্দপ্রদ বা কল্যাণময় বলিয়া জানা থাকিত, তবেই জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ থাকিত। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়, মৃত্যুলভ্য যদি কোন অবস্থা থাকে এবং তাহার অনুভূতি লাভ যদি সম্ভব হইত, তবে সেই অবস্থাও অনুভূতি লাভের জন্যও বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক হইত। সুতরাং বাঁচিয়া থাকিবার সময় বাঁচিব কেন? মরিব না কেন? এইরূপ প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই। জীবন ও মরণ যখন স্বাভাবিক ঘটনা, তখন "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥" স্বভাবের নিয়মে যতদিন বা যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, বেশ, বাঁচিয়াই আছি, এবং মৃত্যু যখন উপস্থিত হইবে, বেশ, মৃত্যুকেও হাসিমুখে প্রসন্নচিত্তে আলিঙ্গন করিব। জীবন জটিলতাসঙ্কুল বলিয়া তাহার হাত এড়াইয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করিতে হইলেই তজ্জন্য জবাবদেহি চাই।

মোট কথা এই, যে ব্যক্তি বাঁচিয়াই আছে, তার এই বাঁচিবার অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থায় যাইতে হইলেই "কেন?" এই প্রশ্ন উঠে। তাহাকে কেহ মরিতে বলিলেই সে প্রশ্ন করিবে "মরিব কেন?"—অর্থাৎ জীবন অপেক্ষা মরণকে অধিকতর আকাঙ্ক্ষণীয় মনে করিব কেন? "বাঁচিব কেন?" এই প্রশ্নই উঠে না, কারণ সে বাঁচিয়াই আছে। পক্ষান্তরে, মৃত্যু যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তার যদি এই ক্ষমতা থাকে যে, সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিলেই বাঁচিতে পারে, তখনই তার এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সে বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিবে কিনা, মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকে বরণীয় মনে করিবে কিনা। সুতরাং বাঁচিব কেন? এটা মুমূর্ষুর প্রশ্ন, সুস্থ মানুষের নয়।

মানুষ যতদিন জীবন ধারণ করে, ততদিন তাহার চিত্তে স্বাভাবিক প্রশ্ন এই যে, সে কি প্রণালীতে তাহার জীবনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, কি উদ্দেশ্য লইয়া কোন্ পথে সে অগ্রসর হইবে, কি ভাবে তাহার বাঁচিয়া থাকাকে সে সার্থকতা মণ্ডিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে? তাহার পরে মৃত্যু যদি স্বভাবিক নিয়মে আসে, আসুক; তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার এখন আবশ্যকতা নাই। এই প্রশ্ন মানুষের মনেই উঠে, কারণ মানুষ তাহার অন্তরে অন্তরে অনুভব করে যে, সে যে জীবন লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচালনা সম্বন্ধে তাহার স্বাধীনতা আছে, পূর্ণরূপে না হইলেও অন্ততঃ আংশিকরূপে আছে। এই স্বাধীনতার অনুভূতির মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যে দেশে, যে কালে, যে বংশে, যেরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার ভিতরে, যে প্রকার দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক শক্তি সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তৎসম্বন্ধে তাহার কোন স্বাধীনতা না থাকিলেও, এই সব শক্তিসামর্থ্য ও অবস্থাপুঞ্জের ব্যবহার সম্বন্ধে ও তাহাদের উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে তাহার স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মানবজীবন সাধকজীবন, এই হেতুই তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে, উৎকর্ষাপকর্ষ আছে; এই কারণেই তাহার জীবনে নানাবিধ সমস্যা আছে, সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আছে, ব্যর্থতার বেদনা ও সার্থকতার গৌরব আছে। এই সকলই মানব জীবনের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন, শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। সুতরাং মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করা ও মানুষভাবে জীবনধারণ করাকে কি ভাবে সার্থক্যমণ্ডিত করিয়া তোলা যায়, ইহাই মানবীয় অহংবুদ্ধির চিরন্তন প্রশ্ন।

কোন প্রকার বাদ বিসংবাদ বা theoryর ঝগড়ার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, একটা সত্য সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, জীবনের সার্থকতা জীবনের মধ্যেই, জীবনবহির্ভূত কিছুর মধ্যে নয়। বস্তুতঃ জীবনই জীবনের চিরন্তন আদর্শ। জীবমাত্রেরই অন্তর্নিহিত স্বভাব-সিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা জীবনকে পারিপূর্ণরূপে আস্বাদন করা। তাহারা আর যাহা কিছু চায়, সবই এই জীবনের পূর্ণতর আস্বাদনের উপকরণরূপে। মানুষের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রদ্‌ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষকে বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় স্বাধীন প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। মানুষ স্বাভাবতঃ বল চায়, আনন্দ চায়, সৌন্দর্য্য চায়, কল্যাণ চায়, মুক্তি চায়। এই সব স্বভাবতঃই আদর্শরূপে তাহার জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই সব আদর্শের অস্ফুট ধারণা লইয়া সে জীবনপথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সব আদর্শ বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই আদর্শের বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন ভাবে আস্বাদনমাত্র। সেই আদর্শ বস্তুতঃ পরিপূর্ণ জীবন। জীবন স্বরূপতই সুন্দর ও মধুর, তেজোময় ও নির্ভীক, উজ্জল ও নির্ম্মল, স্বতন্ত্র ও স্বরাট, কল্যাণময় ও আনন্দময় জীবনই বস্তুতঃ সদ্‌বস্তু। জীবন যে পরিমাণে মৃত্যু দ্বারা বেষ্টিত ও আচ্ছাদিত হয়, সৎ যে পরিমাণে অসৎ দ্বারা আক্রান্ত হয়, 'হাঁ' যে পরিমাণে 'না' দ্বারা আবৃত হয়, সেই পরিমাণেই জীবনের ব্যবহারিক প্রকাশের ভিতরে কদর্য্যতা ও বিরসতা, দুর্ব্বলতা ও ভীতিবিহ্বলতা, ম্লানতা ও মলিনতা, পরাধীনতা ও পরনির্ভরতা, অমঙ্গল ও নিরানন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। জীবন এই সব দোষকে নিজস্ব ও চিরসঙ্গী বলিয়া স্বীকার করে না বলিয়াই ইহারা হেয়। এই সব প্রতিকূলবেদনীয় ভাব ও অবস্থাগুলি যেন জীবনের আপেক্ষিক নিষেধমাত্র,—মৃত্যুর দ্যোতক, —'না' শব্দ-বাচ্য। জীবনকে আশ্রয় করিয়া, জীবন হইতেই জীবনীশক্তি ধার করিয়া, জীবনের সত্তাতেই সত্তা লাভ করিয়া, ইহারা জীবনকে নিষেধ করিতে চায়, জীবনের স্বরূপ আংশিকভাবে আবৃত করিয়া ফেলে, জীবনকে ক্ষুণ্ণ, ম্লান, দুর্ব্বল, মৃত্যুগ্রস্ত খণ্ডিতরূপে প্রতীয়মান করে। জীবন এগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, এই সব উপাধির আবরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। শারীরিক ব্যাধি পীড়া, মানসিক শোক-তাপ, বুদ্ধির মূর্খতা,—এ সবই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়াপাত, জীবনের বাস্তব স্বরূপের আবরণ, জীবনের প্রাকৃতিক নির্জ্জীবতা। হিংসা, দ্বেষ ঘৃণা, ভীরুতা ও সংকীর্ণতা, বিষাদ ও অবসাদ, ক্লীবতা ও পরাধীনতা, বিচারবিমুখতা ও পুরুষকারহীনতা ইত্যাদি যাহা কিছু জীবনকে সঙ্কুচিত করে, জীবনের পূর্ণতাস্বাদনের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, তাহাই মৃত্যুর দূত বলিয়া গণ্য। ইহারা জীবনকে অস্বীকার করিতে চায়, জীবন ইহাদিগকে অস্বীকার করে। জীবনের পক্ষে এগুলি যেন negative qualities,—negations of life জীবন তার negations এর সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াই গণ্ডীবদ্ধ হয়, খণ্ডিত হয়, ক্ষুদ্র হয়। এই negationগুলিকে নিরস্ত করিয়া আপনাকে সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করাই জীবনের সাধনা, এবং এই সাধনায় যে পরিমাণে সিদ্ধিলাভ হয়, সেই পরিমাণেই মানবজীবনের সার্থকতা।

অতএব negation বিহীন জীবন বা মৃত্যুমুক্ত জীবনই মানবীয় সাধনার আদর্শ। এই মৃত্যুহীন পরিপূর্ণ নিখুঁত জীবনের স্বরূপই পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ মঙ্গল, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। উপনিষৎ ইহাকে "অমৃতত্ব" বলিয়াছেন;—ইহাই যথার্থ immortality। সকল প্রকার দুঃখতাপ, জরাব্যাধি, বন্ধন ও সঙ্কোচ হইতে মুক্ত বলিয়া এই জীবনের স্বরূপই মোক্ষ। মানুষের

গৌরব এই যে, এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে, এই নিয়ত পরিণামশীল ক্ষণভঙ্গুর দেহেই, উপযুক্ত-রূপ অনুশীলন দ্বারা মানুষ এই পরিপূর্ণজীবনের—এই অমৃতত্ব ও মোক্ষের—এই পরিপূর্ণ আনন্দ, মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের—আস্বাদন করিতে সমর্থ। এই পরিপূর্ণ জীবনেব আস্বাদনই আত্মার আস্বাদন। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হৃদয়ের সমুচিত সাধনার আদর্শানুগত অনুশীলনের ভিতর দিয়াই এই মৃত্যুহীন জীবনময় আত্মার প্রকাশ ও সম্ভোগ হইয়া থাকে।

নিজের ভিতরে জীবনের যত বিকাশ হয়, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে মৃত্যুব গ্রাস হইতে—জীবনসঙ্কোচক প্রভাবসমূহ হইতে যতই মুক্ত করিয়া আস্বাদন কবা যায়, নিয়ত পবিবর্ত্তনশীল বিচিত্র-দ্বন্দ্বসংঘর্ষময় আপাতমৃত্যুপরিব্যাপ্ত এই বিশাল জগতের মধ্যেও ততই একটা বিরাট অখণ্ড মৃত্যু-হীন জীবনের সাক্ষাৎ লাভ হয়। এক অখণ্ড অনন্ত জীবন নিজের ভিতবে, প্রত্যেক মানুষেব ভিতরে, প্রত্যেক জীবের ভিতরে, প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপারের ভিতরে, বিচিত্র বীর্য্যৈশ্বর্য্যজ্ঞান প্রেম-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য সমন্বিত হইয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ ও সম্ভোগ করিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। জগতে যত মৃত্যু, যত দুঃখ, যত পরিবর্ত্তন, যত বৈষম্য, যত সঙ্কোচ আপাততঃ পবিদৃষ্ট হয়, সবই সেই অখণ্ড পবিপূর্ণ জীবনের বিচিত্র প্রকাশেব, আনন্দলীলাব উপকবণরূপে উপভোগ্য হইয়া থাকে। এই অনুভূতিই আত্মা ও পরমাত্মার মিলন, মানুষের ভগবৎ-সাক্ষাৎকাব। এই অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করার নামই ব্রাহ্মী-স্থিতি। জীবনের এই পরিপূর্ণ বিকাশেব আস্বা-দনটি যে কেমন, তাহা কেহ কখন ব্যক্ত কবিতে পারে না, মন তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, বুদ্ধি তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে না। ভাষায় নানাভাবে নানাপ্রকার রূপকের সাহায্যে ইহার ইঙ্গিত প্রদানের চেষ্টা উপনিষদের ঋষিগণ ও পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ করিয়াছেন। সাধক-গণ নিজেদেব জীবনে সাধনা ও সিদ্ধি দ্বারা ঐ সব ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিয়া থাকেন।

মানবজীবনেব এই সাধনাব সঙ্গে বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সাধনাব ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্বে অনাদিকাল হইতে একটা বিরাট সাধনা চলিতেছে। সেই সাধনাটি জীবনবিকাশেরই সাধনা,—জীবনকে ক্রমশঃ মৃত্যুমুক্ত করিবারই সাধনা। প্রকৃতিরাজ্যের এই সাধনায় জড়ের বক্ষোভেদ করিয়া জীবন বিকসিত হইতেছে, অস্ফুট জীবন ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতেছে, জীবন ক্রমশঃ সজাগ ও স্বাধীনক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন হইতেছে, তাহার ভিতবে বিচাবশক্তি, কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ হইতেছে, জড়েব উপব জীবনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপে জগতে ক্রমশঃ পূর্ণতর, আবো পূর্ণতব, আরো পূর্ণতর জীবনেব বিকাশ ও আস্বাদন হইতেছে। আমাদের পৃথ্বীজননীব এই চিবন্তন সাধনার সিদ্ধিরূপে মানব-জীবনেব প্রকাশ। মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে মানবজীবন ও বিশ্বজীবনেব ঐক্য সাক্ষাৎ অনুভূতি-গোচব হয়। তখন বিশ্বকে নিজের ভিতবে এবং নিজেকে বিশ্বময় বলিয়া আস্বাদন হয়। জীবনের আনন্দাস্বাদন তখন কোন স্থান হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, কোথাও কোন প্রতিকূল বেদনা অনুভব কবিয়া ক্ষুণ্ণ হয় না। ব্যবহারিক জীবনে তখন বিশ্বজনীন প্রেম, নিঃসংশয় তত্ত্বানুভূতি ও নিষ্কাম সেবাবৃত্তি প্রকাশ পায়।

মানবজীবনে বিশ্বজীবনের সাধনধারা (evolution) স্বতন্ত্র সজাগ সপ্রেমধারায় প্রবাহিত হয়, এবং এই ধারা পরিপূর্ণতায় পৌছিয়া একটা পূর্ণ বৃত্ত (circle) সম্পাদন করে,—সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে। বিশ্বজীবনের (universal life এর) ক্রমাভিব্যক্তিতে ব্যষ্টিজীবনের

(individual life) উদ্ভব, ব্যষ্টিজীবনের ক্রমবিকাশে স্বাতন্ত্র্যাভিমানবিশিষ্ট অহং-বোধের প্রকাশ, এই অহং-বোধের ক্রমবিকাশে—individual lifeএর পরিপূর্ণতায়—আত্মাস্বাদনময় জ্ঞানপ্রেমানন্দময় বিশ্ব-জীবনের—universal lifeএর পুনরভিব্যক্তি। একই জীবন সৃষ্টিসাধনার ভিতরে বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়া নিজেকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট স্বতন্ত্রদায়িত্বসম্পন্ন নানাবিধ মৃত্যুব্যাপ্ত খণ্ড জীবন বলিয়া অনুভব করে, আবার এই ব্যক্তি জীবনের ক্রমবিকাশেই পার্থক্য ঘুচিয়া যায়, মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়, বহুত্ব একত্বে পর্য্যবসিত হয়, ব্যক্তি ও বিশ্বের ঐক্যানুভূতি হয়। এই সাধনার প্রত্যেক স্তরেই জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বিকাশ, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ, জ্ঞান ও সত্যের বিকাশ, শক্তি ও মঙ্গলের বিকাশ।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে, আমাদের সাধন জীবনে এই জীবনবিকাশের সাধনাটী কি প্রণালীতে করা আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বীজাদি হইতে বৃক্ষাদি-বিকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই জীবনসাধনার জন্য অনুকূল উপকরণ দরকার। এই উপকরণগুলির পার্থক্যে সাধনার বাহ্যাকৃতির পার্থক্য হইয়া থাকে। আমাদের রুচিও বুদ্ধি, দৈহিক ও মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি, পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আবেষ্টনী, শিক্ষা দীক্ষা ও সংসর্গ—এ সবই সাধনার উপকরণ। এই সব উপকরণ যে ব্যক্তি যেমন পাইয়াছে, তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিয়াই জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে। জীবন-বিকাশের অনুকূলে, জীবনকে মৃত্যুমুক্ত করিবার পথে, এই সব বাহ্য ও আন্তর উপকরণের যথোচিত প্রয়োগের নামই স্বধর্ম্মাচরণ। এই সকল বাহ্য ও আন্তর উপকরণের পার্থক্যনিবন্ধন মানুষের সহিত মানুষের স্বধর্ম্মের পার্থক্য হয়,—একজনের পক্ষে যাহা কল্যাণপ্রসূ স্বধর্ম্ম, অপরের পক্ষে তাহা ভয়াবহ পরধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব নয়। এই হেতু পুরুষের সাধনপ্রণালী সর্ব্বাংশে নারীর অনুকূল হয় না, পাশ্চাত্য দেশের সাধনপ্রণালী সর্ব্বাংশে প্রাচ্যের অনুকূল হয় না, বৃদ্ধের সাধনপ্রণালী সর্ব্বাংশে যুবার অনুকূল হয় না, ইত্যাদি। নিজের ভিতরের ও বাহিরের অবস্থাগুলি যথাসম্ভব বুঝিয়া লইয়া স্বধর্ম্ম নিরূপণ করা আবশ্যক, এবং সেগুলি যেভাবে ব্যবহার করিলে জীবন ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। অকপটভাবে বিচারশক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রথমেই যথাযথভাবে সব বুঝিয়া লওয়া প্রত্যাশা করা যায় না। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভুল ধরা পড়ে ও তাহা সংশোধন করা আবশ্যক হয়। দরদী সজ্জনের পরামর্শ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে ভগবানের প্রথম উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

কোরকের সুপ্তিভঙ্গ

শ্রীঅপর্ণা দেবী

শ্যামা-ব্রততীর শ্যাম আবরণে
ছিনু এতদিন অন্ধ,
কে জানিত,—আছে আমারি হিয়ায়
এত মধু—এত গন্ধ !
কে জানিত,—আছে জগতের মাঝে
এত হাসি, এত গান !
মুক্ত-নীলিম-অম্বর মাঝে
ভরা অনন্ত-প্রাণ !
শত তটিনীর গীতিভরা-গতি,
একটী সিন্ধু পানে ;
শ্যামলা-ধরণী মুগ্ধা-বিভোরা—
নীলিমের আহ্বানে।

হে মোর অরুণ !—দেবতা করুণ—
জাগিনু পরশে তব,
বিপুল আলোকে, আকুল পুলকে,
লভিয়া জীবন নব !
তোমার হিরণ-কিরণ পরশে
ধরণী কনক ভরা,
হাসিতে উজলি'—কনকাঞ্জলি
তোমারে সঁপিছে ধরা।
নদী-গিরি-বন স্বর্ণ-শোভন,
উজল-হিরণ-রাগে ;
নবঘন কায়—কনক-প্রভায়
অম্বর তলে জাগে।

আঁধারের দেশে ছিনু অচেতন
ঘুমেতে মগন আমি ;
স্বপনের মাঝে, কত কি বচন
কহিত 'দীর্ঘযামি'।
কহিত সে শুধু,—"মুদিয়া নয়ন
ঘুমাও তোমরা সবে,
আঁধারে ঢালিয়া নিবিড় আঁধার
অটুট রেখেছি ভবে ;
আমি নরপতি,—আমারি খেয়ালে
জগৎ চলিছে তাই ;
আমি, নির্ম্মম-নিয়তি, জগতে
আমা ছাড়া কিছু নাই।"

তোমার প্রেমের মোহন পরশে
হে মোর পরশ মণি !
লোহার বাঁধন টুটিয়া আজিকে
ঝলকে স্বর্ণ-খনি।
কোথা হ'তে এ'ল—এ মাধুরী ভরা
বিকসিত শতদল !
কোন্ পাষাণের তলে চাপা ছিল
এত মধু—পরিমল !
কে জানিত,—আছে সুধার উৎস
আমারি বক্ষ মাঝে !
যত হাসি-গান, যত আলো, প্রাণ
আমারি পরাণে 'রাজে !

নব জীবনের নবীন প্রভাতে
লভেছি তব যে দান,
তোমারে শোনাতে,—তোমারি জগতে
গাহিব আজি সে গান।
বিশ্বে বিতরি' সৌরভ রাশি,
ভরা'ব তোমার প্রাণ ;
সুধার প্লাবনে জগৎ প্লাবিয়া,
তোমারে করা'ব স্নান ;
আপনারে আমি রিক্ত করিয়া
জগতে বহা'ব বান ;
তোমারি বিশ্বমন্দির মাঝে,
ও পদে লভিব স্থান।

শ্রীম-কথা

শ্রীঅবিনাশ শর্ম্মা

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কত গুণী, কত মানী, কত বিদ্বান্ তাঁর পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে ধন্য হল। তিনি স্বীয় জীবনে কঠোর সাধনা করে জগৎকে কত অমূল্য উপদেশ দান করে গেলেন। তাঁর একটী বিশিষ্ট দান হচ্ছে বিশ্ববরেণ্য ত্যাগীশ্বর চিরকুমার স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি তাঁর গুরুদেবের ভাবধারা দ্বারা সভ্যতাগর্ব্বোদ্দীপ্ত ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জগতের চিন্তারাশির মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করলেন। আর একটী দান হল আদর্শ গৃহী ভক্ত "শ্রীম," যিনি প্রাচ্য জগৎকে তাঁর ইষ্টদেবের 'কথামৃত' পান করিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে মুক্তির পথ দেখালেন। ঠাকুরের আরও অনেক সন্তান নানাদিকে তাঁর প্রেমের রাজ্য বিস্তার করে গেলেন। আজ বলা হবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা স্বর্গীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা "ছেলেধরা মাষ্টার মশায়" বা 'শ্রীম' বিষয়ে। সাধু জীবনের সব কথা কখনও বলা সম্ভব নয়, যৎসামান্য নিয়ে বলা হচ্ছে :—

১৮৮২ সালে মার্চ্চমাসে দক্ষিণেশ্বরে 'শ্রীম' প্রথম দর্শন করলেন তাঁর ইষ্টদেবকে। তখন বসন্তকাল, সন্ধ্যা হয়েছে। বসবার ঘরে ঠাকুর একলা আপন মনে মার নাম করছিলেন। ঐ দিন তাঁর কথা শুনে, তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে 'শ্রীম' সর্ব্বস্ব ঢেলে দিলেন তাঁর শ্রীগুরুর চরণে। ঠাকুরও তাঁকে আপন গোষ্ঠীর একজন চিনে পরিচিত মধুর হাস্যে বললেন, "পরিবারবর্গের আবার এসো গো।" এর পর থেকে তিনি ঠাকুরের কথা শুনতে, তাঁর সঙ্গ করতে সময় পেলেই ছুটে যেতেন। আর সেই দিনই রাত্রে দৈনন্দিন ঘটনা ডায়েরীতে টুকে রাখতেন, পরে কথামৃত নামে পুস্তকাকারে করে গেলেন। মাটীর জগতে বাস করে মাটীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভাল না বেসে উর্দ্ধলোকের অধিবাসী হবার জন্যে ব্যাকুলতা থাকায় 'শ্রীম' গৃহী হয়েও ত্যাগী। তাঁর দীর্ঘ উন্নত বপু, আজানুলম্বিত বাহু, আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, উন্নত প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয়, সকলের মনে শ্রদ্ধা জাগাতো। সব সময়েই তাঁর মুখে লেগে থাকতো হাসি, আর সকলের জন্যে খোলা থাকতো হৃদয় ও দ্বার। কখনও ভরা আকাশের নীচে স্কুলবাড়ীর চারতলায় ছাদের উপর, কখনও বা তাঁর ঠাকুর বাড়ীর উপরের দোতলার ঘরটীতে, কখনও বা তাঁর পৃথক বসবার ঘরে, তিনি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের কথায় মগ্ন হয়ে আনন্দ বিতরণ করতেন। কত ব্যথা ভরা বুকে শান্তি দিয়েছেন, কত মন মরা, কত আশাহারা, কত পথহারাকে স্বপনপুরীর কথা শুনিয়ে পথের সন্ধান দিয়ে অমৃতের অধিকারী করে গেলেন, তার ইয়ত্তা নাই। হরিদ্বার, কনখল, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থের কত প্রসাদ আসতো, যেন সকল তীর্থের সমাগম হত! কত সাধু জীবন তৈরী করলেন। আজ প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বে বন্ধু আনীত একখানি কথামৃত পাঠে লেখক 'শ্রীম' দর্শনে প্রথম তাঁর নিকট গেল। তখন বসন্তকাল, বৈকাল বেলা তাঁর বসবার ঘরে তিনি তখন আধ-ময়লা একখানি উড়ানি গায় দিয়ে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন।

নিকটে একজন এম্-এ হেড্ মাষ্টার বসে, ইনি এখন মঠের সন্ন্যাসী। লেখক প্রণাম করলে, 'শ্রীম' তাকে সহাস্যমুখে সাদরে নিকটে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি কিছু বল্‌বার আছে?" "আজ্ঞে, বড় অশান্তিতে আছি।" এই উত্তর শুনে তিনি তখন সরল বালকের মত উচ্চ হাস্য করে নিকটের যুবাটীকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, "শুন্‌ছেন কথা? সংসারে আছেন আর বল্‌ছেন, বড় অশান্তিতে আছি। এক বোতল মদ খাবেন আর বল্‌বেন, কেন মাতাল হব?" এই কথায় সকলেই হাসল। এমনি ছিল তাঁর কথা বল্‌বার ঢং। পরে তিনি বল্‌লেন, "স্বামীজি যখন পরমহংসদেবের কাছে প্রথম গেলেন তখন তিনি কি গান করেছিলেন তাই শুনুন।" সুমিষ্ট স্বরে ভাবের সঙ্গে আস্তে আস্তে গান কর্‌লেন—

"মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
মিছে ভ্রম অকারণে।"

সমুদয় গানটী গেয়ে, মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষে ব্যাখ্যাও কর্‌লেন। গানটী শেষ হলে গামছা দিয়ে আনন্দাশ্রু পুছে বল্‌লেন, "আর একটা গানও তিনি গেয়েছিলেন, শুনুন।" 'কীর্ত্তন সুরে' মিহি গলায় তান ধর্‌লেন—

"চিন্তয় মম মানস হরি, চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন"; ইত্যাদি—সমস্ত গানটা পূর্ব্বের মত গাইলেন। এবার যুবাটীকে ও লেখককে যোগ দিতে বললেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জানালার ভিতর দিয়ে বসন্তকালের স্নিগ্ধ বাতাস ঝির্ ঝির্ করে আসছে, নির্ম্মল আকাশ থেকে চাঁদের আলো পরিষ্কার বিলেতি মাটীর মেঝের উপর প'ড়েছিল। স্থানটী স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হয়েছিল। গীতান্তে 'শ্রীম' সহাস্যে বল্‌লেন, "তাই ত সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আসুন, এবার আমরা সকলে মিলে একটু নেমাজ পড়ি। ঠাকুর বল্‌তেন, 'সকাল বিকাল ভগবানের নাম করা ভাল'।" শ্রীম নিঃশব্দে ভক্তিভরে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে যুবকটী হারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে একটী ধূপের কাঠি হাতে নিয়ে ঐ ঘরের দেয়ালে টাঙ্গান দেব-দেবীর পটে দেখাতে লাগলেন। কালীঘাটের মা কালীর ছবি, সীতারামের যুগলমূর্ত্তি, বীরাসনে চৈতন্যদেবের ফটো, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমার ছবি, বীরবেশী স্বামী বিবেকানন্দ, দক্ষিণেশ্বরের ভব-তারিণীর মন্দিরের মৃন্ময়ী শ্যামা-মার মূর্ত্তিতে ঘরটী পরিপূর্ণ ছিল। জপান্তে স্বীয় ইষ্টকে বারংবার প্রণাম করবার পর শ্রীমর নিকট লেখক বিদায় প্রার্থনা করলে তিনি সহাস্যে তাকে বল্‌লেন, "আবার যখন এই পথে আস্‌বেন, তখন আমাদের দেখা দিতে ভুল্‌বেন না।" যার কাছে বস্‌লে মন ভরে যায়, সংসার-জ্বালা দূর হয় তাঁকে কখনও কি ভুলা যায়? সময় পেলেই লেখক তাঁর কাছে যেত, কখনও বা ইচ্ছায়, কখনও বা প্রবল আকর্ষণে, এবং তিনি যেসব কথা বল্‌তেন তা সেই দিনই নোট বইএ টুকে রাখ্‌তো। এই রকম করে ষোল সতর বছর কেটে গেল। 'শ্রীম' যখন ঠাকুরের বিষয় বল্‌তেন তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে, যেন একটা চিরবিরহী আত্মা যাতনায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে, যেন অরূপ সাগরের একটা অপরূপ ঢেউ কিছুকাল হেলে দুলে আবার ঐ অরূপ সাগরে মিশ্‌তে সদা ব্যস্ত। এমনি উদাসভরা মনে ব্যাকুলভরা কণ্ঠে অহর্নিশি তিনি তাঁর প্রিয়তমের সন্ধানে সদা জাগ্রত। শ্রীগুরুগতপ্রাণ 'শ্রীম' তাঁর শ্রীগুরুর ছবি কত রকমে এঁকেছেন, আজ তাঁরই একটী ছবি দিচ্ছি। তিনি একদিন বল্‌লেন— "গুরুর পাদপদ্মে যিনি সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতে পারেন তিনিই ধন্য। গুরু Eternal Life (অনন্ত জীবন) দেখতে পান। তাই শিষ্যকে বলেন, 'Ye Sons of Immortal Bliss— (অমৃতস্য পুত্রাঃ— অমৃতের সন্তানগণ) I can give you Eternal

Life—অনন্ত জীবন, অমরত্ব দান করতে পারি।' ঠাকুর যেন একটী পাঁচ বছরের ছেলে, সদাই তাঁর মার জন্মে ব্যস্ত। তিনি যেন একটী ফুল—A beautiful flower, তার স্বভাবই হচ্ছে ফুটে গন্ধ ছড়ান, but waste its sweetness in the desert air—মরুর বুকে ফুটে উঠে মরুর মাঝেই নষ্ট হয়, লোকে দেখ্‌তে পায় না, জানতে পায় না। তিনি যেন Bonfire—জ্বলন্ত আগুনের গোলাবিশেষ, আর তাই থেকে অন্যান্য ছোট পিদিম্‌ জ্বালান হয়েছে।" একটু থেমে বল্‌ছেন, "না না, এ রকম উপমা ঠিক হলনা, Finite point of view থেকে (সসীম বুদ্ধি নিয়ে) Infiniteকে (অনন্তকে) কি কখনও জানা যায়? তিনি যেন একটী স্বর্গীয় বীণা, আপন মনে মার গুণ গানে সদা মত্ত। তিনি যেন একটী বড় মাছ, মহানন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে In a calm clear blue sheet of waterএ মহাসুখে সাঁতার দিচ্ছেন। ঝড়ের সময় পাখীর মত সব আশ্রয়স্থল ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি যেন অনন্তের দ্বারে বসে আপন সুখে অনন্তের গুণ গান করে দোল খাচ্ছেন।" "প্রভুপদ পঙ্কজ ভ্রমরা" 'শ্রীম' আত্মভোলা হয়ে এই ভাবে কত কথা, ঠাকুরের বিষয় বলতেন। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় পরে এই বিষয় আরও লিখবো।

শূন্যের কথা

শ্রীঅভীশ্বর সেন

এমন এক সময় ছিল, যখন মানুষ বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা করিতে পারিত না। বাতাস যে কতকগুলি গ্যাসের সমষ্টি এবং কোন উপায়ে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারা যায়, একথা সকলের ধারণার অতীত ছিল। কারণ, মানুষ বাতাসকে চোখে দেখিতে পায় না। নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে যে অসীম শূন্যপথ আমাদের কল্পনাপথে উপস্থিত হয়, তাহাতে রাত্রিতে তারকাপুঞ্জ ব্যতীত আর কোন পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে কি? বাতাসকে আমরা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু আকাশকে পারি না। বাতাসের বায়বীয় প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইবার পর, আমাদের পৃথিবীর বাহিরে যে অদৃশ্য স্থান রহিয়াছে, তাহাকে মানুষ প্রকৃত শূন্য বলিয়া ঠিক করে। আজ বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে শূন্য বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু মানুষ যন্ত্রাদি দ্বারা যে শূন্যতার সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাহা—যে শূন্যতা পৃথিবীর বাহিরের স্থানে বিরাজ করিতেছে, তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

আলোক বিশ্লেষণ অধুনাতন পদার্থবিদ্যার একটি গৌরবময় সাফল্য। সূর্য্যের যে আলো, নানা বস্তুর উপর পড়িয়া তাহাদিগকে আমাদের দৃষ্টি-পথে আনয়ন করে, তাহা সাতটি নানারঙের আলোক-রশ্মির সমষ্টি। কাঁচের ত্রিকোণ খণ্ডের ভিতর

দিয়া আলোকরশ্মি পাঠাইয়া দিলে, আলোর এই ভাঙ্গিয়া যাওয়া আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কাঁচখণ্ডের কিছু দূরে একটি পর্দা রাখিলে তাহার উপর আলোক বিকীরণকারী বস্তুর একটি রঙ্গিন ছবি উঠে। উহাকে বলা হয়, বর্ণচ্ছটা। দেখা গিয়াছে, যে কোন আলোককে ত্রিকোণ কাঁচখণ্ড দিয়া বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়, তবে এই বর্ণচ্ছটার প্রকৃতি কখনও একরকম নয়। শক্ত ধাতুপদার্থ যখন তাপ-প্রভাবে আলোক বিকীরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার বর্ণচ্ছটায় নানারঙের সমাবেশ সমানভাবে হয়, কিন্তু জ্বলন্ত বায়বীয়পদার্থের বর্ণচ্ছটায় আমরা কতকগুলি রঙের উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাই। আবার, কোন আলোকরশ্মি যদি গ্যাসের ভিতর দিয়া পাঠাইয়া তাহার বিশ্লেষণ করা হয়, তখন ইহার বর্ণচ্ছটায় কতকগুলি কালো রেখা দেখা যায়। ইহার কারণ, গ্যাসের ভিতর দিয়া যাইবার সময়, আলোকরশ্মির কতকগুলি অংশ বাদ পড়ে। সুতরাং সেগুলি আর বর্ণচ্ছটায় প্রকাশ হইবার সুযোগ পায় না। সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছটায় এরূপ কতকগুলি কালো রেখা দেখিয়াই ঠিক করা হয় যে, সূর্য্য জ্বলন্ত গ্যাসের আবরণে আবৃত আছে। আলোকরশ্মি বিশ্লেষণের বড় কাজ হইতেছে,—বর্ণচ্ছটার দ্বারা আলোকবিকীরণকারী পদার্থের ভিতর কোন কোন মৌলিক পদার্থ আছে, তাহা ঠিক করা। দেখা গিয়াছে, যে কোন মৌলিক পদার্থকে যদি তাপ দিয়া আলোক বিকীরণ করিতে বাধ্য করা হয়, তখন তাহার বর্ণচ্ছটায় যে কতকগুলি রেখা পাওয়া যায়, তাহা ঐ পদার্থটির বিশেষ সম্পত্তি—অন্য কোন মৌলিক পদার্থের ঐরূপ রেখা নাই। সুতরাং যখন বর্ণচ্ছটার ভিতর আমরা কালো দাগ দেখিতে পাই, তখন বুঝিতে পারি, কোন মৌলিক পদার্থ আলোকরশ্মির পথে বাধা দিতেছে।

আলোক বিশ্লেষণের আর একটি কাজ আছে। বিজ্ঞানের আর কোন শাখায় এত সুন্দর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের সম্মুখ দিয়া যদি কোন লোক চলিয়া যায় তবে সে কত গতিতে চলিতেছে, তাহার একটা মোটামুটি আন্দাজ পাই। কিন্তু যদি কোন লোক আমাদের দৃষ্টিপথের সহিত এক রেখায় চলিতে থাকে, তখন তাহার গতিনির্ণয় করা ত কঠিন হয় বটেই, অনেক সময় আমরা ঠিক করিতে পারি না, সে আমাদের দিকে আসিতেছে কি চলিয়া যাইতেছে। যে দূরত্বের কল্পনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, ততদূরে অবস্থিত তারকাদের গতি-বিধিও আলোক বিশ্লেষণের দ্বারা সম্ভব। ভগবান মানুষের জন্য অসীম শক্তি অসীম কৌশল সম্মুখে রাখিয়াছেন, চোখবাঁধা মানুষ কোনক্রমে কুড়াইয়া লইলেই হইল। এক্ষেত্রে যিনি এই কৌশলের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার নাম হইতেছে ডপ্‌লার। রেলের বাঁশীর এক সুর, কিন্তু দূর হইতে ষ্টেশনে আসিলে মনে হইবে, তাহা আর এক সুর। এই যে পার্থক্য তাহার মূলে আছে ট্রেনের গতি। দেখা গিয়াছে, এই গতির জন্যই আলোকতরঙ্গের আপাত দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং তাহার বর্ণচ্ছটার বিশেষ রেখাগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাহারা ঠিক এক স্থানে নাই—সরিয়া যাইতেছে। এই সরিয়া যাওয়ার পরিমাণ হইতে, আলোকতত্ত্ববিদ্‌গণ তারকার গতির পরিমাণ ঠিক করিয়াছেন। আর একটা কথা, ট্রেন নিকটে আসিতে থাকিলে মনে হয়, তাহার বাঁশীর সুরের তীব্রতা বাড়িতেছে। তেমনি দূরে সরিতে থাকিলে মনে হইবে, যেন উহা ক্রমেই কমিতেছে। আলোকরশ্মিরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ণচ্ছটার লাইনগুলি দুইদিকে সরিতে পারে; হয় লালরঙের দিকে, নয় বেগুনি-রঙের দিকে। যখনি লাইনগুলি লালরঙের দিকে সরিতে থাকে, তখন বোঝা যায়, তারকাটি দূরে সরিয়া যাইতেছে; বেগুনি রঙের দিকে পরিবর্ত্তন

ঘটিলে তারাটি পৃথিবীর দিকে আসিতেছে বুঝিতে হইবে।

অনেক সময় জ্যোতির্বিদেরা আকাশে দূরবীক্ষণ দিয়া কতকগুলি তারার আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিয়াছেন। একটি তারা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান বেড়িয়া ঘুরিতেছে। হয়ত একটি তারাই দূরবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যাইবে, কিন্তু আলোক-বিশ্লেষণের সাহায্য লইয়া অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, দুইটি তারার বৈশিষ্ট্য বর্ণচ্ছটার ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা ঠিক করেন, একটি আলোর ঔজ্জ্বল্যে দৃশ্যমান, অন্যটির আলো এত ক্ষীণ যে, তাহা চোখে ধরিতে পারা যায় না। ডক্টর হার্টমেন বলিয়া একজন জার্ম্মান জ্যোতিষী এইরূপ এক তারকা-যুগলের ভিতর ক্ষীণতরটিকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল বর্ণচ্ছটার উপর। তিনি দেখিলেন, তাহার ভিতর দুইটি রেখা রহিয়াছে। উজ্জ্বল তারকাটির গতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার আর সন্দেহই রহিল না যে, তিনি অবশেষে ক্ষীণতর তারকাটিকে আবিষ্কার করিয়াছেন।

কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিলেন যে, লাইনগুলির স্থান পরিবর্ত্তন এরূপ ক্ষীণ যে, ক্ষীণতর তারকাটির গতির অনুযায়ী তাহা কখনই হইতে পারে না। অথচ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর এমন কোন জিনিষ নাই, যাহা দ্বারা উহার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল যে, উহার উৎপত্তি স্থান যাহাই হউক না কেন, পৃথিবী হইতে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। অবশ্য লাইনগুলি কোন্ মৌলিক পদার্থের, তাহা নির্ণয় করিতে বেশী দেরী হইল না। দেখা গেল, এগুলি ক্যালসিয়ম বলিয়া একটি ধাতুপদার্থের।

হার্টমেনের যন্ত্রে ও তারকার মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহার কোথাও না কোথাও যে এগুলি রহিয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও নাই এবং তাহার উপরেও নাই। হার্টমেন শুধু এই একটি ঘটনার উপরেই ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার এই ক্যালসিয়ম বাষ্পমণ্ডল, অসীম শূন্যের যে জিনিষ লইয়া গ্রহউপগ্রহ গঠিত হইয়াছে, তাহার এক বিকাশ। নানা সমালোচনার পর তাঁহার এই মতবাদ আজকাল সুধীবৃন্দ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। সোডিয়ম ধাতুর অস্তিত্বও অনেক যায়গায় স্বীকৃত হইয়াছে।

শুধু যে সোডিয়ম এবং ক্যালসিয়মই এই শূন্যমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা নয়. ইহার ভিতর অন্যান্য মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আছে, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন। এরূপ মনে করিবার অনেক কারণও আছে। ইহার ভিতর অক্সিজেনও আছে. নাইট্রোজেনও আছে—সুতরাং বাতাসও আছে। ক্যালসিয়ম, সোডিয়মএর বাতাস ইহার প্রাচুর্য্য আমাদের জীবনধারণের সহিত কত নিবিড়ভাবে সংসৃষ্ট। শূন্যমণ্ডলের ভিতর এগুলিকে দেখিয়া কত আনন্দ হয়। তবে এটা ঠিক শূন্যমণ্ডলের শূন্যতার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। এরূপ শূন্যতার সৃষ্টি করিতে, বোধ হয়, মানব বৈজ্ঞানিক কখনও সমর্থ হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাতাসের যে পরিমাণ স্থানে ৫০,০০০০০০০০০০০০০০০ (৫×১০^{১৭}) গুলি পরমাণু আছে, শূন্যমণ্ডলের সেইস্থানে মাত্র একটি অণুই আছে।

পৃথিবীর বাহিরে শূন্যমণ্ডল তুষার শীতল বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু ইহার ভিতর এতগুলি পদার্থের সমাবেশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর সকলের ধারণা অন্যরূপ হইয়া গেল। গ্যাসের অণুগুলি যখন এত দূরে দূরে রহিয়াছে, তখন তাপ গ্রহণ করিবার শক্তি যেমন তাহাদের কম, তাপ হারাইবার শক্তিও তাহাদের নাই। অপর পক্ষে তারকারাশি হইতে প্রবাহের ন্যায় তাপ আসিয়া তাহাদের উপর পড়িতেছে। আর্থার এডিংটন

ইহাদের তাপ বৃদ্ধির আর একটা কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তারকারাশি হইতে ইহার অণুগুলির উপর যে আলোকসম্পাত হয়, তাহাই ইহার কারণ। আলোকসম্পাতে এক একটি অণু হইতে একটি করিয়া দ্রুতগামী ইলেকট্রন (ইলেকট্রন অণুর ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন অংশবিশেষ) বিচ্যুত হইয়া পড়ে, কিন্তু এই ইলেকট্রন নষ্ট হয় না। কিছু দূর গিয়া উহা আর একটি অণুকর্তৃক গৃহীত হয়। ইহার গতিও সেই অণুতে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং অণুগুলির গতির বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাপেরও বৃদ্ধি হয়। অপর পক্ষে যত ইহাদের গতির বৃদ্ধি হয়, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনাও তত বেশী হয়। তাই তাপেরও হ্রাস ঘটিতে থাকে। আর্থার এডিংটন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই তাপবৃদ্ধি ও হ্রাসের সমতা হয় যখন শূন্যমণ্ডলের তাপ-পরিমাণ প্রায় ১৫০০০, ডিগ্রি (১০০ ডিগ্রিতে জল ফুটিতে আরম্ভ করে) হইয়া দাঁড়ায়।

এই শূন্যমণ্ডলের যে ক্যালসিয়ম মেঘ—তাহা বোধ হয় একদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বিশ্বরচনার উপকরণের মধ্যে বোধ হয় ইহাও ছিল একটি। এগুলিকে নানাপ্রকারে সজ্জিত করিয়া তিনি গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টি করেন। এখন যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা বোধ হয় সৃষ্টির পরের অবশিষ্ট অংশ। অথবা হয়ত এখনও সৃষ্টির শেষ হয় নাই। যে স্থানে বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বে তাঁহার যন্ত্রাদি লইয়া কিছু দেখিতে পাইতেন না, সেখানে তিনি নূতন নীহারিকার সৃষ্টি দেখিতেছেন। সুদূর তারকাদির পৃথিবী হইতে ভীষণ গতিতে সরিয়া যাওয়াও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সীমা বাড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

শূন্যে যে শুধু অণু অণু দিয়া তৈরী এই মেঘ বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে, তাই নয়; শূন্যের আরও অনেক বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, আমাদের সৌরজগতের ভিতর কোন গ্রহ উপগ্রহ বা কোন উল্কাখণ্ড সেকেণ্ডে চল্লিশ মাইলের বেশী গতি পাইতে পারে না। যদি কাহাকেও আমরা চল্লিশ মাইলের বেশী গতিতে ধাবিত হইতে দেখি, তখন বুঝিব, তাহা সৌর-জগতের বাহিরে অসীম শূন্য হইতে আসিয়াছে। ডক্টর অপিক্ কখনও উল্কাখণ্ডের প্রতিসেকেণ্ডে ১৩০ মাইল পর্য্যন্ত গতি দেখিয়াছেন। পৃথিবীর উপর প্রায় প্রতিদিন ২০লক্ষ উল্কাখণ্ডের পতন হয়; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই শূন্যপথ হইতে আসে। সুতরাং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, শূন্যপথের বাষ্পমণ্ডলের অণুগুলি যে একাকী নয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শূন্যজগতের বৈশিষ্ট্য এই পথিক অণুগুলি এবং উল্কাখণ্ডগুলি লইয়াই নয়, আরও না জানি কত বৈচিত্র্য ইহার ভিতর আছে। কিন্তু একটি বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলে প্রথমে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন নানা অনুসন্ধানের পর ঠিক করা হইয়াছে যে, তাহারও উৎসস্থান আমাদের জগতের বহিরের শূন্যজগৎ। এগুলি হইতেছে এক প্রকার অতি তীক্ষ্ণ রশ্মি। বৈজ্ঞানিক কবিরা ইহার নাম দিয়াছেন সৃষ্টিরশ্মি।

ইথরে তরঙ্গ উঠিলে যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহা সব সময় আলোই হয় না। তাপ, আলোক সকলই ইথর তরঙ্গ। তবে ইহাদের দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। রঞ্জনরশ্মি বা এক্সরের যে দৈর্ঘ্য তাহা সকলকার চেয়ে ছোট বলিয়া আগে সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সৃষ্টিরশ্মির দৈর্ঘ্য ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রঞ্জনরশ্মির সৃষ্টি করিতে হইলে কত ভীষণ শক্তির খরচ করিতে হয়, এগুলির সৃষ্টি করিতে আরও শক্তির প্রয়োজন। অথচ দেখা গিয়াছে, এই রশ্মিগুলি সৌরজগতের বাহির হইতে নিরন্তর পৃথিবীতে আসিতেছে। সুতরাং

শূন্যপথের অদৃশ্যগর্ভে তাহাদের জন্ম লইতে তাহারা কত শক্তির প্রয়োজন বোধ করে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইহাদের যেরূপভাবে প্রথম খোঁজ পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির সূক্ষ্ম কার্য্যপ্রণালী ঠিক রাখিবার জন্য সীসক নির্ম্মিত বাক্স দিয়া উহাদের ঘেরিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ইহা সত্ত্বেও তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর ভিতর কোথাও না কোথাও কে যেন বাধা দিতেছে। সুতরাং এই বিঘ্নউৎপাদনকারী বৈদ্যুতিক পথিকের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। মানুষ আকাশে বেলুন পাঠাইয়া, অতল তুষার শীতল হ্রদগর্ভে যন্ত্রাদি নিমজ্জিত করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। দেখা গেল, সারা পৃথিবীর ভিতর এমন কোন স্থান নাই, যেখানে সৃষ্টিরশ্মির অস্তিত্ব দেখা যায় না। আমাদের উপর যেন সৌরজগতের বাহির হইতে এই সৃষ্টিরশ্মির বৃষ্টি হইতেছে।

যে দিন হইতে সৃষ্টিরশ্মির আবিষ্কার হইয়াছে, সেদিন হইতে বৈজ্ঞানিকদের ইহার উপর অনুসন্ধানের বিশ্রাম নাই। ফলে, অনেক নূতন পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধন-বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন একটি। শূন্যে উহাদের কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে, অনেক নূতন মতবাদও এ বিষয়ে প্রচারিত হইয়াছে।

নানা গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর বিখ্যাত আমেরিকান পদার্থতত্ত্ববিদ্ মিলিকান ঠিক করিয়াছেন যে, সৃষ্টিরশ্মিগুলির আবির্ভাব হয়, নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইবার সময়। আমাদের চক্ষে ইহা অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, হয়ত মনে হইতেও পারে, ইহা অসম্ভব, কিন্তু ইহা বিজ্ঞানের সাধনালব্ধ অনুভূতি। দ্রব্যবিশেষের অণুপরমাণু সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে পরমাণু ভাঙ্গিয়া দিলে, বিদ্যুৎসংযুক্ত কতকগুলি কণা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও দেখিয়াছেন যে, কতকগুলি তারার ভিতর এমন পরিবর্ত্তন ঘটে যে, তাহার কিয়দংশের অণু পরমাণুর এইরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া যাওয়া ঘটিতে পারে। আকাশের দিকে দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিতে দেখিতে হয়ত একটি তারার ক্ষীণজ্যোতি দেখিতে পাওয়া গেল—কিছুদিন পরে তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এমন কি, তাহার অবয়বের পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে পারা গেল। ইহার ভিতর তাপের যে বৃদ্ধি ঘটে, আমরা তাহার কল্পনাও করিতে পারি না, হয়ত তাহা সূর্য্য হইতে শত সহস্রগুণ তাপ সংগ্রহ করিল। তাহা যে কতকগুলি অণুপরমাণু ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং একই সময়ে জড়পদার্থের ধ্বংস ও সৃষ্টি হইতেছে। বিশ্বস্রষ্টার এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা কবে শেষ হইবে, বলা যায় না—তবে আমরা তাঁহার খেলার ঘর দেখিয়াছি। তাহা কখনও শূন্য নয়, সৃষ্টি ও শক্তির উপকরণে তাহা পরিপূর্ণ!

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি

শ্যামপুকুরের বাড়ীর কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

যতদূর স্মরণ হয়, খুব সম্ভব ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের গোড়াতে এই শ্যামপুকুরের বাড়ীতেই ঠাকুরের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইহার প্রায় বছর দুই তিন আগে শুধু তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম মাত্র, পরিচয় হয় নাই, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি যখন তাঁহার কাছে যাই, তখন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, এবং বোধ হয় খুব অল্পদিন যাবৎই তিনি তথায় যাতায়াত করিতেছিলেন। ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও যুবক ভক্তগণ সকলেই তাঁহার জন্য যে তখন খুব চিন্তিত অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের তখনকার মুখের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু এই দুঃখ-অবসাদের মধ্যেই নিত্য নূতন নূতন ভক্তসমাগমে এবং ঠাকুরের দর্শনপ্রার্থী নিত্য নূতন সাধারণ দর্শকবৃন্দের আগমনে ও তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের নিয়ত ধর্ম্মালোচনায় এই শ্যামপুকুরের বাড়ীখানি তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সদাই যেন উৎসবক্ষেত্র বলিয়া মনে হইত।

এই পরিচয়ের পরদিন হইতেই আমার মনোভাবের আশ্চর্য্যরকম পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম। যে সংস্কারগত আশা ও কল্পনা অবলম্বনে যে লক্ষ্যমুখে এতদিন জীবনের গতি চলিতেছিল, সহসা কি যেন যাদুমন্ত্রে তাহা কোথায় অপসৃত হইয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে এই মহাপুরুষের চরণ আশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া তখন বোধ হইয়াছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিনা কারণে এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে কেমন করিয়া ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন যুক্তিই তখন আমার মনে স্থান পায় নাই। বিনা কারণে বলিতেছি এই জন্য যে, প্রথম সাক্ষাৎকালে তাঁহার মুখ হইতে "তাঁহাকে পাইলেই ত সব হয়" এই মহৎ বাক্যটী শুনিলেও সে কথার উপর তখন যে আমার তেমন আস্থা বা দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার অহেতুকী অপূর্ব্ব ভালবাসায় বোধ হইয়াছিল, "তিনি যেন কোলে তুলিয়া লইয়া মাত্র একটী চুম্বনের দ্বারা চিরদিনের মত আমাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।"

উক্ত পরিচয়ের পরদিন হইতে কখন কখন দুএক বেলার জন্য হয়ত বাড়ী গিয়াছি, ক্রমশঃ তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। তখনকার অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরমহংসদেবের চিকিৎসা সম্বন্ধে একপ্রকার সুবন্দোবস্ত হইলেও তাঁহার সেবাকার্য্য চালাইবার জন্য সেরূপ কোন সুবন্দোবস্ত তখনও হয় নাই। তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণ নিয়মিতভাবে তাঁহাদের বাটী হইতে দুইবেলা যাতায়াত করিয়া এবং অবসর পাইলে অন্য সময়েও যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিলেও সব সময় স্থায়ীভাবে তথায় থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যুবক ভক্তগণের মধ্যেও পরে যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া

সম্পূর্ণভাবে তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ ও তাঁহার সেবা-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহ তখন তথায় স্থায়ীভাবে দিবারাত্র অবস্থান করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেই তখন বিদ্যার্থী—স্কুল কলেজের ছাত্র। প্রত্যহ বিকালে তখন শ্রদ্ধেয় শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ)কে আসিতে দেখিতাম। বোধ হয়, কলেজের ছুটির পর তাঁহারা আসিতেন। স্থায়ীভাবে তখন কেবল শ্রদ্ধেয় বুড়ো গোপালদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ও লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) এই দুই জনই ছিলেন। মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জন মহারাজকেও দেখিতাম। যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বদা যথাসময়ে নিয়মিতভাবে ঠাকুরকে ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদান ও সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিতে হইলে রাত্রি কালেও তাঁহার নিকট উপযুক্ত লোকের অবস্থান করা দরকার। তখন স্বামীজি মহারাজ (স্বামী বিবেকানন্দ) নিজে ঐ ভার গ্রহণ করিয়া কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ), শশী মহারাজ ও ছোট গোপাল (হুটকো গোপাল) প্রভৃতি কয়জনকে প্রভুর সেবার্থে উৎসাহিত করিয়া রাত্রিতেও তাঁহাদের অবস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে এখানে আসিয়া নিজে সে ভার গ্রহণ করিলেন। রাত্রিকালে ঠাকুরের তত্ত্বাবধানের জন্য যে অসুবিধা ছিল, তাহা স্বামীজি মহারাজই প্রথমে স্বয়ং ও পূর্ব্বোক্ত কয়জনের সাহায্যে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমি যখন যাই, তখনও মাতা-ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত হন নাই। উপরে ছাতে যাইবার সিঁড়ির পাশের যে চাতালটীতে তিনি দিনের বেলা সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া ঠাকুরের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত ও অবসর মত ঐখানেই একটু আধটু বিশ্রামাদি করিয়া কাটাইতেন, সে স্থান দিয়া দুএক দিন বিকালে ছাতে উঠিতে গিয়া, ঐস্থানটী নির্জ্জন দেখিয়া, তথায় বসিয়া কখনও অল্পকাল ধ্যান-জপাদি করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার অবস্থানের কোন চিহ্নই সেখানে দেখি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার খুব অল্প দিন পরেই কবে যে তিনি আবার তথায় আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহা জানিতেও পারি নাই। ঐ একটুখানি বাড়ীতে নিত্য অত লোকসমাগমের মধ্যেও তিনি রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক স্নানাদি ক্রিয়া সারিয়া, সকলের অগোচরে দিনের পর দিন নিয়মিতভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেমনভাবে নীরবে যে দিন কাটাইতেন, সে সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" বিস্তারিত বর্ণন করিয়া-ছেন। সুতরাং সে বিষয় আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগাবস্থায় ঠাকুরের শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁহার ভক্তগণকে—বিশেষ করিয়া গৃহস্থ ভক্তগণকে তাঁহার ব্যাধির কারণ ও ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে শুনিতাম। তাঁহাদের সে জল্পনা কল্পনা আমার কিশোর প্রাণে তখন বড়ই কৌতূহলপ্রদ বলিয়া ঠেকিত। সেইজন্য যখনই তাঁহাদের ঐরূপ বলিতে শুনিতাম, তখনই তাঁহাদের একপার্শ্বে বসিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিয়া যাইতাম, আবার তাঁহার যুবক ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ঐ সকল জল্পনা কল্পনার বিপক্ষে যে নানাবিধ যুক্তির দ্বারা তাঁহার স্বমত ব্যক্ত করিতে থাকিতেন, তাহাও শুনিতাম। তখনকার সেই অল্প বয়সে, সকল কথা ঠিকমত বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার মতই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করিতাম। সত্য বলিতে

কি, আমার নিজের প্রাণে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখনও কোন স্থির ধারণা দাঁড়াইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তবু শুধু ভালবাসার দিক দিয়া তাঁহার প্রতি আমার তখন প্রাণে এমন একটী অপূর্ব্ব ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে দেব-মানব, মহাপুরুষ বা অবতার যাহাই কিছু বলা হউক না, সবই মানিয়া লইতে আমার কিছু অসুবিধা হইত না। ফলে তখনকার আমার নিজের মনের অবস্থা আমি এখন ইহার বেশী আর কিছু বলিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহারই চরণাশ্রয়ে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু শ্যামপুকুরের বাড়ীতে তখন স্থানাভাব ও অন্য নানাকারণে বেশী লোকের একত্রে থাকিবার সুবিধা না থাকায় এবং অল্প বয়স বলিয়া, রাত্রিতে ঠাকুরের সেবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাকে প্রয়োজন বোধ না করায়, পূজ্যপাদ রামদাদা (শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়) তাঁহারই বাড়ীতে তখন আমার থাকিবার ব্যবস্থা করেন। আমি নিত্যই প্রায় প্রত্যূষে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে চলিয়া আসিতাম এবং সারাদিনটাই ওখানে কাটাইয়া, অফিসের ফেরৎ রামদাদা পুনরায় শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আসিলে, রাত্রি প্রায় নয়টা দশটায় তাঁহারই সঙ্গে আবার তাঁহার সিমলাস্থ বাটীতে চলিয়া যাইতাম। মধ্যাহ্নের আহারাদি কোনদিন বা এখানে, কোনদিন বা সেখানে, এই-ভাবেই চলিত। রামদাদার বাড়ীতে অবস্থান-কালেই নৃত্যদা ও তারক মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই। নৃত্যদা পরবর্ত্তী জীবনে যে নামে সাধারণের নিকট পরিচিত তাহা আমার এক্ষণে স্মরণ না থাকায়, আমি নৃত্যদা বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।* রাম-দাদার বাড়ীতে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বেই এই দুইজনকে কয়েকবার ঠাকুরের কাছে আসিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তেমন আলাপ পরিচয় হয় নাই। রামদাদার বাড়ীর দ্বিতলে চোর-কুঠুরীর মত একখানি খুব ছোট্ট ঘরে ইঁহারা দুইজন তখন একত্রে বাস করিতেন। ঘরখানি এত ছোট যে, দাঁড়াইতে গেলে প্রায় মাথায় ঠেকিত। ঘরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের গায় ঐ ঘরেরই উপযুক্ত একটী অতিশয় ক্ষুদ্র জানালা ছিল, তাহারই পার্শ্বে সর্ব্বদা নৃত্যদাকে বসিয়া থাকিতে দেখিতাম, নিকটেই তারক মহারাজও বসিয়া থাকিতেন। কি করিয়া ঐটুকু ঘরের মধ্যে যে তাঁহারা দুইজনে সর্ব্বদা দিন কাটাইতেন, তাহা এক বিস্ময়ের বিষয়। দেখিলে মনে হইত, ইহাও যেন তাঁহাদের একটা সাধনার অঙ্গ। দুপুর বেলা যেদিন হয়ত কোন কারণে শ্যামপুকুর বাড়ীতে আমার যাওয়া ঘটিত না, সে দিন ইঁহাদের কাছে বসিয়া নানাবিধ ধর্ম্ম ও সাধনার কথা শুনিতাম। সেই সময় হইতেই তারকদা ও নৃত্যদা দুজনেই আমায় খুব স্নেহ করিতেন। নৃত্যদা তখন সর্ব্বদাই প্রায় ভাবাবেশে থাকিতেন দেখিতাম। এমন কি, যখন আমার সহিত কথা বলিতেন, তখনও অর্দ্ধভাবাবস্থায় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত, সর্ব্বদাই সেই বড় বড় চক্ষু দুইটী রক্তিম আভায় জ্বল্ জ্বল্ করিত। কথা কহিতে কহিতে কখন বালকের মত হাসিতে থাকিতেন, কখন বা আবার দরদর ধারে তাঁহার চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। বুকের মাঝখানটী দেখিতাম, সকল সময়েই যেন রাঙ্গা হইয়া রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারও ভাবাবস্থা দেখি নাই, সুতরাং তাঁহার সেই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখিয়া শুধু বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকিতাম। ঠাকুরের যে অবস্থা দেখিয়াছি, সে প্রায়ই সমাধির অবস্থা, ভাবোচ্ছ্বাস অবস্থা যদিও বা একটু আধটু দেখিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে যেন শান্তিময় প্রশান্তভাব

* শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপালের পরবর্ত্তী নাম—শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। উঃ সঃ

মিশ্রিত ছিল, এমন উদ্দাম প্রকৃতির নয়। আর একটী কথা এখানে আমার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদিও আমি ইহা খুব ভয়ের সঙ্গে বলিতেছি, সেই ভক্তপ্রবর নৃত্যদার প্রতি কোন অসম্মান উদ্দেশ্যে নয়, এই ভাবাবস্থা আমাদের মধ্যে দুএকজন প্রবীণ —বিশেষতঃ যুবক ভক্তগণের মধ্যেও সংক্রামক রূপে পরে দেখা দিয়াছিল। স্বামীজি মহারাজ কিন্তু এই ভাবাবস্থার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি-তর্কের দ্বারা সকল সময় আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। স্বামীজি (স্বামী বিবেকানন্দ) বলিতেন, "দেখ্ সাবধান, এই ভাবাবস্থা আধ্যাত্মিক পথের একটী সোপান হইলেও ইহাতে কিছুতেই সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়, ধর্ম্মরাজ্যের এ চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয়, এ আসিতেও যেমন, যাইতেও তেমন। অনেক সময় দেখা যায়, ইহা কেবল দুর্ব্বল মন ও দুর্ব্বল হৃদয়ের ব্যাধি স্বরূপ। দুএকজন অবতারপ্রতিম ব্যক্তি, যেমন চৈতন্যদেব প্রভৃতি ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, নইলে সাধারণ লোকের সম্বন্ধে ইহা শুধু দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। এই উচ্চাবস্থা হইতে পতন হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।" তাহার এই কথা যে কতদূর সত্য, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া পরবর্ত্তীকালে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছি, ধন্য স্বামীজি, সত্যই এমনও হয়! যাক্, এসকল কথার আলোচনার এক্ষণে প্রয়োজন দেখিতেছি না। স্বামীজির এই সকল উপদেশের ফলে আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সম্বন্ধে এই ভাবাবস্থার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের পক্ষে খুবই শুভকর হইয়াছিল, কেননা, পরে ক্রমশঃ সকলেরই এই ভাবাবেশের পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল, কাঁহারও আর সেরূপ অবস্থা হইতে দেখি নাই, সকলেই স্বামীজির কথায় সাবধান হইয়া গিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ তারক মহারাজ নৃত্যদার সহিত অবস্থান করিলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, একদিনের জন্যও তাঁহার কখন ওরূপ ভাবাবেশ হইতে দেখি নাই, তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি, সর্ব্বদাই কেমন একটী প্রশান্ত স্থির গম্ভীর ভাব! যখন নৃত্যদার সঙ্গে তাঁহাকে পথে চলিতে দেখিয়াছি, তখনও তিনি মাটীর দিকে চাহিয়া চলিতেন, সকল সময়েই সেই স্থির শান্ত মূর্ত্তি! কিন্তু আবার অত গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও যখন কখনো কাহারও সহিত দুএকটী কথা কহিতেন, তখনই সরল সুন্দর শিশুর হাসির মত কেমন একটী মধুময় হাসি মুখখানিতে দেখা দিত। মহাপুরুষ মহারাজের সম্বন্ধে দুএকটী কথা এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সত্য সত্যই স্বামীজি প্রদত্ত 'মহাপুরুষ' আখ্যা বর্ণে বর্ণেই সত্য। এক্ষণে যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহাই বলি। অন্য সময় বহুবার তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার শেষ সমাধির কিছু পূর্ব্বে দুইবার তাঁহার সঙ্গে আমার যে দেখা হইয়াছিল, কেবল সেই দুইদিনের কথাই এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি। এই দুইবারের মধ্যে প্রথমবারে যখন দেখা, তখনও তাঁহার অসুস্থ অবস্থা, তবে একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থা নয়। নানা কথার মধ্যে সকল কথা তেমন স্মরণ নাই। যতদূর মনে আছে, তারক মহারাজ বলিলেন, "মহা মুস্কিল, বুঝলি খোকা, একেত রোগের জ্বালায় ঠিক মত রাত্রে নিদ্রা হয় না, তার উপর আবার বিপত্তি দেখনা; কাল মাঝের রাত্রি থেকে হঠাৎ একটা পাপিয়া এমন ডাকতে সুরু করলে, একেতো আমরা পাগল, তাতে তার সেই পাগলকরা ডাকে আর কি ঘুম আসে ছাই, সারারাত্রি জেগে কাটাই।" শুনে আমিতো একেবারে অবাক, এই ধীর গম্ভীর লোকটীর মুখ থেকে আজ একি শুনছি! তখন সেই চিরপরিচিত হাসিটীর সঙ্গে তাঁহার বুকের মধ্যে সবটা যেন দেখিতে পাইলাম, খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলাম, 'তা বেশ মহারাজ, কিন্তু আপনার এখন শরীরের যেমন অবস্থা দেখছি, তাতে ভয় হয়, একটু সাবধান থাকার

দরকার।' 'ভয়' এই কথাটী আমার মুখ হইতে বাহির হওয়া মাত্র তিনি হো-হো করিয়া শিশুর মত হাসিয়া বলিলেন, "কি বল্লে, ভয়! হো হো-হো, আমাদের আবার ভয়! খেপেচ?" তখন লজ্জিত হইয়া ভাবিলাম, সত্যি, খেপেছিই বটে, নইলে কাকে কি বলছি। সেই মধুর হাসির সঙ্গে শিশুর সারল্য, ভক্তের পরম নির্ভরতা ও মরণবিজয়ী সাধকের দিব্যজ্ঞানের অভিব্যক্তি—সকলের একত্র সমবায়ে তখন তাঁহার যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি দেখিয়াছিলাম ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। আর দেখিয়াছিলাম, একেবারে তাঁহার শেষ সমাধির দু একদিন পূর্ব্বে। তখন তাঁহার শরীরের সামর্থ্য সমস্তই প্রায় চলিয়া গিয়াছে, শয্যাশায়ী অবস্থা, হস্ত পদাদি সবই যেন শিথিল হইয়া বিছানার সঙ্গে মিলাইয়া গিয়া শুধু লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছেন! সম্মুখে গিয়া কিন্তু দাঁড়াইবামাত্র অতি সন্তর্পণে কেমন যেন একটু আকস্মিক স্নেহবশে আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন, আর মুখে সেই ভুবনভুলান হাসি—সে হাসির জ্যোতির দিব্য ভাতিতে তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যে কি অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব শ্রীর বিকাশ দেখিয়াছিলাম, সেই যন্ত্রণাময় ব্যাধির কোলে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়ার মধ্যেও কোন্ অজ্ঞেয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে মানুষের মুখে যে এমন শমনবিজয়ী হাসি আসিতে পারে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া শুধু তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত এডিসনের মৃত্যুকালীন একটী কথা—"তোমরা দেখ, যথার্থ খৃষ্টান কেমন শান্তিতে মরিতে পারে!" এই কথাটীর উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এক যায়গায় বলিয়াছেন, 'এডিসন মাত্র এই একটী কথায় মনুষ্যসমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।' কথাটী খুবই সত্য। কিন্তু হায় বঙ্কিম বাবু! যদি একবার এই মহাপুরুষের শেষ অবস্থার এই দিব্য হাসিটুকু দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে জানিয়া যাইতেন যে, কথা ত দূরের কথা, শুধু বাক্যহীন এই হাসিটী সকল জন্মান্তরীণ মোহ অন্ধকার নাশ করিয়া বিশ্বাস ও জ্ঞানের পথে মানুষকে পথ দেখাইয়া দিতে কত শক্তি ধারণ করে। এইখানে মহারাজের আর এক দিনের আর একটী কথা এখন মনে পড়িতেছে, নানা কথার মধ্যে এক যায়গায় তিনি বলিয়াছিলেন, "কি ভাবছিস্ খোকা, এই যেমন সব দেখছিস্, ঠিক এমনি আবার সব দেখা হবে নিশ্চয়—নিশ্চয়।" সেদিনকার তাঁহার সেই স্নেহময় মধুর আশ্বাসবাণী এই হাসিটীর মতই চিরদিনের মত আমার প্রাণে যে শান্তির আভাস দিয়াছে, জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যেও যেন কখন তাহা হইতে বঞ্চিত না হই, মহাপুরুষের চরণে ইহাই আমার নিত্য প্রার্থনা। পাঠকবর্গের নিকট পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, যাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই লেখা, তাঁহারই স্মৃতির সঙ্গে এই সকল মহাপুরুষের স্মৃতিও এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, স্মৃতির পট উন্মুক্ত করিবার জন্য ক্রমশঃ টান দিতে থাকিলেই বায়স্কোপের ছবির মত ইঁহাদের স্মৃতি-ছবিগুলিও একে একে আপনা হইতে আসিয়া দেখা দেয়। অতএব পাঠকগণের নিকট আমার এইটুকু নিবেদন, এ বিষয় অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও এইটুকু বুঝিয়া যেন তাঁহারা আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করেন।

পার্থ-সারথি

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ, বি-এ

ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী; ঘন মেঘে মেদুর অম্বর, তমিস্রা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে দিগন্ত আবৃত। একদিকে বজ্রবিদ্যুৎ ও গর্জ্জন প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির মধ্যে বহিঃপ্রকৃতিতে অতি দারুণ দুর্য্যোগের তাণ্ডব নৃত্য; অপরদিকে ধর্ম্মগ্লানি-পীড়িত মানবের অন্তঃপ্রকৃতিতে তেমনি দুর্য্যোগ যেন কাহার আগমনের সূচনা করিতেছিল। এমনি ক্ষণে কংসের অন্ধকার কারাকক্ষে নিগড়বদ্ধা দেবকীর নিকট যে অপূর্ব্ব শিশুটি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার লোকপাবন জীবনকথা যুগ যুগ ধরিয়া মানবের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীভগবান্ গীতামুখে বলিয়াছেন, "আমার এই (অবতাররূপে) দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর জন্ম প্রাপ্ত হন না,—আমাকেই প্রাপ্ত হন।" যিনি স্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি মায়াবলম্বনে বিশ্বরূপ, তিনি যখন আবার আত্মমায়া অবলম্বনে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মের দিব্যতত্ত্ব, মানুষীতনু আশ্রিত ব্রহ্মের লীলারহস্য,—সাধারণ জীব ত ধারণা করিতে পারে না। তথাপি মানুষের অন্তরে যে অস্ফুট পূর্ণত্ব রহিয়াছে, তাহারই প্রেরণায় সে ছুটিয়া যায়—তাঁহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা তাহাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে। কিন্তু মায়াধীশের সেই মায়ামূর্ত্তি পরিগ্রহণের পূর্ণতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে মনে হয় যেন এ রহস্য আকাশের মত সীমাহীন ও অচিন্ত্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের লীলাসমূহ স্মরণ করিতে গেলে মনে হয় যেন আমাদের মানসপটে চলচ্চিত্রের মত দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিয়া যাইতেছে। কখনও দেখি, যশোদা-দুলাল একটি দুরন্ত শিশু, যাহার বাল-চপলতায় গোকুলবাসী আকুল হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সেই দুরন্ত শিশুটিকে নহিলে কাহারও চলে না। কখনও দেখি, একটি কিশোর,—যাহার মধুর মুরলীধ্বনিতে গাভী গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে, যমুনা উজান বহিতেছে, ব্রজগোপী গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কখনও দেখি, বৃন্দাবনে এই চিরতরুণ এক কিশোরীর প্রেমের মধ্য দিয়া এমনি এক রসতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, যাহা শুধু কাম-গন্ধহীন সর্ব্বোচ্চ অধিকারীর চিরদিনের সাধনার সামগ্রী হইয়া রহিল। আবার কখনও দেখি, শক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত এক পুরুষ-প্রবর, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া যাঁহার চরণে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইতেছে, যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভারতের রাজন্যবর্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যাঁহার পাঞ্চজন্য নিনাদে কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে। তারপরে সর্ব্বশেষে দেখি, প্রভাসের মহাশ্মশানে মরণলীলার মধ্যে সমাসীন নিবাতনিষ্কম্পপ্রদীপের ন্যায় সমাধিস্থ মহাযোগী।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ জীবনলীলার মধ্যে দুইটি ভাব জনসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; একটি ভাব "গোপীজনবল্লভ", অপরটি "পার্থসারথি"। আমরা সাধারণ জীব তাঁহার প্রথমোক্ত ভাবের আলোচনার সম্পূর্ণ অনধিকারী। কারণ, কামকলুষ যাহার ভিতর কিছুমাত্রও অবশিষ্ট আছে, জগতে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া এখনও যাহার রমণীবুদ্ধি হয়, সে ত রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার

অধিকারী নয়। একটি তরুণ একটি তরুণীকে ভালবাসে; অথচ সে ভালবাসায় লালসার পূতি-গন্ধ নাই, দেহসঙ্গের কামনা নাই, কামবিকারের সংস্পর্শ নাই, কোন্ সাধারণ জীব এ প্রেমের ধারণা করিতে পারে? এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, যে এযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই মধুরতত্ত্বের সাধনায় স্বয়ং অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিলেও, এবং তাঁহার দিব্যদেহে ভাগবতোক্ত অষ্টসাত্ত্বিক বিকারযুক্ত মহাভাবের পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইলেও, তিনি সাধক-সাধারণের জন্য কখনও এই তত্ত্ব-সাধনার উপদেশ করেন নাই। আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী, স্ত্রীপুরুষে ভেদজ্ঞানরহিত ভগবান্ শুকদেব যে ভাগবতধর্ম্মের বক্তা, সেই মহাপবিত্র তত্ত্ব কাম-কলুষিত জীবের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য, রাসমণ্ডলের রহস্য যবনিকার বহির্ভাগ হইতে এই কিশোর কিশোরীকে, এই অর্দ্ধনারীশ্বরকে শুধু প্রণাম করিয়াই আমরা দূরে সরিয়া যাইব, এবং সেই পার্থসারথির শরণ গ্রহণ করিব, দোষোপহত স্বভাব মোহগ্রস্ত জীবের জন্য যাঁহার আশ্বাসবাণী অহরহঃ ধ্বনিত হইতেছে,—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

কুরুক্ষেত্রের বিশাল সমর প্রাঙ্গণ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খ-ধ্বনিতে রণস্থল প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, শ্বেতাশ্ব পরিচালিত মহারথে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। ত্রিলোকবিজয়ী মহাবীর পার্থ সহসা মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্ব্বলতা ও অবসাদে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ও বিচারবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তিনি স্বধর্ম্মনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধ কর্ত্তব্য, অথবা ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বনীয়, অথবা সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া বনগমনই শ্রেয়ঃ, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সংশয় মুহূর্ত্তে পার্থসারথির গীতাসিংহনাদে পার্থের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আত্মস্থ হইয়া স্বধর্ম্মের সন্ধান পাইলেন। মোহাচ্ছন্ন, অবসাদ-গ্রস্ত, সাময়িক ক্লৈব্যপ্রাপ্ত অর্জ্জুনের প্রতি শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চার করিয়া যে মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে জগৎ অপূর্ব্ব ধর্ম্মামৃতের সন্ধান পাইয়াছে।

গীতাগ্রন্থে সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র রূপটি ও সাধনার সকল স্তর সুনিপুণভাবে দেখান হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি যে বিষয়টি গীতাকে অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে তাহা এই মহাগ্রন্থে উপদিষ্ট অনাসক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। সাধকের জীবনে যখন বৈরাগ্যের প্রথম স্ফুরণ উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রধান সংশয়ই এই উপস্থিত হয় যে, কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ? জগতের অভ্যুদয়ের জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন, আবার অন্যদিকে কর্ম্মবন্ধন জীবের নিঃশ্রেয়স লাভের পরিপন্থী। তাহা হইলে পথ কোথায়? গীতায় এই সমস্যার যে সমাধান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই গীতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতামুখে উপদেশ দিলেন যে শুধু সাধারণ কর্ম্ম বা সাধারণ কর্ম্মসন্ন্যাস, কেহই মানুষের কল্যাণ করিতে পারে না, উভয়েই বন্ধনের হেতু, অনাসক্তিই একমাত্র উপায়। কর্ম্মত্যাগ নয়,—ফলত্যাগ, ফলে অনাসক্ত হইয়া মাত্র ভগবৎ প্রীতির জন্য, 'বিষ্ণুকাম' হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ পথ। গীতায় বারবার বলা হইয়াছে যে, জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। যিনি অনাসক্তির দ্বারা সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, লৌকিক কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা যিনি রাখেন না, কর্ম্মের ফলে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি যাঁহার নাই, তিনি কর্ম্ম-সমুদ্রের মধ্যে থাকিলেও তিনি নিত্য সন্ন্যাসী। এই নিষ্কামকর্ম্মমূলক অনাসক্তিযোগের মধ্যেই মানুষের জীবনসমস্যার প্রকৃত সমাধান হইয়াছে, কারণ

ইহার মধ্যেই একই সঙ্গে আত্মকল্যাণ ও জগৎকল্যাণ সাধনের যে পথ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার সমস্ত জীবনটি যেন এই অনাসক্তিযোগের একটি মূর্ত্ত প্রকাশ। কর্ম্ম ও অনাসক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনে একাধারে অত্যদ্ভুত কর্ম্মী ও স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর মহান্ আদর্শের সংমিশ্রণ তাঁহার গীতোক্ত শিক্ষাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সাগরোপম জীবনের উপরিভাগ শত কর্ম্মচাঞ্চল্যের তরঙ্গে আবর্ত্তিত, কিন্তু ইহার অন্তস্তলে পূর্ণ অনাসক্তির এমনি একটি প্রশান্ত গম্ভীর স্তর ছিল, যাহা সত্যই অচলপ্রতিষ্ঠ—বহির্জীবনের কর্ম্মমুখরতা যেখানে একটিও রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যেদিন অশ্বত্থামা রাত্রিকালে, তস্করের ন্যায়, তাঁহার প্রিয় পাণ্ডবকুলকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল, সেদিনের সেই শোকের অতি করুণ চিত্রও তাঁহার হৃদয়ে ম্লান ছায়াপাত করিল না। যেদিন ধ্বংসের মহাশ্মশানে তাঁহার আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমগ্র যদুকুল আত্মবিরোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহারই চক্ষুর সম্মুখে পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল, তিনি প্রতিবিধানসমর্থ হইয়াও সেই ধ্বংসলীলার শান্ত, নির্ব্বিকার দ্রষ্টামাত্র রহিলেন। "বিনাশায চ দুষ্কৃতাম্" যিনি আসিয়াছিলেন, দুষ্কৃতকারী স্বজনগণের শোচনীয় আত্মবিনাশে তাঁহার হৃদয় হইতে একটিও বেদনার দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল না। সর্ব্বোপরি, তাঁহার বৃন্দাবনলীলার অনাসক্তির যে মহান্ আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, জগতে তাহার উপমা মিলে না। বৃন্দাবনলীলার মধ্যে তাঁহাকে যখন আমরা দেখি, তখন দেখিতে পাই, তিনি যেন শ্রীরাধার প্রেমে আত্মহারা, তাঁহার শ্রীরাধা ব্যতীত যেন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, ব্রজেশ্বরীর সামান্য তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু যেদিন বৃন্দাবনের কৈশোরলীলা শেষ করিবার দিন আসিল, যেদিন মথুরার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল, সেদিন তিনি তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত স্নেহমমতার নিগড়, এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। যাহার কুঞ্জদ্বারে প্রেমভিক্ষা করিয়া কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছিল, ভূলুণ্ঠিতা সেই প্রেমময়ীর আর্ত্তরোদন তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না; এমনকি স্মৃতির কোন বেদনাই তাঁহাকে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে আর একবারও বৃন্দাবনের কুঞ্জদ্বারে ফিরাইয়া আনিল না।

তাঁহার এই শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার স্থূলদেহের লীলা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, কেমন করিয়া মানবহৃদয়ে তাঁহার লীলা শাশ্বত হইয়া আছে। তাঁহার আবির্ভাবে দেবকীর শৃঙ্খল টুটিয়াছিল; এমনি করিয়া জীবের হৃদয়ে তাঁহার পাদস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে জীবত্বের কঠিন বন্ধন খসিয়া পড়ে। তাঁহার মুরলীর মধুর আহ্বানে জীবের প্রবৃত্তি-যমুনা নিবৃত্তির উজান পথে বহিয়া যায়। অন্তর ও বাহিরের শত বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে জীবের যে মহাঅভিযান, সে অভিযানে চিরসারথি তিনিই; জীবনের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথ তাঁহারই রথচক্রে মুখরিত। মোহাচ্ছন্ন জীবের যখন শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারই পাঞ্চজন্য-নিনাদে তাহার মোহনিদ্রা টুটিয়া যায়, ক্লীবতা অন্তর্হিত হয়;—সে তখন প্রবুদ্ধ হইয়া দেখে যে, তাহার কোন ক্ষুদ্রতা নাই, কোন দীনতা নাই, কোন অবসাদ নাই,—সে ভূমার অধিকারী, সে অমৃতের পুত্র। তাহার নিকট তখন আনন্দলোকের দ্বার খুলিয়া যায়,—সে তখন দেখিতে পায় যে, আনন্দ হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছিল, আনন্দের মধ্যেই সে জীবিত রহিয়াছে, এবং আনন্দ-স্বরূপে বিলীন হইয়াই তাহার জীবত্ব একদিন চরমসার্থকতা ও চিরসমাপ্তি লাভ করিবে।

জয় আনন্দ ব্রহ্ম! জয় সত্য, শিব, সুন্দর! সর্ব্বজীবের জীবন স্বরূপ যে ব্রহ্মানন্দ হইতে আনন্দ-কণাসমূহ অহরহ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার আনন্দ-ঘন মূর্ত্তির চরণতলে আজ প্রণাম করিয়া বলি,—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিবানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

বেলুড়মঠ, নবেম্বর, ১৯২০]

আজ পূর্ণিমা তিথি। শান্তকোলাহল জগতের উপর সন্ধ্যা ধীর পদবিক্ষেপে নামিয়া আসিতেছে। দূরস্থ দেবালয়সমূহে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠেও মঙ্গলশঙ্খ আরতির আহ্বান জাগাইয়া দিয়াছে। সাধুভক্তবৃন্দ ভক্তিনম্রচিত্তে ঠাকুরঘরে যাইতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজও নিত্যকার মতন ঠাকুরঘরে গমন করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তিনি ঘরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এক-খানিমৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়াছেন। ধ্যানস্তিমিত নেত্র। আরতি আরম্ভ হইল। আরতির বাজনা প্রশান্ত গম্ভীর ধ্বনিতে মনকে একাগ্র করিয়া তুলিয়াছে—বিশেষ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সৌম্যমূর্ত্তি প্রত্যেকের চিত্তকে অধিকতর অন্তর্মুখ করিতেছে। ক্রমে আরতি শেষ হইল। সমবেত সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশস্তিগীতি আরম্ভ করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজও সকলের সহিত সুর মিলাইয়া সুললিত কণ্ঠে তন্ময় ভাবে আরাত্রিক গান গাহিলেন। গান শেষ হইয়া গেল। একে একে অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে ধ্যানাদিতে চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন, মুখমণ্ডলে সমাধির প্রশান্তি ফুটিয়া উঠিল। কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া গেল।

প্রায় ৮॥ টার সময় মহাপুরুষজী নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিতেছেন। অস্ফুটস্বরে গানে প্রাণের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছেন, কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও প্রেমপূর্ণ। পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন সাধু ও ভক্ত দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী নিজ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলে সকলে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঘর একপ্রকার নিস্তব্ধ, কেহই যেন কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছেন না। আস্তে আস্তে সামান্য দু চার কথা হইতেছে। ক্রমে সাধনভজন সম্বন্ধে কথা উঠিল।

মহাপুরুষ মহারাজ তন্ময়ভাবে বলিলেন, "রাত্রিই সাধনের পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। ধ্যান জপ নিত্যই খুব নিষ্ঠার সহিত করতে হয়, তাতে মন শুদ্ধ হয়। কিছুদিন নিষ্ঠার সহিত ধ্যান জপ করলে হৃদয়ে নিরন্তর একটা ভগবদ্‌ভাব জাগরূক থাকে, এবং একটা আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। ধ্যান করবার পরেই আসন ছেড়ে চলে যেতে নেই, তাতে ভাব দৃঢ় হয় না, বরং ধ্যানভঙ্গের পরে নিজ আসনে বসেই অন্ততঃ খানিকক্ষণ ধ্যানের বিষয় ভাবতে হয়। পরে ধ্যানের অনুকূল খুব ভাল ভাল স্তবাদি পাঠ করতে হয়। তাতে ধ্যানের ভাব ও আনন্দ আরও ঘনীভূত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আসন ত্যাগের পরও খানিকক্ষণ কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলে আপনমনে স্মরণ মনন করতে হয়। তাতে অনুভব হয়, যেন সেই ধ্যানের নেশা লেগে রয়েছে। ওতে প্রাণে খুব আনন্দও এনে দেয় এবং একটা উচ্চভাব আশ্রয় করে থাক্‌বার খুব সহায়তা করে।"

জনৈক সন্ন্যাসী। মহারাজ, আমাদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে তপস্যাদির জন্য বাইরে যাওয়া তো দরকার? এবং তীর্থাদি পর্য্যটন বা

পরিব্রাজক হয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, এসবও তো সাধুজীবনের পক্ষে অনুকূল ?

মহারাজ। বাবা, সাধারণ কথায় বলে a rolling stone gathers no moss (যে পাথর সর্ব্বদা ঘুরছে তাতে শেওলা জমে না)। কেবল ঘুরে বেড়ালেই কি ধর্ম্মলাভ হয়, না ভগবান লাভ হয়? তবে অহংকার অভিমান নষ্ট করবার জন্য বা শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা আনবার জন্য কখনও কখনও মাধুকরী করা বা নিঃসম্বল অবস্থায় নির্জ্জনবাস করা বা সামান্য ঘুরে বেড়ান ভাল। তাতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ঐসব করার কোন প্রয়োজন নেই। লাটু মহারাজ মাঝে মাঝে বলতেন, 'কোথায় ঘুরে বেড়াবি? শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান হোস্ তো একজায়গায় বসে থাক্।' ঠিক কথা। যার হেথায় আছে তার সেথায়ও আছে। আর ঘুরে বেড়াবে কোথায়, কেনই বা? তিনি যে ভেতরেই রয়েছেন। তাই তো ঠাকুর প্রায় নিত্যই এ গানটী গাইতেন—

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেওনাক কার ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন সেই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে ঐ চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

এই বলিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বারংবার মধুর কণ্ঠে এই গানটী গাহিলেন, এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "গানের শেষটাতেই বিশেষ করে তত্ত্বোপদেশ দেওয়া রয়েছে—'কত মণি পড়ে আছে ঐ চিন্তামণির নাচ দুয়ারে'। তাঁর দুয়ারে সবই পড়ে আছে—ভুক্তি, মুক্তি, এমনকি ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সবই। বাবা, তবে খুঁজতে হবে, ব্যাকুল হয়ে চাইতে হবে। এই খোঁজাই হল সাধন ভজন। আন্তরিক ভাবে তাঁকে চাইলেই তিনি কৃপা করেন। আর তিনি কৃপা করে একটু দোর খুলে দিলেই, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা করে দিলেই দেখতে পাবে যে ভেতরেই সব রয়েছে। তবে তাঁর দয়ায় কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হবে না।"

জনৈক ভক্ত। হাঁ, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাই বলতেন যে মূলাধার হতে সুষুম্নার পথ দিয়ে যখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ঊর্দ্ধে ওঠেন তখনই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার খুলে যায়।

মহারাজ। হাঁ, ঠিক, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা না হলে কিছুই হবার জো নেই। তাই তো ঠাকুর মার কাছে অত কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন, 'মা জাগ, মা জাগ,—জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী।'

প্রথম পদটী আবৃত্তি করিয়াই মহাপুরুষজী নিজে গানটী গাহিতে লাগিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি, তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী
তুমি ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিনী
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভূ-শিব-বেষ্টিনী।
গচ্ছ সুসুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী।
শিবসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী॥

আহা! সে যে কি তন্ময়তা তাহা প্রকাশ করিবার নহে। ক্রমে ক্রমে তিনবার গানটী গাহিয়া মহাপুরুষজী চুপ হইয়া গেলেন। শান্ত মাধুর্য্যে তাঁহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত। সমস্ত ঘরটীতে যেন গানের ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পরে মহাপুরুষজী খুব করুণ স্বরে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মা মা, জগজ্জননী।" সে যেন মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দন। ক্রমে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "আহা! ঠাকুরের মুখে কতদিন যে এ গানটী শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। কোন কোন দিন চামর নিয়ে মাকে ব্যজন করতে করতে এই

গান ধরতেন। কি তন্ময় হয়েই না তিনি এই গানটী গাইতেন! আমরা সব স্তম্ভিত হয়ে যেতুম। তাঁর বাহ্যিক কোন হুঁস থাকত না। আস্তে আস্তে চামর দুলছে, আর মাতোয়ারা হয়ে গান গাইছেন। কি মধুর কণ্ঠই না তাঁর ছিল! সে যে কি ভাব তা বলে বোঝাবার নয়। সকলের প্রাণ একেবারে গলে যেত। এমন আকুল আহ্বানে কি মা না জেগে থাকতে পারেন? আর সে মা-ই হলেন ব্রহ্মকুণ্ডলিনী। স্বামিজী বলতেন, 'জানিস্, এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহা-কুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে। individual (ব্যক্তিগত) কুণ্ডলিনী তো জাগ্রতা হবেই, তা আর আশ্চর্য্য কি?' তাই সমগ্র জগতে এক মহা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আর সেই আদ্যাশক্তিই জগতের কল্যাণের জন্ম ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে লীলা করছেন। এবার আর ভাবনা কি?"*

* শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

আনুমানিক ১৮৬৪ সালের এক পুণ্য দিনে কলিকাতা মহানগরীর আহিরীটোলা অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ঘটক বংশে গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দের) জন্ম হয়। সাধারণ দশজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে নবজাত শিশু যতটুকু আনন্দ অভ্যর্থনার মধ্যদিয়া পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন করে, গঙ্গাধর মহারাজ তদপেক্ষা অধিক কিছু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। উত্তরকালে তাঁহার দেহমন অবলম্বন করিয়া যে অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল, সেদিন তাহার কোন আভাস যে কেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন কথাও আমরা জ্ঞাত নহি। আমরা শুনিয়াছি, সাধারণ নিয়মানুসারেই দিনে দিনে বালক বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সাধারণ দশজনেরই মত হাসি, খেলা ও আনন্দের মধ্যদিয়া সে তাহার প্রথম শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিল। হয়ত অন্তর্নিহিত সুপ্তপ্রেরণা এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সচকিত করিত, হয়ত রৌদ্রতপ্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে অনন্ত প্রসারিত দিক্ চক্ররেখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালকের মন অকারণে কখনো কখনো এ জগতের সীমাবন্ধন বিস্মৃত হইত; এ সংসারকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে হইত। কিংবা প্রশান্ত রজনীর ধ্যান গম্ভীর বায়ুমণ্ডলী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অতিক্রম করিয়া দৈবাৎ কোন দেবশিশু ঘুমন্ত বালকের কানের কাছে হয়ত অতীন্দ্রিয়রাজ্যের আহ্বানধ্বনি পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত—বালক তাহাতে অকস্মাৎ ঘুম ছাড়িয়া উঠিয়া বসিত। অথবা হয়ত এসবের কিছুই হইত না—এসব আমাদেরই নিরর্থক কষ্টকল্পনা! বস্তুতঃ, সাধারণের মাপকাঠিতে অসাধারণকে ধরিতে বুঝিতে যাওয়া অনেক সময়ই নিরাপদ হয় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পরিবারের অনুষ্ঠানিক প্রভাব এবং নিজের যুগ-যুগ অর্জ্জিত দৃঢ় সংস্কার বালক গঙ্গাধরকে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, পূজা, জপ প্রভৃতিতে বিশেষভাবে অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। নিষ্পাপ সরলতা

শিশুমাত্রেরই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা দেখিতে পাই সত্য কিন্তু গঙ্গাধর ছিলেন 'মূর্ত্তিমান সরলতা' ও 'মূর্ত্তিমান শৈশব'। আর সে শৈশব-সরলতার অনুপম মাধুর্য্য চিরকাল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান ভূষণ ছিল। জীবনের সকল কর্ম্ম ও সকল চিন্তার মধ্যদিয়া সে সহজ সারল্যের অপূর্ব্ব প্রকাশ চিরদিন তাঁহাকে প্রত্যেকেরই নিকট বিশেষভাবে প্রিয় ও শ্রদ্ধার্হ করিয়া রাখিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমকালে দৈবনির্দ্দেশে বালক গঙ্গাধর বাগবাজারের বিখ্যাত এটর্নি ৺দীননাথ বসু মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিনাথ (যিনি পরবর্ত্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন) সে দিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সে প্রথম দর্শনের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ এই অপাপবিদ্ধ বালককে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজ স্বাভাবিক স্নেহ-স্পর্শ ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে আপ্লুত করিয়াছিলেন কিনা—এত দীর্ঘ কাল পরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার আমাদের কোন উপায় নাই। কেবল পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলী সেদিনের দর্শন—পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক অনুপ্রাস প্রীতি 'গদাধর' ও 'গঙ্গাধর'—এই দুইটি নামের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজিয়া বাহির করিতেও যেন আমাদের মধ্যে একটু ঔৎসুক্য জাগাইয়া দেয়।

সে যাহা হউক, লোকোত্তর গুরু এবং তাঁহার চিহ্নিত এই সন্তানটির মধ্যে প্রথম মিলন এইরূপে কোন মন্দির দেউলে না ঘটিয়া এক সাধারণ ভক্ত গৃহস্থের বাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এই দর্শনের প্রায় দুইবৎসর পরে একদা এক পশ্চিমদেশাগত সন্ন্যাসীর সহিত গঙ্গাধর অত্যন্ত গোপনে গৃহত্যাগ করেন। অবশ্য সে অল্পদিনের জন্য মাত্র। বাঙ্গলার জলবায়ু ও পিতামাতার স্নেহাকর্ষণ অনতিকালমধ্যেই আবার তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনে। এবং এই সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার যাতায়াত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দিনে দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক স্নেহ ভালবাসা এবং তাঁহার অপূর্ব্ব, ত্যাগপূতঃ, সমাধিসিদ্ধ জীবন—এই সরল বালকের হৃদয়টিকে অধিকার করিয়া লয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই উপদেশানুসারে তিনি এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হন। ঠাকুর বলিতেন, "কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরাটি বসাতে হয়—বাড়ীর গিন্নী সে সংবাদ রাখে।" তাই দেখা যায়, বালক ভক্তদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার ভাবের মিল আছে—তাহা সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের মধ্যে পরিচয় ও মিলন সাধন করাইয়া দিতে তৎপর থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়া গঙ্গাধর মহারাজ জীবনে এক পরম সম্পদ লাভ হইল বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনের আরাধ্য দেবতা ও ইষ্টরূপে গ্রহণ করিলেও—কর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার দুর্গম ক্ষুরধার পথে স্বামিজীই গঙ্গাধর মহারাজের যথার্থ পথপ্রদর্শক ও সহায়ক ছিলেন। একাধারে অনুগত শিষ্য, সেবক, বন্ধু ও ভ্রাতারূপে স্বামিজীর পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিয়া চলাই তাঁহার জীবনের আনন্দ এবং ব্রত ছিল।

পরিচয়-হীন, দীন পরিব্রাজক বেশে স্বামিজী যখন ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যখন গুরুভ্রাতাদিগের নিকট হইতে পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ভারতের বিশাল জনারণ্য মধ্যে তিনি নিজকে এককালে বিলুপ্ত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখনও বহুকাল পর্য্যন্ত গঙ্গাধর মহারাজকে তিনি সঙ্গ ছাড়া করিতে

পারেন নাই। স্বামিজী নিজেই বলিতেন, "সবাইকে কাছছাড়া করতে পেরেছি কেবল গঙ্গাধরকে কাছ ছাড়া করতে পাচ্ছি না।" নিজে ভিক্ষা করিয়া স্বামিজীকে আহার করান, লাইব্রেরী হইতে বই বহিয়া আনিয়া স্বামিজীর পাঠের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং যথাসম্ভব তাঁহার একটু সেবাযত্ন করাই গঙ্গাধর মহারাজের এই সময়কার জীবনের চরম আনন্দ ও পরম তৃপ্তির ব্যাপার ছিল। বোধ করি, তাঁহার বালক বয়সের সজাগ ও গ্রহণোৎসুক মনের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেদিন তাঁহার দুর্লভ স্নেহময় মূর্তিটি লইয়া প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেদিন হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে নিজের অজ্ঞাতসারেই গঙ্গাধর মহারাজ যেমন সে মহাপুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও সেই সিংহাসনেরই একাংশে তিনি পরম আগ্রহে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুগ্মজীবন একইরূপ নিষ্ঠায় অন্তরে ধারণ করিয়া তাঁহাদের উভয়েরই বৈশিষ্ট্যধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে এই পুরুষপ্রবরের আজীবন প্রয়াস ছিল। একদিকে স্বামিজী প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের আদর্শে গণদেবতার পূজায় সর্ব্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করিয়া ইহজীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত যেমন সেই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি নিযুক্ত ছিলেন—অন্যদিকে আবার তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকিবার মানসে বাংলার এক অখ্যাত নিভৃত পল্লীতেই তিনি তাঁহার স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম জীবনের নির্জ্জন নীরবতা ও শান্তঃ আবহাওয়া একদিকে যেমন তাঁহার সমগ্র চেতনাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিত—পিতৃমাতৃহীন গৃহহারা দরিদ্র বালকদের সহিত সহানুভূতিতে এক হইয়া অবস্থান করিতেও তেমনি তাঁহার দরদী প্রাণ নিয়ত ব্যাকুল হইয়া থাকিত। আমরা জানি, সারগাছির পল্লী আশ্রম ত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করিবার জন্য ইদানীং তাঁহাকে অনেকেই অনুরোধ করিতেন কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। সারগাছি অনাথ আশ্রমের অসহায় বালকগুলির সহিত তাঁহার যে গভীর স্নেহসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল সেটি ছিন্ন করিয়া চলিয়া আসা বোধকরি তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। ফলকথা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনধারা গঙ্গাধর মহারাজের দেহ মনাবলম্বনে সত্যই একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামঞ্জস্যলাভ করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাতের কিছুকাল পরেই গঙ্গাধর মহারাজ বিদ্যালয়ের পাঠ এককালে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতসঙ্গ এবং আশীর্ব্বাদ তাঁহাকে সংসারের সব কিছুরই উপর উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। আর সেই ঔদাসীন্যের উপর নরেন্দ্রনাথের তেজোদীপ্ত বাণী অব্যর্থভাবে আঘাত করিয়া গঙ্গাধর মহারাজের মধ্যে নিত্য নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত এবং তাঁহাকে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ মহাব্রত গ্রহণে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিল।

কিশোর বয়সের উৎসাহ আনন্দের সুখময় কতকগুলি দিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর কাশীপুর বাগান বাটীতে বড় দুঃখের দিন সমাগত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র প্রমুখ যুবক ও কিশোর ভক্তদিগকে একটা মহান্ জীবনের আদর্শ দেখাইয়া এবং সে জীবন লাভের জন্য দেহ, মন ও প্রাণের সর্ব্বশক্তি অকুতোভয়ে নিয়োগ করিতে একটা অকৃত্রিম প্রেরণা প্রদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সহসা লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া গেলেন। তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে আশ্রয়হীন ও সহায়-সম্পদহীন এই সব যুবক দল কি ভাবে প্রথমে বরাহনগরে ভূতের বাড়ীতে এবং

পরে আলমবাজোরে সাধনার গগনস্পর্শী হোমানল-শিখা প্রজ্বলিত করিয়া নিজেদের সব কিছু তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কি ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহার, অর্দ্ধাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়া—জ্ঞান, শান্তি ও মহদ্ভাব আনন্দের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে পুঁথিগত ও সম্প্রদায়গত অনুদারতার ও সঙ্কীর্ণতার কারাপ্রাচীর হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্ব-ভৌমিক জীবনালোকে তাহাকে নূতন রূপ ও নূতন জীবনীশক্তি প্রদানে বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজ তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা উহার পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। আমরা এস্থানে শুধু এইটুকুই বলিতে চাহি যে, যেদিন নরেন্দ্রনাথ রাখাল-চন্দ্র প্রমুখ দুর্দ্দমসাহসসম্পন্ন যুবকদল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের হিতোপদেশ তুচ্ছ করিয়া এক সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্যরাজ্যের অলৌকিক রত্নরাজী আহরণ করিবার জন্য একমাত্র শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনস্মৃতিরূপ অক্ষয়পেটিকা বুকে ধরিয়া সাধনসমুদ্রের তলদেশ অভিমুখে ডুব দিয়াছিলেন, যেদিন বরাহনগরের ভূতের বাটীতে ইঁহাদের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ত্যাগ তপস্যার যজ্ঞাগ্নিতে ভবিষ্যৎ ভারতের জাগরণমন্ত্র সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল, সেদিন কিশোরবয়স্ক সবল গঙ্গাধরও ইঁহাদের সহিত ঐকান্তিক নিষ্ঠায় যোগদান করিয়া সে নবযুগ-উদ্বোধন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত ছিলেন। অহোরাত্র ধ্যানজপ, শাস্ত্রালোচনা—ভজন, কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে স্বামিজীপ্রমুখ সকলের দিন তখন যে কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইত, গঙ্গাধর মহারাজেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি—এই সময়ে একবার কিছুদিন মঠে অবিরত বৌদ্ধশাস্ত্রাদির আলোচনা হইতে থাকে। স্বামিজীর জ্বলন্ত ভাষায় ঐসব আলোচনা শুনিতে শুনিতে গঙ্গাধর মহারাজের উৎসুক মনে তিব্বতে যাইবার বাসনা প্রবল হয় এবং একদিন নগ্নপদে, পরিব্রাজকবেশে যুবকসন্ন্যাসী গঙ্গাধর সেই সুন্দর অজানা লামার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। তখনো তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কিশোরবয়সে এক রাজা রামমোহন রায়ই বোধ হয় তিব্বত পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন।* তিব্বতীদের দেশে প্রায় তিন বৎসরকাল গঙ্গাধর মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষা, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার প্রভৃতির সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হইতে তিনি তখন বিশেষ যত্ন করিয়া-ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার এই তিনবৎসরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা—"তিব্বতে তিনবৎসর" শীর্ষক ধারাবাহিকপ্রবন্ধে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষার মাধুর্য্যে ও শুচিতায়, ঘটনার বৈচিত্র্যে এবং ভূয়োদর্শনের প্রকাশে—ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠক-মাত্রকেই তখন আকর্ষণ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ প্রবন্ধগুলি অসমাপ্ত রাখিয়াই লেখক লেখনী ত্যাগ করেন এবং যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল সেগুলিও আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

দীর্ঘ তিনবৎসরকাল তিব্বত ও তৎসন্নিকট অঞ্চল সমূহে অতিবাহিত করিয়া সহসা একদিন গঙ্গাধর মহারাজ বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন মঠে থাকিয়া আবার পরিব্রাজকবেশে বাহির হইয়া পড়েন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের অনেক সময়েই গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

* রাজা রামমোহন বিংশতিবর্ষ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিব্বতভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়াছি। কিন্তু আধুনিক অনেক সমালোচক এবিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। রাজা রামমোহন কোন দিনই তিব্বত গমন করেন নাই—এইরূপ মত কোন কোন বিশিষ্ট লেখকের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজপুতানার মরুপ্রান্তর, হিমাচলের দুর্গম প্রদেশ, বিন্ধ্যারণ্যের জনশূন্যবর্ত্ম, গুজরাট, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অংশে পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া গঙ্গাধর মহারাজ—পূর্ব্বাপর ভারতীয় সাধকমণ্ডলীর প্রদর্শিত পথে এই বিরাট দেশ ও তাহার সংস্কৃতি-ধারার সহিত পরিচিত হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সব ভ্রমণকালের প্রত্যেকটি দিন একদিকে যেমন অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দানে ইঁহাদের প্রত্যেকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি নিদারুণ দুঃখকষ্টের অসহ্য উত্তাপ প্রদান করিয়া জগতের সর্ব্ববিধ ঘাতপ্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিবার কঠোর শিক্ষাও প্রদান করিয়াছিল। গুজরাট অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে একবার জনৈক স্ত্রীলোক গঙ্গাধর মহারাজকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দৈবানুগ্রহে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। ঐ প্রদেশেরই মরুপ্রান্তরে আর একবার মন্বন্তর-পীড়িত এক গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দস্যুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। এক বৃক্ষের সহিত হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে সেবার সমস্তদিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। পরে সন্ধ্যায় দস্যুসর্দার দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।

খেতড়িতেও তিনি অনেককাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজপুতনার 'গোল' বা 'গোলাম' শ্রেণীর দাস ও পতিত লোকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পরিব্রাজক জীবনেই তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু বংশানুক্রমিক সুবিধাভোগী, আভিজাত্যপুষ্ট রাজন্যকুলের বিরোধিতায় তাঁহার সে উদ্যম ফলবান হয় নাই। উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলেও দীন দুঃখীদের পতিত ও দুঃস্থ অবস্থা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ সমাজের চির-উপেক্ষিত যাহারা তাহাদের জন্য অনুপম সহানুভূতিবোধ তাঁহার জীবনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরই ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। তাই বোধকরি স্বামিজীর সেবাধর্ম্মের প্রথম ঋত্বিক হইতে পারা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল এবং মুর্শিদাবাদের বিজন পল্লীতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নিরাশ্রয় বালকের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য জীবনের সমগ্রশক্তি কেন্দ্রীভূত করা তাঁহার নিকট পরম শ্রেয়স্কর বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা পরিব্রাজক জীবনের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান কাহারও বেলায়ই যেমন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, গঙ্গাধর মহারাজের বেলায়ও ঠিক তেমনি হইয়াছে। ক্বচিৎ কখনো কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ পরস্পর সম্বন্ধে ২।১টি ঘটনা যাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন তাহাই শুধু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজের মধ্যে পরিব্রাজক জীবনের আকর্ষণ যে শেষ বয়স পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিত তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবকদল যখন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছে তখন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বৃদ্ধ। সে বৃদ্ধাবস্থায় অনেক সময় সমীপাগত যুবকদিগকে ভারতের বিশালক্ষেত্রে পরিব্রাজকবেশে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন "পরিব্রাজকবেশে দেশে দেশে, পাহাড়ে পাহাড়ে যখন ঘুরে বেড়াতুম তখন মনের কি অপূর্ব্ব অবস্থাই না ছিল। সতেজ, অনাসক্ত মন নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা লাভে তন্ময় হয়ে থাকত। শরীরের দুঃখকষ্ট গ্রাহ্যের ভিতরই আসত না। এখন তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি তবু সেই অতীত জীবনের জন্য মনটা চঞ্চল হয়। আমার ইচ্ছা হয়, তোমরা সব বেরিয়ে পড়। একবার যদি ভারতবর্ষের সবটা ঘুরে দেখে আস্‌তে পার তবে বহু বৎসরের বহু পুঁথিপুস্তক পাঠের চাইতে বেশী জ্ঞান লাভ হবে। বয়স বেশী হয়ে গেলে রক্তের তেজ কমে যায়, তখন আর দেশ ভ্রমণ সম্ভব

হয় না। সুতবাং শক্তি থাকতে থাকতে এই সময় ঘুবে এস গে।”

গঙ্গাধর মহাবাজের জীবন সহজ, সবল ও একান্তভাবে অনাড়ম্বর ছিল এবং চিবদিন একই-ভাবে শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। শান্তি ও আনন্দ তাঁহাব দেহমন হইতে নিত্য বিচ্ছুবিত হইত। তাঁহার পুণ্য-দর্শন লাভ যাঁহাদেব ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহাবাই একথা প্রাণে প্রাণে অনুভব কবিয়াছে যে, অন্তবেব প্রগাঢ় শান্তিব অক্ষয় উৎস হইতে উৎসাবিত আনন্দহিল্লোল স্বভাবগত সবল পথে প্রবাহিত হইয়া কেবল তাঁহাকেই যে নিয়ত নিমজ্জিত কবিয়া বাখিত তাহা নহে, পবন্ত তাঁহাব প্রভাব চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রত্যেককেই প্লাবিত কবিয়া ফেলিত। উন্মুক্ত প্রান্তব-মধ্যদিয়া প্রবহমান-জলধাবাব অবাবিত বক্ষ হইতে নবোদিত সূর্য্যেব স্বর্ণকিবণ সহস্রধাবে প্রতি-ফলিত হইয়া যেমন ঐ জলবাশিব একান্ত স্বচ্ছতাব সাক্ষ্য প্রদান কবে, বাহ্য-ঘটনানিচয়েব সংঘাতে হাস্যোদ্ভাসিত এই মহাপুরুষেব বদনমণ্ডলও ঠিক তেমনি তাঁহাব বালসুলভ সবল অন্তঃকবণেব অনুপম স্নিগ্ধতা ও নির্ম্মলতাবই পবিচয় প্রদান কবিত। জীবনেব মধ্যাহ্নে যদৃচ্ছা ভ্রমণ কবিতে কবিতে মুর্শিদাবাদ জেলাব সাবগাছি অঞ্চলে উপনীত হইয়া তথাকাব দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নবনাবীব দুঃখে বিচলিত হইয়া সেই যে সেখানে তিনি সেবাকর্ম্মে আত্মনিয়োগ কবিলেন, জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সেই ব্রতই উদ্‌যাপিত কবিযা গেলেন। লোকচক্ষুব অন্তবালে শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে অগ্রসব হওয়াই তাঁহাব জীবনেব লক্ষ্য ছিল এবং পরের চোখেব জল মুছাইতে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তৎপব থাকাই সর্ব্বকর্ম্ম প্রচেষ্টাব মূলনীতি রূপে তিনি গ্রহণ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক কর্ম্মোদ্যমকে স্বামী বিবেকানন্দ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ আমেরিকা হইতে লিখিত স্বামিজীব পত্রাবলীর *অনেকগুলিই গঙ্গাধব মহাবাজের উদ্দেশ্যে লিখিত* হইয়াছিল।

গুরুভ্রাতাদিগের প্রত্যেকেব জন্য গঙ্গাধব মহাবাজেব ঐকান্তিক ভালবাসা বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিবাব বিষয় ছিল। পূজনীয় স্বামী সাবদানন্দ মহাবাজের যখন দেহত্যাগ হয়, তখনকাব সেই বিষাদময় দিনে আত্মভোলা এই সন্ন্যাসীব একান্ত বিহ্বলভাব ও সকরুণ চাহনি যে-ই প্রত্যক্ষ কবিয়াছে তাহাবই স্মৃতিব পটে উহা উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়া বহিয়াছে। ধর্ম্মজগতেব ইতিবৃত্তে একই গুরুর বিভিন্ন শিষ্যদেব মধ্যে সম্প্রদায়গত বিবোধেব দৃষ্টান্ত বিবল নহে, কিন্তু সে পাপেব কৃষ্ণচ্ছায়া গঙ্গাধব মহাবাজকে কখনো স্পর্শ কবিতে পাবে নাই। নিজেব অন্তর্নিহিত আনন্দেব অনুপম স্নিগ্ধতাবই তিনি সর্ব্বদা ভবপুব থাকিতেন, অন্যেব দোষ ত্রুটি দেখিবাব মত অবসবই তাঁহাব ঘটিযা উঠিত না। বস্তুতঃ, সবলতাব মূর্ত্তবিগ্রহ এই মহাপুরুষ কোন বিষয়ে নিজেকে অন্য কাহাবও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কবিতে অক্ষম ছিলেন। তাই, অন্যকে হেয়-জ্ঞানে তুচ্ছ কবা যেমন তাঁহাব পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল, তেমনি গুরুগিবি কবা কিংবা আচার্য্যপদ গ্রহণ কবাও তাঁহাব স্বভাব ও ইচ্ছাব বিরুদ্ধ ব্যাপাব ছিল। শ্রীবামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে যখন তিনি সমাসীন ছিলেন, সেই সময় অনেক নব-নাবী তাঁহাব নিকট আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদি গ্রহণ কবিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদেব বিশ্বাস, শুধু অবস্থাব চাপে পড়িযাই গঙ্গাধর মহারাজ ঐরূপ দীক্ষাদি প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, নতুবা ব্যক্তিগত ভাবে দীক্ষাদানে সর্ব্বদাই তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন।

দিনে দিনে জগতের চিন্তাধাবা পরিবর্ত্তনেব বিশাল খাদে দুর্জ্জয় গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের এক প্রান্ত হইতে প্রাচীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির উপর দিয়া নিত্য নূতন

চিন্তার প্লাবন চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে আজ বিংশ শতাব্দীর বহু জাতি তাহাদের চরম সিদ্ধান্ত স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে। ভারতবর্ষেও যে সে চিন্তার ঢেউ আসিয়া আঘাত করে নাই এমন নহে কিন্তু তথাপি ভারত ভারতী আজ পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ধর্মকেই তাহার জাতীয় জীবনের শাশ্বত ভিত্তি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়া চলিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। বিপরীত মত মস্তকোত্তলন করিতেছে সত্য কিন্তু এখনো উহা তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। অনাগত ভাবীকালে এই সব চিন্তাধারার কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে এবং ভারতবর্ষই বা কি ভাবে নিজের বহুকালের দৃঢবদ্ধ ধারণার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করিয়া নূতন যুগের যাত্রাপথে পা বাড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সুকঠিন। আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে এস্থলে ইচ্ছুকও নহি, শুধু এইটুকুই উপসংহারে বলিয়া রাখি যে, যুগের হাওয়া যে পথেই প্রবাহিত হউক না কেন, ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ও সংজ্ঞা যেভাবেই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান যাঁহারা, যাঁহারা "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" ব্যক্তিগত সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অক্লেশে বলি দিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জাতি চিরদিনই প্রদান করিবে, মত বা পথের অনৈক্য তাহাতে কখনো বাধা জন্মাইবে না। কারণ, পরার্থে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ মনীষিগণের জীবনালোকেই জাতি অন্ধতমোময় ভবিষ্যতের মধ্য হইতে নিজের অগ্রগতির পথ চিরদিন খুঁজিয়া বাহির করে এবং ইঁহাদের অস্তিত্বেই বিরুদ্ধ আসুরী শক্তি ধ্বংস করিবার মহাবজ্র সে নির্ম্মাণ করিয়া লয়।

পর-নিন্দা

শ্রীসাহাজী

পর-নিন্দা, আত্ম-হত্যা ভিন্ন কভু নয়,
পর-নিন্দা সম পাপ কোথাও না হয়।
চাই অর্থ শক্তি-ব্যয়, ছন্দানুবর্ত্তন,
বনিতা-বিলাস তবে সম্ভবে তখন!
বিনা মূল্যে হেন মজা কোথাও কি হয়?—
পর-নিন্দা-আলাপনে নাহি কোনো ব্যয়!
হেন সুখ রুচিকর জেনো, নাহি আর।
কী ছার কাসুন্দি কুল তেঁতুল-আচার।
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বসি অন্ধ নিরালায়,
রাজা উজিরের মাথা হাতে কাটা যায়।
আত্মঘাতী নাহি পর-নিন্দক যেমন,
পর-নিন্দা সে কারণ ত্যজে বুধগণ।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা ॥৩৫

অন্বয়—*বিমর্ষাত্মা সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্* মনোময়ঃ (স্যাৎ), নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ তৈঃ এব সাকম্ বিজ্ঞানময়ঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—সংশয়াত্মক অন্তঃকরণই সাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয় এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণই অর্থাৎ বুদ্ধিই উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়।

টীকা—"বিমর্ষাত্মা"—সংশয়স্বভাব এবং পঞ্চ-ভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য্যস্বরূপ, যে মনের কথা বলা হইয়াছে, সেই মন, "সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈ সাকম্" —এক এক ভূতের সত্ত্বগুণরূপ অংশের কার্য্য স্বরূপ যে শ্রোত্রাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, "মনোময়ঃ"—মনোময় কোশ হয়। "নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ"—নিশ্চয়স্বভাব এবং সেই পঞ্চ ভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য্যস্বরূপ, যে বুদ্ধি তাহা, "তৈঃ এব সাকম্"—পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া "বিজ্ঞানময়ঃ (স্যাৎ)"—বিজ্ঞানময় কোশ হয়।৩৫

কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।
তত্তৎকোশৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥

অন্বয়—কারণে সত্ত্বম্ মোদাদিবৃত্তিভিঃ আনন্দময়ঃ (স্যাৎ)। আত্মা তু তত্তৎকোশৈঃ তাদাত্ম্যাৎ তত্তন্ময়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কারণশরীরে যে (মলিন) সত্ত্বগুণ আছে, তাহা 'মোদ' প্রভৃতি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশ হয়। সেই সেই কোশের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃই আত্মা সেই সেই কোশময় হইয়া যান।

* টীকা—"কারণে সত্ত্বম্"—কারণশরীরস্বরূপ অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা, "মোদাদি বৃত্তিভিঃ"—ইষ্ট বস্তুর দর্শন, লাভ ও ভোগ হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ নামক যে বিশেষ বিশেষ সুখ, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, "আনন্দময়ঃ স্যাৎ"—আনন্দময় নামক কোশ হয়।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে :—(শঙ্কা) ভাল, স্থূলশরীর প্রভৃতিকেই 'অন্নময়' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বুঝিতে হয় এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।১) শুনা যায়, যথা :—

"এই জন্যই এই পুরুষ (অর্থাৎ হস্তমস্তকাদি সম্পন্নদেহ) অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ" (তৈত্তিরীয় উ ২।১।১) এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া "সেই (ব্রাহ্মণোক্ত) এই (মন্ত্রোক্ত) অন্নরসময় বা অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর 'আত্মা' আছে, তাহার নাম (প্রাণময় কোশ)" (ঐ ২।২।১) "সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্য একটি 'আত্মা' আছে, তাহার নাম মনোময় কোশ।" (ঐ ২।৩।১)।

তাহা হইলে আত্মাকে 'অন্নময়' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য (অর্থ) কিপ্রকারে বলিতেছেন ?

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন দেহাদি অন্নাদির বিকার বলিয়া 'অন্নময়াদি' শব্দের বাচ্য বটে কিন্তু আত্মার সেই কোশের সহিত অভেদ-অধ্যাস বশতঃ উক্তশ্রুতি বচনে আত্মা অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, "আত্মাতু"—প্রত্যগাত্মা কিন্তু, "তত্তৎকোশৈঃ"—সেই সেই অন্নময়াদি কোশের সহিত, "তাদাত্ম্যাৎ,—তাদাত্ম্যভি-

মান বশতঃ, "তত্তন্ময়ঃ ভবেৎ"—সেই সেই কোশরূপ হন। অভিপ্রায় এই যে ব্যবহার কালে (আত্মা) অন্নময়াদি কোশের প্রধান্যবশতঃ অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হন। 'তু'শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে আত্মা উক্ত কোশপঞ্চক হইতে পৃথক্।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে এইপ্রকার আত্মার কি প্রকারে ব্রহ্মরূপতা হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে কোশপঞ্চক হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে পারিলে আত্মার ব্রহ্মরূপতা হয়।৩৬।

এখানে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মা কিরূপে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোশবিবেকতঃ।
স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরং ব্রহ্মপ্রপদ্যতে ॥৩৭

অন্বয়—অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাম্ পঞ্চকোশ বিবেকতঃ স্বাত্মানম্ ততঃ উদ্ধৃত্য পরমব্রহ্ম প্রপদ্যতে।

অনুবাদ—নিম্নবর্ণিত প্রকারে অন্বয় ব্যতিরেক-দ্বারা পঞ্চকোশ সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, অথবা উক্ত কোশসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার উদ্ধার করিলে, আত্মা পরব্রহ্মরূপ হইয়া থাকেন।

টীকা—"অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং"—৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে যে "অন্বয়ব্যতিরেক" বর্ণিত হইবে তাহার দ্বারা, "পঞ্চকোশবিবেকতঃ"—অন্নময়াদি যে পাঁচটি কোশ আছে তাহাদিগকে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে, কিম্বা অন্নময়াদি পাঁচটী কোশ হইতে, আত্মাকে পৃথক্ করিলে, "স্বাত্মানম্"—প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে, "ততঃ উদ্ধৃত্য" সেই সকল কোশ হইতে বুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া তাহাকে চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিলে অধিকারী মুমুক্ষু, "পরংব্রহ্ম" –(১০ হইতে ১৫ শ্লোকে বর্ণিত) ব্রহ্মকে, "প্রপদ্যতে" পাইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। ৩৭

এক্ষণে যে অন্বয় ব্যতিরেকের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ।
সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্ ॥৩৮

অন্বয়—স্বপ্নে স্থূলদেহস্য অভানে আত্মনঃ যৎ ভানম্ সঃ অন্বয়ঃ, তদ্ভানে অন্যানবভাসনম্ ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। আর আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্থূল-দেহের বা অন্নময় কোশের অপ্রতীতি, তাহাই (স্থূল-দেহের বা অন্নময় কোশের) ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (স্থূলদেহের প্রতীতি না হইলেও আত্ম-প্রতীতি তুল্যভাবে থাকে, এবং আত্মপ্রতীতিতে স্থূলদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—স্বপ্নাবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা, স্থূলদেহ বা অন্নময় কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"স্বপ্নে"—স্বপ্নাবস্থায়, "স্থূলদেহস্য অভানে" অন্নময়কোশরূপ স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ"—প্রত্যগাত্মার, "যৎ ভানম্"—স্বপ্নের সাক্ষি-রূপে যে স্ফুরণ থাকে, "সঃ অন্বয়ঃ"—তাহাই আত্মার অন্বয় (অনুস্যূতি)। সেই স্বপ্নাবস্থাতেই "তদ্ভানে"—সেই আত্মার স্ফুরণ হইলে, "অন্যানবভাসনম্"—অন্যের অর্থাৎ স্থূল-দেহের অনবভাসন বা অপ্রতীতি, "ব্যতিরেকঃ"—তাহাই স্থূলদেহের ব্যতিরেক। "স্থূলদেহম্" এই শব্দটি যোগাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' (শব্দ, 'একটি থাকিলে অপরটি থাকে,' 'একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না'—এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; এই দুই শব্দ) দ্বারা অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা ও ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা কথিত হইতেছে। ৩৮

সমালোচনা

রূপসী—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

রামেন্দুবাবুর কবিতার পরিচয় নূতন দেওয়া নিরর্থক। তিনি কাব্য-রসগ্রাহী মহলে সুপরিচিত। মাসিক ও সাপ্তাহিকের পাতায় বহুবার তাঁহার কবিতা আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকের 'আষাঢ়ে', 'ভাদরে', 'মজঃফরপুরে ভূমিকম্প', 'তখন ও এখন', 'তোমারে ফুটায়ে তুলেছি কুসুম,' 'প্রত্যাবর্ত্তন', 'আদার' এবং আরও কয়েকটী কবিতা বিশেষ ভাল লাগিল। বইখানিতে চারিটী ভাগ আছে। প্রথমভাগে সাধারণ নানান্ কবিতা, দ্বিতীয়—অনুবাদ, তৃতীয়—গাথা ও চতুর্থ ভাগে গান। ছন্দ ও মাধুর্য্যের দিক দিয়া সবগুলি কবিতাই সুন্দর।

রসিক মহলে পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কংগ্রেস ও বাঙ্গালা—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ-নিয়োগী, অজন্তা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ টাকা। মূল পুস্তকখানি ২৩৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালা দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সম্পাদক। তাঁহার পুস্তকখানির যথাযথ সমালোচনা করিতে গেলে ইহার অনুরূপ অন্য একখানি পুস্তক লিখিতে হয়; কারণ, সকল বিষয়ই অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। তথাপি বলিতে হয়, ইহা একখানি মূল্যবান্ পুস্তক। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত—শুধু তাহাই নহে, জাতীয় কংগ্রেসের এককালীন পিতা ও মাতা বাঙ্গালীকেই বলিতে হয়, কারণ বাঙ্গালীই ইহার জন্মদাতা, শৈশবে লালয়িতা এবং যৌবনে নব নব ভাবরাশি দ্বারা বাঙ্গালীই ইহাকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একটা সমষ্টিগত জাতির ভাবস্রোত উহার মুষ্টিমেয় ধীমান্ ব্যক্তির মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অর্থাৎ পাশ্চাত্য আধিপত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হইতেই তদানীন্তন দূরদর্শী বাঙ্গালীগণ দেশের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিণতি বিষয়ে অনেক কিছু বুঝিয়া লইলেন। তাঁহাদের সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষা প্রচারের উদ্যম—এমন কি, দেশ-শাসনে যোগ্যতার দাবী ভারতের ইতিহাসে চিরকাল রক্ষিত হইবে।

বাঙ্গালা দেশেরই বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মনোমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথমে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশকে জাগ্রত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম হইতেই বাঙ্গালী নেতাদের আদর্শে ও কার্য্যে প্রাদেশিকতা বর্জ্জনের চেষ্টা দেখা যায়। সেই যুগে অজ্ঞতাই প্রধান শত্রু ছিল, সাম্প্রদায়িকতা তখনও প্রকাশিত হয় নাই।

পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় আছে, গোখলে মহাশয়ের শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি, "চিন্তা-রাজ্যে ভারতে বাঙ্গালীই অগ্রণী, আজ বাঙ্গালা যাহা চিন্তা করে, ভারতের অবশিষ্টাংশ পরে সেই চিন্তায় অবহিত হয়।" এই বাঙ্গালী জাতির মোহনিদ্রার অবসানকাল

আগতপ্রায় হইলে চিন্তাশীল বাঙ্গালী মনীষিগণের প্রেরণায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য সমগ্র ভারতই জাতীয়তার অভাব বোধ করিতেছিল, তাই সামান্য প্রেরণাতেই ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের আদর্শ গৃহীত হইল। ইহাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই সহরে, উহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই যুগের কংগ্রেস বর্ত্তমান সময়কার কংগ্রেসের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ থাকিলেও, বার্দ্ধক্যকে যেমন বাল্যাবস্থার পরিণতি ভিন্ন অন্য কিছু বলা সমীচীন নহে, তেমনই বলিতে হয়।

এই পুস্তকের আলোচিত বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত মনে হইলেও, ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণ ইহা হইতে মূল্যবান উপাদান পাইবেন।

স্বামী রমানন্দ

মণিদীপ—নছক প্রণীত। ঢাকা ওসমানিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

'মণিদীপ' ছোট কয়েকটি গদ্য-পদ্যের সমষ্টি। ইংরাজীতে যাকে বলে Discourse, অনেকটা তাই। বাংলার কথাসাহিত্য একদা উপেক্ষিত ছিল। সে যুগ আজ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাংলার তরুণ লেখকদের অনেকে কথাসাহিত্যের দিকে নজর দিয়াছেন। মণিদীপের গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম। আধুনিক যুগের অগ্রগতির চাঞ্চল্য লেখকের ভাষায় পরিস্ফুট, তাঁহার সাবলীল লেখনি চালনা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। দু'চারিটি নিবন্ধ ভাষার ও ভাবের অসংযমদোষদুষ্ট বলিয়া আমাদের ধারণা, তবে মোটের উপর লেখকের প্রথম উদ্যম ভালই হইয়াছে। দু'একটি লেখায় লেখকের অন্তর্নিহিত ব্যথার ছাপ বেশ ফুটিয়াছে—উহারা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

লীলারহস্য—শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্তশর্ম্মা (অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন) প্রণীত। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৯৫, মূল্য দশ আনা।

গ্রন্থখানিতে একাদশটি পরিচ্ছেদে ব্রহ্মের স্বরূপ, সৎ ও চিৎশক্তি, ব্রহ্মাণ্ড, মায়াশক্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই জটিল। গ্রন্থকার তাহা যথাসম্ভব সহজভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

পিকোচ্ছ্বাসম্—শ্রীসত্যচরণ সেন ও শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশরৎচন্দ্র দাস, ৮।১ সি, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা। ১৩৯ পৃষ্ঠা।

ইহাতে শোকাষ্টকম্, আনন্দদশকম্, জ্ঞানাষ্টকম্, তারাস্তোত্রম্ প্রভৃতি পনরটি সংস্কৃত কবিতা এবং পাঁচটি অধ্যায়ে সত্যকথাঃ নামে একটি ধর্ম-তত্ত্বালোচনা আছে। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংলিশ ও বাংলা অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সুন্দর ও সুললিত হইয়াছে।

অমিতাভ দত্ত

ময়মনসিংহবাসী—(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত। কার্য্যালয়—১১ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২।৵০ আনা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

আমরা এই পত্রিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাইয়াছি। গত বৈশাখ মাস হইতে ইহা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এই তিনটি সংখ্যাই কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের সুচিন্তিত

প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ। ইদানীং বাংলাভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকাতেই উপন্যাস এবং গল্পের ছড়াছড়ি দেখা যায়। আলোচ্য পত্রিকায় এতদুভয়ের স্থান হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা এই নবপ্রকাশিত সহযোগীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ঘরের মায়া—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৪, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা নবজীবন সংঘ হইতে প্রকাশিত। ৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৶০ আনা।

প্রগতিশীল লেখক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচ্য পুস্তকখানি "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত পাঁচটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমবায়ে সঙ্কলিত। গ্রন্থকার নিপুণহস্তে আমাদের ঘরের প্রতি অস্বাভাবিক মায়া বা আসক্তির অকল্যাণকর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। অত্যধিক মোহে আমাদের ঘর যথার্থই কারাগারে পরিণত হইয়াছে, তাই ঘরের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ। পুস্তকখানিতে লেখক ঘরের নিন্দা করেন নাই, ঘরের মোহের কুফল বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"জনসাধারণ হবে নবযুগের উপাস্য দেবতা। পরিবার ব'লে যে কিছু থাকবে না—এমন নয়। পৃথিবীতে পুরুষ আর নারী যতদিন থাকবে—ততদিন পরিবার গ'ড়ে উঠবেই। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন এখনকার মত মানুষের প্রাণকে নিষ্পেষিত ক'রে রাখবে না। সেই প্রাণ গৃহের প্রাকার অতিক্রম ক'রে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে—সমাজের সর্ব্বসাধারণের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে তার সুন্দর পরিণতি হবে।"

আমরা লেখকের এই ভাবের প্রশংসা করি। পুস্তকের ভাষার গতি এবং প্রকৃতি অনন্যসাধারণ। ছাপা ও কাগজ ভাল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

পরলোকে সুখবালা ঘোষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীর মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী সুখবালা ঘোষ প্রায় ৪২ বৎসর বয়সে বিগত ২৫শে আষাঢ়, শুক্রবার, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৺রথযাত্রার দিবসে ইষ্টপদে বিলীন হইয়াছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন শ্রীযুত অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী এবং হাতুয়া ষ্টেটের সহকারী অধ্যক্ষ ৺গিরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আবাল্য ধর্মানুরাগিণী এই পুণ্যবতী মহিলা মাত্র নয় বৎসর বয়সে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রাক্তন শুভ-সংস্কার বশতঃ সংসারের অনিত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া, উহা হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সন্ধান পাইয়া, সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের বধূ সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘটনা উপন্যাসের কাহিনীরই মত বিচিত্র। স্বয়ং অমৃতের সন্ধান পাইয়া তিনি নিজের স্বামীকেও সেই অমৃতের ভাগী করিয়াছিলেন। তাঁহারই সুশিক্ষায় তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও ধর্মনিষ্ঠ। পুত্রকন্যাদের সকলকেই তিনি পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার সযত্ন বন্দোবস্তে সংসারখানি প্রকৃতপক্ষে একটি আশ্রমে পরিণত। ঠাকুরের নিত্যপূজা ব্যতীত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই সংসারে অনেক সাধু ও ভক্তের সেবা হইয়াছে। আমরা এই স্বধর্মপরায়ণা পুণ্যশীলা নারীর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

সংবাদ

বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো—গত জুন মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরি ক্লাব এবং বেদান্ত সোসাইটিতে প্রতি ববিবাব এবং বুধবাব নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন:—"বুদ্ধ বৈদান্তিক ছিলেন", "কি উপায়ে মনকে শান্ত করা যায়", "আমাদেব অদৃশ্য শরীর", "আধ্যাত্মিক উন্নতিব সাতটী স্তব", "মানুষেব কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে", "আমবা কেন বাঁচি ও মবি", "ভাবতেব দার্শনিক শিবোমণি শঙ্কব", "মানবীয় কম্পন রহস্য" ও "সমাধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।"

এতদ্ব্যতীত তিনি সমাগত ভক্তগণকে ধ্যান ধাবণাদি ও বেদান্ত-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা—জুলাই ১৯৩৫ হইতে ডিসেম্বর ১৯৩৬ পর্য্যন্ত কার্য্যাবলীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বহুমুখ কর্ম্মপ্রসাবী বামকৃষ্ণ মিশনেব মাতৃজাতি ও শিশুমঙ্গল সম্পর্কীয় ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৩২ সনে ইহা স্থাপিত হয। বঙ্গদেশে ক্রমবর্দ্ধমান প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুব হাব হ্রাস কবাই এই প্রতিষ্ঠানেব একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে প্রতিষ্ঠানেব কর্ম্মেব একটা মোটামুটি পবিচয় পাওয়া যাইবে—

	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬
সন্তানসম্ভবাদের চিকিৎসা ও যত্ন	৪৫১	৬১৪	১০০২	১৫১৯
প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে বেড সংখ্যা	০	৭	১৫	২৫
প্রতিষ্ঠানে প্রসবের সংখ্যা	০	১৯২	৪৪৮	৮১৫
রোগীর বাড়ীতে প্রসবের সংখ্যা	২৪০	২১১	২৪৯	২৩
প্রসূতিদের পরিচর্য্যার				
দৈনিক গড়পড়তা	০	৪	৮.৫	১৭.২
ঐ (রোগীদের বাড়ীতে)	৭	৭	৮	১১
শিশু পরিচর্য্যার দৈনিক গড়পড়তা				
(হাসপাতালে)	০	৪	৮.৫	১৪.৩
ঐ (বাড়ীতে)	৭	৭	৮	১০
বিদ্যালয়ের বয়স পর্য্যন্ত				
শিশুদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান	৯১	১৫৬	৪৬১	৪৯০
ধাত্রী বিদ্যাশিক্ষা, ছাত্রীসংখ্যা				
(২॥ বৎসরে সমাপ্ত)	০	৬	৬	৬
ধাত্রীবিদ্যা পরীক্ষোত্তীর্ণা	০	০	০	৬
প্রসূতি-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে	০	৭.৫	৭	৩
শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	১০	১০	১০	২২

অত্যল্প সময়েব মধ্যে এই শিশু প্রতিষ্ঠানটী সমজাতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টাব মধ্যে আদর্শস্থান লাভ কবিতে পাবিয়াছে, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রায় সর্ব্বপ্রকাব আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাই ইহাতে অনুসৃত হইতেছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই এই প্রতিষ্ঠান হইতে সেবা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানেব নিজস্ব বাড়ী নাই। ইহা একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। সৌভাগ্যেব বিষয়, কলিকাতা করপোবেশন ল্যান্স ডাউন বোডে প্রায় ৪৮ কাঠা জমি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিয়াছেন। ইহাব মূল্য মোট ৪৪০০০৲ টাকাও তাঁহারা কিস্তিবন্দি মতে লইতে বাজি হইয়াছেন। এই টাকাসহ প্রতিষ্ঠানেব প্রস্তাবিত বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যয় অনুমানিক ২৫০০০০৲ টাকা লাগিবে। প্রস্তাবিত বাড়ী নির্ম্মাণেব কাজ আবম্ভ হইয়াছে। উহা শেষ হইলে বসতবাড়ীকে হাসপাতাল কবার যে অসুবিধা তাহা আব ভোগ করিতে হইবে না, অধিকন্তু ইহাতে অফিস, বহির্ব্বিভাগ, সেবিকা-নিবাস থাকিবে এবং অন্তর্ব্বিভাগে ১২৫টী বেড স্থান পাইবে। এই প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য কবিবার জন্য আমবা দেশবাসী প্রত্যেক নরনারীকে অনুবোধ কবি।

বর্ত্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের দানে এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৪০৲ টাকা হিসাবে ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। অবশিষ্ট ৬০৲ সদাশয় জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে নির্ব্বাহ হয়। আলোচ্য আঠার মাসেব মোট আয় ৩৮১২৯৸/৪ পাই এবং ব্যয় ৩৩৩০৭।৶০ আনা।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, রেঙ্গুন—১৯৩৬ সনে সেবাশ্রম ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিল। এই সেবা-নিকেতনটী কিভাবে দিন দিন বর্ম্মার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট সমাদর লাভ করিতেছে, তাহা দেখিলেই ইহার সুন্দর সুশৃঙ্খল কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। রামকৃষ্ণ মিশনের যতগুলি বৃহৎ হাসপাতাল আছে, এই হাসপাতালটী উহাদের অন্যতম। এই বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

আলোচ্য বর্ষে যে সমস্ত রোগীকে সেবা করা হইয়াছে তাহাদের জাতীয় পরিচয় দেওয়া হইল,—আফ্রিকাবাসী, এংলো ইণ্ডিয়ান, আরব, আর্ম্মানী, অসমীয়া, বাঙ্গালী, বর্ম্মী, চীনা সিংহলী, অষ্ট্রেলিয়ান, গোয়ানিজ, গুজরাটী, গ্রীক, হিন্দুস্থানী, ইহুদী, কাবুলী, মাদ্রাজী, নেপালী, ওড়িয়া, পার্শী, পাঞ্জাবী, পেশোয়ারী, সুরাটী, জাপানী ও পর্ত্তুগীজ।

এই বৎসর অন্তর্ব্বিভাগে ২৯৫২ পুরুষ, ৯৫৭ স্ত্রীলোক, ১৭৪ বালক-বালিকা, মোট ৪০৮৩ জন রোগী চিকিৎসা ও সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বহির্ব্বিভাগে ৫৬৩৬০ পুরুষ, ১৪২১৯ স্ত্রীলোক, ১৮৮৪৪ বালক-বালিকা, মোট ৮৯৫০৬জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। পুরাতন রোগীর সংখ্যা যোগ করিলে এই সংখ্যা মোট ২২৭৩৫৫এ দাঁড়ায়। রোগীর দৈনিক গড়পড়তা, অন্তর্ব্বিভাগে ১১৪ এবং বহির্ব্বিভাগে ৬১২। মৃত্যুর হার শতকরা ৪৭।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৯৩৬৮৸৴৯ সহ এই বৎসরের মোট আয় ৭০০৩৯৮৴৯, মোট ব্যয় ৬০০১১৷৶৬ এবং উদ্বৃত্ত ৯৮২৮৷৶৩ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল—১৯৩৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শে মিশনে কলেজের ছাত্রগণের জন্য একটী ছাত্রাবাস আছে। বিদ্যার্থিগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নৈতিক-জীবন গঠন করিতে পারে, বিদ্যার্থী আশ্রমের তাহাই লক্ষ্য। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ১৮টী ছাত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে ৭টী ফ্রি, ৪টী অর্দ্ধ ফ্রি, ৫টী আংশিক এবং ২টী পূর্ণ ব্যয়ে থাকিত।

আশ্রমের গ্রন্থাগারে সর্ব্বসমেত ৭৮০ খানা পুস্তক আছে। তদুপরি ১৩ খানা মাসিক, ৫খানা সাপ্তাহিক এবং ৩ খানা দৈনিক পত্রিকা রাখা হইয়াছে।

এ বৎসর কলেরা, জ্বর, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ২৮টী রোগীর সেবা ও ৩টী মৃতের সৎকার করা হইয়াছে। এ বৎসর পশ্চিম বঙ্গের নানা জিলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ইহার সাহায্য-কল্পে ৬০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে।

এ বৎসরও আশ্রমে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহাতে ৯টী দরিদ্র রোগীর চক্ষু অপারেশন এবং ১৮টী রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

প্রতি রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য আশ্রমে যোগশাস্ত্র, ভাগবৎ ও চণ্ডী ব্যাখ্যা হইয়াছে। আলেকামান্দা মাতাজীর আশ্রমে, স্থানীয় কলেজে, শঙ্কর মঠ ও অন্যান্য স্থানে মিশনের সাধুগণ ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন।

১৯৩৬ সনে মিশনের মোট আয় ৪৮৮৭৸৴৯ এবং মোট ব্যয় ৩২৭২৸৴৯ পাই।

বহড়াগোড়া (সিংভূম)—বহড়াগোড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও যুবকগণের চেষ্টায় গত ২৪শে জুন হইতে ২৮শে জুন পর্য্যন্ত বহড়াগোড়ায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব পরিচালনের জন্য বেলুড় মঠ হইতে স্বামী গিরিজানন্দ শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পূজা, ঠাকুরের ছবি লইয়া শোভাযাত্রা, প্রসাদ বিতরণ, সংকীর্ত্তন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এই উৎসবের অঙ্গ হইয়াছিল। স্বামী গিরিজানন্দ গত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে জুন তারিখে সাধারণ সভায় যথাক্রমে "কর্ম্ম জ্ঞান ও ও ভক্তির সমন্বয়," "বৈদিকযুগ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় ভাবধারা" ও "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগের ভাবধারা" সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। গত ২৭শে জুন তারিখে স্বামীজি স্থানীয় মধ্য ইংরেজী ও প্রাইমারী স্কুলগুলির শিক্ষক ও ছাত্রগণের সমক্ষে গীতার উপদেশাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গত ২৮শে জুন তারিখে এতদুপলক্ষে প্রায় এক হাজার দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হইয়াছিল।
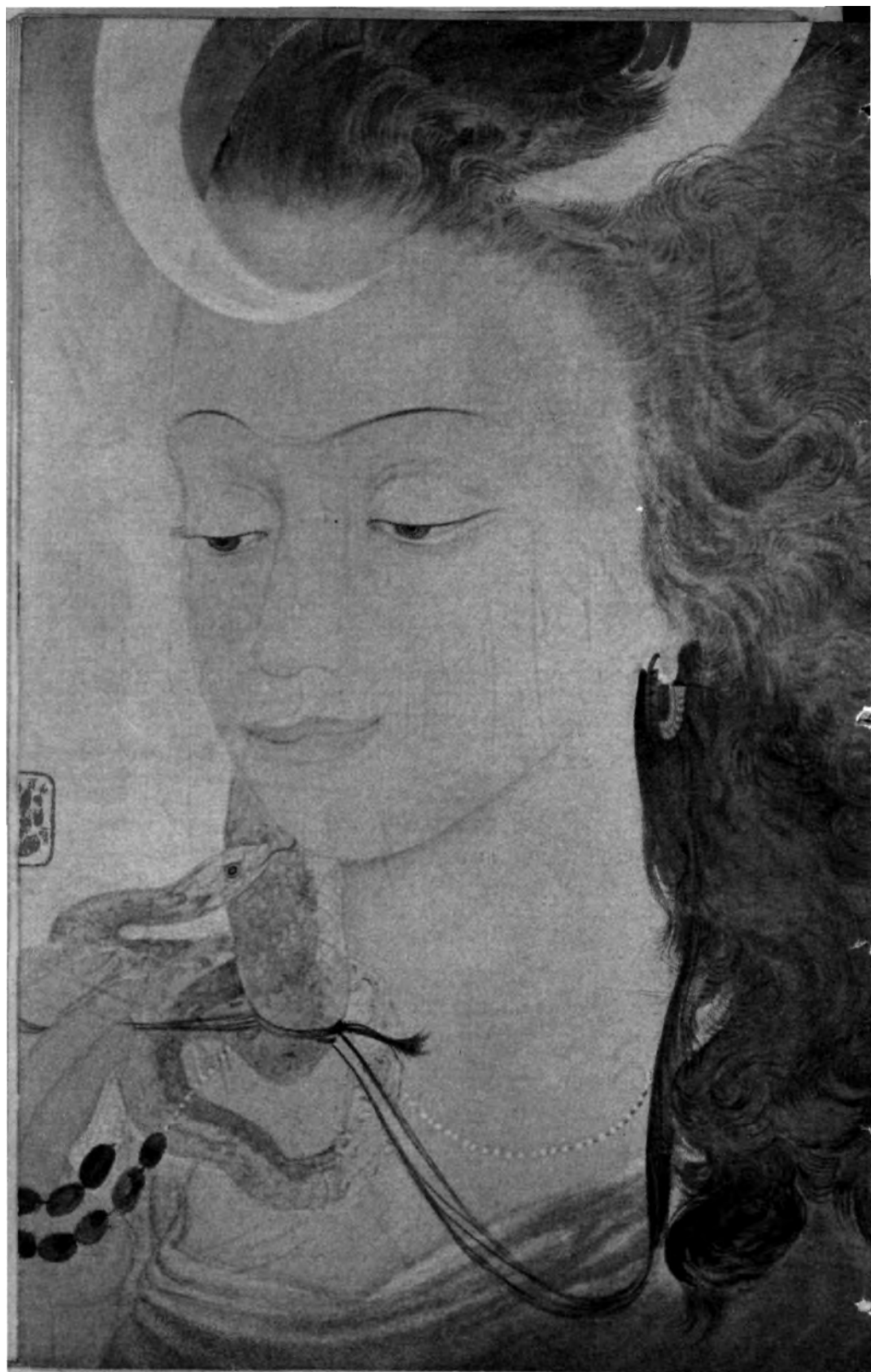
উমা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

বঙ্গে দুর্গোৎসব

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ভারতে শক্তি পূজা কতদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবীসূক্ত রহিয়াছে। ১২৭ সূক্তে রাত্রিদেবীর পূজার বর্ণনা আছে। বৃহদ্দেবতায় রাত্রিদেবীকে বাক্, সরস্বতী, অদিতি ও দুর্গা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালীর নামোল্লেখ আছে এবং ভবানীদেবীকে যজ্ঞাহুতি দিবার কথা হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে ব্যবস্থা রহিয়াছে। তখনও শক্তিপূজা প্রচলিত থাকিলেও বৈদিক দেবদেবীর সঙ্গে একটা সমন্বয় সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকাদেবীকে রুদ্রের ভগিনী বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে এই অম্বিকাকে রুদ্রের পত্নী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তরীয় আরণ্যকে এই অম্বিকা দেবীকেই দুর্গা কাত্যায়নী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন—

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।"

এই তৈত্তরীয় আরণ্যকে যাজ্ঞিকী উপনিষদে দুর্গাগায়ত্রী আছে। সেই মন্ত্র—"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।"

এখানে আমরা প্রথমে রাত্রিদেবী পরে বাগ্দেবী, সরস্বতী, ভদ্রকালী, ভবানী, অম্বিকা, বৈরোচনী, কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী ও দুর্গা নামে দেবীর উপাসনা দেখিতে পাই এবং এই সকলই বৈদিক যুগে শক্তির আরাধনা। বৈদিকী সন্ধ্যায় দেবীধ্যান রহিয়াছে। প্রাতে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী এবং

সজ্ঞায় মাহেশ্বরী বা রুদ্রাণী। অথর্ব্বশিরা উপনিষদে ঈশান ও ঈশানীর কথা রহিয়াছে। "অথ কস্মাৎ উচ্যতে ঈশানঃ? যঃ সর্ব্বান্ দেবান্ ঈশতে ঈশানীভির্জননীভিশ্চ পরমশক্তিভিঃ।" অর্থাৎ কেন তাঁহাকে ঈশান নামে অভিহিত করা হয়? কারণ, তিনি সকলদেবের ঈশ্বর, জগতজনয়িত্রী ঈশানী নামক শক্তি সমূহের তিনি আশ্রয়স্বরূপ, তাই তিনি ঈশান। অথর্ব্বশিরার অপেক্ষা প্রাচীনতর কেনোপনিষদে পরমাশক্তি উমা হৈমবতীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তন্ত্র যে কত প্রাচীন তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভিন্ন দেশ হইতে তন্ত্র আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কিন্তু তাহা অনুমান মাত্র। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন "তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা অথর্ব্ববেদের অংশ। যাহার কিছু গোড়া পাওয়া যায় না তাহাই অথর্ব্ববেদ। এ কথার কি মূল্য জানি না। আমি গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায় লেখা দুইখানি পুঁথি দেখিয়াছি। একখানিতে ঋতক ও মতঙ্গ কথা কহিতেছেন নৈমিষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কি হইল? আমরা ত বৈদিক দীক্ষাই জানি, এখন আবার এ একটা কি দীক্ষা আসিল? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর একজন বলেন, তান্ত্রিকও পুরাণ দীক্ষা—বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের গোড়া ত এইখানেই পাওয়া গেল।

আর একখানি পুঁথি ঐ অক্ষরেই লেখা। এখানির নাম "কুলানিকাম্নায়" বা কুব্জিকা মত।" ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন—

"গচ্ছ ত্বং ভারতবর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।"

"যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমস্তয়া সহ।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস ত ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না। পুঁথি দুখানিই ৮ম শতকের শেষভাগে লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃ ৭ম ও ৮ম শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ তুর্কীস্থানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানারকমের লোকচলিত ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা সে সকল ধর্ম্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন, তাঁহারাই তন্ত্র এদেশে প্রচার করেন। তখন ভারতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্ব্বত, এই সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেই সব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানাদেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের গোড়া। তন্ত্র-শব্দ ইহার পূর্ব্বে ছিল। বরাহমিহিরের টীকাকার ভট্ট উৎপল নানা তন্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম।" (১৩৩৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা)।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মতে আমরা সায় দিতে পারি না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত ও রাত্রিদেবীর সূক্ত রহিয়াছে, যজুর্ব্বেদে ও কেনোপনিষদে শক্তি পূজার উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া পুরাণে ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শক্তি পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মহাকবি কালিদাস "জগতঃ পিতরৌ" পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন। কৈলাসকে মর্ত্তলোকের মধ্যে প্রাচীন ঋষিরা গণ্য করিতেন না এবং হিন্দুরাও করে না। বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও কৈলাস ভারতের ভূগোলের মধ্যে অবস্থিত নহে। সুতরাং কৈলাসে কৈলাসপতি মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন যে "যাও ভারতবর্ষে গিয়া তুমি তোমার অধিকার স্থাপন কর।" তাহার অর্থ যে বিদেশ

হইতে তন্ত্র আসিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিল—ইহা অতি সূক্ষ্ম কল্পনা। তুর্কীস্থানে পুরোহিতেরা কি মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের উপর কিভাবে আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং সমগ্র হিন্দুস্থান তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রভাবে কেমন করিয়া প্রভাবান্বিত হইয়াছিল—তাহার ইতিহাস কোথায়? বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তাঁহারা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন—যাহাতে সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিথিল-মূল হইয়া গেল? তন্ত্রে তো আমরা বৈদিকাচারের রূপান্তর লক্ষ্য করি। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং" সেই মহেশ্বর এবং উমা হৈমবতীর উপাসনাই তন্ত্রের প্রাণ। বৈদিক সোমপানের স্থলে মাধ্বিক পৈষ্টিক সুরা এবং চরুর বদলে মুদ্রা। কাল প্রভাবে আচারের পরিবর্ত্তন হয়। তান্ত্রিকযুগে সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের সংমিশ্রণে কতক আচার ও পূজা পদ্ধতিরও সেইরূপ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। তন্ত্রে "দুর্গা"র একটী নাম পর্ণশবরী অর্থাৎ শবরজাতির পর্ণ-পরিহিতা দেবী। হরিবংশে আছে দুর্গাদেবী "শবরৈ-র্বর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।" অর্থাৎ দুর্গা শবর, বর্ব্বর পুলিন্দ জাতিদের দ্বারা উত্তমরূপে পূজিতা হইতেন। দেবী মদ্য-মাংস-প্রিয়া ছিলেন। শরৎকালে তাহারা এই দেবী পূজার উৎসব করিত। সে উৎসবের নাম ছিল শাবরোৎসব। কালিকা-পুরাণে দশমী তিথিতে শাবরোৎসব অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নৃত্য গীত ও বাদ্যোৎসবে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। তিনি কিরাতদের দ্বারা পূজিত হইতেন। মায়ের অপর নাম কিরাতিনী। শারদোৎসব ও শাবরোৎসব একত্রে মিশিয়া আছে। ইহা বিদেশ হইতে আমদানী হয় নাই, ইহা হিন্দুর নিজস্ব। শস্যশ্যামলাঞ্চলা বাংলার দুর্গাপূজা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব রসধারা। চণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বড়াই শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

"বড় যতন করিআঁ, চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।"

বাংলার চৌদ্দশতকে কীর্ত্তিবাস রামায়ণে রাম-চন্দ্রের দুর্গাপূজার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে বাঙ্গালীরই দুর্গোৎসব। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজায়—

"অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
নৃত্যগীতে মগ্ন হৈল সকল বানরে॥
নবমী পূজা করি মনের সন্তোষে।
দশমী-দিবসে দুর্গা গেলেন কৈলাসে॥"

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩২, ৩য় সংখ্যা, বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ)।

বাংলার দুর্গোৎসব—সকল ধর্ম্মের সমন্বয় উৎসব। ইহার পূজানুষ্ঠানে শবর বর্ব্বর পুলিন্দ কিরাত প্রভৃতির বন্যোৎসব আছে, আবার বৌদ্ধের শক্তি পূজাও রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, "অন্য কথা কি বলিব, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পাঁচটী শক্তি আছেন, তাঁহাদের নাম রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা আর্য্যতারিকা। ইঁহাদের দুজনের মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চরক্ষা আছেন—মহাপ্রতিসরা, মহা-মায়ূরী, মহাশীতবতী, মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী, মহা-মন্ত্রানুসারিণী, দুর্গোৎসবের মধ্যে ইঁহাদেরও পূজা হইয়া থাকে।" মহাশক্তির যে একান্নপীঠ আছে, প্রত্যেকস্থানে সতীর অঙ্গ চিহ্ন রহিয়াছে, কোথাও মূর্ত্তি ও কোথাও বেদী—তাহার ইতিহাস তো আজও প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বাহিরে। এই সকল পীঠ ও উপপীঠে বাংলার ধর্ম্মেতিহাস নিবিড়-ভাবে জড়িত রহিয়াছে। তন্ত্রও প্রায় অনেক অপ্রকাশিত—সুতরাং এই অজ্ঞাতাবস্থায় মীমাংসা কে করিবে? প্রমাণাভাবে আমরা শুধু কল্পনায় অনুমান করি।

কিন্তু বাংলার দুর্গোৎসব বাঙ্গালীরই উৎসব। বঙ্গের বাহিরে এইরূপ সার্ব্বজনীন উৎসব নাই।

কাহিনীতে, কথায়, প্রবাদে, শাস্ত্রে, কাব্যে, সঙ্গীতে, ইহা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে। আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে সারা বৎসর এই দুর্গোৎসবের আশায় চাহিয়া থাকি। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে ভিখারী আগমনী গান গাহিয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ে বাৎসল্যের ক্ষীরধারা সঞ্চারিত করিয়া দেয়, সন্তানের প্রাণ মাকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে আর বাংলার গগনে—পবনে "মা" "মা" ধ্বনি বাজিয়া উঠে। এই যে ভাবের ঢেউ প্রেমের আবেগ—ইহা যে বাংলার নিজস্ব। ভগবানকে এমন ভাবে মাতৃমূর্ত্তিতে সাজাইয়া আর কেহ এমন একান্ত আপনার জ্ঞানে পূজা করে না। এমন অনুরাগভরে "মা" "মা" বলিয়া আর কোন জাতি মাতিয়া উঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে সেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন "মা" "মা" রবে—মাতৃনামের মহামন্ত্রে। জগতের সমক্ষে সেই সর্ব্বধর্ম্মের মহাপ্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করিলেন "ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ।" দুর্গা পূজায় তাঁহার অদ্ভুত ভাব ফুটিয়া উঠিত। কখনও সখী হইয়া জগজ্জননীকে চামর ব্যজন করিতেন, কখনও মার সহিত অভিন্নভাবে বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন, কখনও ভক্তগৃহে মা আনন্দময়ীর প্রতিমার পাশে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি জাগাইতে হইলে শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজা চাই। ইহা বুঝিয়াই বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। এই দুর্গানাম স্মরণ করিলেই শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা ও ভাবে তন্ময় হইয়া গাহিতেন—

"বলরে শ্রীদুর্গা নাম।
ওরে আমার আমার আমার মন।
নমো নমো নমো গৌরি, নমো নারায়ণি,
দুঃখী-দাসে কর দয়া (মা) তবে গুণ জানি।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা, তুমি গো যামিনী,
কখন পুরুষ হও মা কখন কামিনী।"

বাঙ্গালী, আজ এই মহাপূজার মহোৎসবে সেই মাতৃগত-প্রাণ বালক মহাপুরুষকে ধ্যান কর। "মা" নামের মহামন্ত্রে তিনি জগতের সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি জাগরিত করিয়াছেন। তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদেরাও সেই মহাশক্তি জগজ্জননীর নামে মাতোয়ারা "মা" "মা" রবে গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিতেন। দুর্গোৎসবের মহোৎসবে তাঁহারা মহাশক্তির মহাবাণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেন—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

এস বাংলার নরনারী, সেই সচ্চিদানন্দের হ্লাদিনী আনন্দময়ী শক্তিকে আজ উদ্বোধন করিতে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। আমাদের জীবনের মর্ম্মের অন্তস্থলে, কর্ম্ম প্রচেষ্টায়, প্রাণের রসধারায় এই মহাশক্তির প্রেরণার জন্য প্রার্থনা করি। এস বাংলার ভাই বোন্, সকলে জাতি ধর্ম্ম বর্ণ বিদ্বেষ ভুলিয়া সম্মিলিতভাবে প্রেমকণ্ঠে সেই বাংলার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমের মন্ত্রে বল—

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী—বিদ্যাদায়িনী—
নমামি ত্বাম্
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং শ্যামলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

কলুষ কালিমা কলুষিত যুগ, ঈশ্বরে নর অবিশ্বাসী,
দেবতার সাথে নব পরিচয় তুমিই স্থাপিলে আবার আসি।
সহজ সরল তব উপদেশ, জগন্মাতার দ্রষ্টা তুমি,
তোমার জনমে নূতন জনম আবার লভিল বঙ্গভূমি।
তুমিই দেখালে পাষাণে দেবতা, সুলভের মাঝে সুদুর্লভ,
নন শুধু অনুভবের জিনিষ, নহে দর্শন অসম্ভব।
ডাকার মতন ডাকিলে মা আসে, সত্য ইহার হয় না ত্রুটী,
এত বড় আশা যে জন বাড়ালে বন্দি তাঁহার চরণ দুটী।

(২)

ভগবানে তুমি দেখিলে দেখালে শ্যাম ও শ্যামাতে প্রভেদ নাহি,
দুর্লভ ভব পারের তরণী গ্রামের ঘাটেতে লাগালে আনি।
কল্পতরুর মহাফল তুমি সুলভ করিলে প্রেমের হাটে
যেথা বও রচ চক্রতীর্থ দেবতার মেলা তোমার পাটে।
মানবের বেশে হে মহামানব অমৃত ভাণ্ড দিলে যে আনি
কুরুক্ষেত্রে নহেক এবার গৃহমণ্ডপে ধ্বনিল বাণী।
স্মরণে তোমার পুলকিত চিত, স্বপনে লভিয়া জাগিয়া উঠি,
পতিতপাবন হে মহাপুরুষ বন্দি তোমার চরণ দুটী।

'মেঘদূতে' মেঘের পথ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন

কালিদাসের মেঘদূত বিশ্ববিশ্রুত কাব্য। এ কাব্যের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কবিত্ব কৃতিত্ব অসাধারণ। 'মেঘদূত'কে জগতের যাবতীয় খণ্ডকাব্যের মুকুটমণি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে দুই জন অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিব। There is nothing so perfect in the elegiac literature of Europe as the Meghaduta of Kalidasa —Mon Fuache

Kalidasa's Meghaduta is a lyrical gem which won the admiration of Goethe —A A Macdonell's Sanskrit Literature.

মেঘদূতের আরম্ভ এইরূপ :—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহ গুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ

এক যক্ষ—কদাচিৎ
স্বাধিকারে অবধানহীন,
কান্তার বিরহে গুরু
প্রভুশাপে মহিমা-বিলীন—
যথা স্নিগ্ধ ছায়াতরু
জল সীতা-স্নান-পবিত্রিত,
নিবসিল রামগিরি
বর্ষতরে হ'য়ে নির্ব্বাসিত।

(সংস্কৃত অনুবাদ)

ঐ যক্ষ একে কামী—তায় প্রিয়া-বিরহিত। তাহার প্রিয়তমা সুদূর কৈলাসের উৎসঙ্গস্থিত অলকায়। ঐ রামগিরিতে কয়েক মাস কষ্টেসৃষ্টে কাটাইবার পর যক্ষ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'—

আষাঢ়ের নবদিনে
দেখে মেঘ সানু-বিজড়িত
যেন বপ্রক্রীড়ারত
(সুদর্শন) গজ এক আকাশে উত্থিত।

যক্ষ প্রীতমনে মেঘকে 'স্বাগত' করিল—ভাবিল এইত' সুযোগ!—মেঘের মুখে অলকায় প্রিয়তমাকে বার্ত্তা প্রেরণ করি—

আসন্ন শ্রাবণ জানি
রক্ষিবারে দয়িতাজীবন
কুশল বারতা নিজ
মেঘমুখে করিব প্রেরণ

আপনি আমি জানি—সেই প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে কালিদাসও জানিতেন—

ধূম জ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
ধূমবায়ু জ্যোতিঃ জল
সমবায়ে মেঘের গঠন—
আরও জানিতেন—
পটু কর পদ বিনা
নয় কভু সন্দেশবহন।
কিন্তু যক্ষ? সে ত' দ্বিধাহীন—
তথাপি যাচিল যক্ষ
কামবশে গণনাবিহীন—
দেখি কামাতুর জন
জড়ে চিতে সদা দ্বিধাহীন

যক্ষ বলিল—মেঘ! তোমার মহীয়ান্ বংশে জন্ম—তুমি নিজেও মহান্

তাই প্রার্থী দ্বারে তব
বিধিবশে বন্ধু দূরগত—
প্রার্থনা বিফল তবু
উত্তমেতে যাচ্ঞা সঙ্গত।

বন্ধু! আমার একটি মহৎ উপকার করিতে হইবে—আমি প্রভুরোষে নির্ব্বাসিত—এই রামগিরি হইতে সুদূর অলকায়—প্রিয়াপাশে বার্ত্তা মম কবহ বহন—সন্দেশং মে হব ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য। তোমাকে পবন-রথে* চড়িয়া সেই উত্তরে অলকায় যাইতে হইবে—

গন্তব্যা তে বসতিবলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাম্ তুমিত' অব্যাহতগতি—আমি জানি তুমি ঠিক অলকায় পঁহুছিতে পারিবে এবং আমার বিরহে প্রায়জীবন্মৃতা তোমার ভ্রাতৃবধূকে দর্শন করিবে—

অব্যাহত গতি তুমি
　　জীবন্মৃতা হবে নেত্রগত
একপত্নী ভ্রাতৃবধূ
　　তব—দিবসগণনারত।

আমার দূতরূপে তাঁহাকে মদীয় সন্দেশ পঁহুছিয়া দিও। অবশ্য দীর্ঘপথ—প্রায় ৫০০ ক্রোশব্যাপী। ঐ পথ তোমাকে অতিক্রম করিতে হইবে—পথে কত গিরিনদী বন উপবন জনপদ নগর দেবস্থান পড়িবে—দেখো ভাই! অধিক বিলম্ব করিও না।

পথ তোমার অপরিচিত—সেইজন্য, মার্গং তাবৎ শৃণু কথয়তঃ তৎপ্রয়াণানুরূপং। সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্—

সর্ব্বাগ্রে জলদ! কহি
　　মার্গ তব গমনের তরে
পশ্চাৎ আমার বার্ত্তা
　　নিবেদিব তোমার গোচরে।

এই ভূমিকা করিয়া যক্ষ মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত পথের বর্ণনা করিল। ঐ বর্ণনা কেবল নীরস ভূগোল নহে—উহার আদ্যন্ত অপূর্ব্ব কাব্যরসে সিক্ত। কিন্তু সে কাব্যরস আস্বাদনের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়—আমরা সম্প্রতি ঐ ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানের ভৌগোলিক সংস্থানের আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিতে চাই যে 'কালিদাস শুধুই ভারতের মহাকবি নন—তিনি একজন প্রধান আবহবিৎও ছিলেন।' এ সম্পর্কে ডাঃ শচীন্দ্র নাথ সেন (M Sc, Ph D.) বিগত ১৩৪২ সনের আষাঢ় 'ভারতবর্ষে' একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। (ডাঃ সেন সে সময় আলিপুরের আবহাগারের সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন—তিনি এখন পুণার আবহবিৎ (Meteorologist)। ঐ প্রবন্ধে ডাঃ সেন লিখিয়াছেন :—'এখন যেমন প্রত্যেক দিন সকালে আলিপুর মানমন্দিরে তারবেতারযোগে অসংখ্য আবহসংবাদ একত্রিত হয় এবং উহার সাহায্যে ভারতে ও বঙ্গোপসাগরে মেঘগতি, বারি-ধারা ও তুফানের অদূর ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ করা যায়, কালিদাসের সময় এইসব সুযোগ কিছুই ছিল না।' তথাপি কালিদাস উত্তরাভিমুখে মেঘপথ যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, ডাঃ সেনের ঐ প্রবন্ধে চিত্রিত সেই পথের সহিত অপর চিত্রে প্রদর্শিত ১৯৩৪, ১৮ই আগষ্ট তারিখের আবহচিত্র তুলনা করিয়া ডাঃ সেন বলিতেছেন "গাঙ্গেয় *উপত্যকার উপর দিয়া মেঘপ্রবাহের যে সকল রেখা* টানা হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে কালিদাসের মেঘপথ রেখার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।" সেজন্য তিনি বলিতেছেন যে, মহাকবি কালিদাসকে আবহবিদ্‌দিগের মধ্যেও একটি রত্ন বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

অতঃপর আমরা সংক্ষেপে কালিদাসের নির্দ্দিষ্ট মেঘপথের আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি যক্ষদূত মেঘের উত্তরগামী পথের আরম্ভ রামগিরি হইতে। এই রামগিরি কোথায়? প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ বলেন রামগিরি চিত্রকূটে। মল্লিনাথের অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ রামগিরিকে

* সেই অতীত যুগে কালিদাস জানিতেন বায়ুর গতির উপরই মেঘের চলাচল নির্ভর করে—সেই জন্য তিনি লিখিয়াছেন—'মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাম্,' এবং 'মৃদুমন্দ শীতবায়ু লবে তোমা দেবগিরিধাম'।

চিত্রকূট হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। চিত্রকূট পবিত্র তীর্থস্থান। আমি নিজে চিত্রকূট গিয়াছি এবং সেখানে প্রায় এক পক্ষকাল অবস্থান করিয়াছি। রেলপথে চিত্রকূট যাইতে হইলে বোম্বাই মেলে এলাহাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম মানিকপুরে গাড়ী বদল করিয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঝাঁসির অভিমুখে যাইতে হয়। চিত্রকূট বুন্দেলখণ্ডে—নর্মদার অনেক উত্তরে। অথচ 'মেঘদূত' হইতে দেখা যায় নর্মদা পার হইয়া মেঘকে অলকার অভিমুখে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। অতএব রামগিরি কখনই চিত্রকূট হইতে পারে না। মেঘদূতের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক অধ্যাপক উইলসন্ (ঐ অনুবাদের তারিখ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ) বলিয়াছেন যে—রামগিরি নাগপুরের উত্তরপূর্ব্ব রামটেক্ পর্ব্বত। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের নির্দ্ধারণে এখন স্থির হইয়াছে যে রামগিরি মধ্য-প্রদেশের সিরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় পর্ব্বত।

যক্ষ মেঘকে যাত্রাকালে ঐ তুঙ্গ রামগিরিকে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন,—

যাত্রাকালে তুঙ্গ গিরি
মিত্ররবে কর আলিঙ্গন
মেখলা যাহার পূত
বন্দ্য রঘুপতি শ্রীচরণ।

আর বলিলেন—রামগিরি ছাড়িয়া প্রথমেই মেঘকে মনোহর মালভূমি আরোহণ করিতে হইবে। 'মাল'-অর্থে উন্নত ভূতল (Table land) মালম্ উন্নত ভূতলম্—

হে মেঘ।
আরোহিয়া মালভূমি
সদ্যঃ হলকর্ষ মনোহর
পশ্চিমে ঈষৎ হটি
লঘুগতি চলিবে উত্তর।

নিকটেই সানুমান্ আম্রকূট—

ত্বামাসার প্রশমিত বনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।

এই আম্রকূটই অমরকণ্টক। ঐখানে নর্মদার উৎপত্তি। অমরকণ্টকে প্রচুর আম্রবৃক্ষ—সেইজন্য ইহার সার্থক নাম আম্রকূট। যক্ষ বলিতেছেন—কাননাম্রে বেষ্টিত সেই অচলের উপর মেঘ অধিষ্ঠিত হইলে কি অপূর্ব্ব শোভাই হইবে।

পরিণত ফল-শোভী
কাননাম্রে অচল বেষ্টিত
স্নিগ্ধবেণী বর্ণ তুমি
চূড়া'পর হ'লে অধিষ্ঠিত—
অমরমিথুন গিরি
নেহারিবে হইয়া বিস্মিত
যেন গৌর ধরাস্তন
ঘোর কৃষ্ণ চুচুক-মণ্ডিত।

ইহার পরই মেঘকে নর্মদা পার হইতে হইবে—জব্বলপুরের সন্নিকটে সেই মর্মর পাষাণময় বিন্ধ্য-পাদে বিশীর্ণা নর্মদা নদী—

রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্

দেখিবে বিশীর্ণা রেবা
বিন্ধ্যপদে উপল বিষম
যেন গজেন্দ্রের গায়
চিত্র আলিপনা অনুপম।

ইহার পর—

মেঘ! পুষ্পিত কুকুভ-বাসে
পর্ব্বতে পর্ব্বতে সুরভিত
সে আমোদে সখা! তব
শীঘ্রগতি হবে বিলম্বিত

তথাপি ক্রমে তুমি দশার্ণে উপনীত হইবে। এই দশার্ণই প্রাচীন গ্রীক ভূগোল 'Periplus' ও টলেমির উল্লিখিত 'Dasarene'—পূর্ব্ব মালবের বর্ত্তমান ছত্তিসগড় পরগণা। এই দশার্ণের রাজ-ধানী বিখ্যাত বিদিশা—গোয়ালিয়র রাজ্যের ইসাগড় তহশিলের অন্তর্গত ভিল্‌সা। বিদিশা বেত্রবতী নদীর উপকূলে অবস্থিত—উহার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' গিরি। কেহ কেহ অনুমান করেন—

'নীচৈঃ may be the isolated ridge of উদয়গিরি—2 miles S W of বেশনগর and 5 miles from সাঁচি'। যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—

শ্রম বিনোদন হেতু
ব'সো তথা 'নীচৈঃ' অচলে
স্ফুটিত কদম্বে যেন
পুলকিত তব স্নেহজলে।

ঐ বেত্রবতী প্রখ্যাত নদী—শ্রীহর্ষের কাদম্বরীতে উহার উল্লেখ আছে—বেত্রবত্যা পরিগতা বিদিশাভিধানা নগরী রাজধানী আসীৎ। বেত্রবতীর বর্ত্তমান নাম Betwa 'which rising on the north slopes of the Vindyas, runs N E for 340 miles through Malava and passing by Bhelsa (বিদিশা) falls into the Jumna below Calpe' (Wilson) ইহার পর মেঘের পথে নির্বিন্ধ্যাতটিনী পার হইয়া উজ্জয়িনী। কালিদাস জানিতেন, মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা যাইতে হইলে সাধারণতঃ উজ্জয়িনী ঘুরিয়া যাইতে হয় না। সেইজন্য কবি বলিলেন—
বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ—

—উত্তরে চলিত তুমি—
যদিই বা হয় বক্র পথ
উজ্জয়িনী সৌধমালা
চড়ি পূর্ণ কোরো মনোরথ।

এ প্রসঙ্গে ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—'যখন কোন বাদলের ঝড় উৎকল হইতে গুর্জরের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন রামগিরি অঞ্চলে বর্ষা খুব প্রবল হয়, এবং পূর্ব্বমেঘের রামগিরি হইতে উজ্জয়িনী হইয়া অলকা অভিমুখে যাওয়া খুব সম্ভব হয়।' তবেই মেঘের উজ্জয়িনী-অভিমুখে গতি আবহ-বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। কিন্তু বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী যাইতে হইলে পথে পড়ে নির্বিন্ধ্যা নদী। নির্বিন্ধ্যা বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উত্থিতা ক্ষুদ্র তটিনী—ভাগবতে ও বায়ুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। যক্ষ নির্বিন্ধ্যাকে বিরহিনী নায়িকাভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—

খগপংক্তি কাঞ্চীদাম
বীচিক্ষোভ স্তনিত সুন্দর
বিমুক্ত আবর্ত্ত-নাভি
শ্লথ বাস নগ্ন মনোহর।
* * *
প্রতনু সলিল ধারা
এক-বেণী নদী শিরে বয়
পাণ্ডুচ্ছায়া মুখে তার
তটতরুচ্যুত পত্র চয়—ইত্যাদি।

নির্বিন্ধ্যা পার হইয়া অবন্তী বা পশ্চিম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী ('শ্রীবিশালা বিশালা')। উজ্জয়িনী প্রাচীন নগরী—১৫০ খৃষ্টাব্দে টলেমি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উজ্জয়িনীর অপর নাম অবন্তিকা—হিন্দুর পুণ্যতীর্থ—সপ্ত মোক্ষদায়িনী পুরীর অন্যতম—'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা'। কালিদাসের সময়েও উজ্জয়িনীর শ্রী ও সম্পদ অক্ষুণ্ণ ছিল। কবি উজ্জয়িনীর বর্ণনায় যেরূপ পঞ্চমুখ হইয়াছেন, তাহাতে অনেকে মনে করেন, কালিদাস নিশ্চয়ই উজ্জয়িনীর নাগরিক ছিলেন—
স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈ র্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডম্ একম্

—সুকৃত হইলে স্বল্প
স্বর্গবাসী নীত ধরাপর
(তারি) শেষ পুণ্যে বিরচিত
স্বর্গখণ্ড অতি মনোহর!

উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীতটে অবস্থিত (শিপ্রা বিন্ধ্যের উত্তরসানু হইতে উত্থিত হইয়া চম্বল নদীতে পতিত হইয়াছে) এবং শিপ্রার মৃদুবাতে শীতলিত—

শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ

মৃদু শিপ্রাবায়ু—যেন

প্রিয়তম প্রার্থনাচটুল।

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতীতীরে চণ্ডীশ্বর মহাকালের বিখ্যাত মন্দির। মহাকাল শৈবদিগের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম—উজ্জয়িন্যাং মহাকালঃ। কালিদাস সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন (রঘুবংশের প্রথম শ্লোক এবং শকুন্তলার নান্দী ইহার প্রমাণ)—সেইজন্য যক্ষের মুখ দিয়া মেঘকে বলাইয়াছেন—উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে অবশ্য অবশ্য যাইও এবং—

সন্ধ্যা পূজাকালে কবি

শূলপাণি-ডুন্দুভি-বাদন

তুলি মন্দ্র সুমহান্

সফলিও জীমূত-জীবন।

মহাকাল মন্দিরের উত্তরে গম্ভীরা নদী—মালবের ক্ষুদ্রা তটিনী। জিনসেনের আদিপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতঃ চেতসীব প্রসন্নে

ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্

প্রকৃতিসুভগ মেঘ।

প্রসন্ন সলিলে গম্ভীরার

প্রতিবিম্ব রূপে তব

যেন চিত্তে—হইবে প্রসার।

গম্ভীরার পর উত্তরগামী পথে দেবগিরি। এ দেবগিরি বর্ত্তমান দৌলতাবাদ নয়—ইহা পুণ্য স্কন্দ-স্থান—'may be the same as Devagara, situated south of Chambal in the centre of Malava' (Wilson) হে মেঘ!

সেখানে নিয়তবাস

স্কন্দদেব—পুষ্পমেঘাকারে

সিক্তো তাঁরে ব্যোমগঙ্গা-

জলসিক্ত ঢালি পুষ্পাসারে!

দেবগিরির উত্তরে চর্মণ্বতীনদী—বর্ত্তমান নাম চম্বল। 'It rises 8 or 9 miles S W of Martta-nagar from the Vindyas and falls into the Jamna after a course of nearly 570 miles'

প্রবাদ এই—চর্মণ্বতী নদী প্রাচীন নরপতি রন্তিদেব-কৃত গোমেধযজ্ঞের ফল—

স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্

—চর্মণ্বতী পারে নদী

গোমেধজা—করিও সম্মান

রন্তিদেব-কীর্তিধারা

ইহ স্রোতোরূপে বহমান।

চর্মণ্বতীর উত্তরে দশপুর—

পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্।

দশপুর পশ্চিম মালবের প্রাচীন স্থান—মহাভারতে ও গুপ্ত শিলালেখে ইহার উল্লেখ আছে। Dr Kleine has identified it with Dasor or Mandasor, which is 80 miles away from উজ্জয়িনী, and stands on a branch of the Chambal called শিবনা in অবন্তীদেশ (Western Malwa)

এই বার মেঘ আরও উত্তরে অগ্রসরি ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রবেশ করিবে—

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদম্ অথ ছায়য়া গাহমানঃ—সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত—দেবনদী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর অন্তরা-দেশ—

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোরন্তরম্ (মনু)

—যেথানে, ক্ষত্রিয় নিধনকারী

কুরুক্ষেত্র দারুণ প্রান্তর

—ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধন পিশুনং কৌরবং তং ভজেথাঃ।

কুরুক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ভূমি—প্রায় ৪০ ক্রোশ ব্যাপী—হস্তিনাপুরের উত্তর পশ্চিমে ও স্থানেশ্বরের সন্নিকট। ইহার পর মেঘের পথে সরস্বতী নদী। সরস্বতীর ভৌগোলিক বিবরণ এইরূপ—

"Rising in the Simur State it falls

from the southern slopes of the Himalayas, skirts Sthaneswar, flows through Karnul and Patiala and runs into the great desert where it is lost"

সরস্বতী পুণ্যতীর্থ—এক সময়ে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া যুক্ত ত্রিবেণী রচনা করিত। এখন গতিভঙ্গে মরুস্থলীর বালুকাস্তরে অদর্শন হইয়াছে। কালিদাসের সময়ে কি সরস্বতী বহতা ছিল? তিনি অন্ততঃ মেঘকে উপদেশ দিয়াছেন—

সেই সরস্বতী নীরে
অবগাহি পাপবিমোচন
অভ্যন্তরে হবে স্বচ্ছ
মাত্র বাহ্য কালিম বরণ।

ইহার পর উত্তরগামী পথে কনখল। কনখল কুরুক্ষেত্রের প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে। কনখলও পুণ্যতীর্থ। এখানে গঙ্গার নীলধারা প্রবাহিত —অদূরে হিমালয়ের পাদশৈল (foothills) শিবালিক পর্ব্বত।

চল কনখল এবে
যথা গঙ্গা হ'তে হিমাচল
সগর সন্তান স্বর্গ-
পংক্তি রূপা—নামেন ভূতল।

ইহার পরই তুষার-ধবলিত হিমাচল। যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—

জন্মে গঙ্গা যে অচলে
মৃগনাভি-গন্ধে সুরভিত
লভি এবে হিমালয়—
শৃঙ্গ যার তুষারে আবৃত—
পথশ্রম বিনোদিতে—
শৃঙ্গে তার হ'লে সমাসীন
হবে শোভা পঙ্ক যেন
শ্বেত হর-বৃষশৃঙ্গ লীন।

হিমালয়ে অনেক দ্রষ্টব্য আছে—কিন্তু বিশেষ করিয়া মহাদেবের চরণচিহ্ন, (হরকা পায়রী) দর্শন করিও।

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণ ন্যাসম্ অর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিত বলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ—

সে অচলে ব্যক্ত যেই
চন্দ্রমৌলি-বিন্যস্ত চরণ
নিত্য পূজে সিদ্ধগণ—
—ভক্তিনম্র কোরো প্রদক্ষিণ।
শ্রদ্ধায় দেখিলে পদ,
দেহনাশে মরণের পরে
শ্লাঘ্য প্রমথ পদ
নষ্ট-পাপ পায় চিরতরে।

হিমালয় দৈর্ঘ্যে "স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" —প্রস্থে প্রায় একশত ক্রোশ ব্যাপী। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত। তিব্বত একটি অত্যুচ্চ সুপ্রশস্ত মালভূমি (Table-land)। তিব্বতে গমন করিতে হইলে কোন একটি রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিতে হয়। তিব্বতীরা এই সকল রন্ধ্রপথকে—'লা' বলে—যথা নাথু লা, জালাপ লা ইত্যাদি। যক্ষ যে রন্ধ্রপথ দিয়া মেঘকে তিব্বতে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন—তাহার নাম—ক্রৌঞ্চরন্ধ্র (হংসদ্বার)। এই পথে নাকি 'মানসোৎকাঃ হংসাঃ' মানসসরোবরে গতাগতি করে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, এই হংসদ্বার Niti Pass-এর সহিত অভিন্ন। প্রবাদ এই যে এক সময় পরশুরাম স্কন্দদেবের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া হিমগিরির কঠিন শিলা কাটিয়া এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র রচনা করিয়াছিলেন। যক্ষ বলিতেছেন—

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতি যশোবর্ত্ম যৎক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।

হিমাদ্রির তটে তটে
সবিশেষ দ্রষ্টব্য দেখিয়া
ভৃগুপতি যশোগুহা

হংসদ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া
চলিবে উত্তর মুখে
লম্বমান ন্যুব্জদেহ হেন
বলিনিয়ন্ত্রণোদ্যত
শ্যামবর্ণ বিষ্ণুপদ যেন।

যক্ষ বলিতেছেন—নিতি-পাস দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়া, মেঘ! একবারে সরাসর কৈলাসপর্ব্বতে উপনীত হইও—এবং কৈলাসের কুমুদধবল শৃঙ্গে বিশ্রাম করিও—

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃকুমুদধবলৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ
—কুমুদধবল শৃঙ্গ
সমুচ্ছ্রিত—ব্যাপিয়া আকাশ,
ঘনীভূত যুগ যুগ
যেন ত্র্যম্বকের অট্টহাস।

কৈলাসের conical শৃঙ্গ ২০২২৬ ফিট উচ্চ—ঘন তুষারে চিরাবৃত। কৈলাস মানুষের বাসযোগ্য নয়—কিন্তু তথাপি উহা হরগৌরীর স্থান—

সেই ক্রীড়াশৈলে গৌরী
পদব্রজে ফিরেন ভ্রমিয়া
ভুজঙ্গ-বলয়-ত্যাগী
হরকর শ্রীহস্তে ধরিয়া।

কৈলাসের দক্ষিণ পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ মানসসরোবর—উহার ব্যাস (diameter) ১৫½ মাইল—নীল সলিলের গভীরতা ২৫০ ফিট। মানস সরঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই পুণ্যতীর্থ, প্রতি বৎসর যাত্রিদল তীর্থযাত্রা করিয়া মানসের তীরে সমবেত হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পর্য্যটক মানসের শোভা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাসের কি মানসসরঃ স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল? না ঘটিলেও তিনি ভাবনেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া মেঘকে বলিতেছেন—

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
—কনক কমলপ্রসূ মানসের কোরো জলপান
এবং ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতে
—কল্পবৃক্ষকিশলয় মৃদুবাতে কোরো সঞ্চালন।

এইবার অলকা—কৈলাসের উৎসঙ্গে—মেঘের গম্যস্থান—

কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে।
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
নত্বংদৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্
—কামগতি! সে কৈলাসে
শ্লথগঙ্গা সূক্ষ্ম বাস পরি
প্রিয় অঙ্কে লগ্না যেন
চিনিবে না অলকা সুন্দরী?

অলকা ভৌম স্থান নয়—কল্প-পুরী। তাহার বর্ণনায় কবি কল্পনার সমস্ত সম্ভার পুঞ্জীভূত করিয়াছেন—কিন্তু সে ভূগোল নয়—কাব্য। যক্ষ-দূত মেঘকে অলকায় পৌঁছিয়া দিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করি—এখন দূত নিজের দৌত্য সম্পূর্ণ করুন।

মাণিক্যবাচকের একটী স্তোত্র

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

[তামিল বানান ধরিয়া তামিল শব্দগুলির প্রতিবর্ণীকরণ করা হইয়াছে। 'ে' এবং 'ো' =দীর্ঘ এ, দীর্ঘ ও ; ঝ = zh ; ন, র =তামিলের বিশিষ্ট 'তালব্য' ন ও র ধ্বনি, ব = অন্তঃস্থ ব, v বা w ; ळ =মূর্ধন্য ল।]

ভক্তিবাদ অল্পবিস্তর উত্তর-ভারতে থাকিলেও, দক্ষিণ ভারতে 'তমিঝ্-নাটু' বা 'তামিল্-নাডু' অর্থাৎ দ্রাবিড়-দেশেই যে ইহার সমধিক বিকাশ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরে পরানুরক্তি, ঐশী শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ও ঐশী শক্তির নিকট আত্মনিবেদন, ঈশ্বরে প্রীতিভাব--এগুলি বৈদিক যুগ হইতেই ভারতীয় ধর্মজগতে পাওয়া যায়; ঋগ্বেদে বরুণদেবের ও অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত এমন কতকগুলি ঋক্ অথবা সূক্ত পাওয়া যায়, যেগুলিতে ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা প্রকটিত দেখা যায়। অবশ্য, পরবর্ত্তী যুগে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়া যেভাবে ভক্তিধর্ম বিকসিত হইয়াছিল, ঠিক সে ভাবটী প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যে মিলে না। নানা উল্লেখ ও ইঙ্গিত দেখিয়া মনে হয়, বিশেষ করিয়া দ্রাবিড়-দেশেই বিষ্ণু ও শিব, ঈশ্বর প্রকৃতির এই দুই মহনীয় কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। দ্রাবিড়দেশেই এমনটী হইবার কারণ কি, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান হয়, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে, তামিল দেশে উত্তর ভারত হইতে আগত বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন আর্য-পূর্ব যুগের দ্রাবিড় ধর্মের অবশেষ, এই চারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, ভক্তিধর্ম ব্রাহ্মণ্য ও দ্রাবিড় ধর্মের মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়। সমগ্র ভারত জুড়িয়া ব্রাহ্মণ্য ও দ্রাবিড় ধর্মের সম্মিলিত দেবলোক হইতে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে, পৌরাণিক বা হিন্দুজগতের শিব ও বিষ্ণুর উদ্ভব এবং বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ঘটিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তিধর্ম খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের মধ্যেই তাঁহাদের নামের ও লীলার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। নিজেদের জীবনে যাঁহারা ভক্তিধর্মকে ফলবান্ করিয়াছিলেন, শিব বা বিষ্ণুর প্রতীকের মাধ্যমে ঈশ্বরের সত্তাকে প্রেমময় জ্ঞানময় ও মঙ্গলময় রূপে যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দ্রাবিড়দেশে এবংপ্রকার অনুভূতিশালী কতকগুলি সাধক, যেন দিব্যোন্মাদ দ্বারা অভিভূত হইয়া, নিজেদের জীবন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক গানের সাহায্যে জনগণ মধ্যে ভক্তিধর্মের প্রচার করিয়া-ছিলেন, দেশে ভক্তির স্রোত বহাইয়াছিলেন।

দ্রাবিড়দেশের এই সমস্ত ভক্তকবি ও সাধকদের কতকগুলির নাম ও তাঁহাদের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী দ্রাবিড় দেশে সুপরিচিত, এবং ইঁহাদের রচনাও পাওয়া যায়। বিষ্ণু প্রতীকে যাঁহারা উপাসনা করতেন, এরূপ ভক্ত কবিদের 'আঝ্ বার্' (Āzhvar) বলে। আঝ্ বার্-রা সংখ্যায় ছিলেন ১১ জন, ইঁহাদের নাম যথাক্রমে—পেয়্, পূতত্ত (ভূদত্ত), পোয়্ কৈ, তিরুমঝিচৈ, নম্ম্ ন, কুলচেকরন্ (কুলশেখর), পেরিয়ন্, আণ্টাळ্ (আধুনিক উচ্চারণে আণ্ডাळ্), তোণ্টরটিপ্পোটি, তিরুপ্পান্

এবং তিরুমঙ্কৈ। ইঁহাদের রচিত তামিল গান বা পদ, শ্রীনাথমুনি কর্তৃক 'নালায়িরপ্-পিবপন্তম্' (বা 'নাল্-আয়ির-প্রবন্ধ'=চারি সহস্র প্রবন্ধ বা পদ) নামে মহাগ্রন্থে সংগৃহীত আছে। শ্রীনাথমুনি খ্রীষ্টীয় ৯২০ সালে দেহত্যাগ করেন; সুতরাং আঝ্‌বার্-গণ খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বেকার মানুষ ছিলেন। অবশ্য, তামিল-দেশে আঝ্‌বার্-দের সময় সম্বন্ধে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির মত প্রাচীন যুগের ধারণা আছে—প্রচলিত তামিল বিশ্বাস মতে ইঁহাদের সময় ছিল খ্রীঃ পূঃ ৪২০৩ হইতে ২৭০৬-এর মধ্যে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, আঝ্‌বার্‌গণ খ্রীষ্ট জন্মের পরে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হন (৫০০ হইতে ৯০০র মধ্যে)।

শিব-প্রতীক আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের সাধনা ছিল, যাঁহারা শুদ্ধা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই চাহিতেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিজন সমধিক প্রখ্যাত। এই চারিজনের নাম—চম্পান্তর্ (সম্বন্ধ), অপ্পর্‌চুবামি (অপ্পর্-স্বামী), চুন্তরর্ (সুন্দর বা সুন্দর মূর্তি স্বামী) এবং মাণিক্ক-বাচকর্ (মাণিক্য বাচক)। এই চারিজন শৈবভক্ত 'চিত্তর্' বা 'শিত্তর' (সিদ্ধ বা সিদ্ধ পুরুষ) আখ্যায় অভিহিত হন, এগার জন বৈষ্ণব ভক্তকে যেমন 'আঝ্‌বার্' বলা হয়। সম্বন্ধ, অপ্পর্, ও সুন্দর, এই তিনজনের রচিত সঙ্গীত 'তেবারম্' (দেবারম্) নামক গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। নম্পি-আণ্টার্-নম্পি (বা নম্বি-আণ্ডার্-নম্বি) কর্তৃক ৭৯৭ পদ বা শ্লোকময় এই গ্রন্থ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০০০-এ সংকলিত হইয়াছিল। মাণিক্যবাচকের ৫১টী পদ বা কবিতা পাওয়া যায়—এগুলি পৃথক্ আকারে 'তিরুবাচকম্' (অর্থাৎ 'শোভন-উক্তি') নামে একখানি বইয়ে রক্ষিত আছে। এই চারিজন শৈব সিদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে আঝ্‌বারদের মত অতটা প্রাচীনত্ব আরোপিত হয় না বটে, তবে নিশ্চিতভাবে ইঁহাদের জীবৎকাল জানা যায় না। অনুমান হয়, ইঁহারা আঝ্‌বার-দেরই সমকালীন ছিলেন, এবং খ্রীষ্টীয় ৫০০ হইতে ৯০০ বা ১০০০-এর মধ্যে জীবিত ছিলেন। ভক্তিধর্ম, শিব-ভক্তি ও বিষ্ণুভক্তি এই দুই ধারায়, একই কালে দ্রাবিড় দেশে প্রবাহিত ছিল। দ্রাবিড় দেশের এই অভিনব ভক্তিবাদ পরে উত্তর ভারতকেও প্লাবিত করিয়া, বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠার চিত্তকে সরস ও উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল।

'আঝ্‌বার্' ও সিদ্ধদের রচনা তামিল দেশের বৈষ্ণব ও শৈবেরা অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে অবশ্য পালিতব্য অঙ্গ-স্বরূপ এখনও ইঁহারা এইসব পদ পাঠ বা গান করিয়া থাকেন। নালায়ির-প্রবন্ধম, দেবারম্ ও তিরুবাচকম্ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তিরুবাচকম্ পুরাপুরি, ও অন্য সংগ্রহগ্রন্থ দুইটী আংশিকভাবে, ইংরেজীতে অনূদিতও হইয়াছে। জগতের ভগবদ্‌ভক্তিতে অনুপ্রাণিত কাব্য সাহিত্যে ও সাধন-সাহিত্যে এই প্রাচীন তামিল স্তোত্রগুলির স্থান অতি উচ্চে। এগুলি পাঠ করিলে উপাসনা বা আরাধনার কাজ হয়, মনে অনুরূপ চিত্তপ্রসাদ আসে—বিশেষ করিয়া মাণিক্য-বাচকের ভক্তিময় অপূর্ব পদগুলি পাঠ করিলে।

ইংরেজ পাদরি, বিখ্যাত তামিল ভাষাবিৎ, পরলোকগত জী-ইউ পোপ সাহেব, 'তিরুবাচকম্'-এর একটী সুন্দর সংস্করণ ১৯০০ সালে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত করেন। ইহাতে উপরে মূল তামিল ও নীচে চমৎকার একটী ইংরেজী অনুবাদ আছে, আর তা ছাড়া, নানা মূল্যবান্ তথ্যে পূর্ণ বিরাট্ ভূমিকা আছে। একটী শব্দসূচী আছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে বসিয়া পোপ-এর অনুবাদের

মারফৎ তিরুবাচকম্ পাঠ করিয়াছিলাম। পরে ১৯১৬ সালে এই বই একখণ্ড সংগ্রহ করি; তাহার পর হইতে তিরুবাচকম্-এর ভক্তি স্রোতে মাঝে মাঝে অবগাহন করিয়া পূত হইয়া থাকি। পোপ-এর ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করিয়া, ও মূল তামিলের মধ্যে প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দগুলি যথাসম্ভব ব্যবহার করিয়া, তিরুবাচকম্-এর প্রথম পদ বা স্তোত্রটীর বঙ্গানুবাদ দিতেছি। অনুবাদ সহজ সাধুভাষার গদ্যে করিবার প্রয়াস করিয়াছি; ইংরেজী অনুবাদের বাহিরে নূতন কিছু আনি নাই। ইংরেজী অনুবাদের মধ্যেও মূলের যে দীপ্তি, যে শক্তির আভাস পাওয়া যায়, আমার অক্ষমতার জন্য বাঙ্গালা অনুবাদে তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইংরেজী হইতে আমার এই অনুবাদ, ইংরেজী ও বাঙ্গালা, এই দুইটী ভাষার পরদায় মূল রচনার আলো যে কতটা ঢাকা পড়িয়াছে, তাহা অনুমেয়। তথাপি শ্রীমাণিক্যবাচকের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার রচনায় আমাকে যে আনন্দের অধিকারী করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, সুধীগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

এই স্তোত্রটীর নাম—'শিবের পুরাতন লীলা কীর্ত্তন' [শিবপুরাণম্], অথবা 'অনাদি ও অনন্ত কাল ধরিয়া শিবের চরিত্র' [শিবনতনাতিমুরৈ-মৈয়ানপঝমৈ]। স্তোত্রটী আট খণ্ডে বিভক্ত।

১। প্রণাম-স্তোত্র [তোত্তিরঙ্কল]

নমঃ শিবায় মন্ত্রের জয়।

প্রভুর শ্রীচরণের জয়।

যিনি এক নিমেষও আমার মনের বাহিরে যান না, তাঁহার শ্রীচরণের জয়।

তীর্থরাজ, কোকঝির অধিপতি, গুরুমণি শিবের শ্রীচরণের জয়।

আগমশাস্ত্রের ন্যায় যিনি আবির্ভূত হন, যিনি স্থির থাকেন, যিনি আগমন করেন, তাঁহার শ্রীচরণের জয়।

যিনি এক, যিনি অনেক, যিনি রাজা, তাঁহার শ্রীচরণের জয়।

আমার প্রাণের আকুলতা যিনি দূর করিয়াছেন, যিনি আমাকে তাঁহারই করিয়া লইয়াছেন, সেই রাজার শ্রীচরণের জয়।

যিনি জন্ম-শৃঙ্খল ছেদ করেন, সেই জটাপিনদ্ধের মণিমণ্ডিত শ্রীচরণের জয়।

যিনি বাহিরের লোকেদের নিকট হইতে সুদূরে, তাঁহার শ্রীচরণ-কমলের জয়।

যিনি বদ্ধাঞ্জলি সেবকদের মধ্যে বিলাস করেন, সেই রাজার শ্রীচরণ-মঞ্জীরের জয়।

যাহারা মাথা নত করিয়া থাকে তাহাদের যিনি তুলিয়া লন, সেই মহিমময়ের শ্রীচরণ মঞ্জীরের জয়।

ঈশ-চরণে নমস্কার। পিতৃ-চরণে নমস্কার।

উপদেষ্টৃ-চরণে নমস্কার। শিবের অরুণ-চরণে নমস্কার।

স্নেহবশে যিনি নিকটেই আছেন, সেই নির্ম্মল-শিবের শ্রীচরণে নমস্কার।

যিনি মোহময় জন্ম দূর করেন, সেই রাজার শ্রীচরণে নমস্কার।

পেরুন্ তুরৈ তীর্থের দেবতার শ্রীচরণে নমস্কার।

নিজ প্রসাদ-স্বরূপ যিনি ক্লম-রহিত আনন্দ দেন, সেই শ্রীশৈলচরণে নমস্কার॥

২। মুখবন্ধ [মুকবুরৈ]

যেহেতু তিনি আমার চিন্তায় সদা বিরাজমান, কেবল তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, সানন্দচিত্তে আমি শিবের পুরাতন লীলাকথা কহিব; ইহার দ্বারা আমার পূর্ব কর্ম সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হউক।

আমি আসিলাম, ভাল-নেত্র শিব যে অনুগ্রহ করিলেন তাহার অধিকারী হইলাম; চিন্তার অগম্য তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিলাম।

তুমি আকাশ পূর্ণ করিয়া আছ, পৃথিবী পূর্ণ করিয়া আছ, তুমিই স্বপ্রকাশ জ্যোতি।

তুমি চিন্তার অতীত, তুমি অসীম।

তোমার মহিমা বিরাট—ভক্ত আমি, সেই মহিমার স্তুতি করিবার উপায় আমি জানি না॥

৩। বিবিধ জন্ম [পিরপ্পুকল]

আমি তৃণ ছিলাম, আমি লতাগুল্ম ছিলাম, কীট, তরু ছিলাম, বহু বহু প্রকারের পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পাষাণ, মানব, অসুর ছিলাম।

তোমার অনুচরবর্গের মধ্যে আমিও তোমার সেবক ছিলাম।

আমি দুর্ধর্ষ অসুর, মুনি এবং দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম।

এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবরূপের মধ্যে প্রত্যেক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, হে প্রভু, হে মহিমময়, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি॥

৪। জ্ঞানগুরু-প্রাপ্তি [ঞানকুরু]

সত্যই আজ তোমার স্বর্ণময় শ্রীচরণ দেখিয়া আমি মুক্তি পাইয়াছি।

হে সত্যস্বরূপ, তুমি ওঙ্কাররূপে আমার আত্মার মধ্যে বিরাজ করিতেছ, আমি যেন উদ্ধারলাভ করি।

বিমল প্রভু। বৃষভপতি। বেদাধিপতি। উত্থান-পতন-প্রসবণশীল সূক্ষ্মতত্ত্ব।

তাপ তুমি, তুমিই শীত। হে বিমল প্রভু, তুমিই অধিপতি।

কৃপাময় তুমি আগমন করিলে, সমস্ত অসৎ দূর হইল।

হে সত্য জ্ঞান, সত্য মহিমার দ্বারা সমুদ্ভাসিত, জ্ঞান-বিরহিত আমার নিকটে তুমি আগমন করিলে, হে আনন্দময় প্রভু।

হে সুন্দর, হে জ্ঞানস্বরূপ, তোমার প্রভাবে অজ্ঞান দূরে বিতাড়িত হয়॥

৫। পঞ্চকৃত্য [ঐন্তুতোঝিল্]

তোমার বৃদ্ধি, মান বা অন্ত অজ্ঞাত।

সর্ব লোককে তুমি সৃষ্টি কর, পালন কর, সংহার কর, প্রসাদপূর্ণ কর, মুক্তি দাও।

তোমার সেবকগণের মধ্যে আমাকে তুমি স্থান দাও।

তুমি সৌরভ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। তুমি দূরে, তুমি অন্তিকে। তুমি বাগতীত ও চিন্তাতীত প্রণব-বচন।

সম্মিলিত দুগ্ধ, সুমধুর ইক্ষুরস ও ঘৃত যেমন, তুমি তেমনই তোমার মহিমময় ভক্তগণের মধ্যে তাহাদের চিন্তাকে মধুর মত পরিস্কৃত কর।

পুনর্জন্ম-গ্রহণও তুমি নিবারণ কর, হে মহান্ ঈশ॥

৬। শিব-প্রসাদ [অরুল্]

তোমাতে পঞ্চবর্ণ বিদ্যমান (ক্ষিতি=স্বর্ণবর্ণ, অপ্=শ্বেত, তেজ=লোহিত, মরুৎ=কৃষ্ণ, ব্যোম=ধূম্র)।

হে আমাদের মহান্ ঈশ্বর, দেবগণ তোমার স্তব করিয়াছিলেন, তুমি তখন অপ্রকট ছিলে।

কর্মের কঠিন নিগড়ে, মায়ার তমিস্রাময় আবরণে আমি আবৃত ছিলাম।

পঙ্কিল, বিমূঢ়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষভাবে প্রতারিত আমার নবদ্বার গৃহকে পাপ ও পুণ্যের রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া এবং কৃমি ও মল দ্বারা পূরিত করিয়া, উপরে ত্বক্ দ্বারা তুমি আমায় আচ্ছাদিত করিয়াছিলে।

কিন্তু নীচাদপি নীচ গুণহীন আমাকে তুমিই অনুগ্রহ করিয়াছিলে—

তোমারই অনুগ্রহের ফলে যে আমার চিত্ত ইতিপূর্বে পশুত্বের মধ্যে ছিল সেই আমি, হে শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তি-আপ্লুত হইয়া চিত্তপ্লাবী আনন্দের প্রবাহে বিগলিত হইতে পারিয়াছি।

এই পৃথিবীর বক্ষেই কৃপা-পরবশ হইয়া তুমি অবতীর্ণ হইলে;

দাসানুদাস কুকুরাধম আমি পড়িয়াছিলাম, আমাকে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করাইলে;

মাতৃস্নেহের অপেক্ষা মহার্ঘ তোমার সত্ত্ব-স্বরূপ যে করুণা তাহা আমার প্রতি প্রদর্শন করিলে॥

৭। স্তুতি [তুতি]

হে নিষ্কলঙ্ক মহিমা! হে পূর্ণপ্রস্ফুটিত পুষ্পের শোভাস্বরূপ!

হে উপদেষ্টা! মধু অমৃত! শিবপুরাধীশ!

নিখিল-পূজিত! রক্ষক! পাশমোচনকারী!

আমার মানসিক মোহ বিদূরিত হইবে বলিয়া করুণা ও স্নেহের কর্মে তোমার প্রসাদ প্রকাশিত।

অশ্রান্ত স্রোতে প্রবাহিত, লোকোত্তর স্নেহ ও করুণার মহানদ।

যে অমৃতপানে তৃপ্তি মিটে না! হে অসীম, হে মহান্ প্রভু!

যে-সকল জীব তোমাকে চাহে না তাহাদের মধ্যেই নিহিত অপ্রকাশিত জ্যোতি।

বিগলিত ধারায় প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত তুমি যে আমার প্রাণের মধ্যেই রহিয়াছ।

সুখদুঃখবিহীন, অথচ সুখদুঃখযুক্ত!

ভক্তজনে অনুকূল! প্রদ্যোত! সর্বময়! সর্ব-সংহারময়! তমোদ্বারা অনাবেষ্টিত মহান্ প্রভু!

আদি তুমি, তুমি মধ্য, তুমিই অন্ত; তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন।

পিতা, প্রভু, তুমিই তো আমায় টানিয়া লইলে, এবং তোমারই করিলে।

সত্যজ্ঞানের সর্বভেদী দৃষ্টি দ্বারা যে মনীষিগণ দর্শন করেন, তুমি তাঁহাদের নেত্রস্বরূপ, তোমাকে দর্শন করা কঠিন।

তুমি সূক্ষ্মবিচার-স্বরূপ, কেহই তোমার অন্ত পায় না।

শুদ্ধ, গমনাগমনরহিত, সঙ্গাসক্তি-রহিত!

আমাদের রক্ষা-পালক! সকলের অদৃশ্য মহান্ জ্যোতি!

আনন্দ-প্লাবন-স্বরূপ! পিতা! পরিদৃশ্যমান সমস্ত নশ্বর সৌন্দর্যের আভ্যন্তর জ্যোতি! বর্ণনাতীত সূক্ষ্ম জ্ঞান-শক্তি!

এই বিচিত্র জগতে যাহা কিছু সত্য বলিয়া পরিচিত, তুমিই সেই সকলের ধ্রুব-জ্ঞান।

জগতে স্থির-নিশ্চয়তা তুমিই।

আমার চিন্তার মধ্য হইতে উৎস-রূপে উদ্ভূত অপূর্ব অমৃত তুমি।

আমার প্রভু তুমি॥

৮। আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা

[বিণ্ণপ্পম্]

হে গুরু, এই বিকারযুক্ত ক্ষুদ্র শরীর গৃহে অবস্থান করা আর আমার সহ্য হইতেছে না।

হর, তোমার ভক্তগণ সত্যশুদ্ধ হইয়া তোমাকেই আহ্বান করে, তোমার উপাসনা করিয়াই রহিয়া যায়, এবং তোমার স্তুতির দ্বারা অসৎ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক আর এখানে ফিরিয়া আসে না।

কর্ম ও জন্ম মানুষে যে লিপ্ত থাকে না, এবং এই মায়াময় ভোগেচ্ছাপূর্ণ দেহের পাশ হইতে মানুষ যে মুক্ত হইতে পারে, সে কেবল তোমারই শক্তিতে।

প্রভু, তমোবনকে বিদলিত করিয়া তুমি নৃত্য কর;

তিল্লৈ-এর (চিদম্বরম্ বা মানব চিত্তের) নটরাজ! দক্ষিণ-পাণ্ড্য-দেশ-নিবাসী!

তুমি পাপ পুনর্জন্ম ধ্বংস কর।

তোমার আরাধনা করিয়া লোকে তোমার নাম দেয়, কিন্তু কথায় তোমার প্রকাশ সম্ভব নয়।

তাহার পরে, তোমারই শ্রীচরণতলে লোকেরা তাহাদের স্তুতির অর্থ বুঝিতে পারে।

শিবপুরীতে যে বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত বাস করেন, শিবের চরণের আশ্রয়ে অবনত থাকিয়া তাঁহারা শিবেরই স্তবন করেন॥

বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন

অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ—উপনিষৎ সমূহই বেদের অন্ত বা চরমভাগ। উপনিষৎ সমূহে যে তত্ত্ববিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বেদান্তদর্শনের উপজীব্য। অতি প্রাচীন কাল হইতেই উপনিষদের বাণী সমূহ আলোচনা করিয়া তাহাদের পরস্পর আপাততঃ বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভগবান বাদরায়ণ এই উদ্দেশ্যে উপনিষদ্ বাক্য সমূহের সমন্বয় করিয়াছেন তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রের মধ্যে। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রই এ জাতীয় প্রয়াসের চরম ফল। পূর্ব্বতন ঋষিগণও যে এইরূপ সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। উপনিষদের মৌলিক বাক্য-সমূহের অর্থ লইয়া যেখানে মতভেদ উত্থিত হইয়াছে, সেখানে মহর্ষি বাদরায়ণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিমত সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে আচার্য্যগণ এই বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার উপর বৃত্তি বা ভাষ্য রচনা করেন। আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে তিনি বোধায়নকৃত অতি বিস্তীর্ণ বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, সেই মত অবলম্বনে তিনি 'শ্রীভাষ্য' রচনা করেন। অপর ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য ও উপবর্ষপ্রণীত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন, ইহা বলিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'শারীরক ভাষ্যে' অনেক স্থলে বৃত্তিকারের মত বলিয়া কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাতার মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এই বৃত্তিকার কে—তিনি বোধায়ন কিংবা উপবর্ষ অথবা অন্য ব্যক্তি এবিষয়ে কোন অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সমূহের মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত শারীরকভাষ্যই অতি প্রাচীন এবং তৎপ্রণীত উপনিষদের ভাষ্য সমূহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাখ্যা। রামানুজ, মধ্ব, ভাস্কর, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সকলেই ব্রহ্মসূত্রের উপর এবং কেহ কেহ উপনিষদের ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার উপর ভাষ্য রচনা করেন। উপনিষদ্ সমূহকে শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়প্রস্থান ও ভগবদ্গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক আচার্য্য বা তদনুবর্ত্তী শিষ্যগণ প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য বা টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্য ভাষ্যকারগণ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী। শঙ্করাচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের উপরেই ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তিনি এই ভাষ্য সমূহে যে মতের প্রচার করিয়াছেন, তাহার নাম 'অদ্বৈতবাদ'। এই অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় স্থূলভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই তিনটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে হইবে। প্রথম, একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। দ্বিতীয়, জগৎ প্রপঞ্চ নানা বিচিত্র আকারে প্রতীতিগোচর হইলেও তাহা অবিদ্যা-কল্পিত। তৃতীয়, জীবগণও এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই অবিদ্যাকৃত বিবর্ত্ত বা প্রকাশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্তদ্বয়ের উপজীব্য সিদ্ধান্ত 'মায়াবাদ'। ব্রহ্ম যদিও এক এবং তদ্ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকিতে পারে না, তথাপি প্রতীয়মান নানাত্বের অপলাপ করা যাইতে পারে না বলিয়া এই নানাত্বের সহিত একের অবিরোধ উপপাদন করা আবশ্যক। যদিও নানা দার্শনিক এই একের

সহিত বহুর বিরোধের সমাধান নানা প্রকার কল্পনার সাহায্যে সম্পাদন করিয়াছেন, তথাপি সেই সমস্ত সমাধান ও সিদ্ধান্ত ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদের অনুকূল হয় নাই। রামানুজ একের সহিত বহুর অঙ্গাঙ্গিভাব বা শরীর-শরীরিভাব সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া এক ও বহুর সমন্বয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মধ্বাচার্য্য এই বিরোধের সম্ভাবনাই স্বীকার করেন না। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রুতি (উপনিষদ্) ও যুক্তির স্বারসিক গতির উপর কিছু না কিছু সঙ্কোচ করা হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই শ্রুতি ও যুক্তির স্বরসের প্রতিকূলতা না করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নানাকে জোড়াতাড়া দিয়া একের মধ্যে স্থান দিবার প্রয়াস করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যায় যুক্তি বিরোধ নাই। যুক্তির কণ্ঠরোধ করিয়া শ্রুতির স্বমতানুকূলে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াসও তাঁহার ভাষ্যে দেখা যায় না। যদি কোন স্থলে শ্রুতির আপাত-প্রতীত অর্থের পরিহার করিয়া লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা হইয়াছে, সেস্থলে নিপুণভাবে এবং অপক্ষপাতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে যুক্তিবিরোধ পরিহার করাই সে স্থলে ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। অদ্বৈতবাদী সত্যনির্ণয়ের উপায়রূপে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই তিনটী প্রমাণ অবলম্বন করেন। ইহাদের অবিসংবাদে ও একবাক্যতায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাই উপাদেয় হইয়াছে এবং যেমত স্বীকার করিলে ইহাদের মধ্যে অন্যতমের বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেমত তাঁহার মতে ত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাঁহার ব্যাখ্যা সমীচীন ও যথার্থ এ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের সহিত অর্ব্বাচীন কালে সমুদ্ভূত বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের কোথায় মিলন ও কোথায় বিচ্ছেদ ইহা সংক্ষেপে বিচার করিব এবং প্রাচীন ও নবীন মনীষিগণ অদ্বৈতবাদের সহিত বৌদ্ধমতবাদের অভেদ কল্পনা করিয়া যে সমস্ত আক্ষেপ করিয়াছেন তাহার সারবত্তা বিচার করিব। যাহা হউক, একের সহিত প্রতীয়মান নানাত্বের বিরোধের সমাধান প্রত্যেক আচার্য্যকেই করিতে হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'নানা' আপাতপ্রতীয়মান হইলেও তাহার পরমার্থ সত্তা নাই। তাহা শুক্তিতে রজতের ন্যায় মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু সৎস্বরূপে মিথ্যার প্রতীতিই বা হয় কেন এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে অবিদ্যা বা মায়াই এইরূপ প্রতীতির হেতু। এই অবিদ্যার আশ্রয় চৈতন্য এবং অনাদিকাল হইতে ইহা বর্ত্তমান এবং ইহা বিচিত্র নানা ভেদসম্ভারপূর্ণ জগৎস্বরূপে এক চৈতন্যকে প্রতিভাসিত করে। অবিদ্যার স্বরূপ, চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধ এবং জীব ও জড় প্রভৃতিভেদে চৈতন্যের প্রতীতিতে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি অতি জটিল সমস্যার সমাধানে বেদান্তদর্শন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার বুঝিতে হইলে বেদান্তদর্শনের চরম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহে ব্যুৎপত্তিলাভ করা প্রয়োজন।

মায়াবাদই অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে। মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান এই তিনটী শব্দ মূলতঃ সমানার্থক। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা জ্ঞানের অভাব মাত্র নহে, তাহা ভাবরূপ। অন্ধকার যেমন প্রকাশকে আবৃত করে, তেমনি এই অবিদ্যা আত্ম-চৈতন্যস্বরূপ প্রকাশকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে জীবের সৃষ্টি হয়। জীব নিজের অসঙ্গ ও চিদানন্দ স্বভাব বুঝিতে পারেনা—তাহার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল স্বরূপের আবরণমাত্রই সম্পাদন করে ইহা নহে, উহা চৈতন্যের উপর নানা বিচিত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি করে এবং চৈতন্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়। তাহার ফলে এক অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন বস্তু স্বরূপতঃ চৈতন্য ও

আনন্দ স্বরূপ হইয়াও নিজেকে পরিচ্ছিন্ন, অজ্ঞানাবৃত ও নিরানন্দ বলিয়া মনে করে। দেহ ও ইন্দ্রিয় এই অবিদ্যার সৃষ্টি এবং চৈতন্য নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এই জীবত্বও অবিদ্যক এবং মিথ্যা। মিথ্যা শব্দের অর্থ অসৎ নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। অর্থাৎ যাহাকে সৎ কিংবা অসৎ বলিয়া নির্বচন (define) করা যায় না, তাহা অনির্বাচ্য। দেহ প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর স্বভাবই এই যে ইহাকে সৎ বলা যায় না। কারণ 'সৎ' তাহাকেই বলা যায় যাহা দেশ বা কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না এবং কোন দেশ বা কালে বাধিত হয় না। যাহা 'সৎ' তাহার অসত্তা হইতে পারে না।* 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' এই গীতা বাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সৎ ও অসতের এইরূপ স্বরূপ নির্বচন করিয়াছেন। 'যদ্ বিষয়া বুদ্ধি র্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্ বিষয়া ব্যভিচরতি তৎ অসৎ'। অর্থাৎ যে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানের ব্যভিচার হয় না তাহা সৎ এবং যে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানের ব্যভিচার হয় তাহা অসৎ। ঘট বিষয়ে জ্ঞান হয়, কিন্তু পট বিষয়ক জ্ঞান কালে ঘটের জ্ঞান হয় না। অতএব ঘট 'সৎ' নহে। এইরূপে পটবিষয়ক জ্ঞানও ব্যভিচারী হয়, সুতরাং পটও সৎ নহে। কিন্তু সমস্ত বিষয় জ্ঞানেই 'সত্তার' জ্ঞান হয় এবং এই সত্তাজ্ঞানের ব্যভিচার হয় না। ঘট জ্ঞানেও 'সৎ ঘট', পট জ্ঞানেও 'পট সৎ' এইরূপে সতের জ্ঞান অব্যভিচারী হয়। 'ঘট নাই' এরূপ জ্ঞানে অর্থাৎ অভাববিষয়ক জ্ঞানেও সত্তার জ্ঞান হইয়া থাকে। অভাব ও 'সৎ' বলিয়াই প্রতীত হয়। অবশ্য 'সত্তা' অভাবের ধর্ম নয়, তথাপি অধিকরণের সত্তাই অভাবে প্রতিভাত হয়। এ কারণে মীমাংসকগণ অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা অভাবকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারাও অভাবের অধিকরণে সত্তা আছে বলিয়া সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সত্তা অভাবের বিশেষণরূপে প্রতীত হয় ইহা বলেন। ফলে সত্তার জ্ঞান সর্বত্র অব্যভিচারী হয় বলিয়া ইহা অস্বীকার করা যায় না এবং ইহাকে 'সৎ' বা 'সত্য' বলিয়া মানিতেই হইবে। এইরূপে যাহার অপলাপ করিলে স্ববিরোধ বা স্বব্যাঘাত (Self-Contradiction) দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, তাহাকে সৎ বলিয়া মানিতেই হইবে। এই নীতি অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে জ্ঞান বা চৈতন্য সৎ পদার্থ। কারণ জ্ঞান নাই এইরূপ নিষেধ করিলেও জ্ঞানের সত্তা নিষিদ্ধ হয় না। 'জ্ঞান নাই'—ইহা আমরা জ্ঞানের সাহায্যেই নিষেধ করিতে পারি এবং তাহাতে জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতে হইল। অন্য সমস্ত জ্ঞেয়ের নিষেধ করিলে স্বব্যাঘাত দোষ উপস্থিত হয় না। কিন্তু জ্ঞানের নিষেধে তাহা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইজন্য চরম ও পরমতত্ত্ব, যাহাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করেন, সৎ ও চৈতন্য স্বরূপ, ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই সত্তা ও চৈতন্য পৃথক্ নহে, উহা এক। কোন একটি শব্দের ঈদৃশ শক্তি নাই যাহার দ্বারা সত্তা ও চৈতন্যরূপ অভিন্ন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে। এ কারণে দুইটি শব্দের প্রয়োজন। কিন্তু শব্দের ভেদ থাকিলেও অর্থের ভেদ নাই। ইহার কারণ কেবল এই নয় যে সত্তা ও জ্ঞানরূপ দুইটী চরম (Ultimate) তত্ত্বকে স্বীকার করিলে গৌরবদোষ হইবে কিংবা দুইটী অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বীকারে দুইটীকেই পরস্পর পরিচ্ছিন্ন করা হইবে। অবশ্য দুইটি অপরিচ্ছিন্ন বস্তু থাকিতে পারে না। পরিচ্ছেদ শব্দের অর্থ কাল, দেশ বা বস্তুন্তর দ্বারা পৃথক্ করণ। যদি একটি বস্তুর পার্শ্বে অপর বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহার কাল বা

* "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎ সত্যম্। যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ব্যভিচরদনৃতমুচ্যতে"—তৈত্তিরীয়োপনিষদের 'সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম'—এই বাক্যের শাঙ্করভাষ্য।

দেশকৃত পরিচ্ছেদ না হইতেও পারে। কারণ নিত্য ও বিভু দ্রব্যের কাল বা দেশকৃত ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের তাদাত্ম্যাভাবে একটীর দ্বারা অপরটির ভেদ ঘটিত হয় বলিয়া বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ থাকিয়াই যায়। কিন্তু এইমাত্র যুক্তির দ্বারাই সত্তা ও চৈতন্যের অভেদ স্বীকার করা আবশ্যক, ইহা বেদান্ত বলেন না। বেদান্তের যুক্তি আরও গভীর ও সূক্ষ্ম। যদি চৈতন্য সত্তা হইতে পৃথগ্‌ভূত বস্তু হয়, তবে তাহা অসৎ হইবে এবং চৈতন্যকে জগতের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলেও শূন্যবাদে পর্য্যবসান হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে না। অতএব চৈতন্যকে 'সৎ' বলিতেই হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে চরমতত্ত্ব চৈতন্য স্বরূপ হইলে তাহাকে সৎ বলিতেই হইবে ইহা মানিতে হইল। কিন্তু তাহাকে 'সত্তা'-স্বরূপ বলিলে তো চৈতন্য-স্বরূপ বলিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। এই মতও বিচারসহ হইতে পারে না—ইহা আমরা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখিতে পাইব। যদি 'সত্তা' মাত্রই অর্থাৎ চৈতন্য ভিন্ন সত্তাই চরম তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে প্রশ্ন হইবে এই 'সত্তা' বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি না? যদি সত্তা কোন প্রমা অর্থাৎ প্রমাণজনিত জ্ঞানের বিষয় হয়, তবে তাহা অনির্বাচ্যই হইবে অর্থাৎ শুক্তিরজতের ন্যায় মিথ্যা হইবে। জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ যদি শুদ্ধ ভেদাত্মক হয়, তবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তুর ভেদ থাকিবে না। আমরা অজ্ঞাত বলিয়া তাহাকেই নির্দ্দেশ করি, যাহা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বা বহির্ভূত থাকে। যদি জ্ঞাত বস্তুও এইরূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন এবং বহির্ভূত থাকিয়া যায়, তবে তাহাকে অজ্ঞাত হইতে পৃথক্ করিবার হেতু থাকিবে না। আর যদি জ্ঞাত বস্তু জ্ঞানের সহিত অভেদাপন্ন হয়, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকিবে না এবং ইহা বিষয় এবং ইহা জ্ঞান এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে না। ফলে 'জ্ঞান' অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ ভেদ বা অভেদ না হওয়ায়, ইহা অনির্বাচ্য হইবে। যাহা পরস্পর বিরোধী প্রকারে অভিহিত হইতে পারে না, তাহা 'বস্তু' (reality) হইবে না। বস্তু বা সতের লক্ষণই হইতেছে যাহাকে নির্বচন করা যায়। যাহা ভিন্ন নহে, তাহা অভিন্ন হইবে এবং অভিন্ন না হইলে ভিন্ন হইবে। ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে—ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। 'পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ। নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্র বিরোধতঃ"—(ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৩য় স্তবক ৮ম শ্লোক) উদয়নাচার্য্যের এই উক্তিবলে ভেদ ও অভেদের ঐক্যও কল্পনা করা যাইতে পারে না, কারণ ইহাতে স্ববচন বিরোধ (Contradiction in terms) অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

আমরা দেখিলাম জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অনির্বাচ্য। যাঁহারা ইহাকে বিষয়তা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন, তাঁহারাও 'বিষয়তা' বস্তুটি কি, তাহা বলিতে পারেন না। ফলে ইহাকে পরিহার করিয়া চলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করাই দর্শনের উদ্দেশ্য, তাহা পরিহার করিলে নিজের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইবে। বেদান্ত তাই বলেন যাহা জ্ঞেয় তাহা অনির্বাচ্য, কারণ তাহা জ্ঞানের সহিত ভিন্ন বা অভিন্ন ইহা নিরূপণ করা যাইতে পারে না। যেমন রজত শুক্তির সহিত ভিন্ন বা অভিন্ন বলা যায় না, যে হেতু ভিন্ন ঘট পটাদির শুক্তির সহিত অভেদে প্রতীতি হয় না। অভিন্নও বলা যায় না—কারণ তাহা হইলে শুক্তির স্বরূপ জ্ঞানে রজতের বাধ হইত না এবং রজত শুক্তিস্বরূপ হইলে শুক্তির ন্যায় তাহার অবাধিত প্রতীতি হইত। তাহা যখন হয় না—তখন রজতকে অনির্বাচ্য বা মিথ্যা বলিতে হইবে। মিথ্যা তাহাকেই বলা যায়—যাহা কোন অধিকরণে প্রতীত

হইলেও সেখানে কোন কালেই থাকে না। অর্থাৎ যাহা স্বরূপতঃ অসৎ হইয়াও প্রতীতির বিষয় হয়। মিথ্যাকে অলীক বলা যায় না—যেহেতু যাহা অলীক, যেমন চতুষ্কোণ বৃত্ত (square circle), তাহা প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় না। যাহা 'মিথ্যা' তাহা প্রত্যক্ষীকৃত হয়। যদ্যপি পরমার্থতঃ উভয়েই অসৎ, তথাপি উহাদের ভেদ এই স্থলে। দেখা গেল—যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা সৎ নহে—অনির্বাচ্য। যদি চরমতত্ত্ব 'সত্তা' জ্ঞানাত্মক না হয়, তবে তাহা জ্ঞানের বিষয় হইবে এবং তাহা হইলে তাহা অনির্বাচ্য বা মিথ্যা অর্থাৎ পরমার্থতঃ অসৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু 'সত্তা' তত্ত্ব অথচ মিথ্যা বা অসৎ ইহা বলিলে ব্যাঘাত দোষ দুর্নিবার হইবে। কাজেই চরমতত্ত্ব 'সত্তা' ও 'চৈতন্যের' অভেদ, ইহা বলিতে হইবে। দেখা গেল শ্রুতি যাহাকে সচ্চিৎস্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখিলেও অবশ্য স্বীকার্য্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি ও যুক্তির মধ্যে কোন স্থলেই বিরোধ নাই, অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্য ও তদনুযায়ী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যায়। এইরূপে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। তাহার প্রমাণ অনুভবও তন্মূলক যুক্তি। যদি ব্রহ্ম, যিনি জীবের আত্মা, আনন্দ বা সুখ না হইত, তাহা হইলে কাহারও নিজের স্বরূপের প্রতি এরূপ অচ্ছেদ্য প্রেম হইত না। আত্মা সকলেরই প্রিয়—অন্য সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়—এই আত্মার সহিত সম্বন্ধ বলিয়া। 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি—নহি পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।' ইহার অর্থ পতিকে যখন আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া পত্নী গ্রহণ করে, যখন পতির মধ্যে নিজের স্বরূপকে দেখে, যখন পতি ও পত্নী ঐকাত্ম্য প্রাপ্ত হয়—তখনই পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির প্রিয় হইয়া থাকে। আর আমাদের একমাত্র প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হইতেছে আনন্দ বা সুখ। 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'। এই আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ভূমা আনন্দের বিন্দুমাত্র বিষয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া জীব বিষয়ের প্রতি এত লোলুপ। আনন্দ যে বাহিরের বস্তু নহে, তাহা একান্তভাবে ভিতরের এবং তাহা আমাদের স্বরূপ ইহা আনন্দানুভূতির প্রণালী অনুভব করিলেই বুঝা যাইবে। সুখাদ্য ভোজনে সুখ হয় ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—সুখাদ্য হইতে সুখ সমাহৃত হইয়া থাকে কিংবা তাহার দ্বারা নিজের স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তিমাত্র হয়। খাদ্যের মধ্যে সুখ নাই, খাদ্য ভোজনেও সুখ নাই, কারণ সর্ব্বত্রই শ্রম এবং আয়াসের আবশ্যকতা আছে। আয়াস তো সুখের কারণ হইতে পারে না। নিরায়াসতাই সুখ। সুখের অভিব্যক্তি হয় যখন সমস্ত ত্বরা এবং ঔৎসুক্যের অবসান হয়। সে সুখ ভিতরের—তাহা আমাদের স্বরূপের। ইন্দ্রিয়ের তাড়না নিবৃত্ত হইলে, চিত্ত বহির্মুখ প্রয়াস হইতে বিরত হইয়া অন্তর্মুখী হইলে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব-সম্পাতে চিত্তে সুখের উপলব্ধি হয়। কিন্তু চিত্তের এই অন্তর্মুখীনতা সত্ত্বোদ্রেক জনিত এবং এই সত্ত্বোদ্রেক এত ক্ষণিক যে তাহাতে যে সুখের অভিব্যক্তি হয়, তাহা মনুষ্যকে প্রলুব্ধই করে—তৃপ্তি দেয় না। *'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি'—অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ ভিন্ন মনুষ্যের তৃপ্তি কোথায়! এই অনুক্ষণ অতৃপ্তিই মানবের আনন্ত্য ও অসীমতার প্রমাণ। কোন বাহ্য বিষয়, সে যতই বিপুল ও বৃহৎ হউক না কেন, মানবকে তৃপ্তি দিতে পারে না। যেহেতু যাহা বাহিরের তাহা ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন এবং তাই আর্ত্ত—'অতোঽন্যদার্ত্তম্'। তাই একদিন বিষয়ে অতৃপ্তি আসিয়া—বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে—কারণ এইখানেই ভূমানন্দ বর্ত্তমান, অন্যত্র তাহার মরীচিকা মাত্র দেখিয়া জীব বিভ্রান্ত হয়।

আমরা দেখিলাম চরমতত্ত্ব সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। জীবের স্বরূপও এই। আত্মা ও ব্রহ্ম এক। শ্রুতি বলিতেছেন 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি'—এই সমস্ত জগৎ এই আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই ব্রহ্মই আত্মা এবং তুমিও সেই আত্মা। আত্মা বলিতে জীবাত্মাকে বুঝি, তাহার কারণ অবিদ্যারূপ যবনিকা দ্বারা আবৃত আত্মা আমাদের নিকট স্বমহিমায় প্রকাশিত হন না। যখন বিদ্যার দ্বারা এই অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হইবে তখন ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, কারণ ভেদজ্ঞান মিথ্যা এবং ভ্রান্ত এবং যাহা মিথ্যা ভ্রমাত্মক, তাহা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত

* তৈঃ উঃ ব্রহ্মানন্দবল্লী ৫ম অঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হয়। শুক্তির স্বরূপ জ্ঞাত হইলে তাহাতে কল্পিত রজতের ভ্রম দূর হইয়া যায়—ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া সৎস্বরূপ নহে। কারণ 'সতের' বিনাশ নাই। কিন্তু ইহা 'অসৎ'ও নহে। যদি অসৎ হইত ইহার অর্থক্রিয়া-কারিত্ব থাকিত না। যাহা কোন অর্থক্রিয়া বা কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহা অলীক হইতে পারে না। অলীকের কোন কার্য্যকারিতা নাই। তাই বলিয়া অবিদ্যাকে 'সদসদাত্মক' বলা যায় না—কারণ পরস্পর বিরোধী ধর্মের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। কাজেই ইহা অনির্বাচ্য এবং অনির্বাচ্য বলিয়াই অবস্তু ও অপরমার্থসৎ। অবিদ্যা কেন আছে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হয়—ইহা জিজ্ঞাসা করা যায় না। যেহেতু ইহার উৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহার উপাদান কারণরূপে অপর অবিদ্যার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে এবং ইহা যে আছে তাহা অনুভবসিদ্ধ। আমরা সকলেই অনুভব করি—'আমি জানি না'। এই 'জ্ঞানি নাই' অবিদ্যার প্রত্যক্ষ। ইহা জ্ঞানাভাব নহে, কারণ অভাব জ্ঞানে প্রতিযোগীর (যাহার অভাব থাকে তাহা প্রতিযোগী) জ্ঞান কারণ এবং প্রতিযোগিরূপে জ্ঞানের জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানাভাব থাকিল না। আর তাছাড়া 'জ্ঞান নাই' ইহাও জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে; কাজেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানাভাবস্বরূপ এইরূপ মনে করা যাইতে পারে না। জ্ঞান আছে অথচ জ্ঞান নাই বলা—নিছক স্ববিরোধ ভিন্ন কিছু নহে। সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চে যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা অনির্বাচ্য, কারণ জ্ঞানের বিষয় অনির্বাচ্য এবং মিথ্যা তাহা আমরা প্রমাণিত করিয়াছি। সমস্ত জ্ঞেয়বস্তু মাত্রই যখন মিথ্যা, তখন তাহার কারণও মিথ্যাস্বভাব হইবে এবং এই কারণ অবিদ্যা ভিন্ন কিছু নহে। কার্য্য যে জাতীয় কারণ তাহার বিরুদ্ধ-জাতীয় হইলে কার্য্য কারণ সম্বন্ধই কল্পনা করা যাইতে পারে না। কাজেই অবিদ্যার অস্তিত্ব বা কারণতা অস্বীকার করা যায় না। এখন এই অবিদ্যাই একমাত্র তত্ত্ব ইহা স্বীকার করা যাউক ইহাকে মানিয়াও আবার ব্রহ্ম বা এক অদ্বিতীয় চৈতন্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ কল্পনাও সমীচীন হইতে পারে না।

শূন্যবাদ

অবিদ্যার অস্তিত্ব বেদান্তদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু অবিদ্যা চৈতন্যরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। অবিদ্যার স্বভাব আবরণ এবং বিক্ষেপ। যাহা প্রকাশ স্বভাব তাহারই আবরণ হইতে পারে। অবিদ্যা স্বয়মাবৃত, এবং জড় ও আবৃত-স্বভাব বলিয়া অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না। আবরণ আছে ইহাও সিদ্ধ হয় না যদি তাহার প্রকাশক না থাকে এবং প্রকাশ চৈতন্যেরই ধর্ম। কাজেই অবিদ্যা নিজের স্বরূপ ও অস্তিত্ব প্রকটিত করিতে পারে না বলিয়া চৈতন্যের অপেক্ষা করে এবং চৈতন্যের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করিতে পারে। অবিদ্যার তো প্রকাশ নাই—তাহার ধর্ম অপ্রকাশ। কাজেই চৈতন্য না থাকিলে অবিদ্যার প্রকাশই হইত না। অবিদ্যার আশ্রয় ও ভাসকরূপে চৈতন্যের স্বীকার না করিলে অবিদ্যার অস্তিত্বই প্রকাশিত হইত না। অতএব অবিদ্যা মাত্রই জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিলে অবিদ্যার প্রকাশ না থাকায় অবিদ্যা-জন্য জড়প্রপঞ্চেরও প্রকাশ থাকিবে না। ফলে জগদান্ধ্য প্রসক্ত হইবে। চৈতন্যরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে অবিদ্যার আবরণ কার্য্যই অসম্পন্ন হইবে তাহা মাত্র নহে, অবিদ্যার বিচিত্রসৃষ্টিকারিত্বরূপ বিক্ষেপও অসম্ভব হইবে। বিক্ষেপ শব্দের অর্থ একবস্তুকে অন্যরূপে প্রতিভাত করা। যদি কোন অধিষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে কোথায় বিক্ষেপ হইবে? নিরাস্পদ ভ্রম হইতে পারে না। যেখানে যাহা নাই তাহার প্রতীতি হইতেছে ভ্রম এবং ইহারই নামান্তর বিক্ষেপ বা আরোপ। কাজেই জ্ঞেয় মিথ্যা হইলে জ্ঞানও মিথ্যা হইবে শূন্যবাদীর এযুক্তি গ্রহণ করা যায় না। শূন্যবাদী বলেন যে ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণের অভিপ্রায় ও শক্তি বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিতেন। যাঁহারা জ্ঞেয়কে শূন্য বলিয়া বুঝিলেও জ্ঞানের শূন্যত্ব স্বীকার করিতে ভয় পাইতেন, তাঁহাদিগের নিকট বিজ্ঞানের স্বপ্রকাশতা উপদেশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জ্ঞেয় যেমন জ্ঞানের অতিরিক্ত হয় না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয়ের উপলব্ধি হয় না বলিয়া জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয়ের অসত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না বলিয়া এবং জ্ঞেয়ব্যতিরেকে

জ্ঞানের নিরূপণ হয় না বলিয়া জ্ঞানকেও জ্ঞেয়ের ন্যায় অনির্বাচ্য বলা উচিত। শূন্যবাদীর এই আক্ষেপ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে অনুত্তরণীয়। বেদান্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানকে অনির্বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বিজ্ঞান পরমার্থতঃ ক্ষণিক হইতে পারে না। যদি বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস থাকে, তবে এই উৎপত্তি ও ধ্বংস বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ জ্ঞানের দ্বারাই বস্তু সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি ঈদৃশ জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহা নিত্য ইহা মানিতে হইবে। যে জ্ঞানের উৎপত্তি বা ধ্বংস হইবে, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাহার উৎপত্তি বা ধ্বংসের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের ধ্বংস কালে সে জ্ঞান থাকে না এবং উৎপত্তির সময়েও সে জ্ঞান নিজের স্বরূপমাত্র প্রকাশ করিলেও তাহার পূর্বক্ষণে অসত্তা ছিল ইহা জানিতে পারে না। যদিও পরবর্ত্তী বিজ্ঞান ক্ষণে পূর্বক্ষণিক বিজ্ঞানের সংস্কার উৎপন্ন হয় বলিয়া পরবর্ত্তী বিজ্ঞান পূর্ব বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস জানিতে পারে ইহা বলিয়া ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী প্রমাতার ঐক্য জ্ঞানের উপপত্তি করিতে প্রয়াস করেন, (যদিও এই সমাধান অন্যবাদিগণ স্বীকার করেন না), তথাপি বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে শূন্যবাদে পরিসমাপ্তি হইবে। কারণ শূন্যবাদী যে যুক্তিবলে জ্ঞেয় ও জ্ঞানের বিজ্ঞানবাদ-সম্মত অব্যভিচার স্বীকার করিয়া জ্ঞেয়ের ন্যায় বিজ্ঞানের ও অনির্বচনীয়তা প্রতিপাদন করেন তাহার খণ্ডন বিজ্ঞানবাদী করিতে পারেন না। জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কোথায় ইহা দেখাইতে না পারিলে বিজ্ঞানই সৎ, জ্ঞেয় অসৎ ইহা প্রতিপাদন করা যায় না। যদি জ্ঞেয় নিরপেক্ষ জ্ঞান, যাহাকে গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ কোটিদ্বয় বর্জ্জিত অদ্বয় জ্ঞান বলা হয়, সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়ের সহিত ভেদ কল্পনা করা যাইবে না এবং জ্ঞানের স্বতন্ত্র সত্তা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এই অদ্বয় জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি? আর এই অদ্বয় জ্ঞান ক্ষণিক ইহা কি করিয়া সিদ্ধ হইবে? যদি জ্ঞানের বিনাশ কল্পনা করিলে জ্ঞানই অনুপপন্ন হয় তবে জ্ঞানের নিত্যত্ব ও স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হইতে পারে—কিন্তু ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত কেবল আগমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যুক্তিবিরুদ্ধ আগমের প্রামাণ্য বেদান্তী স্বীকার করেন না। এই নিত্যত্বের সাধক প্রমাণ কি? বেদান্তী বলেন যে জ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকার করিলে তাহা অন্য উৎপত্তিও ধ্বংসশালী বস্তুর ন্যায় অনির্বাচ্য হইবে এবং ফলে অসৎ হইবে। জ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস জ্ঞানের দ্বারাই নিরূপিত হয়, কাজেই জ্ঞানের অত্যন্তাসত্তা স্বীকার করা যায় না। যদি ক্ষণিক বিজ্ঞান সন্ততির অবিচ্ছেদ মানিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ উপপন্ন করিতে পারা যায়—(বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না), তথাপি এই বিজ্ঞান ক্ষণিক এ বিষয়ে বৌদ্ধ যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অনুপাদেয়। বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ কল্পনা করিয়া জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানকেও ক্ষণিক বলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইবে—জ্ঞেয়ের সহিত যদি জ্ঞানের অভেদ থাকে এবং জ্ঞেয় ক্ষণিক বলিয়া জ্ঞানকে ক্ষণিক বলা হয়, তবে জ্ঞেয় অসৎ বলিয়া জ্ঞানকেও অসৎ বলা হয় না কেন? বস্তুতঃ ইহার উত্তর বেদান্তীই দিয়াছেন। বেদান্তমতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অভেদ নহে, ভেদও নহে, কিন্তু অনির্বচনীয়। জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞানের যে অভেদ উপলব্ধ বা অনুমিত হয়, তাহা আধ্যাসিক অভেদ—কল্পিত অভেদ মাত্র। কল্পিত অভেদের দ্বারা একের ধর্ম অন্যত্র প্রতিপন্ন হয় না। এক শুক্তিকে বঙ্গ ও রজতরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অনুভব করা হইলেও বঙ্গ বা রজতের ভেদ নিবন্ধন শুক্তির ভেদ হয় না। সেইরূপ জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞানের কল্পিত অভেদ মানিয়া জ্ঞেয়ধর্ম ক্ষণিকত্ব জ্ঞানে আরোপিত হয় মাত্র—বস্তুতঃ জ্ঞানের ঐক্য তাহাদ্বারা ব্যাহত হয় না। যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের সম্বন্ধ তাত্ত্বিক অভেদ হইত, তবে জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞান ও ক্ষণিক হইত। বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী জ্ঞানও জ্ঞেয়ের পারমার্থিক অভেদ স্বীকার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং এইজন্য শূন্যবাদীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন যুক্তি তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

"চৈত্য"

শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

"চৈত্য"
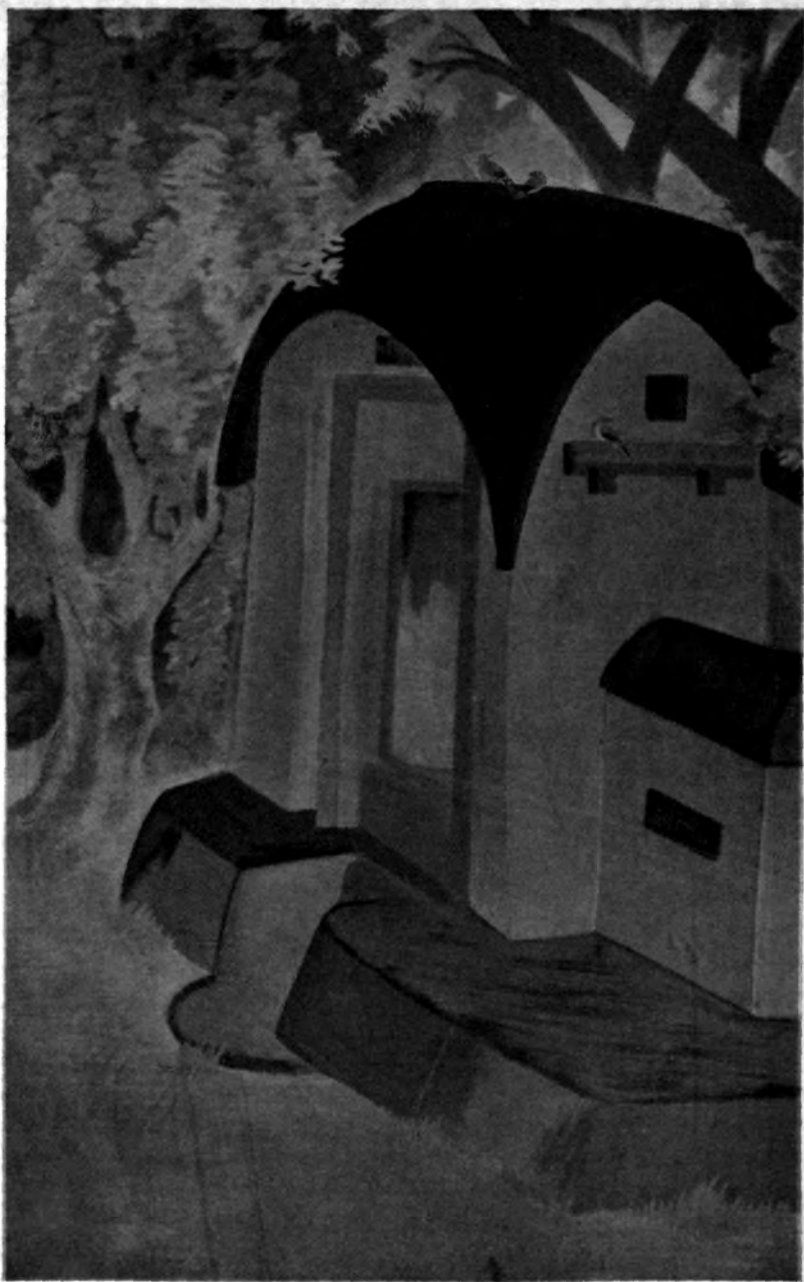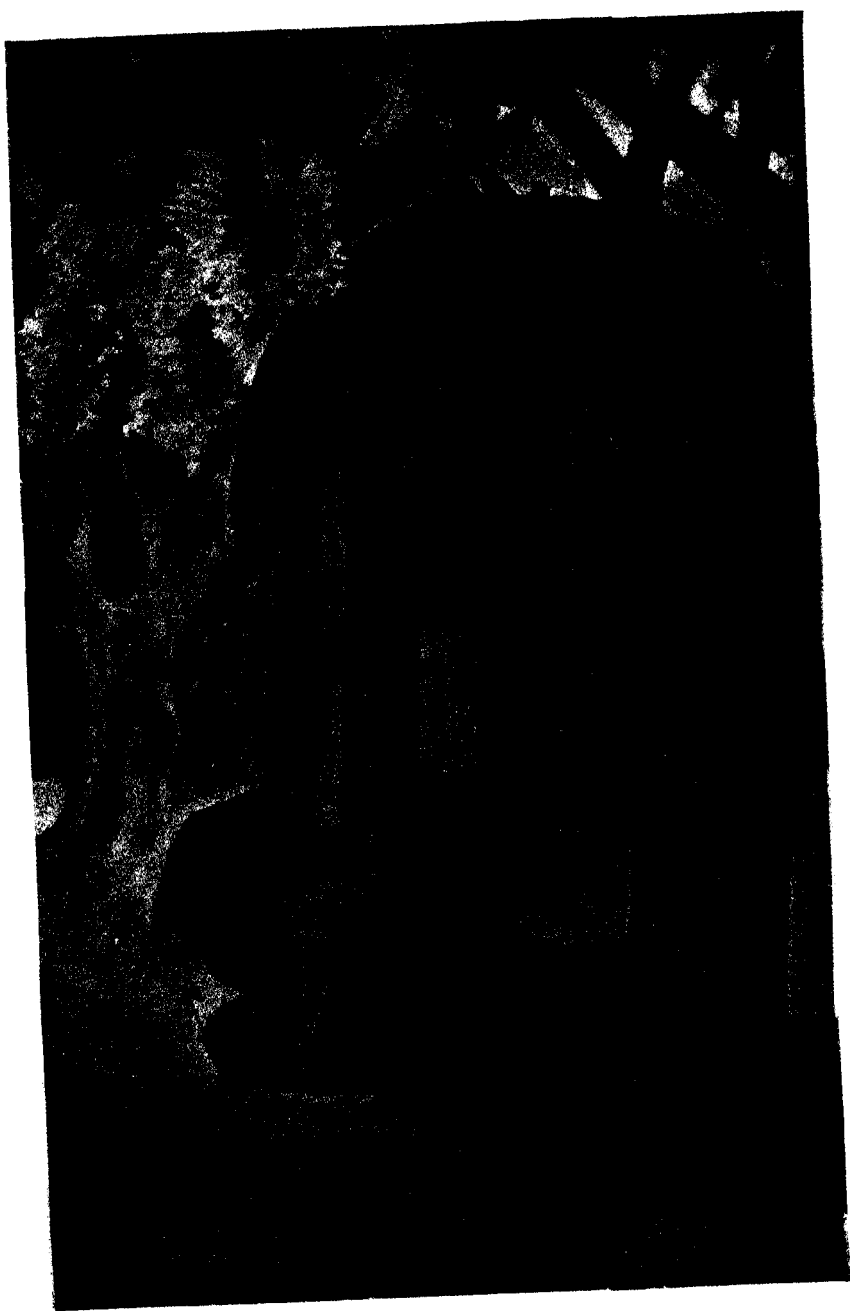
শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক

ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন),
অধ্যাপক হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে কয়জন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শশাঙ্কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রায়বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, ডাক্তার শ্রীরমেশ-চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়গণ শশাঙ্কের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন।[১] শশাঙ্কের জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তাঁহারা সকলেই শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্দ্ধন ও নরহত্যার সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রাপ্ত প্রমাণাদি দ্বারা শশাঙ্কের জীবনী বিশদভাবে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিহার প্রদেশের সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত সাসারাম হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রোটাস্‌গড় অবস্থিত। অনেকদিন পূর্ব্বে রোটাস-গড়-গিরি-দুর্গস্থ প্রস্তরগাত্রে খোদিত একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে—"শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য"—শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক-দেবের।[২] শশাঙ্ক সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন প্রমাণ-পত্র। অক্ষরতত্ত্বের আলোচনাদ্বারা এই শিলা-লিপির কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত শশাঙ্ক এবং রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী শশাঙ্ক যে একই ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা-দ্বারা প্রমাণ হয় যে শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম করদরাজা ছিলেন। শশাঙ্কের অধিরাজ কে ছিলেন, এই বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নীরব রহিয়াছেন। একটু বিশদ-ভাবে সমালোচনা করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

মৌখরী ঈশানবর্ম্মার রাজত্বকালের হারাহা-লিপি ৫৫৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] ঈশানবর্ম্মার রাজত্বের অবসানে সর্ব্ববর্ম্মা, অবন্তীবর্ম্মা ও গ্রহবর্ম্মা ক্রমান্বয়ে মৌখরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গ্রহবর্ম্মা অকালে নিহত হন।

৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ঈশানবর্ম্মার রাজত্বের শেষবর্ষ অনুমান করিয়া যদি তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক পুরুষ ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন ধরিয়া লওয়া হয় তবে গ্রহবর্ম্মার সিংহাসনারোহণের তারিখ ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

যে ভাবেই গণনা করা হউক, শশাঙ্ক গ্রহবর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন ধরিয়া লইলে কোন ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য হয় না।

দেববর্ণাক শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সর্ব্ববর্ম্মা এবং অবন্তীবর্ম্মা বালাদিত্য নামক এক পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি কর্তৃক নগর ভুক্তির অন্তর্গত বালবীবিষয়াবদ্ধ বারুণীকা গ্রাম দান অনুমোদন করিয়াছেন।[৪]

১ গৌড় রাজমালা, Early History of Bengal, বাঙ্গালার ইতিহাস, History of Orissa, History of North-Eastern India.

২ Gupta Inscriptions—Fleet.

৩ Epigraphia Indica, Vol. XIV.

৪ Gupta Inscriptions—Fleet.

বারুণীকার বর্ত্তমান নাম দেববর্ণাক। বিহার প্রদেশের সাহাবাদ জিলার প্রধান সহর আরার ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে দেববর্ণাক অবস্থিত। বালবীবিষয় বর্ত্তমান সাহাবাদ জিলার প্রাচীন নাম।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে শশাঙ্ক এই সাহাবাদ জিলার করদ রাজা ছিলেন। এই সমস্ত আলোচনাদ্বারা প্রমাণিত হয়, শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম অবন্তীবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র গ্রহবর্ম্মার অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। ডাক্তার বসাকের মতে শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম কর্ণসুবর্ণে স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। তারপর তিনি ক্রমশঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গয়া, রোহিতগিরি এবং কোঙ্গোদমণ্ডল করায়ত্ত করেন। শশাঙ্ক মৌখরীদের অধীনে মহাসামন্তরূপে রাঢ়, গৌড় ও মগধ শাসন করিতেন বলিয়া সমীচীন বোধ হয় না। মহাসামন্ত শশাঙ্ক উক্ত দেশত্রয়ের শাসক ছিলেন ধরিয়া লইলে তাঁহার রাজ্য তাঁহার অধিরাজের রাজ্য হইতে বৃহৎ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ মহাসামন্ত শশাঙ্কের আধিপত্য সাহাবাদ জিলা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। রোহিতগিরি (বর্ত্তমান রোটাসগড়) প্রাচীন কালে একটি বিখ্যাত স্থান ছিল। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রবংশোদ্ভব নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষদের রাজধানী ছিল।[৫] শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম রোটাসগড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং মূলতঃ শশাঙ্ক রোটাস গড়েরই অধিবাসী ছিলেন। এমতাবস্থায় শশাঙ্ককে বাংলার সর্ব্বপ্রথম জাতীয় বীর বলিয়া উল্লেখ করা ভুল।[৬] শশাঙ্ক বাঙ্গলার জাতীয় বীর বলিয়া গণ্য হইলে অন্যান্য যে সমস্ত বিদেশী বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল তাহাদিগকেও বাঙ্গলার জাতীয় বীর বলা যাইতে পারে।

শশাঙ্ক পশ্চিমদেশে যুদ্ধাভিযানের পূর্ব্বে মগধ, গৌড় ও রাঢ় জয় করিয়াছিলেন। রোটাসগড় হইতে কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্ত্তমান নাম রাঙ্গামাটী। উহা মুর্শিদাবাদ জিলায় অবস্থিত। শশাঙ্কের জয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড় ও রাঢ়ের অধিপতি কে ছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বপ্পঘোষ তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন।[৭] নিধানপুর তাম্রলিপির সংবাদানুযায়ী কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা কিছু কালের জন্য কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন।[৮] ভাস্করবর্ম্মা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার শিলমোহর নালন্দার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গুপ্ত সম্রাটগণের, হর্ষবর্দ্ধনের, ও সর্ব্ববর্ম্মার শিলমোহর সহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৯] পণ্ডিতদের মধ্যে ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ অধিকারের সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

ডাক্তার মজুমদারের মতানুযায়ী ভাস্করবর্ম্মা হর্ষের মৃত্যুর পর কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হর্ষ এবং ভাস্করবর্ম্মা একযোগে কর্ণসুবর্ণ দখল করিয়াছিলেন। ইহার পর শশাঙ্কের রাজ্য কোঙ্গোদ মণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল। ডাক্তার বসাক মনে করেন যে হর্ষ ভাস্করবর্ম্মার সহায়তায় কর্ণসুবর্ণ দখল করিয়া ভাস্করবর্ম্মার হস্তে তাহা অর্পণ করেন।

হর্ষচরিত হইতে জানা যায়, ভাস্করবর্ম্মা হর্ষের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য দূত হংসবেগকে হর্ষের নিকট প্রেরণ করেন। হংসবেগ হর্ষের নিকট নিবেদন করিয়াছিল যে শৈশবাবধি ভাস্কর-

৫ Inscriptions of Bengal, Vol III

৬ Dr. Majumdar's Early History of Bengal.

৭ Epigraphia Indica, Vol. XVIII

৮ Ibid, Vol XII.

৯ Ibid, Vol XXI

বর্ম্মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—শিবের পদযুগে নত হওয়া ভিন্ন আর কাহারও পদে নত হইবেন না। এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ের যে কোন একটির অবলম্বনে সম্ভবপর ছিল। যথা—পৃথিবী জয়ের দ্বারা, মৃত্যু আলিঙ্গনে এবং হর্ষের মত নৃপতির সহিত সখ্য স্থাপনে। ভাস্করবর্ম্মার শেষোক্ত উপায় অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ইহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, কোন এক বহিঃশক্তি ভাস্করবর্ম্মার রাজশক্তি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

সেইজন্য ভাস্করবর্ম্মা হর্ষের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক হর্ষের সাহায্যে আপনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা এক-যোগে স্বীকার করেন যে ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের ভয়েই হর্ষের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের সহিত কোন সম্মুখ সমরে পরাজিত না হইয়া এই বিধি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইহা খুবই সম্ভবপর যে ভাস্করবর্ম্মা জয়নাগকে পরাজিত করিয়া কর্ণ সুবর্ণ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়দেশ তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। ইহার পরেই ভাস্করবর্ম্মা কামরূপের সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য হর্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মনে হয় শশাঙ্ক উত্তরভারতে যুদ্ধাভিযানের পূর্ব্বে দক্ষিণদেশ জয় করিয়াছিলেন। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত গঞ্জাম তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে মহারাজ মহাসামন্ত দ্বিতীয় মাধবরাজ শালিম নদী-তটের সন্নিকটে অবস্থিত স্কন্ধাবার হইতে কৃষ্ণগিরি-বিষয়ান্তর্গত ছবলখাগ্নে নামক গ্রাম কোন এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।[১০]

[১০] Epigraphia Indica, Vol. VI.

গঞ্জাম জেলার রামগিরি এজেন্সির অন্তর্গত কোঙ্গোদের প্রাচীন নাম কোঙ্গোদ। কোঙ্গোদ মণ্ডল ও গঞ্জাম জিলা অভিন্ন। উক্ত তাম্রলিপিতে দ্বিতীয় মাধবরাজের পিতা মাধবরাজ অয়শোভিত, এবং পিতামহ মহারাজ মহাসামন্ত (প্রথম) মাধবরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় মাধবরাজ কলিঙ্গে স্থাপিত শৈলোদ্ভব বংশজ। গঞ্জাম তাম্র-শাসন হইতে বুঝা যায় যে প্রথম মাধবরাজ কাহারও সামন্ত ছিলেন। ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত পাতিয়-কেল্লা শাসনের শম্ভুয় তাহার অধিরাজ ছিলেন বলিয়া মনে হয়।[১১] অয়শোভিতকে মহাসামন্ত বলিয়া উল্লেখ না করায় মনে হয় যে তিনি স্বাধীন নরপতির স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মাধবরাজ মহাসামন্তের পদে অবনমিত হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য শশাঙ্ক তাঁহার এই পতনের মূল। উড়িষ্যার খুরদা সহরে মাধবরাজ সৈন্যভীতের দ্বারা সম্পাদিত একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে[১২]। এই মাধবরাজের পিতার নাম অযশোভিত এবং পিতামহের নাম সৈন্যভীত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন যে উক্ত মাধবরাজ এবং গঞ্জাম তাম্রলিপির দ্বিতীয় মাধবরাজ একই ব্যক্তি। খুরদালিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, মাধবরাজ থোরণ বিষয়ের অন্তর্গত অবহম্ম গ্রামাবদ্ধ কয়েকখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও জ্ঞাত হওয়া যায় যে মাধবরাজ "সমস্ত কলিঙ্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"[১৩]। খুরদা তাম্রলিপি পাঠে জানা যায়, মাধবরাজ স্বাধীন নরপতি ছিলেন না। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে শশাঙ্ক মাধবরাজকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করিয়া সমস্ত কলিঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। প্রাচীন-

[১১] Ibid, Vol III

[১২] Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXX III, Part I, P 284.

[১৩] সকল কলিঙ্গাধিপত্য সকল কলাবাপ্ত ইত্যাদি।

কালে কলিঙ্গ বলিতে বর্ত্তমান গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম এবং গোদাবরী নদীর উত্তরে গোদাবরী জিলা বুঝাইত।

হিউয়েনসাংয়ের মতে কলিঙ্গ—কোঙ্গদ, দক্ষিণ কোশল এবং অন্ধ্রদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[১৪] সুতরাং এই মতানুযায়ী কোঙ্গোদ বা গঞ্জাম জিলা কলিঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শশাঙ্কের রাজ্য গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আইহোল লিপি হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় পুলিকেশি কলিঙ্গ ও অন্ধ্রদেশ জয় করিয়াছিলেন[১৫]। খ্রীষ্টীয় ৬১৭ অব্দে তিনি কলিঙ্গ ও অন্ধ্রের শাসনভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন[১৬]। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজত্বের ক্ষোদিত দুইখানা লিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজ্য ভিজাগাপট্টম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল[১৭]। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, হিউয়েনসাংয়ের বর্ণিত কলিঙ্গ ৬১৬—১৭ খ্রীঃঅব্দে চালুক্যবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

মনে হয় যে শশাঙ্ক এবং তাঁহার সামন্ত দ্বিতীয় মাধবরাজকে পরাজিত করিয়া পুলিকেশি কলিঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন ও তাঁহার বংশধরগণ কলিঙ্গ ও অন্ধ্রদেশ বিনা বাধায় ক্রমাগত কয়েক শত বৎসর শাসন করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের পক্ষে উড়িষ্যা জয় না করিয়া কলিঙ্গ জয় সম্ভবপর ছিল না। উড়িষ্যাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি শম্ভুয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। শম্ভুয় ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।[১৮]

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশে আপনার শক্তি দৃঢ় করিয়া শশাঙ্ক পশ্চিমদেশ জয়ে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কলচুরি বুদ্ধরাজের কান্যকুব্জ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতে বিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় শশাঙ্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সুগম হইয়াছিল। বুদ্ধরাজ মৌখরী গ্রহবর্ম্মাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্ঞী রাজ্যশ্রীকে কান্যকুব্জে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।[১৯] ইহার পর তিনি স্থানেশ্বরাভিমুখে অভিযান করেন। এই সুযোগে শশাঙ্ক কান্যকুব্জ আপনার অধীনে আনয়ন করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধন ও মালবরাজ বুদ্ধরাজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন। তিনি তাঁহার প্রধান সেনাপতি ভণ্ডিকে স্থানেশ্বর অভিমুখে প্রেরণ করেন ও স্বয়ং রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিবার জন্য কান্যকুব্জাভিমুখে ধাবিত হন। পথিমধ্যে শশাঙ্কের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি কান্যকুব্জ জয়পূর্ব্বক যদি শশাঙ্কের সহিত সংগ্রামে রত হইতেন তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন শশাঙ্ক মালবরাজের সহিত মিত্রতাস্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যবর্দ্ধন ও মৌখরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। বাণ গ্রহবর্ম্মণের হত্যা ও রাজ্যশ্রীর কারারুদ্ধের জন্য শশাঙ্ককে দায়ী করেন না। বাণের মতে মালবরাজ একাকীই রাজ্যবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজ্যবর্দ্ধন যদি জানিতেন মালবরাজের মিত্র শশাঙ্ক তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রধান সেনাপতি ভণ্ডিকে স্থানেশ্বরে প্রেরণ করিতেন না। শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কিয়ৎকাল পরে হর্ষকে ভণ্ডির

১৪ Walters, Vol. II, P. 196 H

১৫ Epigraphia Indica, Vol VI

১৬ Author's "Eastern Chālukyas"—Indian Historical Quarterly.

১৭ Ibid

১৮ পাণ্ডিয়ক্কের শাসন—Epigraphia Indica, Vol. III.

১৯ Journal of the Bihar and Orissa Research Society Vol. XIX, P. 405—Author's "Malava in the sixth and seventh Centuries."

সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এমতাবস্থায় শশাঙ্কের কার্য্যাবলীর সহিত মালবরাজের কার্য্যাবলীর কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শশাঙ্কের সহিত সংঘর্ষে রাজ্যবর্দ্ধন প্রাণ হারাইয়াছিলেন। হর্ষচরিত হইতে জানা যায়, হর্ষবর্দ্ধন স্থানেশ্বরে অবস্থানকালীন জনৈক সংবাদবাহক হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন অনায়াসে মালবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়পতির কপটাচারে ভুলিয়া তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও বিদিত হওয়া যায় যে রাজ্যবর্দ্ধন অসতর্কতার জন্য প্রাণ হারাইয়াছেন। অসতর্কতার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অর্থশাস্ত্র, কামান্দকীয় নীতিসার, বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীনকালে নৃপতিবৃন্দ স্ত্রী সম্বন্ধীয় অসতর্কতার জন্য কি প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে হর্ষকে বলা হইয়াছে—রমণীঘটিত ব্যাপারে অসতর্কতার দোষে মানুষ কত যে কষ্ট পাইয়াছে তাহা হর্ষের অবিদিত নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শঙ্করকর্ত্তৃক লিখিত হর্ষচরিতের টীকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে শশাঙ্ক দূতমুখে রাজ্যবর্দ্ধনের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের মিথ্যা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন অনুচরবর্গসহ শশাঙ্কের শিবিরে গমন করেন। তিনি যখন সেখানে ভোজনে রত ছিলেন শশাঙ্ক ছদ্মবেশে তাঁহাকে হত্যা করেন। এই সম্পর্কে শঙ্করের টীকার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা অনুচিত। কেননা কোন সূত্রে যে তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

হিউয়েনসাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লিখিত আছে—শশাঙ্ক প্রায়ই তাঁহার মন্ত্রিবর্গকে বলিতেন, "কোন প্রদেশের রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে তাঁহার প্রতিবেশী রাজার মঙ্গল নাই।" এই ভাবিয়া তিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে এক পরামর্শ সভায় নিমন্ত্রণ করেন ও তাঁহাকে হত্যা করেন। অন্য স্থানে আবার উল্লিখিত হইয়াছে, হর্ষকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে অমাত্যবর্গের দোষে রাজ্যবর্দ্ধন শত্রুবর্গের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[২০] হর্ষের তাম্রলিপি হইতে জানা যায়, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে শত্রুশিবিরে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।[২১]

রায়বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ও ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে বাণ ও হিউয়েনসাং কর্ত্তৃক লিখিত রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধীয় বিবরণ অবিশ্বাস্য। বাণ হর্ষের বৃত্তিভোগী সভা-কবি ছিলেন আর হিউয়েনসাং হর্ষের নিকট উপকৃত ছিলেন। হর্ষের তাম্রলিপিতে শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কোন আভাস নাই। সুতরাং শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে ন্যায়যুদ্ধেই হত্যা করিয়াছিলেন। মালবরাজের সহিত যুদ্ধের পর রাজ্যবর্দ্ধনের ৬১৭ হাজার সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। শশাঙ্ক বিপুলবাহিনী লইয়া নিশ্চয়ই রাজ্যবর্দ্ধনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কপট উপায় অবলম্বন করিবার কোনই আবশ্যক ছিল না।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে রায়বাহাদুর মহাশয় মালবরাজের সহিত যুদ্ধের পর রাজ্যবর্দ্ধনের কত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল তাহার মোটামুটি সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বাণ এবং চীন পরিব্রাজক জানিয়া শুনিয়া শশাঙ্কের চরিত্র মিথ্যাপবাদে কলুষিত করিয়াছেন ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে।

২০ Walters, Vol. I, p 343, Beals Record, p 210-211, Life of Hiuen Tsang, p. 83.

২১ Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 210.

হর্ষের তাম্রলিপি হইতে বুঝা যায় যে রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে অর্থাৎ নৈতিকতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শশাঙ্কের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় অথবা পাশবিক বলের দ্বারা সেই স্থানে লইয়া যাওয়া হয় নাই। রাজ্যবর্দ্ধন নৈতিকতার দিকে চাহিয়া শত্রুশিবিরে নিশ্চয়ই সসৈন্যে গমন করেন নাই। মল্লযুদ্ধে শক্তিপরীক্ষার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন ভাবা নিরর্থক। রাজ্যবর্দ্ধন যে শত্রুশিবিরে সত্যের অনুরোধে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন সেই শত্রু আর যাহাই হউক সাধু ছিলেন বলিয়া মনে করা চলে না। অধিকন্তু রাজ্যবর্দ্ধন যদি ন্যায়যুদ্ধেই প্রাণ হারাইয়া থাকিবেন, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার লিপিতে কেন তাহা উল্লেখ করিবেন? প্রাচীন ভারতে নৃপতিবৃন্দ কেহই তাঁহাদের পরাজয়ের বার্ত্তা তাঁহাদের কৃত শিলালিপি অথবা তাম্রলিপিতে উল্লেখ করিতেন না। এই স্থলে শত্রুর ঘৃণ্য কার্য্যাবলী প্রকাশ করাই হর্ষের উদ্দেশ্য ছিল।

শশাঙ্ক কেন এই পাপনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। রাজ্যবর্দ্ধন হূণরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার প্রবল শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কান্যকুব্জ জয়ের পর রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মালবরাজের পরাজয়ের পর রাজ্যবর্দ্ধন যে কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। শশাঙ্ক যখন রাজ্যবর্দ্ধনের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহার এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হইল। গুপ্ত নামক এক কুলরাজপুত্র কান্যকুব্জ দখল করিয়া রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিলেন। এই গুপ্ত এবং হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রলিপিতে উল্লিখিত রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগুপ্ত একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। তিনি রাজ্যশ্রীকে এই ভাবিয়া কারামুক্ত করিয়াছিলেন যে রাজ্যশ্রী যতক্ষণ কান্যকুব্জে আবদ্ধ থাকিবেন, রাজ্যবর্দ্ধন প্রাণপণে কান্যকুব্জ করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণ হয় যে শশাঙ্ক শত্রুদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই তিনি শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণের হর্ষচরিত হইতে জানা যায়, হর্ষ রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণমাত্র এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যদি কতিপয় দিবসের মধ্যে পৃথিবী নির্গৌড় করিতে না পারেন তাহা হইলে স্বীয় দেহ অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিবেন। তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। ভণ্ডির সহিত পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও ভণ্ডির নিকট রাজ্যশ্রীর বিন্ধ্যবনে পলায়ন-বৃত্তান্ত অবগত হন। ভণ্ডি তাঁহার নিকট নিবেদন করেন যে তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছেন — যখন রাজ্যবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিলেন গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি কান্যকুব্জ দখল করেন এবং রাজ্যশ্রী কারা হইতে বহির্গত হইয়া অনুচরীসহ বিন্ধ্যবনে পলায়ন করেন। অন্য স্থানে বলা হইয়াছে— গৌড় "সম্ভ্রম" সময়ে রাজ্যশ্রীকে গুপ্ত নামক এক কুলরাজপুত্র কারামুক্ত করেন এবং রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে পলায়ন করেন। উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয়, রাজ্যশ্রীর মুক্তি ব্যাপারে শশাঙ্কের কোন সম্বন্ধ ছিল না। শশাঙ্কের দ্বারা অধিকৃত কান্যকুব্জ গুপ্ত অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে গুপ্ত শশাঙ্কের মিত্র ছিলেন না।

ইহার পর হর্ষ ভণ্ডিকে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং বিন্ধ্যবনে গমন করেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিবাকর মিত্রের সাহায্যে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। দিবাকর মিত্র তাঁহাদের উভয়কেই বৌদ্ধ ভিক্ষু হইতে অনুরোধ করেন। শশাঙ্ককে কতিপয় দিবসের মধ্যে উচ্ছেদ করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া

হর্ষ দিবাকর মিত্রের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হন। তাহার পর তিনি কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করিবার পর ভণ্ডির সহিত গঙ্গাতীরে মিলিত হন।

বাণ হর্ষচরিতের বিবৃতি এই স্থানেই সমাপ্ত করেন। সুতরাং শশাঙ্কের সহিত হর্ষের সংঘর্ষের ফলাফল হর্ষচরিত হইতে জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বাণ হর্ষের সহিত সর্ব্বপ্রথম অজীরাবতী নদীর তটে সাক্ষাৎ করেন। অজীরাবতীর বর্ত্তমান নাম রাপ্তী। বাণের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে হর্ষ সিন্ধু ও হিমালয় প্রদেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরবর্ত্তী কালেই এই সমস্ত দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। কেন না হর্ষ সিংহাসনারোহণের অনতিকাল পরেই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রার ফলাফল বাণ অবগত ছিলেন।

বাণ হর্ষের সহিত সাক্ষাৎলাভের পর যখন সোননদীর তটে নিজগ্রাম প্রীতিকূটে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ হর্ষের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বাণ প্রত্যুত্তরে বলেন, শতবর্ষেও হর্ষের জীবনচরিত বলিয়া শেষ করা সম্ভবপর হইবে না। তথাপি যদি তাঁহারা হর্ষের জীবনী শ্রবণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের নিকট তাহার একাংশ বলিতে পারেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, বাণ ইচ্ছা করিয়াই হর্ষচরিতের আখ্যান মধ্যপথে সমাপ্ত করেন এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযানের ফলাফল বর্ণনে নীরব রহেন। ইহার সহিত গঞ্জাম তাম্রলিপিতে বিবৃত শশাঙ্কের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিলে হর্ষের উপরোক্ত অভিযান যে নিষ্ফল হইয়াছিল তাহাই প্রমাণ হয়।

তর্ক-প্রসঙ্গে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে যদি হর্ষের শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান নিষ্ফলই হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে বাণ কেন জানিয়া শুনিয়া হর্ষের প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ করিবেন। উপরে বলা হইয়াছে যে হর্ষ রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যদি কতিপয় দিবসের মধ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারীকে নিঃশেষ করিতে না পারেন তাহা হইলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। বাস্তবিকপক্ষে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হর্ষ শশাঙ্কের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে হর্ষ অন্ততঃ চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে যে নীতির অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝা যায়, শশাঙ্কের সৈন্যবল রাজ্যবর্দ্ধনের অপেক্ষা অল্প ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া তিনি আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন মাত্র। দেবগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তিনি কান্যকুব্জ জয়ের চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জ দখল করিয়াছিলেন, এবং ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রয়াগে প্রথম ধর্ম্মসভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

৬১৫—১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে শশাঙ্কের রাজশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। উক্ত বর্ষে দ্বিতীয় পুলিকেশী তাঁহার নিকট হইতে কলিঙ্গ অধিকার করেন। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েনসাং মগধ পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে তাঁহার মগধ ভ্রমণের অল্পকাল পূর্ব্বে শশাঙ্ক বুদ্ধগয়াতে বোধিবৃক্ষ ধ্বংস করেন।

ইহার কয়েকমাস পরে অশোকের শেষ বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মন বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত করেন। অন্যস্থানে হিউয়েনসাং উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি যখন নালন্দা গিয়াছিলেন তখন নিকটবর্ত্তী স্থানে

হর্ষশিলাদিত্যকর্ত্তৃক এক ধাতুমন্দির নির্ম্মিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহার দুইশত পদপূর্ব্বে তিনি পূর্ণবর্ম্মনকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ৮০ ফিট উচ্চ এক বুদ্ধের তাম্র মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে শশাঙ্ক, পূর্ণবর্ম্মন ও হর্ষ কর্ত্তৃক মগধ ক্রমান্বয়ে অধিকৃত হইয়াছিল। শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়া অথবা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পূর্ণবর্ম্মন মগধের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং হর্ষ শশাঙ্কের নিকট হইতে মগধ জয় করেন নাই, পূর্ণবর্ম্মন অথবা তাঁহার বংশধরের নিকট হইতে তাহা অধিকার করিয়াছিলেন। হিউয়েনসাং বলেন, হর্ষ পূর্ব্ব ভারতে অগ্রসর হওয়ার পথে কজঙ্গলে (রাজমহল পাহাড়ে) শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি রাজ্য সেই সময়ে কাহার দ্বারা শাসিত হইতেছিল তাহার কোন আভাস দেন নাই। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণ হয় না যে ঐ সমস্ত দেশ হর্ষের অধীন ছিল। হিউয়েনসাং কলিঙ্গ এবং অন্ধ্রদেশের শাসকদের সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ করেন নাই। উক্ত দেশদ্বয় হর্ষের অধীন ছিল না। ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত দেশদ্বয় বেঙ্গির চালুক্যদের অধীন ছিল। মোটের উপর এমন কোন প্রমাণপত্র নাই যাহা হইতে জানা যাইতে পারে যে হর্ষ কখনও বাঙ্গলার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

মঞ্জুশ্রী মূলকল্প হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মণবংশে সোম নামক এক নৃপতি ছিলেন। বৈশ্যবংশের রাজা "র" সোমের মতই ক্ষমতাশালী ছিলেন। নৃপতি "র" নীচজাতীয় এক রাজাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। "র"র কনিষ্ট ভ্রাতা "হ" পূর্ব্বভারতে পুণ্ড্রনগরে সোমের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সোমকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের সীমানার বাহিরে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সোম ১৭ বৎসর ১ মাস ৭ দিন রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নরকে গমন করেন। তাঁহার রাজধানী দৈবদুর্য্যোগে ধ্বংস হয়। ইহার পর গৌড়দেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়। একজন রাজা এক সপ্তাহ রাজত্ব করেন এবং দ্বিতীয় একজন একমাস রাজত্ব করেন। ইহার পরে সোমের পুত্র মানব আট মাস পাঁচ দিন রাজত্ব করেন। ইহার পর জয়নাগ রাজা হন।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে মঞ্জুশ্রী মূলকল্প-বিবৃত "সোম" "র" এবং "হ" ক্রমান্বয়ে শশাঙ্ক, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প অনেক অনৈতিহাসিক বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহার মতে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী শশাঙ্ক ছিলেন না। এই বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে যথেষ্ট ভুল হইবার সম্ভাবনা। ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার মূল্য খুব কম।

হিউয়েনসাং শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্যাতক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, শশাঙ্কের অত্যাচারেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হয়।

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর এবং ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়। রামপালে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশ রোহিতগিরিতে রাজত্ব করিত। শ্রীচন্দ্রের প্রপিতামহ ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। উক্ত চন্দ্রবংশের সহিত শশাঙ্কের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

প্রলয়-দুর্য্যোগে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার কঙ্কালে বাজে রণবাদ্য বহু শতাব্দির
কানে বাজে অবিরাম সংঘাতের অস্ত্র ঝনৎকার ;
আর্ত্তস্বরে কম্পমান মূঢ় মূক স্থবিরা পৃথিবী
সভয়ে মুদিছে আঁখি দাম্ভিকের উন্মত্ত চিৎকারে।
নিপীড়িত সহস্রের নিরুপায় বঞ্চিতের ব্যথা
ঘনাইয়া উঠিতেছে কাল-বৈশাখীর কালো মেঘে :
পুঞ্জিভূত বেদনার যুগে যুগে সঞ্চিত বিক্ষোভ
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আজি প্রহর গণিছে অন্তরালে
—কখন ঈশান কোণে উড়াইয়া ঝড়ের কেতন
ভৈরব উঠিবে জাগি, বিদ্যুৎ খেলিবে জটাজালে,
প্রলয়ের নৃত্য-শেষে হবে তম সৃষ্টির সূচনা।

কতকাল ? আর কতকাল এ প্রতীক্ষা চলিবে এমনি,
দুর্দ্দম লোভের বশে নরহত্যা আর কতকাল
বীরত্বের নাম দিয়ে চালাইবে মানুষের জাতি ?

হেরিতে পারি না আর বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখছবি
শুনিতে পারি না আর নিরাশ্রয় আর্ত্তের রোদন,
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা কুটিল হাসির অন্তরালে
গোপন রাখিয়া চলে জহ্লাদের হত্যার কৌশল ,
লোভে লোভে যে সংঘাত,স্বার্থে স্বার্থে যে হীন সংগ্রাম
কাপুরুষ মানুষেরে দিতে চায় বীরত্ব-গৌরব,
সে আজি পড়েছে ধরা, মুখোস্ পড়েছে তার খসি'
তীক্ষ্ণ নখদন্ত পাঁতি, জঘন্য হিংস্র তার রূপ
অসন্দিগ্ধ মানুষেরও দৃষ্টিপথে হয়েছে প্রকট।

যুগে যুগে ইহারাই দুই হাতে করিছে লুণ্ঠন
ক্ষুধিতের অন্নগ্রাস ; জয়রথচক্র তলে
নিষ্পেষিত ইহাদেরি অসহায় সুসভ্য মানব।
ছলে ও কৌশলে এরা বর্ব্বর পশুর ঘৃণ্যবলে
নর-কঙ্কালের 'পরে কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়িছে সোল্লাসে,
বীরে করে শৃঙ্খলিত, বীর্য্যের করিয়া অপমান
শিশুর কোমল প্রাণ সংহারিছে নিষ্ঠুর আঘাতে ,
রাশি রাশি নরহত্যা করিতেছে চক্ষের পলকে
আপন সীমানা ছাড়ি এরা চলে পরস্ব হরণে ,
ইহারাই বীর আজি নপুংসক নরের সমাজে,
ইহারা নির্দ্দেশ দেয় সর্ব্বজাতি শান্তির বৈঠকে,
ভ্রূকুটি করিয়া এরা উড়াইয়া দেয় নীতিকথা,
ভ্রূক্ষেপ করে না দম্ভে দেবতার বিচার শাসনে ;
তাই শুনি দূরে দূরে পিনাকীর কোদণ্ড টঙ্কার
হেরি তাই অন্তরীক্ষে ঘনমেঘ মৃদু সঞ্চরণ
অনুভবি মর্ম্মে মর্ম্মে ভৈরবের ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি,
ডম্বরুর ডিমি ডিমি প্রত্যাশিত প্রলয়-দুর্য্যোগে।

আধুনিক মন

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে ইহা একটি পাশ্চাত্য চলিত কথা—কিন্তু শুধু কথার কথা। ইহা তত্ত্ব নহে—তত্ত্বের আভাস মাত্র। একটু নিপুণভাবে পরীক্ষা করিলেই ইহার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে। এ দেশের আপ্তপুরুষগণও কালের পুনরাবৃত্তির কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাহার দীর্ঘ মেয়াদ। এক একটি কল্পশেষ হইলে পুনরায় যুগের আবৃত্তি ঘটে এবং এক কল্পের অন্তে জীবসমূহ ঠিক পূর্ব্ব কল্পেরই মত ঘুরিয়া আসে এবং ঘটনা স্রোতও সমান ক্রমে, সমান তালে বহিতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে এত দীর্ঘ মেয়াদ যে স্বল্পবুদ্ধি বা ক্ষুদ্র পর্য্যবেক্ষণে ইহার সত্যাসত্যতা নিরূপিত হইতে পারে না। তর্ক পরাস্ত, সুতরাং বিশ্বাসই এ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির বিষয়ে প্রতীচীর কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে সংসার-তাপক্লিষ্ট—ভাগ্যদেবতার খেলার পুতুল—মানুষের একটা সহজ সান্ত্বনা মিলিত। কিন্তু ভূয়োদর্শন তাহার অন্তরায়। যদি অসুরগণের প্রাবল্যের পরই দেবগণ জয়ী হইতেন, রাক্ষসের অত্যাচার অতিমাত্রায় উঠিলে রামরাজত্ব স্থাপন যদি প্রকৃতির নিয়মে নির্দ্ধারিত থাকিত, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান যদি অচিরে ধর্ম্মরাজ্যের সূচনা করিত—তাহা হইলে 'চক্ষু নিমীলিত করিয়া' মেঘদূত-বর্ণিত যক্ষের মত উৎপীড়ন, অত্যাচারের 'শেষ চারি মাস' স্বচ্ছন্দে ও আশ্বাসভরেই মানুষ কাটাইয়া দিতে পারিত। মনু বলিয়াছেন—তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে কিংবা তিন দিনে অত্যুৎকট পাপ-পুণ্যের ফল ইহলোকেই মানুষ পাইয়া থাকে। ইতালীর আবিসিনীয়া-অধিকার উৎকট পাপ বা উৎকট পুণ্য—তাহা নীতিনিপুণগণের বিচার্য্য। কিন্তু পামর জন স্থূল মানদণ্ডের উপাসক—সুতরাং তিন বৎসরের বাকি সময়টুকু অপেক্ষা না করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইতিমধ্যে নানা সংশয়ে মানবমন আন্দোলিত হইতেছে; আশঙ্কা হইতেছে বুঝি বা গোড়াতেই গলদ। যে সকল ধারণা ও সিদ্ধান্ত এ যাবৎ অবিসংবাদে গৃহীত ও প্রচলিত—সেগুলিই বুঝিবা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। পাপ ও পুণ্যের একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা যতদিন মানব-সমাজে স্বীকৃত হয় ততদিন পাপীর শাস্তি, পুণ্যবানের পুরস্কার সম্ভব। কিন্তু পাপ-পুণ্যের ধারণার যদি ওলট পালট হইয়া পড়ে, সকল পুরাতন সংস্কার হইতে মুক্তিলাভই যদি মানুষের সাধনার বিষয় এবং পুরুষার্থে দাঁড়ায় এবং ব্যক্তি বিশেষের নহে, এক একটি বিপুল জাতির এবং পরিণামে সমগ্র মানব-পরিবারের মনই যদি সেই ভাবে গঠিত ও চালিত হয়—যদি এতাবৎ স্বীকৃত নৈতিক মানদণ্ডই মনুষ্য-ব্যাপার হইতে বর্জিত হয়—তাহা হইলে কে দণ্ডার্হ, কে দণ্ডদাতা, কোন্‌টিই বা শাস্তি, কোন্‌টিই বা পুরস্কার—তাহার নির্দ্ধারণ হইবে কিরূপে? একটা অহেতুক আতঙ্কের সৃষ্টি করিবার জন্য যে এরূপ মুখবন্ধ নহে—তাহাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

পৃথিবীময় বর্ত্তমানে একটা নৈতিক বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস যেন লক্ষিত হইতেছে। ইহার ফলে কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে—সে প্রশ্ন এখন দূরে। উপস্থিত যে মনোবৃত্তিপুঞ্জ সুসভ্য মানবের চিন্তা ও আচার, সাহিত্য ও দর্শনে দেখা দিতেছে—তাহার কিছু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ—পরিবর্ত্তন ব্যগ্রতা। পরিবর্ত্তনশীলতা

মানব-চরিত্রে নূতন উপসর্গ নহে। যে সকল জাতির মধ্যে জীবনের গতি স্মরণাতীত কাল হইতে নিরুদ্ধ, যাহারা অগণিত শতাব্দী ধরিয়া আদিম সভ্যতায় বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু চিন্তাশীল, উন্নতিপর মানবের স্বভাবই হইতেছে নানামুখী চেষ্টা—নূতন উদ্ভাবনে প্রবৃত্তি। সুতরাং বৈচিত্র্য পরিবর্ত্তনে নহে, পরিবর্ত্তনের মাত্রায়—উহার দ্রুততায়। শতাব্দীর কাজ এখন দশ বৎসরে সম্পন্ন হইতেছে। ইহার কারণ—অন্য সকল বৃত্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অভিভূত করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিই মানবমনের উপর একাধিপত্য লাভ করিতেছে। অনুশীলনেই বৃত্তির প্রাখর্য্য এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষ। এ যুগে একদিকে নানা জাতীয় কারখানায় নিরন্তর কাজ চলিতেছে—উদ্দেশ্য মানবের প্রয়োজন ও বিলাসের সামগ্রী অজস্র পরিমাণে উৎপাদন। তেমনি মস্তিষ্ক যন্ত্রাগারেও অতি নিপুণ ও সঙ্ঘবদ্ধ অবিরাম ব্যাপার এ যুগের একটি লক্ষণ। ফলে অতীতের সকল তথ্য এবং উদ্ভাবন তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষিত এবং নিঃসঙ্কোচে আলোড়িত হইতেছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—এ যুগের কথা নয়। এ যুগ মনুষ্যবুদ্ধির সার্ব্বভৌম অধিকারের যুগ। সুতরাং যে তত্ত্বে মন পৌঁছায় না—যেখান হইতে ভাষা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে—তাহা অপ্রাসঙ্গিক, অগ্রাহ্য। Your absolute God and absolute devil belong to the class of irrelevant non human facts. The only things that concern us are the little relative gods and devils of history and geography, the little relative goods and evils of individual casuistry. Everything else is non-human and beside the point.

চেতনার যে স্তরে বুদ্ধির প্রবেশ নাই—তাহা মনুষ্য-ব্যাপারে একরূপ অপ্রাসঙ্গিক—নিরর্থক। সুতরাং অধ্যাত্মদৃষ্টি, আত্মোপলব্ধি, যোগিপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যে সকল সূক্ষ্ম অনুভূতি আমাদের চিত্তভূমিকে ঊর্ণনাভতন্তুর মত জড়াইয়া থাকে, সে সকলই যুক্তির নিকষে পরীক্ষণীয়। এ দেশের প্রাচীন কথা—তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ। এ যুগের কথা—যাহা তর্কসিদ্ধ নহে তাহাই অপ্রতিষ্ঠ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীই স্বতন্ত্র। ফলে ধর্ম্ম, নীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব—সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক চিন্তারীতি ও বিচার-প্রণালী প্রাধান্য লাভ করিতেছে। নানাযুগের, নানা দেশের প্রথা, আচার, সমাজ-ব্যবস্থার নিরন্তর তুলনা ও সমালোচনার ফলে তাহাদের মধ্যে যেগুলি সাধারণ উপাদান সেগুলি প্রকট হইয়া পড়িতেছে। এবং অলৌকিকত্ব, ভগবৎপ্রেরণা, প্রত্যাদেশ, শাস্ত্রগ্রন্থের অপৌরুষেয়ত্ব, জাতি-বিশেষের অসাধারণ বিশুদ্ধি ও সাত্ত্বিকতা কিংবা উহার প্রতি বিলক্ষণ দৈবানুগ্রহ প্রভৃতি যে সকল বিশ্বাস ধর্ম্মের ও সমাজের ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইত এবং আস্তিক্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করিত—সেগুলি দুর্ব্বল, অস্পষ্ট, অস্বীকৃত হইয়া যাইতেছে। পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এ সকল বিষয়ে যে সুস্পষ্ট ধারণা এ যাবৎ মানুষের মনে স্থান পাইয়াছে—তাহা ক্ষীণ ও শিথিল হইয়া আদিম মনোবৃত্তি বা জীর্ণসংস্কারের কোটিতে গিয়া পড়িতেছে। আধুনিক পরিভাষায় ধার্ম্মিকের নামান্তর God snob—ভক্তম্মন্য, আস্তিকম্মন্য। এ সকলেরই পরীক্ষা—যুক্তির কষ্টিপাথরে। এরূপ ভাববিপর্য্যয়ের কারণ, প্রাণীবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্ত—Determinism এবং Behaviourism. জীব শুধু পঞ্চভূতের বা পঞ্চাশীতি ভূতের সমবায় ও সঙ্ঘর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছাহীন, উদ্দেশ্যহীন জড়প্রপঞ্চের মধ্যেই তাহার স্থান। তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ামক অচেতন শক্তিপুঞ্জ মাত্র। মানুষ কর্ত্তা

নহে—কতকগুলি অন্ধ উপাদান ও শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র। গীতার ভাষায় 'প্রকৃতিজ গুণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া অবশভাবে সে কর্ম্ম করিয়া থাকে'। তাহার কার্য্যাবলি আবিষ্টের আচরণ মাত্র। স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া তাহার দায়িত্ব নাই। কতকগুলি বাহ্য পদার্থ তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর ক্রিয়া করে —ইহাই তত্ত্বকথা।

ধর্ম্মগ্রন্থের বিচার-বিশ্লেষণ করা হইতেছে সাহিত্যিক দৃষ্টি লইয়া। সেগুলির মধ্যে ভাষা, রীতি, রসসত্তা প্রভৃতি কাব্যের উপাদান এবং সমাজ-চিত্র, ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রভৃতি বাস্তব সত্য প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। ফলে অনুল্লঙ্ঘ্য ঈশ্বরাদেশ, অনতি-ক্রমণীয় নৈতিক প্রেরণার উৎসরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রের যে মর্য্যাদা ছিল তাহা ক্রমশঃ অবজ্ঞাত হইতেছে। বাস্তবিক কার্য্যপ্রবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির উপরই ধর্ম্ম-গ্রন্থের মুখ্যতঃ প্রভাব—রস ও সৌন্দর্য্যের উদ্বোধে নহে। কিন্তু আধুনিক মন ধর্ম্ম গ্রন্থের এই দিকে লক্ষ্যহীন বা শ্রদ্ধাহীন। ধর্ম্মের অর্থ জীর্ণ, পুরাতন, অমার্জ্জিত মনোবৃত্তি। শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মমত আকাশ-কুসুমের মত অলীক। বিজ্ঞানের hypothesis বা অভ্যুপগম, দার্শনিক মতবাদ, অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম এবং ধর্ম্মমত সকলই এক পর্য্যায়ের তত্ত্ব—অর্থাৎ আপেক্ষিক, আংশিক তত্ত্বাভাস। যুগে যুগে মানুষের কৃষ্টির প্রসার ও পূর্ণতার সাথে সেগুলিও বর্দ্ধন-সংস্কার-ও বর্জনার্হ।

Living modernly is living quickly You can't cart a waggon-load of ideals and romanticisms about with you these days When you travel by aeroplane, you must leave your heavy baggage behind. The good old-fashioned soul was all right when people lived slowly. But it is ponderous nowadays. There is no room for it in the aeroplane

এই যে অপ্রয়োজনীয় ভাবের, প্রাচীন আদ-র্শের ও বিশ্বাসের জঞ্জাল ফেলিয়া দিয়া খাঁটী মানুষ-রূপে বিমানে বিহার করিবার প্রবৃত্তি—ইহাতে মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি হইতেছে কি? এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। হয়ত প্রশ্নটাই বাহুল্য মাত্র। মনুষ্যজাতির উন্নতি, প্রগতি প্রভৃতি ধারণাই হয়ত মরীচিকা-প্রায়। দেহ, মন, আত্মা তিনে মিলিয়া একরূপ শতের ঘর পূরণ। একের পুষ্টিতে অন্যের খর্ব্বতা—যোগফল নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট বাঁধা মোট কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। একাধারে মল্ল ও মনীষী কে দেখিয়াছে? দেহের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে মনের শক্তির মন্থরতা। সাধক ও ভক্ত করে তার্কিক-চূড়ামণিরূপে দেখা দেন? ভাবুকতার প্রাচুর্য্যে বিচার ও বিবেচনার সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী।

তবে বর্ত্তমান বুদ্ধিপ্রধান চিন্তারীতির একটা বিলক্ষণ সুবিধা আছে। ইহাতে লোক-ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান যদি প্রজ্ঞার চক্ষুর্দ্বয় হয় এবং সকল দেখার কাজে আর কোন যন্ত্র না থাকে—তাহা হইলে মানুষে মানুষে ভাব-বিনিময়ের, মতের ঐক্যের সম্ভাবনাও বাড়িয়া যায়। এ যুগের তাহাই লক্ষ্য। বিবর্ত্ত বা Evolutionএর আরম্ভ অব্যাকৃত একত্বে, মধ্যাবস্থা সুনির্ণীত বহুত্বে এবং পরিসমাপ্তি সেই অব্যাকৃতরূপে প্রত্যাবর্ত্তনে। From undifferentiated homogeneity through highly differentiated heterogeneity again to undifferentiated homogeneity মনুষ্যসমাজ এখন বিবর্ত্তের সেই তৃতীয় পর্ব্বে উপনীত। এখন সাগর-সঙ্গমের সে যাত্রী। অসংখ্য বিভেদ ও বিচ্ছেদ পরিহার করিয়া সাধারণ মানবতার অসীম অপার অর্ণবে মিশিবার আগ্রহে সে আজ অগ্রসর।

ইহার উপর প্রাচীনপন্থীর যাহা মন্তব্য তাহা, বোধ হয়, জর্ম্মাণ মনীষী Grillparzar-এর ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে। রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ইহা একটী parabola-প্রায়—জাতীয়তার ভিতর দিয়া মানুষ পরিশেষে পশুত্বে উপনীত হয়।

বর্ত্তমানে সকল পথেরই, বোধ হয়, এই এক গন্তব্য। সৎ ও অসৎ—এই দুয়ের পরস্পর বিরোধ শুধু ঈশা-বা মুশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে নহে—পরন্তু সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই স্বীকৃত। আলোক ও অন্ধকার, চেতন ও অচেতন যেমন অন্যোন্য-প্রতিযোগী—ইহাও সেইরূপ বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু এখন এগুলি পৃথক্ বা বিরুদ্ধ না থাকিয়া মিশিয়া যাইতেছে—আপোষ করিতেছে—সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অজ্ঞেয়তা ও আপেক্ষিকতাবাদ এইরূপ যুগযুগান্ত-পোষিত ধারণাকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্যোঢা বা অনূঢা-সঙ্গে যে গ্লানি বা কদর্য্যতা বোধ সমাজ-মনের অভ্যস্ত সংস্কার ছিল, তাহা শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। নিকট আত্মীয়তা, শোণিত-সম্বন্ধ, গুরুজন-বোধ, বয়ঃপার্থক্য প্রভৃতি নরনারীর মিলনে অনুল্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিত। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে দেখা যায় এ সকল বাধা বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত লঘু হইয়া সভ্যমানবের মানসাকাশে বিলীন হইবার উপক্রম করিতেছে। এখন নরনারীর সাক্ষাৎ হইলেই মৃগ-ব্যাধ, শিকার-শিকারী মনোবৃত্তির উন্মেষ ন্যায্য ও স্বাভাবিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। D. H Lawrence-এর ভাষায় বলি—

My great religion is a belief in the blood, in the flesh as being wiser than the intellect. We can go wrong in our minds But what our blood feels and believes and says is always true The intellect is only a bit and a bridle What do I care about knowledge ? All I want is to answer to my blood direct without fribbling intervention of mind or moral or what not

এইরূপ মতবাদের গৌরবময় নামকরণ—the gospel of animalism, the resurrection of the body—জৈব-ধর্ম্মের নববার্ত্তা—নবদেহের জ্যোতির্ম্ময় পুনরভ্যুত্থান। এরূপ মতবাদের মুখে পাতিব্রত্য, একানুরক্তি প্রভৃতি যে sexual obscurantism বা যৌনসম্পর্কে সত্য-বিমুখতা বা তামস ধারণা বলিয়া গণ্য হইবে—তাহাতে বিচিত্র কি ? আধুনিক সাহিত্যের স্রষ্টৃগণের মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, কল্পনার কৌশল, বাক্‌শিল্প থাকিলেও উহার প্ররোচনা হইতেছে ক্ষণিক সুখস্পৃহার দিকে। চিত্ত চাঞ্চল্যের প্রোৎসাহন, তাহারই অসংখ্য প্রকারভেদের মনোরম চিত্র—ইহাতেই এখন রসসাহিত্যের সার্থকতা ও গৌরব-বোধ।

পারিবারিক ও সামাজিক নীতিতে যেরূপ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আদর্শেও তদনুরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে। উনবিংশ শতাব্দী আধুনিক সভ্যজাতিসমূহ বিশেষতঃ ব্রিটিশগণ কর্ত্তৃক বাণিজ্য-ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগ। এ সকল প্রচেষ্টার মুখ্য প্রেরণা জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি হইলেও গত শতাব্দীতে বাহ্যতঃ একটা উদার ভাবের আবরণ ছিল। ফরাসী বিপ্লবের উদাত্ত মূলমন্ত্রের ঝঙ্কার তখনও থামে নাই। সভ্যতার বিস্তার, দলিত-নির্য্যাতিতের পরিত্রাণ, দুর্নীতির প্রতিরোধ, ধর্ম্মের প্রচার, পরাধীনতার মোচন প্রভৃতি মহনীয় আদর্শের অন্তরালেই শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভের প্রয়াস পৃথিবীময় চলিয়াছে। এই ভাবেই শ্বেতকায় মানবের দায়িত্ব-ভার বাড়িয়া চলিয়াছিল। ফলে উদ্যোগী পুরুষের

লক্ষ্মীলাভ যেমন ঘটিয়াছে, সাথে সাথে আধ্যাত্মিক অভিমানেরও পরিপুষ্টি হইয়াছে। আত্মতৃপ্তি পাশ্চাত্যজাতির মন স্নিগ্ধ ও সরস রাখিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর এ পিঠ ও ওপিঠে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সর্ব্বত্র যখন এই বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের খেলার সঙ্গী বা প্রতিযোগী বাড়িয়া উঠিল, তখন পরার্থ-পরতার মুখোস অগত্যা খসিয়া পড়িতে লাগিল। বিগত মহাযুদ্ধে সেই শতাব্দী-ব্যাপ্ত চাতুরী এবং ঔদার্য্যের ভান চরমে উঠিয়া একেবারে ভূমিসাৎ হয়। চতুরে চতুরে, শঠে শঠে যখন সংঘর্ষ তখনই ভণ্ডামির অবসান ঘটে। ফলে অনেক প্রাচীন নৈতিক সংস্কার আবর্জনারূপে পরিত্যক্ত হয়। ঋণ করিলে পরিশোধ করিতে হয়—ইহা বোধ হয়, একটি আদিম সংস্কার—সুতরাং আধুনিক যুগের অনুপযোগী। আর্ত্তত্রাণরূপ ক্ষত্র-ধর্ম্মও এই পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হাবসীরাজ্যে ইতালীর কীর্ত্তি। উহা সম্ভব হইয়াছিল, কেন না প্রথম শ্রেণীর সুসভ্য শক্তি সমূহ নিজ নিজ স্বার্থের আঁচল গুটাইতেই বিব্রত। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, বিপুল রণতরীসম্ভার অগণিত বজ্রোদ্গারী মারণ যন্ত্র থাকিলেও কাতর ভাবে আশ্রয়প্রার্থী, প্রাণভয়ে ব্যাকুল উৎপীড়িতের উদ্দেশে—"অভয়ং শরণাগতস্য" একথা বলিবার প্রবৃত্তি ও সাহস কাহারও হয় নাই। অথবা প্রবৃত্তি ও ভরসা দুইই হয়ত আছে—কেবল স্বার্থবোধের অভাবে তাহারা প্রকাশ নাই।

ঐতিহাসিক আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীও বর্ত্তমানে বদলাইয়া গিয়াছে। কোন অপার্থিব উদ্দেশ্য বা আদর্শের প্রেরণায় মানুষের কার্য্যাবলি বা ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা নিয়মিত—ইহা এখন অতীত তত্ত্বে দাঁড়াইয়াছে। নূতন গবেষণায় একমাত্র অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই মানব প্রচেষ্টার উৎস বলিয়া আবিষ্কৃত। এই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই আধুনিক জগতের কর্ম্মপ্রেরণার মূল। এই একই মূল হইতে বহু কাণ্ড, প্ররোহ, শাখার উদ্ভব। একদিকে ধনসাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ—অপর দিকে উৎকট স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ—এই মৌলিক চার্ব্বাক মতেরই বিচিত্র অভিব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলিয়াছে তাহার পরিণাম কি? যাহারা এই সকল মতবাদের আবর্ত্তে নিত্য ঘূর্ণমান, মগ্নপ্রায় তাহাদের কথাই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

Bolsheviks and Fascists, Radicals and Conservatives, Communists, and British Freemen—what the devil are they all fighting about? They're fighting to decide whether we shall go to hell by Communist express train or capitalist racing motor car, by individualist bus or collectivist tram running on the rails of state control The destination's the same in every case They're all of them bound for hell, all headed *for the same psychological impasse* and the social collapse that results from psychological impasse—*Point Counter point.*

এই স্বার্থের কলহ এবং মতের কোলাহলের মধ্যে ভারতের চিন্তা ও কর্ম্ম কোন্ ধারা আশ্রয় করিবে? যাঁহারা ভারতের আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পাশ্চাত্য ভাবস্রোত ব্যাহত ও প্রতিরুদ্ধ করিবার আশা পোষণ করেন—তাঁহাদের ইহা নিপুণভাবে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। কারণ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম-জাতি রূপে আমাদের অন্তরে তথাকথিত আদিম মনোবৃত্তির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। ভারত যে প্রজ্ঞার উপাসনা করে, তাহা পুরাণী প্রজ্ঞা। ইহা মানুষকে শান্ত, ধ্যানস্থ, সমাহিত, স্থিরদৃষ্টি হইতে

বলে। বিজ্ঞানে ও উদ্ভাবনে আধুনিক জগৎ অনেক বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য-জ্ঞান-সম্পৎ অতিক্রম করিলেও, আত্মার স্বরূপ, মানব মনের বৃত্তি ও ক্রিয়া, সামাজিক জীবের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে যে ভাস্বর তত্ত্ব সমূহ এদেশের উপনিষৎ, পুরাণ ও দর্শনে বিবৃত হইয়াছে—তাহা শাশ্বত ও আজও অমূল্য। আধুনিক মনের সুখৈষণা, ধনৈষণা, লোকৈষণার আলোচনায় মনে পড়ে ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের প্রসিদ্ধ অগ্নিসূক্ত। "ভিক্ষুগণ, সমস্তই প্রজ্বলিত। যদি বল, কি সমস্ত প্রজ্বলিত? ভিক্ষুগণ চক্ষু প্রজ্বলিত। রূপ প্রজ্বলিত, চাক্ষুষ জ্ঞান প্রজ্বলিত, চক্ষুঃ-সংযোগ প্রজ্বলিত, চক্ষুঃ-সংযোগ-প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন যে বেদনা, তাহা সুখই হউক, দুঃখই হউক, অথবা সুখ বা দুঃখ নাই হউক, তাহাও প্রজ্বলিত। যদি বল, কিসের দ্বারা, প্রজ্বলিত? রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত; জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, চিত্তবৈকল্য, নৈরাশ্য দ্বারা প্রজ্বলিত। এইরূপ কর্ণ প্রজ্বলিত, শব্দ প্রজ্বলিত। ঘ্রাণ প্রজ্বলিত, গন্ধ প্রজ্বলিত। জিহ্বা প্রজ্বলিত, রস প্রজ্বলিত। কায় প্রজ্বলিত, স্পর্শ গ্রাহ্য বিষয় প্রজ্বলিত। মন প্রজ্বলিত, পদার্থের ধর্ম্মসমূহ প্রজ্বলিত, মানস-বিজ্ঞান প্রজ্বলিত, মানস-সংস্পর্শ প্রজ্বলিত, মনঃসংস্পর্শ-প্রত্যয় হইতে যাহা কিছু বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহা সুখই হউক বা দুঃখই হউক, কিংবা সুখ বা দুঃখ নাই হউক, তাহাও প্রজ্বলিত; জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, চিত্তবৈকল্য, নৈরাশ্য দ্বারা প্রজ্বলিত।" মহাকবি কালিদাসের ভাষার ক্রম-বিপর্য্যয় করিয়া বলা যাইতে পারে—আধুনিক মন যাহাকে স্পর্শক্ষম রত্ন বলিয়া নিরন্তর গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত—তাহা আদিমসংস্কার-মতে এই জ্বালাকরাল অগ্নিস্তোম।

ভারতের পুরাণী প্রজ্ঞা এবং আধুনিক মনের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা উপনিষদের সেই গম্ভীর উক্তির মধ্যে নিহিত—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তমেনং বিদুর্ব্বুধাঃ।

ব্রহ্ম বা ভূমা নাই বলিয়া যে জানে সে নিজ সত্তাই হারাইয়া ফেলে। আছে বলিয়া যদি কেহ জানে, মনীষিগণ তাহাকেই সত্তাবান্ বলিয়া গণ্য করেন। মানুষকে মহাশয় বলিতে থাক—সে মহাশয়ই। তাহাকে নীচাশয় বলিতে থাক—সে নীচাশয়েই পরিণত হইবে।

তবে প্রশ্ন উঠিয়াছে—এ সকল মহাবাক্য অতি প্রাচীন কাল হইতে আছে—তথাপি মানুষ আত্মকৃত দুঃখ কষ্ট, অনাচার, অত্যাচারে জ্বলিতেছে, যাতনা পাইতেছে কেন? কেন সর্ব্বভূতমৈত্রী, সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধি, ত্যাগ, সংযম, বৈরাগ্য সম্বন্ধে উদাত্ত উপদেশবাক্যি প্রচলিত থাকিলেও সামাজিক বৈষম্য—ধনে, জ্ঞানে, ভোগে চরম ঐশ্বর্য্যের পাশে চরম দৈন্য দেখা যায়? বুদ্ধ, কনফুসিয়াস্, খৃষ্ট, চৈতন্যের বাণী বহু সহস্র বা বহু শতবৎসর প্রচারিত থাকিলেও নির্ম্মমতা, নৃশংসতা, আত্ম-পর-জ্ঞান, ঘৃণা ও দ্বেষ সেই পূর্ব্বতন আকারে রহিয়াছে বা বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? প্রাচীন নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের অসাফল্যই কি আধুনিক Secularism ঐহিকতা, Communism ধনসাম্যবাদ। বা Humanism মানবীয়তার পক্ষে প্রধান যুক্তি ও বল নহে? 'পুরাতন উপায় প্রয়োগ করিয়া অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সাহায্যে মানবকে উন্নত করিবার দীর্ঘকাল যথেষ্ট প্রয়াস হইয়াছে—ফলাফল প্রত্যক্ষ। এখন সে সব ভূতের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্পষ্ট খ্যাপন করিয়া একান্তভাবে ঐহিক কল্যাণের সেবা করিয়া দেখা যাউক। ইহার ফলে সভ্যতার উৎকর্ষ, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ হয়ত নাও হইতে পারে—তবে বর্ত্তমান হইতে অবস্থা খারাপ হইবার সম্ভাবনা নাই।' —আধুনিক মনের ইহাই মর্ম্মকথা। এবং ইহার অনুকূলে রহিয়াছে একটি মৌলিক মনস্তত্ত্ব। বাহ্যজগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ সকল পদার্থকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভি-

মুখে অনিবার্য্য বেগে টানিতেছে, তেমনি মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে রক্ত-মাংস, দেহেন্দ্রিয়ের অনুক্ষণ তীব্র আকর্ষণ সকল চিন্তা ও মনোবৃত্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, সুখের দিকে, স্থূল বিষয়ের দিকে টানিতেছে। প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় নৈতিক আদর্শ, ধর্ম্মমত, সাধনামার্গ—এ সকলকে এই সতত-সক্রিয় বিরুদ্ধ শক্তি আজ সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে। সেই জন্য মনে হয়, পূর্ব্বতন জীবন-পরিকল্পনার অগ্নি পরীক্ষার কাল আসন্ন। মহনীয় আদর্শের আকর্ষণে, দিব্যচরিত্রের অনুকরণে, প্রকৃতিনিহিত সদ্বৃত্তির প্রেরণায় ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যে মহত্ত্বে উন্নীত হইতে পারে—তাহার প্রমাণ পৃথিবীর অতীত ইতিহাস। বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রবদ্ধ, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত, সঙ্ঘ-পরিচালিত মানব কল্যাণ প্রচেষ্টার সহিত প্রতিযোগিতায় যদি স্বপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে নূতন উদ্যম ও নূতন উৎসাহে সেই জীবন-পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত, জাগ্রত ও মহনীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সেই পরিকল্পনার জীবন্ত আধার স্বরূপ মহাপুরুষ-পরম্পরা 'আত্মনো মোক্ষায়' এবং 'জগদ্ধিতায়' অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কি? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটিবে কি? শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভট্টকুমারিল, আচার্য্য শঙ্কর, আচার্য্য রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিক্রমে যে মহামানব-ধারা সেদিন পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দে অবিচ্ছিন্ন প্রমাণিত হইয়াছে—বহুপ্রসূ ভারতজননীর আধুনিক সন্ততি-গণে তাহা পুষ্ট ও প্রবৃদ্ধ হইবে কি? বর্ত্তমান ভারতে এই মহান্ উদ্দেশ্যে, বিপুল আয়োজনে আবার সেই মহনীয় পুংসবন-সংস্কারের আয়োজন হইতেছে কি?

'জীব শিব' ও 'কাঁচা আমি'

স্বামী নির্ব্বেদানন্দ

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের একটী প্রধান সিদ্ধান্ত জীবের ক্রমোবিবর্ত্তন (evolution), বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট অভ্রান্ত প্রমাণের সহায়ে প্রকৃতির এই গূঢ় রহস্যটী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই সত্যটী মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে এ যাবৎ কোন বলবান্ সঙ্গত যুক্তি কোন তরফ হইতে আসে নাই। এই ক্রমোবিবর্ত্তন কোন্ শক্তির প্রভাবে এবং কি ভাবে সংঘটিত হয় এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা বৈজ্ঞানিকের আসরে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে সকল সমস্যার মীমাংসা আজও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। কি ভাবে ইহা সংঘটিত হয়, এই সম্বন্ধে অবশ্য কয়েকটী অতি সন্নিকট কারণের (immediate cause) সন্ধান তাঁহারা দিয়াছেন, কিন্তু কি মূলশক্তির প্রভাবে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইল তাহা তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া বলিতে আজও অক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই বিষয়ে একটা সুমীমাংসার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেমন বট-বীজের মধ্যে পূর্ণাবয়ব বটবৃক্ষে পরিণত হইবার একটী অদৃশ্য এবং অমোঘ শক্তি আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়, ঠিক্ সেই রকম ভাবেই স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্ষুদ্রতম জীবাণুর মধ্যেই বুদ্ধত্বে পরিণত হইবার বিপুল শক্তি বিদ্যমান, ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে ক্রমোবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া একদিন 'বুদ্ধের' আবির্ভাব জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের ক্রমাভিব্যক্তির একটা

রহস্যময় ইতিহাস। ক্রমশঃ নৈসর্গিক উপায়ে উপরিস্থিত কঠিন আবরণ যতই অপসৃত হয়, ততই হয় জীবের পূর্ণতার দিকে ঊর্দ্ধগতি। ইহা অপেক্ষা যৌক্তিক এবং সহজ ব্যাখ্যা বিবর্ত্তনবাদের আর কি হইতে পারে?

এখন প্রশ্ন, কোন্ আবরণের আড়ালে এই পূর্ণতারূপী শিব প্রচ্ছন্ন থাকেন? হিন্দুশাস্ত্র বলেন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ শক্তির দ্বারাই এই আবরণ গঠিত। উদ্ভিদ্ ও নিম্নস্তরের প্রাণীর কথা বাদ দিয়া, প্রাণী-জগতের উচ্চস্তরে পৌঁছাইলে শিবের আবরণ এক কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায় "কাঁচা আমি"। স্বার্থসর্ব্বস্ব হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-ভোগ ও জীবনধারণের জন্য যথেচ্ছ প্রচেষ্টা করাই এই 'কাঁচা আমি'র স্বভাব। নিজের সুখের জন্য অপরের দুঃখ উৎপাদন করিতে ইহার তিলমাত্রও লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। স্বভাব-চালিত হইয়া প্রবৃত্তির পথে ভয় ছাড়া অপর কোন বাধাকেই ইহা গ্রাহ্য করে না। ভোগলোলুপ, স্বার্থান্বেষী, হিংস্রস্বভাব এই "কাঁচা আমি"টির পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখা যায় পশুজগতে।

আদিমযুগে প্রকৃতির ক্রোড়ে যখন মানুষের প্রথম জন্ম হয় তখনও তাহার উপর পশুর মতই ছিল এই ভোগলোলুপ, স্বার্থান্ধ, জিঘাংসাপরায়ণ "কাঁচা আমির" অপ্রতিহত অধিকার। ঠিক পশুরই মত নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখা এবং যথেচ্ছ ভোগ আহরণ করার জন্য কঠিন বিপদসঙ্কুল আবেষ্টনীর সঙ্গে নিয়ত লড়াই করাই ছিল আদিম মানুষের কাজ। কিন্তু একটা নৈসর্গিক কারণেই আদিম মানুষ ক্রমে 'কাঁচা আমি'কে সংযত, গণ্ডীবদ্ধ, শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন অনুভব করিল। কোন এক শুভলগ্নে অপরকে ভালবাসার এক অভিনব বৃত্তি, বহুকে লইয়া সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করার এক অদম্য স্পৃহা এবং প্রয়োজনবোধ আদিম মানুষের নির্ম্মম হৃদয়কে রসসিক্ত করিয়া তুলিল। এই বিশেষ রসভোগের আয়োজন করিতে গিয়া সে দেখিল যে ইহার বিনিময়ে তাহার 'কাঁচা আমি'র অবাধ স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ হইল না। কারণ, রিপুর তাড়না তাহার কাছে যতটা স্বাভাবিক সমাজপ্রেমের আকর্ষণও তাহার কাছে ততটাই স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। "কাঁচা আমি"কে যতটুকু বাঁধিয়া সমাজের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় এই অভিনিবেশের মধ্য দিয়াই সামাজিক বিধি, নিষেধ, রাজার আইন-কানুন প্রভৃতির উদ্ভব। ইহাই মানব-সমাজের ক্রমো-বিবর্ত্তনের সাধারণ এবং নৈসর্গিক ধারা। সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যষ্টির "কাঁচা আমি"টিকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়াই হইয়াছে মানবসভ্যতার বিরাট অভিযান।

কিন্তু নিছক সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনেই এই দুর্দ্দমনীয় 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। অবাধ-স্বাধীনতাকামী যথেচ্ছাচারপ্রিয় এই 'কাঁচা আমি' কোন প্রকার বিধি-নিষেধের বশ্যতা স্বীকার করিতে নারাজ। পশুরই মত ইহা ভয় করে শুধু প্রবলের কঠিন শাসন। অন্তরের অসন্তোষ ও তীব্র প্রতিবাদ লইয়া সে একটুখানি মাথাহেঁট করে শুধু ভয়েরই কাছে। কিন্তু পশু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি থাকায় মানুষ সুযোগ বুঝিয়া শাসনের কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আর যাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতির তাহারা সমাজ বা রাজার শাসনকে উপেক্ষা করিয়াই সংযমের নির্দ্দিষ্ট কোঠার বাহিরে চলিয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই অধুনাতম সমাজেও দেখা যায় যে কঠোর ফৌজদারী-দণ্ডের ব্যবস্থা বাহাল থাকা সত্ত্বেও নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করার লোকের অভাব নাই। যাহারা

দুর্ব্বল তাহারা শাসন মানিয়া লয় শুধু ভয়ে; ঐ শাসনের কঠোরতা শিথিল হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে "কাঁচা আমি"র প্রবল প্রেরণায় উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বরণ করিয়া লইতে পারে ইহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃই মানুষের এই দাম্ভিক, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ, হিংস্র-স্বভাব "কাঁচা আমি"টিকে শুধু বাহিরের শাসন দিয়াই সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব বলিলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু বিপদ শুধু এইটুকুই নয়। এই "কাঁচা আমি"র দানবীয় প্রভাব শুধুই ব্যক্তির জীবনে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের জীবনেই নিবদ্ধ থাকে না। যদিও বা কোন সমাজের কড়াশাসনের প্রভাবে ঐ সমাজের ব্যক্তিদের জীবন কতকটা সংযত হইয়া উঠে, তথাপি কৌশলী 'কাঁচা আমি' অপর এক দিক দিয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বসে। প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজেই (জাতি বা সম্প্রদায়) একটা সমষ্টিগত "কাঁচা আমি" সৃষ্টি হয়। নরহত্যা, ব্যভিচার, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি গুরু অপরাধ নিজ নিজ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে দণ্ডনীয় হইলেও, যখন একটী ক্ষুদ্র সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই অপরাধ-গুলি স্বদেশ বা স্বজাতির নামে মহিমান্বিত হইয়া উঠে, জগতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই চিত্র উজ্জ্বল ভাবেই অঙ্কিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান জগতের ইতিহাস বোধ হয় অতীতকে লজ্জা দিবার জন্যেই এই উৎকট লীলার রেকর্ড ভঙ্গ করিতে উদ্যত। ইউরোপখণ্ডে মহাপরাক্রম-শালী "কাঁচা আমি" "নেশন" নাম লইয়া খাড়া হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের এক বিশেষ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অবৈধ এবং নির্লজ্জ অত্যাচার আধুনিক মানবসমাজের দৈনন্দিন ব্যাপার। জড়প্রকৃতি মন্থন করিয়া বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞানরূপী অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে বিষও তুলিয়াছে যথেষ্ট। বিজ্ঞানের সহায়ে "নেশন"গুলি লোক ও জনপদ বিধ্বস্ত করার নূতন নূতন লোমহর্ষণ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, ইহাদের ভয়ে পৃথিবীর দুর্ব্বল জাতিগুলির শঙ্কা ও ব্যথার সীমাই নাই। ইহাদের কাহারও লুব্ধ এবং সকোপ দৃষ্টি পড়িবামাত্রই দুর্ব্বলজাতির মৃত্যুর পথে যাত্রা করিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ভয় শুধু দুর্ব্বল জাতিরই নয়। দুর্ব্বল ও সবল শুধু আপেক্ষিক শব্দমাত্র। সবল হইতেও সবলতর আছে। তাই ভয় আপেক্ষিক সবলতাকেই। এই জন্যই বর্ত্তমান ইউরোপখণ্ডে নেশনগুলির অনেকের মধ্যেই দেখা যায় সবলতম হইবার দুর্নিবার উদ্যম। তাই সমগ্র জগতের শান্তিরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সভাসমিতির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই বড় নেশনগুলির মধ্যে চলিয়াছে রণসজ্জার প্রতিযোগিতার এক অভূতপূর্ব্ব সাধনা। একটি বীভৎস মহাসংগ্রামের নিদারুণ স্মৃতি লোপ পাইবার পূর্ব্বেই আর একটি মহাসমরের ঘন-ঘটায় জগতের রাজনৈতিক আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই অবশ্য বুঝিতেছেন যে এই পথে অগ্রসর হইলে, বিগত মহাসমরের আর দুই একবার পুনরাবৃত্তি হইলে সমগ্র মানব-সমাজকেই বোধ হয় পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তথাপি দুর্দ্দমনীয় সঙ্ঘ-বদ্ধ "কাঁচা আমি"কে অবশ্য প্রয়োজনীয় সংযমের কোটায় বাঁধিয়া রাখিবার সাধ্য যেন কাহারই নাই।

বস্তুতঃই "কাঁচা আমি"টাই সকল অনর্থের মূল। ইহার অবাধ সেবা অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং সঙ্ঘ-বদ্ধ স্বার্থপরতা ও ভোগসর্ব্বস্বতার কাছে আত্মসমর্পণ করাই ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন বিষময় করিয়া তোলে। ইহারই অপ্রতিহত প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডীর মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসে এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ইহাই

সমগ্র মানব-সমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। "কাঁচা আমির" প্রভাবে শুধু পশুবৃত্তি লইয়াই যদি মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অধুনালুপ্ত অতিকায় পশুগুলির মত মানুষের একদিন পৃথিবীর বুকে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাহার কঙ্কালটী রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

দেখা গেল, মানুষের "কাঁচা আমির" প্রবল প্রতাপ, ইহাকে সংযত করা কত কঠিন এবং করিতে না পারার ফল কত বিষময়, গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই "কাঁচা আমিটী"কে সংযত করার পথে ব্যর্থতার কি করুণ কাহিনী, এবং এই ব্যর্থতার পশ্চাতে ধ্বংসের চিত্র কত বীভৎস!

কিন্তু মানবসমাজের প্রগতির সাধনায় এইটুকু সব কথা নয়। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রবল 'নেশন'গুলি যে আত্মঘাতী প্রচেষ্টায় প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছে ঐ পথেই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সকল মানুষকে অগ্রসর হইয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইত।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের আর একটী দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে এই "কাঁচা আমিটীকে" সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। মেগাস্থেনিসের বর্ণনার মধ্যদিয়া তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, অথবা কনফুসিয়াসের আমলে চীনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টি জীবনেও "কাঁচা আমিটীকে" সংযমের গণ্ডীর মধ্যে রাখা খুবই সম্ভব। কিন্তু এই সংযমের প্রেরণা শুধু সমাজের বাহ্যিক শৃঙ্খলা রাখার প্রয়োজনের দিক হইতে আসে নাই—ইহা আসিয়াছে আর একটী বিশেষ দিক হইতে—সেটী ধর্ম্মের দিক।

যেমন একটী শুভলগ্নে আদিম মানুষের মনে সমাজ গঠন করার এক অদম্য ক্ষুধা জাগিয়াছিল, সেইরূপ আর একটী বিশেষ শুভলগ্নে মানুষ আবিষ্কার করিয়া বসিল তাহার অন্তরের মধ্যে "কাঁচা আমি"র আড়ালে এই "কাঁচা আমিটী"কে জয় করার উপযুক্ত এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং আশাপ্রদ প্রত্যক্ষ হইল এই যে যখন একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এই "কাঁচা আমি"টী মরীচিকার মত শূন্যে মিলাইয়া যায়। তখনই মানুষের অন্তরে প্রকট হয় মানুষের যথার্থ স্বরূপ, যেখানে হিংসা নাই, লোভ নাই, ক্রোধ নাই—আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির এক মহান্ গাম্ভীর্য্য আর সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকামনার এক অফুরন্ত প্রবাহ, তখন তাহার "আমি"টী "কাঁচা আমি"র মত একটা ক্ষুদ্র দেহ-মনের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে না। তার "আমির" মধ্যে দেখিতে পায় সে বিশ্ব-সংসার। "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব-ভূতানি চাত্মনি, ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥" সকলের প্রতিই তার সমদৃষ্টি, সকলের কল্যাণের মধ্যে পায় সে অনাবিল আনন্দ। "কাঁচা আমির" ক্ষুদ্র স্বার্থপর সত্তার স্থান অধিকার করিয়া সেখানে বিদ্যমান এক ভূমা বিশ্বকল্যাণ-মূর্ত্তি। নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, সংশয় নাই, ভয় নাই, কোন কিছু পাবার উদ্বেগ নাই, দুঃখও নাই। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" তাহার অনাবিল স্বার্থগন্ধশূন্য বিশ্ব-প্রেমের প্রেরণায় নিরন্তর লোককল্যাণই হয় একমাত্র কাম্যবস্তু। "বসন্তবল্লোকহিতে চরন্তঃ", বসন্তকালের মত সকলের কল্যাণ কামনাই হয় তাঁহার স্বভাব। পরিস্ফুট দেবস্বভাবের প্রেরণায় অপরের কল্যাণের জন্য বিষপান করিতেও তাঁহার দ্বিধা নাই। ছাগশিশুর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবনকে অর্পণ করিতে অথবা মানব-কল্যাণের জন্য ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইহাই "কাঁচা আমি"-মুক্ত জীবের স্বরূপগত শিবের পরম কল্যাণময় মূর্ত্তি।

জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ভারতে, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" প্রভৃতি উপনিষদ্-বাক্যের মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব প্রথম ঘোষিত হয়। সেই সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যুগে যুগে ভারতের তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি ও আচার্য্যগণ এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন এবং নানা ভাষায় নানা ছন্দে এই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি", ইত্যাদি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলিলেন "জীব শিব"। জীবের ইন্দ্রিয় চালিত বহির্মুখী স্বার্থান্বেষী একটা বাহিরের মূর্ত্তির অন্তরালে যে তার স্বরূপগত পরম কল্যাণময় শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ইহা নিছক কবির কল্পনা নয়, ঔপন্যাসিকের উচ্ছ্বাস নয়, যুক্তিসর্ব্বস্ব দার্শনিকের অসার অনুমান নয়। ইহা শুদ্ধ ও একাগ্র মানববুদ্ধিমাত্রেরই গোচর প্রকৃতির একটী চিরন্তন মূল সত্য। ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন-দেশে এবং বিভিন্ন যুগে এই সত্যের সন্ধান ও যথোপযুক্ত প্রচার হইয়াছে। যীশুর "I and my Heavenly Father are one"—ইহা এই সত্যেরই ঘোষণা।

যাহা হউক, জগতের তত্ত্বদ্রষ্টা আচার্য্যগণ যুগে যুগে এবং দেশে দেশে এই সত্য উপলব্ধি করাকেই মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অন্তর্নিহিত শিবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যেই মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষ. ইহাতেই তাহার সকল অভাব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি, ইহাতেই সকল দুঃখ, ভয় ও সংশয়ের চির অবসান। ইহাতেই হৃদয় পূর্ণ হয় ভূমা আনন্দে, নিঃস্বার্থ প্রেমে; জীবন মধুময় হয়, কৃতকৃত্য হয়। ইহাই ব্যক্তিগত মানব-জীবনের চরম পরিণতি। সুতরাং ইহাই মানবের জীবনব্যাপী সংগ্রামের চরম লক্ষ্য।

মানব-সমাজের পরম কল্যাণকামী আচার্য্যগণ এই আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই আদর্শলাভের উপায়ও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিলেন। কেমন করিয়া "কাঁচা আমি"র আবরণটী মুক্ত করিয়া শিবত্বের ক্রমোবিকাশ ঘটাইতে হইবে তাহাও তাঁহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মানুষকে শিখাইলেন, এই আদর্শ লাভের প্রচেষ্টাই মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনা। ইহারই নাম ধর্ম্ম। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "Religion is the manifestation of the Divinity already in man" মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের (শিবত্বের) পূর্ণ অভিব্যক্তি যখন হয় তখন হয় তাহার যথার্থ ধর্ম্মলাভ।

জগতের সকল ধর্ম্মমতগুলির মূলেই আছে "কাঁচা আমি"জয়ের ন্যূনাধিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ত্যাগ ও সেবা, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়া অপরের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার নাম সেবা, এই ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া যে "কাঁচা আমি"র আবরণ ভেদ করিয়া মানুষ শিবত্বের ক্রমোবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে কোন অস্বাভাবিক যুক্তির আশ্রয় লইতে হয় না।

শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্তর্নিহিত শিবত্বে আস্থাবান্ হইতে পারিলেই এই পথে অগ্রসর হইবার প্রবল প্রেরণা আসে। আদর্শলাভের মহান্ প্রেরণায় মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নীচ, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ "কাঁচা আমি"র বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ত্যাগ ও সেবার পথে অগ্রসর হয়। নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নিজে বরণ করিয়া লয় বলিয়াই ত্যাগ ও সেবার আপাতবন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ক্রমে বাড়িয়াই চলে। এই জন্যই, শুধু সমাজের

বিধিনিষেধ এবং রাজার কঠোর শাসন যে "কাঁচা আমি"কে ঈষৎমাত্র সংযত রাখিতেও অক্ষম, সেই "কাঁচা আমি"কে নিজ অভীষ্টলাভের প্রেরণায় সম্পূর্ণ লয় করাও অসম্ভব হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের আত্মসংযম সমাজ ও রাজার শাসনজনিত সংযম অপেক্ষাও হয় অধিকতর কার্য্যকরী। তাই যখনই কোন সমাজের জীবনে ধর্ম্মলাভের ব্যাপক জাগরণ-লক্ষিত হয় তখনই সহজ ও দ্রুতপদক্ষেপে সেই সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। কন্‌ফুসিয়াসের আমলের চীনে এবং মেগাস্থেনিসের আমলের ভারতে ব্যাপক শান্তি ও শৃঙ্খলার মূলে ছিল এই স্বতঃপ্রবৃত্ত অধ্যাত্ম সাধনার প্রভাব—ধর্ম্মের প্রেরণা।

কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মের দিক্ দিয়াও মানবসমাজ "কাঁচা আমি"কে ব্যাপকভাবে এবং স্থায়ীভাবে জয় করিবার পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবন এবং কিছুদিনের জন্য কোন কোন সমাজের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সত্য—কিন্তু সভ্যতাগর্ব্বিত বর্ত্তমান জগতের সমষ্টিগতজীবনও "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" আছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ইহার কারণ, ব্যক্তিগত "কাঁচা আমি" বড়ই প্রবল, বড়ই কৌশলী, এবং সমষ্টিগত "কাঁচা আমি" আরও প্রবল আরও কৌশলী। আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াও মানুষ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভুলিয়া যায় যে "কাঁচা আমি"কে জয় করাই ধর্ম্মের মূল কথা। তখন ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর সে সবটুকু রাখিয়া দেয় বটে, বরং উহার মাত্রা বোধ হয় দিন দিন সে বাড়াইয়াই চলে, কিন্তু অন্তর্নিহিত শিবের আবাহনের পরিবর্ত্তে সে ছদ্মবেশী "কাঁচা আমি"র নূতন রকমের পূজায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। ত্যাগ ও সেবার, প্রেম ও পবিত্রতার স্থান অধিকার করিয়া বসে অভিমান, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের প্রবল স্পৃহা। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ তখন অন্তরের পশুত্বকে বহাল রাখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে, মূলকথা বিস্মৃত হইয়া এই পথেও সঙ্ঘবদ্ধ "কাঁচা আমি" ধর্ম্মের পতাকা উড়াইয়া উৎকট হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের সমাজকে কতভাবেই বিপর্য্যস্ত করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাম্প্রদায়িক কোলাহল ও অশান্তির মূলে এই সঙ্ঘবদ্ধ "কাঁচা আমি"রই প্রতারণা। ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া "কাঁচা আমি" মানুষকে মিথ্যাচার করিয়া তোলে, এবং সকল কল্যাণের মূল উৎস যে ধর্ম্ম, তাহাকেই বীভৎস করিয়া বসে।

এইজন্য বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে ধর্ম্মের নাম থাকিলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মেরও একটা স্বরূপ আছে এবং একটা বিকৃতি আছে, "কাঁচা আমি"কে ক্রমশঃ লয় করিয়া শিবত্বের প্রকাশ করাই যথার্থ ধর্ম্মের লক্ষ্য। সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে "কাঁচা আমি"র কোন প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব, যদি কোথাও কোন প্রকার আপোষ দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেখানে ধর্ম্ম কক্ষচ্যুত হইয়াছে। মূল লক্ষ্য হারাইয়া উহা বিকৃত হইয়াছে এবং সমাজকে কল্যাণের নামে অকল্যাণের বিপরীত পথে লইয়া যাইতেছে। এইরূপ বিকৃত ধর্ম্মই গীতার "ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ," (ধর্ম্মের গ্লানি)।

বর্ত্তমান জগতে আস্তিক সমাজগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম্মের চিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই বাহ্যিক আচার ও আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের অন্তরালে "কাঁচা আমি"র অবাধ পূজার ব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। স্বার্থপর, দাম্ভিক, নৃশংস, ক্রূর, অত্যাচারী, ব্যভিচারী ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা সকল দেশেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মজগতে যাঁহারা নেতার পদ দখল করিয়া আছেন, তাঁহাদের অবস্থাই যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ধর্ম্মগুরুর জীবনেই

যদি প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি ও মাধুর্য্যের আদর্শ তাহারা দেখিতে না পায়, তাহারা সংযমের পথে আকৃষ্ট হইবে কোন্ প্রেরণায়? মানুষকে চিরকাল অজ্ঞ রাখিয়া, শুধু পরকালের ভয় দেখাইয়াই কল্যাণের পথে চালিত করা যায় না। অন্তঃসার-শূন্য হইয়া ধর্ম্মযাজকগণ জনসমাজে ধর্ম্মের অস্তিত্ব বহাল রাখিবার জন্য যখন এই পথ অনুসরণ করেন, তখন বস্তুতঃই তাঁহারা ধর্ম্মের সমাধি রচনা করেন।

বর্ত্তমান যুগে গণশিক্ষা বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য-খণ্ডে প্রায় প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মযাজকদের ভণ্ডামি ধরা পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ফলে কোথাও প্রতারক ধর্ম্মযাজকদের অপরাধে আচার্য্য-প্রচারিত মূল ধর্ম্মই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কোথাও ধর্ম্ম-যাজকদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতা ও অভিজাততাকে খর্ব্ব করার আয়োজন চলিতেছে। এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম্মের বিকট চিত্র দেখিয়া বহু মনীষী ধর্ম্মকে মানব-সমাজের প্রগতির পথের বন্ধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই মনীষীদের দোষ দেওয়া যায় না। ধর্ম্মের স্বরূপ ও বিকৃতির মধ্যে ভেদটা স্বর্গ ও নরকের ভেদের মতই একেবারে বিপরীত। বিকৃত ধর্ম্মই যদি ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে ইহার চিরনির্ব্বাসনই মানুষের কল্যাণের পথ, এ কথা নিঃসংশয় আর এক কথা। ধর্ম্মের স্বরূপগত যে একটী পরম কল্যাণময় রূপ আছে তাহার সন্ধান না পাওয়ার জন্য এই মনীষিবৃন্দকে দায়ী করা যায় না। কারণ চতুর্দ্দিকে যখন ধর্ম্ম গ্লানিগ্রস্ত তখন কাহারও পক্ষে যথার্থ ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। এই জন্যেই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন (ধর্ম্মের নব জাগরণের জন্য) স্বয়ং আমি অবতীর্ণ হই।' "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" যাহা হউক, গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম্মও যেমন সমাজকে বিপরীতদিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, উহার প্রতিকারকল্পে মূলধর্ম্মের লোপ-সাধনের প্রচেষ্টাও ঐ পথে সমাজকে লইয়া যাইতে বাধ্য। কারণ উভয় পক্ষেই আছে সেই সকল অনর্থের মূল পশুভাবাপন্ন "কাঁচা আমি"র ছলনাময় আত্মপ্রসারের প্রচেষ্টা। একপক্ষে "কাঁচা আমি'র ছদ্মবেশী অভিযান, অপর পক্ষে উহারই উলঙ্গ আস্ফালন। ইহারই ফলে ইউরোপে আজ ব্যাপক অশান্তি এবং সমগ্র মানব সমাজের আসন্ন বিপদ।

ভারতের ধর্ম্মও গ্লানিগ্রস্ত এবং ইহার প্রতিকারের জন্য এখানেও মূল ধর্ম্মকেই নির্ব্বাসন দিবার চিন্তা অনেক মনীষীর মনই অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্রই বোধ হয় এইরূপ একটী বিপরীত গতি সুরু হইয়াছে।

তথাপি একটু নজর করিলেই দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশের মনীষীদের মধ্যেও কেহ কেহ গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম্মের বীভৎসতা দেখিয়াও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হন নাই, বরং আশার বাণী শুনাইয়াছেন ও শুনাইতেছেন। তাঁহারা মূলধর্ম্মের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার বার্থ চেষ্টা করেন নাই। বরং ধর্ম্মের যুক্তি বিরোধী আবর্জ্জনা দূর করিয়া উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা সেই বিষয়েই গবেষণা করিতেছেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু ইঁহাদের উপায়টী উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট কিনা তাহা প্রণিধানযোগ্য। ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মতত্ত্বের উপলব্ধির মধ্য দিয়াই সম্ভব, কল্পনা বা বিচারের সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু ইঁহারা শুধু বিচারকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এক একটী কল্পনা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অবশ্য উদ্দেশ্য মহান্ বলিয়া তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা একবারে উপেক্ষার বস্তু নয়।

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক ক্রমোবিবর্ত্তনবাদটীকে যুক্তিদ্বারা অনুসরণ করিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটী উজ্জ্বল চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে মানুষের মধ্যে একটী অতি-মানবতার (Superman) বীজ রহিয়াছে, এই বীজ হইতেই একদিন অতিমানবের সৃষ্টি হইবে এবং মানুষের সমাজ ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া অতিমানব সমাজে পরিণত হইবে। এই মতের প্রবর্ত্তকদের মধ্যে জার্মাণ দার্শনিক নীটসে এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ডের ভাব-নায়ক বার্ণার্ডশর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইঁহাদের কল্পিত অতিমানবের চিত্রটী বুদ্ধ বা যীশুর অনুরূপ হইবে, কিম্বা হিট্লার ও মুসোলিনীর অনুরূপ হইবে তাহা বলা যায় না। মানুষ তাহার গণ্ডীবদ্ধ শক্তির সীমা ছাড়াইয়া অসুরেও পরিণত হইতে পারে, দেবতাও হইতে পারে। "কাঁচা আমি"টীকে যদি বাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সে হয় অসুর আর উহাকে সম্পূর্ণ জয় যদি করিতে পারে, তাহা হইলে হয় দেবতা।

মানুষের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশার বাণী আর একদিক্ হইতেও উঠিয়াছে। উপনিষদের ঋষিদের মতেই নিজের শুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে নূতন করিয়া "জীব শিব" মন্ত্রের পুনরায় উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও সংকল্প ও সাধনাবলে এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া জগতে ইহার বহুল প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিয়াছেন যে, এই "জীব শিব" মন্ত্রের সাধনের মধ্য দিয়াই মানব-সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, অন্যথা নয়। এই জন্যই ত্যাগ ও সেবার মহিমা প্রচার করিয়া তিনি জগতের নর-নারীকে কল্যাণের পথে আহ্বান করিয়াছেন। "কাঁচা" আমিকে জয় করিয়া অন্তর্নিহিত শিবকে প্রকট করাই ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মই মানব সমাজের যাবতীয় কল্যাণের মূল উৎস, এই কথা প্রচার করিয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্ত জগৎবাসীকে যথার্থ প্রগতির পথের সন্ধান দিয়াছেন।

ইউরোপকে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে উহার সমগ্র বর্ত্তমান সভ্যতার নীচেই আছে এক ভীষণ আগ্নেয়গিরি। যদি এখনও ঐ সভ্যতা আমূল শোধিত হইয়া অধ্যাত্ম পথে চালিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সভ্যতার ধ্বংস হইতে আর বিলম্ব নাই। ভারতবাসীকেও দুইটী আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি সতর্ক করিয়াছেন। ভারতের একদিকে গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম্মের উৎকট ব্যভিচার, অপর দিকে যুক্তিবাদী নাস্তিকতার নির্লজ্জ পরানুকরণস্পৃহা। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া, ঔপনিষদিক ধর্ম্মের কল্যাণময় রূপটী প্রকট করিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তিনি ভারত-বাসীর উপর। ভারতই জগতের আদি ধর্ম্মগুরু। আজ নিয়তির চক্রে ভারত নিজে পথভ্রষ্ট হইলেও তাহার দায়িত্ব লোপ পায় নাই। তাই বুঝি এখানে বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং "জীব শিব" মন্ত্রের পুনঃ প্রচার।

ইসলামে উদারতার আদর্শ

রেজাউল করীম, এম্‌-এ, বি-এল্‌

যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক সমালোচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই একটা বিষয়ে মস্ত ভুল করিয়া বসেন। সেইজন্য তাঁহাদের আলোচনা পক্ষপাতশূন্য হইতে পারে না। এবম্প্রকার সমালোচনায় সাধারণতঃ দেখা যায়, লেখক পূর্ব্ব হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া লন যে তাঁহার ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপর সেই মানদণ্ডে অপরাপর ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে সমগ্র আলোচনাটি হইয়া পড়ে মিশনারী প্রচারকদের মত। অন্যপক্ষ ইহার প্রত্যুত্তর দিবার সময় ঠিক সেই প্রকার ভুল পন্থা অবলম্বন করেন। এইভাবে প্রত্যেক লেখকের আলোচনা অপরের ধর্ম্মের গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া যায়। যে সব গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা থাকে তাহা পাঠ করিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সঠিক উপলব্ধি হয় না, হইতে পারে না। যে কোন লেখকের (সে লেখক আমির আলি হউন, অথবা মুইর ও জুইমারই হউন) একখানা গ্রন্থ পড়িলে দেখা যাইবে, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মের নিন্দায়, আর লেখকের নিজের ধর্ম্মের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। ধর্ম্মালোচনা করিবার এই নীতি অত্যন্ত গর্হিত ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনার সময় লেখককে প্রথমেই ধরিয়া লইতে হইবে যে তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। অপক্ষপাতদর্শক ও সমালোচকের মত তাঁহাকে সব দিক দেখিয়া ও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া তবে আলোচনা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বিশ্বে প্রচলিত কোন ধর্ম্মই মূলতঃ কলুষিত নহে, মন্দ নহে ও নিন্দার্হ নহে। ন্যায় নীতি ও সুবিচারের আদর্শ সকল ধর্ম্মেই আছে এবং ইহার প্রভাব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনুভূত হয়। ন্যায় নীতির আদর্শ কেহ যদি অপরের ধর্ম্মে দেখিতে না পায় তবে সে দোষ ধর্ম্মের নহে, সে দোষ সমালোচকের বুদ্ধি বিচারের। যাহারা অপরের ধর্ম্মকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে না পারে তাহাদের কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এমন এক যুগ ছিল যখন লেখক ও ধর্ম্মপ্রচারক নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া অপর ধর্ম্মের নিন্দা না করিয়া ছাড়িতেন না। লেখকবর্গ অপরের ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া প্রথমেই প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে তাহা ভ্রান্ত ও কুসংস্কার-পূর্ণ তারপর নিজের ধর্ম্মের মহিমা গান গাহিয়া দেখাইতে চাহিতেন যে এই ধর্ম্মটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আনন্দের বিষয় যে উপস্থিত অনেকের এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরধর্ম্মের নিন্দামূলক আলোচনা কমিয়া আসিতেছে। অপরের সহিত সমালোচনা না করিয়াই লেখকবর্গ নিজ নিজ ধর্ম্মের সকল প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন—ইহাতে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। এইভাবে যদি ধর্ম্মালোচনা হয়, তবে দেখা যাইবে যে কোন ধর্ম্মের মূলনীতি বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। আচার পদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মই সমভাবেই করিতে পারে। চিত্তশুদ্ধি, পরোপকার, সৎভাবে জীবনযাপন এবং বিধাতার সান্নিধ্যলাভ—এসব যে কোনও ধর্ম্মের মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে সম্ভব হইবে।

আজ সর্ব্বত্র বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনকষাকষি, রেশারেশি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতেছে তাহার একটা প্রধান কারণ অপরের ধর্ম্মের মূল-নীতি সম্বন্ধে সাধারণের উপলব্ধি খুব পরিষ্কার নহে। মিশনারী আদর্শে লিখিত পুস্তকাদি পড়িলে কখনই হৃদয় উদার হইবে না। যদি প্রত্যেকে উদার দৃষ্টি লইয়া অপরের ধর্ম্মে প্রবেশ করে, তবে হয়ত তাহার অনুদারতা অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে, তাহার মনোবৃত্তিরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এদেশে আমরা বহুদিন হইতে বসবাস করিতেছি কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে হিন্দু মুসলমানের একে অপরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে না। আর যদি কেহ কোনও সংবাদ রাখে তাহাও সে বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া। এ যুগের হাজার হাজার লোকের মধ্যে আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয় ঋষিকল্প রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে, কারণ হাজার লোকের মধ্যে তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা করিতেন না। সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই উদার মত পোষণ করিতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইস্‌লামের মূলধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা ধর্ম্মমত বিষয়ে উদারতার সমর্থক, পরধর্ম্মের প্রতি পরম সহিষ্ণু। এই প্রবন্ধে ইস্‌লামের উদারতার আদর্শ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

سخن کز بہر دین گوئی چہ عبرانی چہ سریانی
مکان کز بہر حق جوئی چہ جابلقا چہ جابلسا

উপরে হাকিম সানা-ইর যে কবিতাংশটি উদ্ধৃত করিলাম তাহা ইস্‌লামের উদারতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান উক্তি। "ইসলাম" এই শব্দের অর্থ শান্তি। সকল সৃষ্টজীব বিশেষতঃ সকল মানুষের সহিত শান্তি স্থাপন করা ইস্‌লামের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের সহিত মানুষের সদ্ভাব-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করাই হইল ইস্‌লাম-সেবকদের কর্ত্তব্য। শান্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইলে অপরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতার ভাব দেখাইতে হয়। অপর সম্বন্ধে নিজের হৃদয় কোমল করিতে না পারিলে কেহই মানব-প্রেমিক হইতে পারে না। যাহাতে অপরের অনুভূতি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত না লাগে সেদিকেও সতত দৃষ্টি রাখা দরকার। অপরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনুদার ব্যক্তি মানব-প্রেমিক হইতে পারে না, কাহারও সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারে না। সুতরাং সে বিশ্বে শান্তি স্থাপনেও সাহায্য করিতে পারে না। মুসলমানের নাম ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি শান্তির পথে অথবা মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের পথে ব্যাঘাত উৎপাদন করে সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃত মুসলমান নহে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ কোর-আন পাঠ কর, হজরতের অমৃত বাণী—হাদিস পাঠ কর, দেখিবে তাহা উদারতার আদর্শে পরিপূর্ণ, অপরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার তাকিদে ভরপুর। "ধর্ম্মের জন্য কোনরূপ বল প্রয়োগ নাই," "মানুষের ইচ্ছামত ধর্ম্ম বাছিয়া লইবার অবসর দাও", "মানুষকে সত্য ও সুযুক্তির দ্বারা ধর্ম্ম পথে আহ্বান কর", "অপরের ধর্ম্মমত বিষয়ে সহিষ্ণু ও উদার হইও"—এই প্রকার বহু শ্লোক ইস্‌লামের ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। উদারতার জন্য এই প্রকার নির্দ্দেশ ইস্‌লামের পলিসি নয়, ইহা ইস্‌লামের অন্যতম মূল-নীতির অন্তর্গত। ইস্‌লামের এই শিক্ষাকে স্মরণ করিয়া হাকিম সানা-ই উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। উহার ভাবার্থ এইরূপ: "প্রার্থনার ভাষা আরবী হউক বা হিব্রু হউক, তাহাতে কিছু (ঈশ্বরের) আসে যায় না,—সত্যের সন্ধানে বলকা গমন কর বা বলসা গমন কর তাহাতে (ঈশ্বরের) কিছু আসে যায় না।" পরবর্ত্তী মুসলমানগণ ইস্‌লামের উদারতার আদর্শকে কতদূর কার্য্যকরী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তৎবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব হইবে না। বোধ হয় এতটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে উদারতা ও পরধর্ম্মে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে হজরত মহম্মদ যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বিস্মৃত হন নাই, বরং বর্ণে বর্ণে পালন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইস্‌লামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ পরধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতার যে মহান্ আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহা সে যুগে বহুস্থানে ছিল না। প্রাথমিক খলিফাগণ যখন বিভিন্ন দেশ জয় করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা পবিত্র কোর আনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। হজরত মহম্মদ ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদেরকে ধর্ম্মে স্বাধীনতা দিবার জন্য কতগুলি সনদ (charter) দিয়াছিলেন। সেই সনদে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ধর্ম্মের স্বাধীনতা, ধর্ম্মপ্রচারের স্বাধীনতা, ধর্ম্ম-মন্দিরের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। হজরতের অনুবর্ত্তিগণ পরদেশে গমন করিয়া সেগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। কোথাও যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটনা সাধারণ নিয়মই প্রতিপন্ন করে। সুতরাং আমরা কখনও একথা বলিব না যে ইস্‌লামের আদর্শ হইতে কোনও দিনই কোন মুসলমানের পদস্খলন হয় নাই। অনেক স্থানেই হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের বহু মুসলমান ইস্‌লামের উদারতার আদর্শকে পদাঘাত করিয়াছে, অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অনেকের ধর্ম্মমন্দির ও গীর্জ্জা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, অনর্থক অপরের রক্তপাত করিয়াছে। কিন্তু এসব অধিকাংশই হইয়াছিল রাজনৈতিক কারণে—অপরের ধর্ম্মকে নিপীড়ন করিবার জন্য নহে। বিজয়ী সেনাপতি বিজয় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া এইভাবে অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু বিধর্ম্মী দলনের জন্য ইস্‌লামের সমগ্র ইতিহাসে Inquisition Court এর মত কোন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

হজরত মহম্মদের দেহ ত্যাগের পর যখন হজরত আবুবকর খলিফা হইলেন, তখন তিনি একটি ঘোষণাবাণী প্রচার করিলেন, তাহাতে খৃষ্টান, ইহুদী ও অগ্নি-উপাসকদেরকে তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। পারসীকদেরকে প্রকাশ্যভাবে অগ্নি উপাসনা করিবার, খৃষ্টানদিগকে ক্রুশ ব্যবহার করিবার এবং ইহুদীদিগকে তাহাদের আচার-পদ্ধতি পালন করিবার সমস্ত অধিকার প্রদান করিলেন। গীর্জ্জা ও ধর্ম্মমন্দিরাদির পবিত্রতা সর্ব্বদা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যখনই তিনি কোথাও সৈন্য প্রেরণ করিতেন, তখনই সেনাপতি ও সেনানীদিগকে অমুসলমানদিগের সহিত সদ্ভাব করিতে বলিতেন। শান্তির সময় অথবা যুদ্ধের সময় কোন অবস্থাতেই যেন তাহারা গীর্জ্জা ও ধর্ম্মমন্দির স্পর্শ না করে সে বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ তাকিদ করিতেন। হজরত আবুবকরের পর হজরত ওমর খলিফা হন। তিনি আবুবকরেরই মত উদার ছিলেন এবং আবুবকরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহার সময় মুসলমানগণ মিসর জয় করেন। সেই সময় তিনি তথাকার খৃষ্টানদের প্রতি যে উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বহু খৃষ্টান লেখক স্বীকার করিয়াছেন। মিসরের সমুদয় গীর্জ্জাগুলির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, গীর্জ্জার তত্ত্বাবধানে বহু সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র আত্মসাৎ করিবার অধিকার মুসলমানদিগকে তিনি দেন নাই। সুতরাং গীর্জ্জাগুলি তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে গীর্জ্জা ও পাদ্রিগণ ষ্টেট হইতে যে মাসহারা পাইতেন তিনি তাহাও বন্ধ করেন নাই। হজরত ওমরের পর হজরত ওসমান খলিফা হন। তারপর খলিফা হন হজরত আলি। হজরত আলি পরধর্ম্মের প্রতি উদারতায় সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার খিলাফতের সময় জনৈক মুসলমান একজন

অমুসলমানকে বধ করে। সে মনে করিয়াছিল ইহাতে সে দণ্ডভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। কিন্তু হজরত আলির বিচারে সে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। এতৎ প্রসঙ্গে হজরত আলি বলিয়াছেন: "একজন জিম্মির রক্ত মুসলমানের রক্তেরই সমান।" (জিম্মি অর্থে মুসলমানের রাজ্যে যেসব অমুসলমান আশ্রয় লয়) কেহই মুসলমান বলিয়া অতিরিক্ত সুবিধা পাইবে না। হজরত ওমরের সময় এইরূপ আরো একটি ঘটনা ঘটে। ওলিদ ইব্‌নে ওকার তখন কুফার শাসনকর্ত্তা। সেই সময় একজন ইহুদী যাদুকর সাধারণের সম্মুখে কতকগুলি যাদু-কার্য্য দেখাইতেছিল। যাদুবিদ্যা ইসলামে নিষিদ্ধ এই মনে করিয়া জান্দাল ইব্‌নে ওকার তৎক্ষণাৎ সেই ইহুদীকে বধ করিয়া ফেলিলেন। হজরত ওমরের আদেশে তিনি তৎক্ষণাৎ ধৃত হন, এবং বিচারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এতৎ প্রসঙ্গে হজরত ওমর বলিয়াছিলেন যে, বিচারের সময় মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য ইসলামে নাই। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, বিচার করিবার জন্য সে যুগে উন্নততর দণ্ডবিধি প্রণীত হয় নাই। ধর্ম্মনীতির নামেই বিচারকার্য্য সমাধা হইত।

প্রত্যেক খলিফা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার উত্তরাধি-কারীদিগকে হজরত মোহম্মদ প্রদত্ত উদারতার সনদ প্রতিপালন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া যাইতেন। পরবর্ত্তী যুগে যখন কোন কোন খলিফা সেই সনদের সর্ত্তভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেন তখন সে যুগের পণ্ডিতবর্গ (আলেমগণ) তাঁহার সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং খলিফাগণকে হজরতের আদর্শ পালন করিতে বাধ্য করিতেন। খলিফা হারুন্‌র্‌ রশীদের সময় একজন খৃষ্টান রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতেছিলেন। ইহাতে খলিফাপ্রবর ভয়ানক কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি খৃষ্টানদের প্রতি ধর্ম্মীয় স্বাধীনতার যে সনদ দিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিয়া দিতে উদ্যত হন। এ বিষয়ে আলেমদের (পণ্ডিতবর্গের) মতামত জানিবার জন্য বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম আবুইউসুফকে তাঁহার অভিসন্ধির কথা বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের দেশে খৃষ্টানদের ধর্ম্ম ও গীর্জ্জার কি স্বাধীনতা থাকিতে পারে?" ইমাম সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন: কেন? পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিবার অধিকার কোনও খলিফার নাই। তখন খলিফাপ্রবর জিজ্ঞাসা করেন, সে স্বাধীনতা কি? তদুত্তরে ইমাম সাহেব বলেন, খৃষ্টানদের গীর্জ্জা রক্ষা করিতে হইবে, তাহা দিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মপালন করিতে দিতে হইবে, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে—সুতরাং হে খলিফা, তুমি তাহাদের উপর যতই বিরক্ত হও, তাহাদের এ অধিকার অপহরণ করিতে পার না। অতঃপর খলিফা সে বিষয়ে আর কিছু করেন নাই। ('কিতাবুল্ খিরাজ'—দ্রষ্টব্য)। আর একটি উদাহারণ দিব। আব্বাস বংশীয় খলিফা হাদীর সময় আলিইব্‌নে সুলেমান মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি খৃষ্টানদের কতকগুলি গীর্জ্জা নষ্ট করিয়া ফেলেন। তৎপরে খলিফা হাদীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে যখন হারুনঅররশীদ খলিফা হন, তখন তিনি খৃষ্টানদের প্রতি এই প্রকার অন্যায়ের সংবাদ পাইয়া মিসরের উক্ত শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করেন। এবং সমুদয় গীর্জ্জাগুলিকে সরকারী ব্যয়ে পুনঃ নির্ম্মাণ করিবার ও উহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। এই সুযোগে রাজকীয় ব্যয়ে খৃষ্টানগণ তাহাদের অধিকৃত বহু জীর্ণ গীর্জ্জাও সংস্কার করিয়া লইল। খলিফা দ্বিতীয় ওমর, খলিফা ওলিদ, খলিফা মনসুর খৃষ্টানদের জন্য নূতন গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সেগুলির

ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বহু ভূসম্পত্তি এমন কি মাসহারাও দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতের বহু মুসলমান নৃপতি ও শাসনকর্ত্তা এদেশের হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ইতিহাস বর্ত্তমান থাকিতে সে উপায়ও নাই। কিন্তু তৎসত্বেও এথানে বহু মুসলমান নৃপতির উদারতারও অভাব ছিল না। ধর্ম্মের স্বাধীনতা, ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা এবং সাধুসজ্জন ও মঠ-মন্দিরকে সম্পত্তি দান এ সব বিষয়ে তাঁহারা কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। প্রাচীন দলিলপত্র অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শুধু ধর্ম্মব্যাপারে নয়, সাংসারিক ব্যাপারেও প্রাথমিক মুসলমানগণ অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন ও উদার আচরণ দেখাইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ভূমিস্বত্ব আইনের কথা বলা যাইতে পারে। সে যুগে বহু দেশে ভূমির অধিকার লইয়া জেতা ও বিজেতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। বিজেতাই ছিল সব অধিকারে অধিকারী, জেতার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানগণ নিজেদের জন্য সেরূপ কোনও রূপ বিশেষ সুবিধা সংরক্ষিত করিয়া রাখেন নাই। বিজিত দেশের অমুসলমানের ভূমিসম্পত্তি যাহাতে বিজেতা মুসলমানগণ বাজেয়াপ্ত করিতে না পারেন, খলিফাগণ সেজন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাজেয়াপ্ত করা ত দূরের কথা, মুসলমানগণ বিজেতার নিকট হইতে কোন ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতেও পাইতেন না। যদি রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জন্য কোন ভূমির দরকার হইত, তবে সরকার হইতে তাহার জন্য উচিত মত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম মুসলমানের পক্ষে, বিজিত দেশের অমুসলমানদের নিকট হইতে কোনও প্রকার ভূসম্পত্তি ক্রয় করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন: তাহা হইলে বিজয়ী মুসলমানগণ বিজিতদের উপর অন্যায় চাপদিয়া অল্পমূল্যে অথবা ফাঁকি দিয়া ভূসম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইবে। ('কিতাবুল খিরাজ')। এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ বিজিতদের নিকট হইতে কোনও ভূমি ক্রয় করিবার অধিকার পান নাই। ইমাম লায়েস্ ইবনেসাদ এক সময় বিজিত জাতির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করেন। ইহাতে পণ্ডিতগণ (আলেমগণ) তাঁহার উপর রাগান্বিত হন এবং ইহার প্রতিবাদ করেন। সুতরাং উক্তভূমি তাহার পূর্ব্ব মালিককে পুনঃ প্রদান করা হইল। হজরত মাবিয়ার সময় ওকাবা মিসরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য খলিফার অনুমতি লন এবং একটী জলাময় স্থান নির্ব্বাচন করেন। তাঁহার একটি ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, সুন্দর সুন্দর স্থান থাকিতে আপনি কেন এই জলাময় কুৎসিত স্থান নির্ব্বাচন করিলেন? ইহাতে তিনি বলিলেন, সেরূপ ভূমি লইবার আমার কোন অধিকার নাই। ('কিতাবুল খিরাজ')। আর উদাহরণ বাড়াইব না। এই কয়েকটি উদাহরণ হইতে পাঠকবর্গ বেশ বুঝিবেন, প্রাথমিক মুসলমানগণ ইসলামের উদারতার আদর্শ কিভাবে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

মিশনারী প্রণালীতে ইস্‌লামের মহিমা গাহিবার জন্য এই প্রবন্ধরচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। অমুসলমানের কথা কি বলিব, অনেক মুসলমানই এসব সংবাদ রাখেন না। সংবাদই যদি রাখিবেন তবে ভোলানাথ সেন ও নাথুরাম হত্যার মত নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হইত না। ধর্ম্মকে জড়বাদ ও সন্দেহ-বাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ব্যবহার করা উচিত। অনুদার মত লইয়া কেহই ধর্ম্মকে যুগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই উদার আদর্শে প্রত্যেক সম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হউক, এই প্রার্থনা করি।

শিক্ষা সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি

বাঙ্গালা দেশ গরীবের দেশ। গরীবেরা খুব হিসাব করিয়া পয়সা খরচ করে অন্ততঃ খরচের সময় তাহাদের হিসাবী হওয়া উচিত। এক বিষয়ে কিন্তু বাঙ্গালী বাপ মা অত্যন্ত বেহিসাবী। ছেলের শিক্ষার জন্য আর কোন দেশের বাপ মাই বোধ হয় এমন বেপরোয়া হইয়া খরচ করে না। তাই এদেশে অনেক গরীবের সন্তানও লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা পায়। আগে আর্থিক হিসাবে পিতা মাতার এই অসাধারণ ত্যাগস্বীকার সার্থক হইত। যে জননী সন্তানের শিক্ষার জন্য শেষ আভরণখানি মহাজনের ঘরে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, পুত্র পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাঁহার শূন্য অঙ্গের কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিত। এখন আর সে দিন নাই। পরীক্ষা পাশ করিলেই চাকরী পাওয়া যায় না। বাপ মা আগের মতই ঘরবাড়ী বাঁধা দিয়া পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বহন করেন। যতদিন শিক্ষা শেষ না হয় ততদিন তাঁহারা ভবিষ্যত সুদিনের স্বপ্ন দেখেন। পাশ করিবার পর যখন বছরের পর বছর চলিয়া যায়, পাশ করা ছেলে পয়সা রোজগার করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না তখন নিরাশায় দারিদ্র্যের দুঃখ দুঃসহ হইয়া ওঠে। শিক্ষা বন্ধ হইলেই যে এই দুঃখ দূর হইবে তাহা নহে। কিন্তু শিক্ষার জন্য এখন যে টাকা খরচ হয় তাহার অপেক্ষাকৃত বেশী সদ্ব্যবহার করা যায় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

সকল দেশেই গরীবেরা সংখ্যায় বেশী। সুতরাং মোটামুটি একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে গরীবের ঘরে এমন অনেক বুদ্ধিমান ছেলের জন্ম হয় যাহারা স্বভাবজ প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনের যথোপযুক্ত সুযোগ পায় না। সুতরাং তাহারা সুবিধা পাইলে দেশের যে উপকার করিতে পারিত, সমাজ ও দেশ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। আমাদের দেশ অনেক বিষয়েই ত পশ্চিমের পিছনে পড়িয়া আছে। সুতরাং অনাদরে প্রতিভার অপচয় হইতে দেওয়া মোটেই আমাদের স্বার্থের অনুকূল নহে। অথচ গরীবদিগের শিক্ষার দায়িত্ব এখনও এদেশের সরকার গ্রহণ করেন নাই। এই জন্যই এদেশের রাজনৈতিক নেতাদিগের মধ্যে আমরা কেয়ার হার্ডি বা টমাসের মত শ্রমজীবীর সাক্ষাত পাই না, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে টমসন এলভা এডিসনের মত দরিদ্রের সন্তান দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিক্ষার ব্যয়কে অপব্যয় বলিলে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু এখানেও একটু পাত্রাপাত্র বিবেচনা করা উচিত। কেবল পারিবারিক সুখের কথা না ভাবিয়া দেশের সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। দরিদ্রের ঘরে যেমন বহু বুদ্ধিমানের জন্ম হয় তেমনই ধনী পরিবারেও যে নির্ব্বোধ নাই এমন নহে। ধনী পিতা স্বভাবতঃই নিজের ছেলের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেন। কিন্তু সে অর্থ অপাত্রে ব্যয় হয় বলিয়া পরিবার অথবা সমাজের পক্ষে তাহা অপব্যয় বলিয়াই মনে করিতে হইবে। ওদিকে গরীব পিতা সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও বুদ্ধিমান পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

বিলাতে দুই শ্রেণীর ছাত্র সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এক টাকাওয়ালা ঘরের ছেলে। সমাজে প্রতিপত্তিলাভের উদ্দেশ্যেই

ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে। অপরিণত বুদ্ধি যৌবনে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে কথঞ্চিৎ সংযম শিক্ষা করে। আর আসে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিভাবান যুবকেরা। পিতা মাতা ইহাদের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে পারেন না। কিন্তু বিলাতের বিদ্যালয় সমূহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর বুদ্ধিমান ছাত্রদিগের জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রতিযোগি-পরীক্ষা দিয়া এই সকল বৃত্তি লাভ করিতে হয়। আবার ভবিষ্যতে শিক্ষকতা করিবার চুক্তিতেও কোথাও কোথাও সাধারণের তহবিল হইতে অর্থানুকূল্য পাওয়া যায়। এখানে সরকারী কয়েকটি বৃত্তি ছাড়া দরিদ্রদিগের শিক্ষার জন্য আর কোনই ব্যবস্থা নাই বলিলেও হয়।

প্রত্যেক বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ শ্রেণীতে বিনাবেতনে অথবা অর্দ্ধবেতনে অধ্যয়ন করিবার জন্য বহু দরিদ্র ছাত্র আবেদন করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু কলেজে প্রবেশ করিবার পর ইহাদিগকে দারিদ্র্যের সহিত এমন কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় যে শেষ পর্য্যন্ত ইহাদিগের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে না। অনেক ছাত্রই সামান্য বেতনে সকালে বিকালে শিক্ষকতা করিতে বাধ্য হয়। দুইবেলা খাটিয়াও তাহারা স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসের বা পর্য্যাপ্ত আহারের সংস্থান করিতে পারে না। শিক্ষকতা করিয়া যে অল্প অবসর থাকে তাহাতে আশানুরূপ পড়াশুনা করা সম্ভব হয় না। তারপর যখন প্রকৃতপক্ষে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন এই সকল অল্লাহারক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত যুবকের আর শক্তি বা উৎসাহ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একটু দুধ এক টুকরা মাংস ইহাদের পক্ষে মস্ত একটা বিলাস। আমি একটি এম্ এ ক্লাসের ছাত্রের কথা জানি। প্রকৃতি তাহাকে স্বাস্থ্য অথবা দৈহিক শক্তি হইতে বঞ্চিত করে নাই। সুন্দর দীর্ঘায়ত তাহার দেহ। কিন্তু খরচ কমাইবার জন্য সে একবেলা আহার করিত। মেসের নিম্নতলের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার ঘরে বাস করিত। ইহাদের প্রতি কি দেশের কোনই কর্ত্তব্য নাই?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবী ছাত্রদিগের জন্য গুটিকয়েক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ছাত্রদিগের সংখ্যার অনুপাতে তাহা নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয় এই সকল ছাত্রের জন্য অল্প ব্যয়ে বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করা যায় কি না তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু দেশের সম্পন্ন শ্রেণীর লোকেরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হন তাহা হইলে কিছুই করা যাইবে না। আবার অনেক দরিদ্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্তও পৌছিতে পারে না। তাহাদের কথাও ভুলিলে চলিবে না।

বিলাতের লোকেরা নাকি ব্যষ্টিবাদী। যৌথ পরিবার সেখানে নাই। সকলেই নিজের নিজের ভাবনা ভাবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করেন। তাহারা সকল বিষয়েই হিসাবী। সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহারা ঘরবাড়ী বান্ধা দেন না, মহাজনের নিকট মাথা বেচেন না। পিতার সঙ্গতি শক্তি ও রুচি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ধনী পিতাও অযোগ্য পুত্রের শিক্ষার জন্য অযথা অর্থ অপব্যয় করেন না। স্নেহ অপেক্ষা তাহারা এবিষয়ে যুক্তি দ্বারাই বেশী পরিচালিত হন। আবার যাহার অর্থ আছে তিনি সাধারণের উপকারার্থে কিছু না কিছু দান করিয়া যান। কাহারও কাহারও চরমপত্রে (will) দানের ব্যবস্থা থাকে আবার কেহ কেহ জীবিতকালেই প্রকাশ্যভাবে দান করেন। বিলাতের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই এই জাতীয় ছোট বড় দানে সমপুষ্ট। এইত সেদিন লর্ড ন্যাফীল্ড অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য দুই কোটির অধিক টাকা দান করিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি

পাচ পাউণ্ড মূলধন লইয়া অক্সফোর্ডে একটি সাইকেল মেবামতের দোকান খুলিয়াছিলেন। এখন সেই দোকান বিবাট মোটবের কারখানায় পবিণত। সেই সামান্য দোকানেব মালিক মিঃ মবিস এখন কোটিপতি লর্ড ন্যুফীল্ড। নিজেব বোজগাবেব সমুদয় টাকাই ত তিনি নিজের সুখেব ও আরামের জন্য খবচ করিতে পাবিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কার্নেগী, রকফেলাব প্রভৃতি ধনকুবেরও দেশেব ও দশেব প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই উপার্জ্জিত অর্থেব অধিকাংশই জনহিতকব কার্য্যে ব্যয় কবিয়া গিয়াছেন। এখানেও অনেকে দবিদ্র অবস্থা হইতে কোটিপতি হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদেব বিত্ত সম্পত্তিব অল্প অংশও দরিদ্রেব শিক্ষাকল্পে নিয়োজিত হয় নাই।

আজ কাল বড় ঘবেব ছেলেদেব বিলাত যাইবাব বেওয়াজ হইয়াছে। এখন দুই হাজাবেব বেশী ভাবতীয় ছাত্র বিলাতে আছে। এই দুই হাজাবেব মধ্যে আঠাব শত ছাত্র বিদেশে না গেলে তাহাদেব বা দেশেব কোনই ক্ষতি হইত না। ববঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে তাহাদেব বিদেশ যাত্রা তাহাদেব ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ ও আত্মীয় স্বজনের সন্তাপেব কাবণ হইয়াছে। এই আঠার শত যুবকেব শিক্ষার জন্য বৎসবে ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড খবচ হইতেছে। ইহাব অর্দ্ধেক টাকাও যদি মেধাবী দবিদ্র ছাত্রদিগেব জন্য ব্যয় হইত তবে দেশেব কত উপকাব হইতে পাবিত।

যদি কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত হয় তবে মোটা টাকা দিতে না পাবিলেও প্রায় সকল উপার্জ্জনশীল গৃহস্থই সামান্য কিছু কিছু দান কবিতে পাবেন। অক্সফোর্ডেব বিশ্ববিদ্যালয়েব এসমোলিয়ান মিউজিয়মে দেখিয়াছি যে অধিকাংশ চিত্রই ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছাত্রীদিগের উপহার। এখানেও যদি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে প্রত্যেক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র অন্ততঃ একখানি কবিয়া ভাল বই উপহাব দেন তাহা হইলে এই সকল গ্রন্থাগাব অচিরেই বিশেষ সমৃদ্ধ হইবে। আমরা বই কিনি, তাহা হারাইয়া যায়। অথবা অযোগ্য পুত্র বেচিয়া ফেলে, কিন্তু প্রাণ ধরিয়া কোন সাধাবণ প্রতিষ্ঠানে দান কবিতে পারি না। পবলোকগত অধ্যাপক ডান সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহাব স্বামীব গ্রন্থ-সংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান কবিয়াছেন। স্বর্গীয় জে, এন, দাস গুপ্তের পুত্রগণও এই সদৃষ্টান্ত অনুসবণ করিয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বায় ও ডাঃ সতীশচন্দ্র বাগচি জীবিত কালেই তাঁহাদেব লাইব্রেরী বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ দানেব সংখ্যা এদেশে নিতান্তই বিরল। অথচ শুনিয়াছি যে রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সংগৃহীত অমূল্য পুঁথিগুলি এখন আব পাওয়া যাইতেছে না। অনাদবে অযত্নে যে কত পণ্ডিতেব গৃহে কত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি নষ্ট হইয়াছে তাহা কে বলিবে? যাঁহারা এই সকল গ্রন্থেব মর্য্যাদা বুঝেন তাঁহাবা যদি পূর্ব্বাহ্লেই ইহাব ব্যবস্থা কবেন তবে এমনটা হয় না। এই গরীব দেশে একখানি বই একখানি পুঁথিও অযত্নে নষ্ট হওয়া উচিত নহে।

যে পর্য্যন্ত দবিদ্র পবিবাবে জাত বহুসংখ্যক মেধাবী ছাত্রেব প্রতিভাব অপচয় নিবাবণের পন্থা উদ্ভাবিত না হয়, যে পর্য্যন্ত সম্পন্ন সম্প্রদায় দেশেব ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত না হন, যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের সর্ব্ববিধ সম্পদ রক্ষাব সুব্যবস্থা না হয়, সে পর্য্যন্ত জাতীয় উন্নতির গতি শ্লথ হইবেই, পরিমাণ অল্প হইবেই।

বিরাটের পূজা

সম্পাদক

ব্রহ্মবিদ্ আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন, "হে সৌম্য, এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ অর্থাৎ অস্তিতামাত্র ছিল" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)। "তিনি (মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া) বহুরূপে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩)। এই উদ্দেশ্যে তিনি "এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন" (তৈঃ উঃ ২।৬)। ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলিয়াছেন, "যাঁহা হইতে এই সকল ভূত (উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রই) জন্মিয়াছে, যদ্দ্বারা জীবিত থাকিতেছে, আবার প্রলয়কালেও যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে বা লয়প্রাপ্ত হয়, তুমি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর অর্থাৎ জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম" (৩।১)। এইরূপে বেদ-উপনিষদ্ সমস্বরে প্রমাণ করিয়াছেন, "পুরুষ এব ইদং সর্ব্বম্" (ঋগ্বেদ ১০।৯০।২)—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১), 'এই জগতের যাহা কিছু তাহাই পুরুষ বা ব্রহ্ম', এবং মনোমুগ্ধকর কবিত্বের ভাষায় গাহিয়াছেন, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠ উঃ ২।২।১৫), 'তাঁহার আলোকে সকল আলোকিত।' এই সর্ব্বগতঃ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ঋষি স্তব করিয়াছেন, "তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমিই সদ্যঃপ্রসূত বালক, তুমি বিশ্বতোমুখ," (শ্বেঃ উঃ ৪।৩)। এই সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সহস্রশীর্ষা পুরুষের স্বরূপ-বর্ণন করিতে যাইয়া উপনিষদ্ ঘোষণা করিয়াছেন, "সকল দিকে তাঁহার পদ, সকল দিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক, মুখ, সকল দিকে তাঁহার কর্ণ, সকলকে আবৃত করিয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৬)।

হিন্দুমাত্রই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বিরাটের উপাসক। অদ্বৈতবাদী "সর্ব্বং ব্রহ্ম"রূপে প্রত্যক্ষ-ভাবে জ্ঞানযজ্ঞে এই বিরাটের আরাধনা করেন এবং দ্বৈতবাদী পরোক্ষভাবে ভক্তি উপহারে ইঁহার সাধন করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষ এই বিরাটের ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে সসীমের ভিতর দিয়া বিরাটকে দর্শন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এইজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মে কোন না কোন আকারে প্রতীকোপাসনা প্রচলিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রতীকোপাসনার মূলেও আমরা এই সত্যই দেখিতে পাই। প্রতীক যদি তাহার ভিতর দিয়া অসীমকে দর্শন করিতে সাহায্য না করিয়া সসীমেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উহা পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হয়। হিন্দু পৌত্তলিক নহে, কারণ সসীমের ভিতর দিয়া অসীমকে দর্শন করাই তাহার প্রতীকোপাসনার উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবের পরম পবিত্র শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "আমি সর্ব্ব প্রাণীতে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তা-প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা-পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়" (৩।২৯।১৮)। হিন্দুপূজক তাঁহার উপাস্য দেব বা দেবীকে প্রতীকে আনয়ন করার জন্য, বিরাটকে ক্ষুদ্র প্রতীকে সীমাবদ্ধ করার নিমিত্ত পূজান্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। বিখ্যাত মহিম্ন-স্তোত্রের রচয়িতা পুষ্পদন্ত নানাভাবে শিবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াও বলিয়াছেন, "তুমি বাক্য

মনের অগোচর অদ্বৈত বলিয়া আমার বাচালতা অতীব নির্লজ্জ" (৯)। অসীমকে সসীমে সীমাবদ্ধ করিতে হয় বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে "বাহ্য পূজাধমাধমা" বলিয়া বর্ণিত। পক্ষান্তরে হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ", 'আত্মাই সকল দেবতা'। "উচ্চাবচ সকল ভূতে সমভাবে শ্রীহরি আত্মরূপে বিদ্যমান" (প্রবোধসুধাকরঃ ২১৫)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন, "যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করেন তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন" (১।৪।৮)। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ঘোষণা করিয়াছেন, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (৬।৮।৭), 'এই জগতের সকল বস্তু আত্মারই বিকাশ'। আত্মার উপাসনা এবং বিরাট ব্রহ্মের উপাসনায় কোন পার্থক্য নাই, যথা—"তদ্‌ব্রহ্ম, তদমৃতং, স আত্মা" (বেদান্তদর্শনম্ ১।৩।৪১)। 'আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানই বিদ্যা' (উপদেশসহস্রী, ঈশ্বরাত্মপ্রকরণম্ ৩।১)। সুতরাং প্রতীক সহায়ে আত্মার উপাসনা করিয়া হিন্দু বিরাটেরই উপাসনা করিয়া থাকে, অনাত্ম জড় পদার্থ বা ক্ষুদ্র পুতুলের পূজা করে না। হিন্দুর উপাস্য সকল দেবদেবীই যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সর্ব্বাত্মক বিরাট ব্রহ্মের প্রতীক, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে প্রমাণের অভাব নাই। হিন্দুর নিত্যপাঠ্য দেবদেবীগণের স্তোত্র হইতেও আমরা এই সত্যের প্রমাণ পাই। "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপস্থং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্" (বিষ্ণোঃ শতনাম-স্তোত্রম্) বলিয়া বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে, "বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাধিবাস" (শিবনামাবল্যষ্টকম্) বলিয়া শৈবগণ শিবকে, "প্রভুঞ্চ সর্ব্বলোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্" (সূর্য্যাষ্টকম্) বলিয়া সৌরগণ সূর্য্যকে এবং "সদা বিশ্বরূপং গণেশং নতাঃ স্মঃ" (গণপতি স্তোত্রম্) বলিয়া গাণপত্যগণ গণেশকে যে বিরাটরূপে স্তব করেন, রামচন্দ্রের উপাসকগণ "সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বগতস্বরূপং" (রাম-স্তবরাজঃ) বলিয়া রামকে এবং বৈষ্ণবগণ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯) বলিয়া কৃষ্ণকে যে সেই একই বিরাটের বিগ্রহরূপে স্তুতি করিয়া থাকেন তাহা উদ্ধৃত স্তোত্রসমূহের শব্দার্থ হইতে স্বতঃপ্রমাণিত। চণ্ডীতে দেবীভক্তের প্রার্থনা "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" (৫।৩৪) বাক্যের মধ্যেও এই বিরাটের উপাসনাই প্রকট। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীর উদ্দেশ্যে গীত স্তবসমূহের মধ্যেও আমরা এই বিরাটের সাধনার পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, যথা, "নমস্তে জগদ্-ব্যাপিকে বিশ্বরূপে" (দুর্গা স্তবরাজঃ), "সর্ব্ব-সম্পদ্‌স্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী" (লক্ষ্মী-স্তোত্রম্), "বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে" (সরস্বতী-স্তোত্রম্), "বিশ্বকর্ণা বিশ্বদৃষ্টি-বিশ্বেশী বিশ্ববন্দিতা" (গঙ্গা-স্তোত্রম্)। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রমুখ দশ অবতারকেও হিন্দু এই বিরাটের প্রতীক জ্ঞানেই পূজা করে, যথা, "ভূতানাং ভূতহেতবঃ" (মৎস্য-স্তোত্রম), "বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতবতারস্য পদাম্বুজং তে" (কূর্ম্ম-স্তোত্রম্), "বিশ্বং সমস্তং ভগবন্" (বরাহ-স্তোত্রম্); এইরূপে অন্যান্য অবতারগণও বিরাটের প্রতীকরূপে উপাসিত। এমন কি হিন্দুর শীতলা, মনসা প্রভৃতির পূজার মধ্যেও এই একই বিরাটের উপাসনা বিদ্যমান, যথা, "শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা" (শীতলাষ্টকম্), "জগৎকারুর্জগদ্‌গৌরী মনসা সিদ্ধিযোগিনী" (মনসা-স্তোত্রম্)। সর্ব্বজনবিদিত গুরু-প্রণামমন্ত্র "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্" হিন্দুর বিরাট উপাসনার সাক্ষ্য প্রদান করে। উদ্ধৃত স্তোত্রবাক্যসমূহ হইতে নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বিরাটের উপাসনাই হিন্দুর সকল ধর্ম্মমত এবং সকল দেবদেবী অর্চ্চনার একমাত্র লক্ষ্য। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেঃ উঃ ৬।১১), সকল ভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ

এক বিরাটই যে বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুর পূজা গ্রহণ করিতেছেন, এ কথার সত্যতাও উদ্ধৃত বাক্যাবলীর ভিতর দিয়া দিবালোকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সত্যের উজ্জ্বল আলোকে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬), "ত্বমেকোঽসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ" (তৈঃ আঃ ৩।১৪।৩), "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১) প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধীপ্রতীয়মান হিন্দুধর্মমতসমূহের মধ্যে বিরাটের পূজার ভিতর দিয়া এক অশ্রুত-পূর্ব্ব সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের সন্ধান পাইবেন। বিরাটের পূজার প্রাঙ্গণে হিন্দুর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং দেবদেবী এক ও অভেদ, সুতরাং ধর্ম্মমত ও দেবদেবীবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন লইয়া বিরোধ একান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক।

হিন্দুশাস্ত্রসমূহ কেবল সর্বোচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব হিসাবে বিরাটের পূজামাহাত্ম্য প্রচার করেন নাই, অধিকন্তু ইহাকে সাধকের প্রত্যক্ষানুভূত সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, সমস্ত ভূতের যাহা কারণ তাহা আমিই। চরাচরে এমন ভূত নাই যাহা আমা ব্যতিরেকে হইতে পারে" (গীতা ১০।৩৯)। অর্জ্জুন বলিলেন, "হে পুরুষোত্তম, তোমার এই ঈশ্বরীয়রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি" (গীতা ১১।৩)। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, এখন তুমি আমার এই দেহে একত্রস্থিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্ব এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, দেখ" (গীতা ১১।৭)। প্রেমোন্মত্ত ব্রজগোপীগণ সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখ-বিবরে বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার উপাস্য দেবীকে সর্ব্বভূতে সন্দর্শন করিয়া গাহিয়াছেন, "তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।" যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিরাটকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া নিজমুখে বলিয়াছেন, "তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল। এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন বেলপাতা ছিঁড়িতে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল। দেখলাম, গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হলো। * * একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হলো না (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, ২২১ ও ২২২ পৃঃ)। "কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়, কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ, সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলুম। যা দেখি তাই পূজা করি। * * একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি, এমন সময় দেখিয়ে দিলে এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৭৫ ও ৭৬ পৃঃ)। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পরমভক্ত গোপালের মা-ও বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। এই অশ্রুতপূর্ব্ব দর্শনসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "একবার গঙ্গার অপর পারে মাহেশ রথযাত্রা দেখিতে যাইয়া সর্ব্বভূতে শ্রীগোপালের দর্শন পাইয়া তাঁহার (গোপালের মা-র) বিশেষ আনন্দ হয়। তিনি বলিতেন, তখন রথ, রথের উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, যাহারা রথ টানিতেছে—সেই অপার জনসংঘ সকলই দেখেন তাঁহার গোপাল।—ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র। এইরূপে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের দর্শনাভাস পাইয়া ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ৩০৪ পৃঃ)।

এইরূপে শত শত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, বিরাটের উপলব্ধি হিন্দুর নিকট কেবল কথাবকথা মাত্র নহে, ইহার সত্যতা হিন্দুসাধকের প্রত্যক্ষ। বৈষ্ণবশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেন, "ন পশ্যামি পরং ভূতম্‌কর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ" (৩।২৯।২৮), 'সর্ব্বত্র সমদর্শনকারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি আমি দেখি না।' গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে অভিন্ন অব্যয় এক বস্তুকেই লক্ষ্য করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান" (১৮।২০)। অন্যত্র—"যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং প্রকৃতির বিনাশেও অপরিবর্ত্তিত বুঝেন, তিনিই ঠিক বুঝিয়াছেন" (১৩।১৮)। হিন্দু যদি তাহার ধর্ম্মকে ঠিক ঠিক বুঝিতে চায়, তাহা হইলে সে যেমতের এবং যেপথেরই পথিক হউক না কেন, এই বিরাটের পূজায় আত্মবিনিয়োগ তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। কালের পরিবর্ত্তনে নানা প্রকার প্রতিকূল শক্তি সমবেত হইয়া হিন্দুধর্ম্মরূপ প্রবাহসমূহের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফলে ইহাতে বদ্ধজলজ উদ্ভিদরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক 'দল' জন্মলাভ করিয়াছিল, এবং বিরাট সমুদ্রই যে ইহাদের একমাত্র গন্তব্য স্থান তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়সাধন এই প্রবাহসমূহের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাই আজ ইহারা গতিশীল হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার আবর্জ্জনাকে ভাসাইয়া আবার বিরাট সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

বেদান্তদর্শনের ভাষায় স্থূলশরীরসমূহের সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর বা বিরাট নামে অভিহিত, কারণ ইনি সর্ব্বদেহাভিমানী এবং বিবিধ প্রকারে বিরাজমান। "বিবিধ রাজমানত্বাৎ বিরাট", বিবিধরূপে বিরাজমান বলিয়া ব্রহ্মকে বিরাট বলা হয়। অপর দিকে, ব্যষ্টিস্থূলশরীরে উপহিত এবং তাহার সহিত একাত্মভাবপ্রাপ্ত আভাস চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যায়, স্থূলসমষ্টির সহিত স্থূলব্যষ্টির এবং তদুপহিত বিরাটের সহিত বিশ্বের, বনের সহিত বৃক্ষের ন্যায়, অথবা বনাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, কিম্বা জলাশয়ের সহিত জলের ন্যায়, অথবা জলাশয়গত প্রতিবিম্বের সহিত জলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অভেদ। বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ; তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য্য, জীব এই বিরাট সমুদ্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। এই হিসাবে পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্যষ্টি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আপনাকে সমষ্টি হইতে পৃথক মনে করিতেছে। এই পার্থক্য বুদ্ধি হইতেই জগতে সর্ব্ববিধ অশুভ, অকল্যাণ, অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য জন্মলাভ করিয়াছে। দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ ইহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহারা সমবেত ভাবে আত্মার একত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতির মহান্‌তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ঈশোপনিষদ্‌ বলেন, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে" (৬). 'যিনি আত্মাতে—আপনা হইতে অভিন্ন ভাবে সমুদয় সৃষ্টপদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বপদার্থকে (অর্থাৎ বিরাটকে) আত্ম-স্বরূপে অনুভব করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।' কারণ, এ স্থলে অপরকে ঘৃণা করা আর আপনি আপনাকে ঘৃণা করা একই কথা।

আধ্যাত্মিক আদর্শহিসাবে হিন্দু তাহার শাস্ত্রকারদের প্রচারিত সাম্য, সমদর্শন, একত্ব, অভেদত্ব ও অদ্বৈতের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের দিক দিয়া সে অসাম্য, ভেদ, অনৈক্য ও সংকীর্ণতার সমর্থক! হিন্দু পূজার আসনে বসিয়া তাহার উপাস্যকে "তস্মৈ লোকাত্মনে নম." (বেদান্তদর্শনম্‌ ১।২।২৫), 'লোকমূর্ত্তি

পরমেশ্বরকে নমস্কার' বলিয়া শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করে কিন্তু আসন ত্যাগ করিয়াই বলে, "দূরমপসর রে চণ্ডাল!" সে মন্দিরে যাইয়া তাহার উপাস্যকে "সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্" (গীতা ৫।২৯) বলিয়া স্তুতি করে কিন্তু বাহিরে আসিয়াই বলে, "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা"। হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ মুখে বলে, "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ" কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে —ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে অগণন স্বদেশবাসীকে শত বিধি-নিষেধের পাষাণচাপে নিষ্পেষিত এবং তাহাদিগকে জন্মগত স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আজও আপনাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট! এইরূপে হিন্দু পরমার্থের দিক দিয়া যে উচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব প্রচার করিতেছে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের দিক দিয়া উহার বিপরীত ভাবকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার সমাজকে অনৈক্য-বিরোধের লীলাস্থলীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুর পারমার্থিক আদর্শের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য সমর্থন করিতে যাইয়া কায়েমী স্বার্থবাদিগণ বলেন, 'পারমার্থিক উচ্চ আদর্শ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সাধকের জন্য—সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে।' এই 'অজুহাতে' হিন্দু-সমাজ-বিধ্বংসী ভেদ-বৈষম্যের সমর্থক দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ইঁহাদের রসনা মুখরিত! কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, অসাম্যের পথে চলিয়া কে কবে সাম্যের রাজ্যে উপনীত হইয়াছে? ময়লা দিয়া কেহ কি ময়লা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে? পাপের সাহায্যে কি পুণ্যলাভ কখনও সম্ভবপর? বৈষ্ণবের সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেন, "আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুবিদধে ভয়মুল্বণং" (৩।২৯।২১), 'যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ আপনার দুঃখের তুল্য অপরের দুঃখ অনুভব করে না, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুস্বরূপ ঘোরতর ভয় বিধান করি।' এইরূপে অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে পরমার্থ সাধনায় কোনপ্রকার ভেদ-বৈষম্যের স্থান নাই। যে সকল স্মৃতিগ্রন্থে ভেদ-বৈষম্যের সমর্থন আছে, উহা প্রামাণ্য নহে, কারণ হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য। হিন্দুর এক যুগের স্মৃতি অপর যুগে প্রামাণ্য বলিয়াও পরিগৃহীত নহে। কায়েমী স্বার্থবাদিগণ যাহাই বলুন, কোন বিষয়কে মহান আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ উহার বিপরীত আচরণ করা—একরূপ ভাবা এবং অন্যরূপ করা মস্তিষ্কের সুস্থতার লক্ষণ নহে। পক্ষান্তরে, এই বিরোধই যে হিন্দুজাতির গৃহবিবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দ্দশার মূলকারণ তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। অতএব হিন্দুজাতিকে ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিতে হইলে এই বিরোধরূপ বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতার নির্দ্দেশে সমাজের সর্ব্ববিধ ভোগাধিকার বৈষম্য বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ সাম্য-ভিত্তির উপর হিন্দুর জীবন-প্রাসাদ পুনর্গঠন করিতে হইবে। সমষ্টি-জীবনের সঙ্গে ব্যষ্টি-জীবনের ঐক্য-প্রতিষ্ঠা—লোক-মূর্ত্তি বিরাটের পূজা হইবে এই সংগঠনের একমাত্র আদর্শ। বিরাটের উপাসক হইয়াও—সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বিরাট সত্তারূপে সন্দর্শন করিয়াও হিন্দু শত শত শতাব্দী যাবৎ নানাপ্রকার ভেদ-বৈষম্যের কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, এই সকল অনর্থকে নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিতে হইবে; কারণ, ইহারাই হিন্দুর জাতীয় অবনতির উপাদান।

ভারতের লোকমূর্ত্তি বিরাট বিগ্রহ দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলেন। ঐ দেখ, ধীরে ধীরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিতেছেন! কৃষক, শ্রমিক, অনুন্নত

অস্পৃশ্য, বেকার, নিরক্ষর, রুগ্ন, বুভুক্ষু জনসঙ্ঘের আর্ত্তনাদপূর্ণ আন্দোলনের অভ্যন্তর দিয়া এই বিরাটের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হে সাধক, তুমি "লোকাত্মনে নমঃ" বলিয়া তোমার সমীপাগত এই লোকমূর্ত্তি বিরাটকে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে বরণ করিয়া লও। বৈষ্ণবের প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়াছেন, "মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন ঈশ্বরোজীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি" (৩।২৯।২৯), 'ঈশ্বর জীবরূপ ধারণ করিয়া সকল প্রাণির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই প্রকার জ্ঞানে বহুমান প্রদানপূর্ব্বক সকলকে প্রণাম করিবে।' হে হিন্দু, শাস্ত্রের নির্দ্দেশে তুমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত এই লোকমূর্ত্তি বিরাটকে বহুমান প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম কর এবং ইঁহার দাবীপূরণরূপ উপকরণে ইঁহাকে পূজা কর। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ এই বিরাটের পূজাকেই এযুগে ভারতের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতা দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। * * প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা—ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না; 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য" (ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৪৪ পৃঃ)।

ভারতের গণবিগ্রহ শত শত শতাব্দী যাবৎ স্বদেশী বিদেশীর অত্যাচার সহিয়া আজ সর্ব্বহারা! তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন সর্ব্ববিধ স্থূল বা বাহ্য বন্ধন-বিমুক্তি—রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক স্বাধীনতা। এই ত্রিবিধ উপচারে পূজা করিয়া তাহাদের সকলপ্রকার ঐহিক উন্নতির রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। তারপর যদি হৃদয়ে মহত্ত্ব থাকে এবং সাহসে কুলায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শরীর মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম বা আভ্যন্তর বন্ধনের বাহিরে যাইবার উপায়—সর্ব্বপ্রকার জাগতিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ আপনার নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ দেখাইতে হইবে।

দীর্ঘকাল ভিতরে বাহিরে নির্যাতন সহিয়া ভারতের গণবিগ্রহ ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ, পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে তাহাদের মনুষ্যত্ব, মূক হইয়া রহিয়াছে তাহাদের ভাষা, বিস্মৃত হইয়াছে তাহাদের অনন্ত শক্তি। এজন্য উপনিষদের ওজঃপ্রদ মন্ত্রসহায়ে প্রথমতঃ তাহাদের আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে হইবে—বলিতে হইবে, তুমি অনন্ত শক্তির আধার, মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তাহা কেবল এই শক্তি-প্রকাশের তারতম্যে, যে কোন মানুষ তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির সম্যক্ বিকাশের ফলে দেবতা হইতে পারে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে চাই শত শত আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ যুবক, যাহারা নিজের জন্য কিছুমাত্র না ভাবিয়া ভারতের কৃষক, শ্রমিক, অস্পৃশ্য, অবনত, নিরক্ষর, পতিত, রুগ্ন, বেকার, দরিদ্র জনসঙ্ঘের উন্নয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। স্বার্থপরতা—"চাচা আপন বাঁচা"—নীতির অনুসরণ সকলের অপেক্ষা বড় পাপ। ক্ষুদ্রের উপাসকের বিরাটের পূজা করিবার অধিকার নাই। যিনি যত অধিক নিজের জন্য

না ভাবিয়া সকলের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তিনি তত ধার্ম্মিক—একমাত্র তিনিই বিরাটের পূজার অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে একদিন বলিয়াছিলেন, "মাকে বললুম (গলায় ক্ষত দেখাইয়া) 'এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বললেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—কেন ? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস।' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৮১ পৃঃ)। হে ভারত, তুমি যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের এই নির্দ্দেশে একমুখে খাইতে লজ্জা বোধ করিয়া বিরাটের উপাসকরূপে তোমার বুভুক্ষু দেশবাসীর শত মুখে খাও, আপনার ব্যষ্টিকে সমষ্টি লোকমূর্ত্তি বিরাটের অঙ্গে অঙ্গীভূত কর, আপনার স্বাতন্ত্র্যকে বিরাটের মধ্যে নিমজ্জিত কর, তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ—গণবিগ্রহের উপাসনা, দেশমাতৃকার সাধনা, বিরাটের পূজা সার্থক হইবে।

মৃত্যুর প্রতি

(ইংরাজী হইতে)

অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, এম্-এ

যেদিন আসবে, বন্ধু, সঙ্গে ল'য়ে যেতে সেই দেশে,
নাই যেথা দিবালোক, আছে শুধু তিমির তরল —
মধুর অধরপুটে করিও না প্রেমিকের ছল
গুঞ্জরি অফুটভাষে , আঁখিকোণে আধ-হাসি হেসে
তোমার সে বাঁশিখানি বাজায়ো না—মিলন-আবেশে।
কিম্বা, দেখায়ো না ভয়, করিও না পরাণ বিকল
অট্টহাসে , মেঘ-ঝড়ে পথখানি কোরো না পিছল—
কি কাজ তোমার, বন্ধু, সাজিবারে হেন মিথ্যা-বেশে ?

না, না, এস !—সকল চাতুরী-ছল দূরে পরিহরি'
তোমার স্বরূপ-রূপে, প্রাণসখা ! হৃদয়-ঈশ্বর !
বাড়াও বাহুটি তব, তারি' পরে করিয়া নির্ভর
হেরিব নীরব ওষ্ঠে অতি মৃদু হাসির লহরী ;
নির্ভয়ে রাখিব মাথা—যেইখানে ঘনঘোর করি'
তোমার অলক নীল রচিয়াছে তিমির-নির্ঝর।

সমাজ ও চারুকলা

অধ্যাপক শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

আজকাল সকলেই স্বীকার করছেন যে উচ্চ-শ্রেণীর মানসিক প্রক্রিয়াগুলিও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈজ্ঞানিকও শিল্পী যখন অ-বাস্তব পরীক্ষা কিংবা সৃষ্টি করছেন তখনও তাঁহাদের মনের পিছনে সামাজিক সংস্কার অজ্ঞাতসারে কাজ করে। সেই সংস্কার দুই প্রকারের, এক, অতি পুরাতন পরিশীলনের ফলে যেটি জাতির মজ্জাগত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়, সামাজিক সংগঠনের জন্য যেটি শ্রেণীর আশা-দুরাশা, ভয়ভরসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। প্রথমটির বাস মনের গভীরতম কন্দরে বলেই তার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ওপরতলার অধিবাসী, তাই তার অস্তিত্ব সহজে প্রমাণিত হয়। সংস্কারমুক্ত বিধান দুর্লভ, তাই বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতাও অসম্পূর্ণ। শিল্পী সাহিত্যিকের অসম্পূর্ণতা আরো বেশী। আমি এই প্রবন্ধে কোনো বিচার করছি না। মাত্র দেখাব যে বাঙ্গালীর আধুনিক সংস্কৃতির ধারায় বাংলা-সমাজ পরিবর্ত্তনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বঙ্কিমবাবুর 'রাবিবাহিনী (Rajmohun's wife) নামে একটি উপন্যাস আছে। তার নায়ক মাধব। তিনি মস্ত জমিদার, গ্রামবাসী, গ্রামের প্রাসাদে সোফায় শুয়ে ইংরেজী বই পড়েন, মোটেই অত্যাচারী নন, অন্যান্য গ্রামবাসী ইতর ভদ্রের সঙ্গে আলগোছে মেলামেশা করেন, যেমন কড়া পিতা পুত্রের প্রতি ব্যবহার দেখান। ভদ্রলোক সত্য কারের নিরীহ, অত্যাচারের বিপক্ষে টু শব্দটি করেন না। ডাকাত পড়লে চেঁচিয়েই মাধবচন্দ্র তাদের তাড়িয়েছিলেন। এই পুস্তকে মথুরচন্দ্র নামে এক দুষ্ট ব্যক্তি আছেন, তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমনবার্ত্তা শুনেই আত্মহত্যা করেন। বঙ্কিম বাবুর মাধবচন্দ্র নগেন্দ্রের—তথা, তথাকালের বাঙ্গালী জমীদার বাবুর প্রতীক।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহ থেমেছে। ইংরেজ সবে মাত্র শাসন সুরু করেছে। ইংরেজ-শাসন পদ্ধতির প্রধান স্তম্ভ হলেন জমিদার-বর্গ। দেশে ডাকাতের দল লোপ পায় নি তখনও। বাবুরা তখন সহরের বাসিন্দা হয়ে গ্রামের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন নি। জমিদারবর্গ তখন একসঙ্গে সাহেব ও ডাকাত দুইই ভয় করেন। শিক্ষা ও জমিদারীর এই সমাবেশ বঙ্কিমের অন্যান্য রচনায় বেশ পরিস্ফুট। শ্রেণীগত সংস্কারের চিহ্নের মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। হিন্দুসংস্কারের ছাপ তাঁর রচনায় সর্ব্বত্র। তাঁর সকল অর্দ্ধপতিতা রমণীই সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুবারির দ্বারা শোধিতা হয়ে পবিত্রা হন। বঙ্কিম বাবুর ডেপুটিগিরি বৃত্তির উদাহরণ দিলাম না। বন্দেমাতরম্ রচয়িতার প্রতিভার অন্য একটি অংশ ছিল, যার জন্য তিনি রামরাজত্বকে ইংরেজ শাসনের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেছিলেন।

এই জমিদার-সম্প্রদায়ের শক্তি ক্রমেই ক্ষীয়মাণ হয়েছে নানা কারণে। ইংরেজী আদর্শে সার্থক-জীবন গড়ে তুলেছেন হঠাৎ বড় লোকের দল। সেই সঙ্গে ইংরেজী সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হলেন অনেকে। বাঙ্গালী সমাজ তখনও ধূলিসাৎ হয় নি, ঝড় এল সমাজের মাথায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ন্যাশন্যালিজম, পজিটিভিজম, দেশাত্মবোধের প্রবল বাত্যায় পূর্ব্বসঞ্চিত ধূলা উড়ে গেল। কিন্তু সমাজের ভিত্তি নড়ল না।

বঙ্কিমের রচনায় প্রায় সবগুলিই পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। আমাদের সমাজ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠির ওপর। তাই প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের নজর ঐ গোষ্ঠির ওপর। বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে পিতা-পুত্রের বিরোধ, চোখের বালি ও নৌকাডুবিতে পুরুষ ও স্ত্রীর বিরোধ অত্যন্ত পরিষ্কার। শেষ দুটি নভেলের নায়ক-নায়িকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। গোড়ায় নানাবিষয়ের আলোচনা আছে, তার মধ্যে জাতীয়তাবোধের স্বরূপ বিচার নির্ব্বাচিত হয়েছে ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায়ের বিষয়ে। যোগাযোগে অভিজাত সম্প্রদায়ের গুণাবলী এবং নতুন ধনী সম্প্রদায়ের দোষ সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও রবীন্দ্রনাথ অনেকটা নিরপেক্ষ-ভাবেই দুই দলের সামাজিক সংস্থান দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তবু একাধিক স্থানেই তার নিজের শ্রেণীগত মনোভাব অজানিতে প্রকট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যুবক-নায়ক সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর। তাঁর নায়িকারা কিন্তু সাধারণতঃ উপর স্তরের। এঁদের মধ্যে নায়িকারাই অধিক বিদ্রোহী। তাঁদের বিদ্রোহের মূলশক্তি, রবীন্দ্রনাথের মতে, হৃদয়বৃত্তি, এবং স্ত্রীত্ব। স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথের এক সুস্পষ্ট ধারণা আছে। তাঁর মতে স্ত্রী পুরুষকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে সরে দাঁড়াবে। তাঁর মতামত বিচার না করে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে তাঁর বর্ণিত বিদ্রোহী স্ত্রীত্বের সামাজিক ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাঁর যুগে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল সেই সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের অত্যাচার পূর্ব্বকার সমাজে পুরুষের অত্যাচার অপেক্ষা বেশী না হলেও স্ত্রীজাতির শিক্ষার দরুণ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজের বিত্তশালী নতুন সম্প্রদায়েরই মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা যৎসামান্য প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী নায়ক নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত। উপরের শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক তখন খেতাবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই শ্রেণীর নায়কবৃন্দ, রোম্যান্টিক, গ্রন্থকীট, দার্শনিক ভালোমানুষ।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় নিম্নতম সামাজিক জীবনের ছবি পাওয়া যায় না। বাউল, বোষ্টমীর সাক্ষাৎ পাই অবশ্য। রবীন্দ্রনাথ একবার লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যেমন আলোর নীচে আঁধার তেমনই ধনীর নীচে নির্ধন। অর্থাৎ রাশিয়া ভ্রমণের পূর্ব্বে সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে স্বাভাবিক বিধান বলেই তিনি মেনে নেন। তার পরে তিনি অনেক পুস্তক লিখেছেন, গদ্য কবিতার বিষয়ে এবং বাঁশরী প্রভৃতি রচনায় তিনি স্বশ্রেণী থেকে অবতরণ করেছেন প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে অবতরণ কল্পনার সাহায্যে।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পরবর্ত্তী তথা কথিত আধুনিক সাহিত্যিকের গল্পে, নভেলে, ও কবিতাতেও নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্ণনা আছে। তাদের দুঃখ কষ্ট, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অনেক ক্ষেত্রেই চমৎকার ফুটেছে। আধুনিক নভেলের নায়ক নায়িকার চরিত্র বিচার করলেই তিনটি জিনিষ ধরা পড়ে। (১) তাঁরা সকলেই উপরকার শ্রেণীর স্বচ্ছলতা অর্জ্জনের প্রয়াসী, কাজে নয়, কল্পনায়, এবং (২) তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে জাগ্রত। (৩) তাঁরা সকলেই রোমান্টিক, সকলেই সুখপিয়াসী, সকলেই নিজত্ব অর্জ্জনে প্রয়াস পাচ্ছেন। ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনে বাধাই তাঁদের (নায়ক নায়িকাদের) বিরোধের বস্তুসম্ভার। এই তিন বিশেষত্ব ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফল। লিবারেলিজম যে সমাজ গঠনের প্রতীক হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজে, তারই প্রক্রিয়া চলছে এ দেশের সাহিত্যে। অবশ্য তার সঙ্গে সবচেতনায় সঞ্চিত হিন্দু-সংস্কারও মিশেছে। যাঁরা পদদলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত শ্রেণী থেকে নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচন করেন তাঁদের মনোভাবেও পূর্ব্বোক্ত তিনটি গুণ আছে। পল্লীসমাজ নিয়ে

অনেকে গল্প, কবিতা, নভেল লিখছেন, কিন্তু মনোভাবে বিভিন্নতা নেই। * পেতিত বুর্জোয়া একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী নয়, তাঁরা পতিত-বুর্জোয়া, তাই বুর্জোয়া মনের সব চিহ্নই (রোমান্টিসিজম, লিবারেলিজম প্রভৃতি) তাঁদের রচনায় বর্ত্তমান। ঠিক এই কারণেই তাঁরা পাঠক ও পাঠিকার মনোহরণ করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় লেখক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন, চাকরী না পেয়ে। বড় ঘরের বৌ ঝিরা আধুনিক সাহিত্যকে immoral বলেন।

সাহিত্যে যেমন শ্রেণীগত মনোভাব অবচেতনার হিন্দুসংস্কারকে কোণঠেসা করেছে তেমনটি চিত্রকলায় নয়। চিত্রকলায় বরঞ্চ তার বিপরীতটাই দেখি। অবশ্য, পুরাতন জমিদার-বাড়িতে বিলেতী ছবি ও রবিবর্ম্মার মোহিনী মূর্ত্তি এবং আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় অবনীবাবু, নন্দলাল, অসিতকুমারের এলবাম্ চোখে পড়ে। এ ছাড়া চিত্রকলায় শ্রেণীমূলক মনোভাব নজরে পড়ে না। তার একটি কারণ বোধ হয় এই, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেউ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চ ডিগ্রীধারী ছিলেন না, যাঁরা বড় চাকরীর দরখাস্ত করলেই সাহেবেরা তাঁদের আদর করে ডেকে চাকরী দিতেন। যথার্থ কারণ কিন্তু অন্য ধরণের। দেশে চিত্রশিল্প ধারা শুখিয়ে যায়, যখন প্রবাহ এল তখন সেটি বাংলাদেশের সংস্কৃতি থেকে আসে নি, এসেছিল সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি থেকে, যার নিদর্শন অজন্তা প্রভৃতি। সেই জন্যই হিন্দুত্বের প্রভাব নব্য-চিত্রকলায় বেশী। মুঘলচিত্রের সৌন্দর্য্য আবিষ্কারের ফলে হিন্দুস্থানী অবচেতনা চেতনরাজ্যে ভেসে ওঠবার সামর্থ্য পায়। গত কয়েক বৎসরে চিত্রশিল্পে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে সমাজ গঠনে পরিবর্ত্তনের ছাপ রয়েছে সন্দেহ হয়। পৌরাণিক বিষয় পরিত্যাগ, রোমান্স-বর্জ্জন, সাধারণ জীবনের বিষয় নির্ব্বাচন, পুরাতন আঙ্গিকের বদলে নূতন বিদেশী আধুনিক আঙ্গিক গ্রহণ কেবল আর্টিষ্টের খামখেয়াল নয়।

এ-যুগে সঙ্গীতের অভিব্যক্তিতে আমি তিনটি অধ্যায় দেখি। বঙ্কিমের সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ওস্তাদীগানের প্রচলন ছিল। ধ্রুপদই তখন গাওয়া হত রাজা রাজড়া ও জমিদার বাড়িতে, সঙ্গে থাকত তানপুরো পাখোয়াজ। এমন কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরেও তাই চলত, যে সমাজের নেতৃবৃন্দ নতুন ধনিসম্প্রদায় ভুক্ত ও ইংরেজী আদর্শে পিউরিট্যানিক ছিলেন। বাংলাদেশে ঐ পিউরিট্যানিজমের জন্যই উচ্চ সঙ্গীতের অবনতি হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রমহোদয়গণ অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন গান বাজনা সম্বন্ধে। কিন্তু তাঁদের অবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পড়েনি। তাঁদের বংশধর যখন তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করতে অক্ষম হলেন তখন তাঁরা সঙ্গীতের অনুরাগী হয়ে পড়লেন। বড় ওস্তাদ রাখবার টাকা নেই, ছোটখাট ওস্তাদ যাঁরা দেশে ছিলেন তাঁদেরই কাছে গান বাজনা শিখতে হল। সেই থেকে ধ্রুপদের অবনতি। (রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সঙ্গীতরসকে বাঁচিয়ে রাখা, স্বরচিত বাংলা গানের সাহায্যে।) সেই সঙ্গে যাত্রাও উঠে যায়। এল থিয়েটার সর্ব্বসাধারণের জন্য। থিয়েটারী সঙ্গীতের সামাজিক কর্ত্তব্য নিতান্ত ছোট ছিল না। আজ যে আধুনিক বাংলা গানের অতটা প্রচার হয়েছে তার জন্য দায়ী কিংবা দোষী ঐ নাটকী সঙ্গীত।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে সঙ্গীতের দুটি ধারা। কিন্তু দুটিতেই একই শ্রেণীর স্বার্থ বইছে। যে খেয়াল ঠুংরী আজকাল শোনা যায় (ধ্রুপদ উঠে গিয়েছে প্রায়) সে খেয়াল ঠুংরীও দরবারি নয়। তার মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত শ্রোতৃবৃন্দের মনোহরণের প্রয়াস আছে, যার ফলে তার তাল দ্রুত,

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে আমি আলোচনার বাইরে রাখছি।

ভাষা কবিত্বময়, লয় লঘু। এ শ্রেণীর অবসর নেই তাই বিলম্বিত খেয়াল অচল। এঁরা উচ্চ সঙ্গীতে অনভ্যস্ত এবং অশিক্ষিত। পয়সা কোথায় যে ওস্তাদী গান শুনবেন। টিকিট কিনে শোনা যায় বটে, কিন্তু তখনও ওস্তাদ টিকিটধারী ডিমক্র্যাসীকে অমান্য করতে পারেন না। তাই বাংলাগানের প্রচলনে সুবিধা এল। আজ Lower middle class পরিবারের মেয়েরাও গান শিখছেন, বেশীর ভাগই বাংলা আধুনিক গান। তাতে পরিশ্রম কম, খরচও কম। তা ছাড়া, বিবাহ মেয়েদের দিতেই হবে। গান জানলে যৌতুক কমতেও পারে—এটা কম কথা নয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কৃপাতেই বাংলা গানের আদর হয়েছে, তাই গানের ভাষা ও সুর, ঐপ্রকার, অর্থাৎ তাঁদেরই বোধগম্য, তাঁদেরই উপভোগ্য। আমাদের পলিটিক্যাল আন্দোলনে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তা কি আজ বলতে হবে? এ বিষয় আমি অন্যত্র আলোচনা করব।

আমার মোদ্দা কথা এই: সমাজ-গঠনের পরিবর্ত্তন চারুকলাতেও উদ্ভাসিত হয়। প্রাথমিক সামাজিক সংস্কারগুলি মনের নিম্নতম স্তরে থাকে, সেইজন্য তার প্রতিরূপ অস্পষ্ট। পরিবর্ত্তন ও আদিম-সংস্কারের বিরোধেই আজ সমগ্র চারুপ্রচেষ্টা অশান্ত।

সাঙ্গীতিকী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নিতান্তই ব্যক্তিগত ভাবে ঘরোয়া ভাবে গান সম্বন্ধে লিখব কয়েকটি কথা: যা মনে হয়েছে গত কয়মাস ধ'রে। অনেক বৎসর পরে দেশে ফিরে সঙ্গীতের নানান পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। অনেক কিছু দেখে অবিমিশ্র আনন্দ পেয়েছি, অনেক কিছু দেখে দুঃখবোধ করেছি। অনেক বন্ধু বলছেন এসম্বন্ধে কিছু লিখতে—ইম্প্রেশন হিসেবে। মন্দ কি।

সবচেয়ে চোখে পড়ে গানে মেয়েদের উন্নতি। মনে পড়ে যখন ১৯২২ সালে কালাপানির ওপার থেকে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি তখন প্রকাশ্যে মেয়েদের গান করাটা ছিল অভাবনীয় না হোক্ বিরল। ঘরে অনেকে গাইতেন অবশ্য, কিন্তু তাকে প্রায়ই গান বলা যেত না। সে সময়ে শ্রীমতী সাহানা দেবী ছাড়া সত্যিকার গান বলতে যা বোঝায় তা আর কোনো মেয়ের মুখে শুনি নি বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অন্তত প্রকাশ্যে যে শুনি নি একথা নির্ভয়ে বলা যায়। কদাচ কোনো বাড়িতে হঠাৎ এক আধটি মেয়ের গলায় দুএকটা তানের টুক্‌রো শুনে মনটা খুসি হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে হ'ত দুঃখও: যে এসব মেয়েরা যদি গান শিখতেন।

শিখতেন না যে সেজন্যে দোষটা একা তাঁদেরই ছিল না অবশ্য। কেন না শেখার পথে বাধা ছিল বহু। প্রধান বাধা শেখাবার লোকের অভাব। ভালো গায়ক দুচারজন ছিলেন অবশ্য। কিন্তু তাঁদের আবির্ভাব ছিল ডুমুরের ফুলের মতনই বিরল। পৌরুষী বৈঠকীতেই তাঁদের আনাগোনা

ছিল—যেখানে মেয়েদের না ছিল প্রবেশাধিকারের সুবিধা, না সুযোগ। সুতরাং ভালো গান তাঁরা শুনতেই পেতেন না, শিখবেন কোত্থেকে? দুএকটা সাদামটা গান কোনোমতে গেয়ে দিতে পারলেই তাঁরা বাহবাও পেতেন, বোধ করি আত্মপ্রসাদও। প্রকাশ্য বৈঠকে (রাবীন্দ্রিক অভিনয়াদি ছাড়া) তাঁদের গান হ'ত যাকে বলে once in a blue moon অন্তত টিকিট ক'রে তাঁদের গান শোনার রেওয়াজ যে ছিল না এ সবাই জানেন। যতদূর মনে পড়ে আমিই প্রথমে রামমোহন লাইব্রেরিতে টিকিট ক'রে বিশুদ্ধ গানের বৈঠকীর প্রবর্তন করি —যার জন্যে আমাকে বহু লাঞ্ছনা গালিগালাজ সহ্য করতে হয়েছিল (পরে শ্রীমতী রেবা রায়ের নৃত্য প্রবর্তনের সময় তো কথাই নেই—সবাই একবাক্যে বললেন, হিন্দুধর্মের এবার ভরাডুবি হ'ল)। আজ চ্যারিটি গানে মেয়েদের সহযোগের দৃশ্যে কে না গৌরববোধ করেন?

মনে দুঃখ পেতাম। ভাবতাম, এমনটা কেন হয়? নারীকণ্ঠের গান বিশুদ্ধ পবিত্র আনন্দ দিতে পারে—বিশেষ ক'রে ভগবৎবিষয়ক গান। আজো মনে পড়ে শ্রীমতী সাহানা দেবীর মুখে অতুলপ্রসাদের "কি আর গাহিব বলো হে মোর প্রিয়, শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো" অথবা বিদ্যাপতির "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়" শ্রেণীর ভাগবত সঙ্গীত শুনে কী গভীর ভক্তিরসের আনন্দই না পেয়েছিলাম। সাঙ্গীতিক আনন্দ তো বটেই, কিন্তু তার চেয়ে লক্ষগুণে বড় হ'ল ভক্তির আনন্দ। এ আনন্দ মেয়েরা কত সহজেই না সঞ্চার করতে পারেন—ছেলেদের তুলনায়। ছেলেদের কণ্ঠে বহু সাধনায় যে-আলো ফুটে ওঠে মেয়েদের ভগবদ্দত্ত স্বভাব মনোহারী কণ্ঠে সে-আলো ফুটে ওঠে প্রায় বিনাপ্রয়াসে বললেই হয়। আমার মনে বরাবরই দুঃখ ছিল যে সঙ্গীতরাজ্যে মেয়েদের সহযোগ পাওয়া ভার। লোকনিন্দার ভয়, মেলামেশার সুযোগের অভাব, সুকণ্ঠী মেয়েদের গান শেখার পথে বাধা—আরো কত কী অন্তরায় যে।

একটা বড় অভাব ছিল মেয়েদের গানে তাল-নৈপুণ্যের অভাব। সুর যদি বা মিলত তালে দক্ষতা মিলত না। আর গানে সুর ও তালের সমাবেশ না হ'লে আনন্দ পুরোপুরি নিটোল হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু তবলা মৃদঙ্গ পাখোয়াজের সঙ্গতে গান করা দুরূহ—মানে, সাধনালভ্য। কাজেই মেয়েদের গানে পূর্ণ তৃপ্তি মিলত না প্রায়ই। পেশাদারী বাইদের সঙ্গীত শুনেই তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হ'ত।—কেন না নারীকণ্ঠে স্বভাব-সুললিত গান শোনার তৃষ্ণা আমাদের মজ্জাগত—এ-দাবিতেও আমাদের জন্মস্বত্ব যে। কিন্তু বাইজীদের গানে সুরতাল শুদ্ধি থাকলেও প্রায়ই (সবক্ষেত্রে নয় অবশ্য) মস্ত একটা অভাব থাকত। আমরা আধুনিক গানে চাই সংস্কৃতি, ভাববিশুদ্ধি, আবহের মাধুর্য। বাইজীদের গানের আবহ ও ভাব প্রায়ই দুঃসহ হ'য়ে উঠত। গান তো শুধু সুর ও তালের নৈপুণ্য প্রদর্শনী নয়, রাগমালার সম্পদ নিয়ে জাহিরিপনাও নয়, এমন কি সস্তা-ধরণের ঠুন্‌কো মিষ্টতাও নয়। গানে আমরা চাই অনেক কিছু: সুকুমার আনন্দ, সুরের আনন্দ, ছন্দের আনন্দ, কাব্যের আনন্দ, ভাবের আনন্দ, ঘরে ঘরে পবিত্র শান্তির আনন্দ। বাইজীদের গানে এ ধরণের আনন্দ প্রায়ই মিলত না। তাছাড়া বাড়ির মেয়েরা ঘরোয়া গান ঘরোয়া ভাবে গাইবেন এ না চায় কে? কিন্তু যা আমরা চাই অনেক সময়ই তো পাই না—তাই চেয়ে চেয়ে নিরাশই হ'তে হ'ত।

এবার এসে দেখা গেল যে এই আট নয় বৎসরে এ-দিকে বিপ্লব ঘ'টে গেছে। আমি বছর ছয়েকের চেষ্টায় (১৯২২—১৯২৮) মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রে জোর ক'রেই গানের আসরে নামাই —প্রায়ই শিখিয়ে নিয়ে তবে। কিন্তু তখনও পূর্বযুগের পর্দার সংস্কার ছিল প্রবল। তাছাড়া

মেয়েরা স্বভাবতই কমবেশি লজ্জাশীলা—প্রকাশ্য আসরে নামতে অনেকেই চাইতেন না—নিতান্ত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যদি বা গাইতেন গানের বৈঠকীতে গাইতে ডাকলেই হয় চমকে উঠতেন না হয় লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠতেন। উপরন্তু গুরু-গঞ্জনা, লোকলাঞ্ছনার ভয় তো ছিলই—বলাই বাহুল্য। তাই বহু চেষ্টায়ও আশানুরূপ ফল ফলত না। গানের প্রচার খানিকটা আনুকূল্যের অপেক্ষা রাখতো। যুগধর্মও সহায়তা করে বৈ কি। এ-যুগে হঠাৎ দেখা গেল যে বহু অন্তরায় গেছে স'রে। বহু সাধ্যসাধনায় যে-আনন্দ আংশিক ভাবে মিলত সে-যুগে, এযুগে সে-আনন্দ মেলে ঘরে ঘরে, বিনা প্রয়াসে। এখনকার দিনে মেয়েরা ডাক দিতে না দিতে গান করতে আসেন ও সুরতালের নৈপুণ্যে চমৎকৃত করেন। (তাঁদের নৃত্যচর্চায়ও গভীর আনন্দ পেয়েছি—এ সম্বন্ধে পরে লিখব।) মেয়েরা স্বভাব-বেতালা এ অপবাদ আজকালকার তরুণীরা ঘুচিয়েছেন। এতে আমার আনন্দের অবধি নেই। মনে পড়ে সে-যুগে আমার পুরুষ বন্ধুরা প্রায়ই "মেয়েদের গান" শুনলেই টিটকিরি দিয়ে উঠতেন। ভাবখানা—"বেতালা বেসুরা পর্দানশীনার গান। ওর নাম কি গান?" (আজ তাঁদের মুখে কোথায় সে উচ্চাঙ্গের হাসি? মেয়েরা কেন ছেলেদের চেয়ে ছোট হবে শুনি?)

কিন্তু আজ? কতগুলি মেয়ের যে সুন্দর সুরে তালে অনবদ্য গান শুনলাম। গীতশ্রী গীতা দেবী, মালা দেবী, শান্তিলতা দেবী, বীণাপাণি দেবী, হাসি দেবী, রেণুকা দেবী (মোদক), মন্দিরা দেবী আরও কত মেয়ের গান শুনে কমবেশি মুগ্ধ হয়েছি, তারিফ করেছি গানে তাঁদের আত্মপ্রতীতি (self-confidence) এসেছে দেখে, উল্লসিত হয়েছি গানে তানালাপ করবার ক্ষমতা দেখে—আরও কত গুণপনা দেখেছি তাঁদের গানে, নৃত্যে, সঙ্গীতানুরাগে, কলাসাধনায় নিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখে।

কেবল এখনো একটা অভাব আছে। গানে ভক্তিরস—যা সঙ্গীতজগতে সবচেয়ে বড় রস, জীবনেরও সবচেয়ে বড় অনুভূতি—তা এখনো তেমন পাই না মেয়েদের কণ্ঠে। আমার আশা আছে তাঁরা এস্থেটিক গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে ভাগবত সঙ্গীত কীর্তনাদিও গাইবেন। ভাটিয়ালি প্রভৃতি মন্দ না, কিন্তু গানে আমাদের হৃদয় চায় গভীর আনন্দ। আর সবচেয়ে গভীর আনন্দ দিতে পারে ভক্তি। এ কয় মাসে শ্রীমতী হাসিকে কয়েকটি ভক্তির গান শেখাই। নানা আসরে তিনি সেসব গান গেয়ে কত লোককে যে আনন্দ দিয়েছেন তাঁর অনুপম কণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীত মাধুর্যে। আশা করি তাঁর ও অন্য সব মেয়েদের মধ্যেও গানে ভক্তিরসেরই প্রাধান্য আসবে ক্রমশ। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হ'ল ভাগবত উপলব্ধি। যে-গানে সেই উপলব্ধির আভাস ইঙ্গিত ফোটে তার চেয়ে বড় আনন্দ কী মিলতে পারে সঙ্গীতের রাজ্যে? আর মেয়েদের সহজ আবেগপ্রবণ হৃদয়ে স্বভাব-সুন্দর কণ্ঠে ভক্তির ঢেউ কত সহজেই না খেলতে পারে। "গীতশ্রী" মেয়েদের কাছে তাই এই অনুরোধ রইল আমার বিশেষ ক'রে যে তাঁদের টেকনিকাল দক্ষতাকে প্রধানত এদিকে মোড় ফিরিয়ে দিন তাঁরা।

এ-যুগে গানে সুর ও তালের নৈপুণ্য খুবই প্রাধান্য পেয়েছে ও পাচ্ছে। এর দরকার ছিল। অনেক ছেলেদের গানেও এ-নৈপুণ্যের বিকাশ দেখা গেল নিখুঁৎ ভাবে। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন গোস্বামী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির হিন্দি গানে ও কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মন প্রমুখ কতিপয় গায়কের বাংলা গানে সুর ও তালের নৈপুণ্য মুগ্ধ করে। আশা

করি এ-নৈপুণ্য তাঁরাও শুধু এস্থেটিকে নয় ভাবগভীর আধ্যাত্মিক গানের সেবায় নিয়োগ করবেন। বিশেষ ক'রে বাংলা গানে।

অবশ্য এস্থেটিক গান, ক্লাসিকাল গান এসবে আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। গানেরও তো নানান্ ধারা থাকবেই। যেসব ধারার মধ্যে শ্রীহীনতা নেই, গ্লানি নেই, কপটতা নেই, অহেতুক আহিবিপনা নেই, যেসব গানে আছে ভাবের সৌন্দর্য, সুরের সুষমা, তালের নিখুঁৎ ছন্দরূপ সেসব গানেরই কমবেশি আদর থাকতে বাধ্য—থাকা উচিতও। আমার কেবল এই কথা মনে হয় যে কণ্ঠসঙ্গীতে ভাবাত্মক গানের আদর বেশি হওয়া উচিত—সুরপ্রধান গানের আদরও থাকুক কিন্তু ভাবাত্মক গানের রসমূল্য বেশি—কণ্ঠসঙ্গীতে। আর যেহেতু মানবজীবনে ভাগবত ভাব সবচেয়ে বড় ভাব সেহেতু কণ্ঠসঙ্গীতে ভাগবত সঙ্গীতকেই করা উচিত সবচেয়ে বেশি সমাদর। এস্থেটিক বনাম স্পিরিচুয়াল সঙ্গীতের তর্ক তুলব না—বলেছি আমার ব্যক্তিগত মনোভাব সরলভাবেই ব'লে যাব। তাই সহজ ভাবেই বলছি—তর্কযুক্তির বিড়ম্বনা বাদ দিয়ে—যে, কণ্ঠসঙ্গীতে ভাগবত ভাবের নানান্ সূক্ষ্ম ও গভীর রস যত বেশি প্রবাহিত হবে ততই সঙ্গীত হবে সার্থক।*

(ক্রমশ)

* এভাবে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রইল ক্রমশ—ধারাবাহিক পর্যায়ে। নৃত্য সম্বন্ধেও লিখব।

শিল্প ও শিক্ষা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতি চৌষট্টিকলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আনন্দ ও পরিকল্পনা রেখা রং গঠনের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ ও নানাবিধ কারুকর্ম্মে অভিব্যক্ত হয়েছে।

এ সব কাজকে কেউ কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে বর্ণনা করেছে। যে কোনো কলসীতে জল রাখা চলে, কিন্তু শিল্পী তার আকার বা ডৌলকে নয়নাভিরাম করে তৈরী করেছে; শুধু তাই নয়, তার গায়ে আঁচড় কেটে, নানা লতাপাতা চিত্রিত করেছে। কলসীর প্রয়োজন শুধু জল রাখা, তার গায়ে ছবি আঁকার প্রয়োজন কি? কলসীর জল মেটায় দেহের তৃষ্ণা, কিন্তু তার গায়ে যে ছবি, তা মেটায় মনের ক্ষুধা। কাপড়ের পাড়ের যে পরিকল্পনা তার কি প্রয়োজন? শুধু এক রঙা পাড় হলে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হত? প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে পাড়ের নকসা না হলেও চলত, কিন্তু পাড়ের নকসা দেয় চোখের তৃপ্তি। মানুষে দেওয়ালে ছবি টাঙিয়ে, সুচিত্রিত পর্দা টাঙিয়ে মনের আনন্দকে ব্যক্ত করে থাকে।

এ সমস্ত প্রকাশ করে থাকে যে, মানুষের উদ্দেশ্য শুধু বেঁচে থাকা নয়—রূপে রসে বর্ণে গন্ধে শব্দে জীবনকে নানাদিক থেকে উপভোগ করা—A man does not live by bread alone.

ইংরাজীতে চিত্র, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ প্রভৃতিকে Fine Arts বলে থাকে—বাংলা ভাষায় একথা নানাভাবে অনূদিত হয়েছে, যেমন—চারু শিল্প, রস শিল্প, চারু কলা, রস কলা, রম্য কলা ইত্যাদি। এ শব্দগুলি নিতান্ত ইংরাজী শব্দের "পায়ের মাপের জুতা।" আমি এ ক্ষেত্রে শুধু "শিল্প" শব্দই প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু শিল্প বলতে ইংরাজীতে industry বলতে যা বুঝায় তাই বুঝিয়ে থাকে—যেমন Textile industry, Jute industry,

বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প ইত্যাদি। শিল্প শব্দ এখন হয়ে পড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য-দ্যোতক। ইউরোপে বা আমাদের দেশে industry বলে কোনো ব্যাপার সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্ব্বেই শিল্প শব্দ ছিল। বেদে এর প্রয়োগ আছে। ইংরাজীতে Fine Arts বলতে যা বুঝায় শিল্প বলতে তাই কতকটা বোঝাত। কাজেই শিল্প শব্দেই Fine Arts বোঝান যেতে পারে, নতুন করে এর অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই।

আমাদের শিক্ষায় ও দৈনন্দিন জীবনে এই শিল্পকে বোঝার অভাব আছে। আমরা এর কোনো মূল্য দিতে চাই না। আমাদের জীবনের সঙ্গে এর যে কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা ভাবি না। দেওয়ালে ছবি টাঙাবার প্রয়োজন হলে কেলেণ্ডারের একটা ছবি টাঙিয়ে দিলে তো হয়। এরূপ মনোবৃত্তি আমাদের মনের অসাড়তাকেই প্রমাণ করে। মানব-সভ্যতায় শিল্পের স্থান কতটুকু যদি উপলব্ধি করতে পারি, তবে শিল্প সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা হবে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে কত ভাবধারা নিয়ে শিল্প প্রাণবন্ত হয়েছে, মহাপুরুষদের বাণী শিল্প বহন করে নিয়েছে দেশে দেশে। বাণী বর্ণে, প্রস্তরে রূপায়িত হয়ে কত কত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। বুদ্ধের বাণী, খৃষ্টের বাণী শিল্পীর হাতে রূপ লাভ করে মানবের মুক্তির পথে সহায় হয়েছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ঠিকই বলেছেন, "শিল্প আত্ম সংস্কৃতির জন্য।"*

শিল্পের ভিতর মানব মনের ঐক্যের সন্ধান পাই। বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন যুগকে শিল্প ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে।

আমাদের শিক্ষা কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ হতে পারে না, যদি আমরা শিল্পের সৌন্দর্য্য বুঝতে না পারি, এবং সুন্দর জিনিষের আদর করতে না শিখি। সুন্দর জিনিষকে আদর করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি; কিন্তু আমরা যে আবহাওয়া এবং শিক্ষার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠি, তাতে এই বৃত্তি পরিপুষ্ট হতে পারে না, একে যেন নির্ম্মমভাবে পিষে মারা হয়। গুরুমশায় যেন বেত হাতে শাসিয়ে বলছেন, "পড় বসে ক, খ, গান করতে হবে না।" শিশুকে একটা সুন্দর জিনিষ দেখালে, সে আনন্দে হাত বাড়ায়, সে সুন্দর জিনিষের কদর বোঝে।

আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে চিত্র-শিক্ষার তেমন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত নেই। চিত্র শিক্ষা করতে গেলে আর্টস্কুলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যারা ছবি আঁকা শিখিতে চায়, তারা নিরুপায়। ড্রয়িংক্লাস নামে যে ক্লাস থাকে সব ইস্কুলে, তা নিতান্ত বিরক্তিকর, একেবারেই চিত্তাকর্ষক নয়। ছোটবেলা থেকেই খেলা ধূলা, নানাপ্রকার হাতের কাজ, এবং ছবি আঁকার সঙ্গে লেখাপড়া আরম্ভ করতে পারলে শিশুদের শিক্ষা চিত্তাকর্ষক হতে পারে। ইউরোপে নতুন নতুন শিক্ষাবিধির পরীক্ষা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল কাজের ভিতর শিশুদের মন, চোখ ও হাত এই তিনের সংযোগ সাধন করা। আমাদের দেশেও অবশ্য কোথাও কোথাও শিক্ষার নতুন বিধির প্রবর্ত্তন হয়েছে।

সকল শিশুবিদ্যালয় থেকে চিত্র সংগ্রহ করে বিলাতে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপের সকল দেশের এবং আমেরিকার শিশুদের চিত্র তাতে স্থান পেয়েছে। এশিয়ার তরফ থেকে একমাত্র জাপান তাতে স্থান পেয়েছে। ৬ বছর বয়স থেকে ১৫।১৬ বয়স পর্য্যন্ত, বালক বালিকাদের চিত্তাকর্ষক চিত্র তাতে সংগৃহীত হয়েছে। নানাদেশের শিশুচিত্ত কি ভাবে তাতে উন্মেষলাভ করেছে, এর থেকে পরিচয় পাওয়া যাবে। শিশুদের কল্পনা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি কোথাও

* আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমানো আত্মানং সংস্কুরুতে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

বাধা পায় নি, তারা তাদের চারপাশে যা দেখেছে, তাই তারা তাদের সুকোমল হাতে এঁকেছে।

আমাদের স্কুলে ড্রয়িংক্লাস নামে যে ক্লাস আছে, তা মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়। ড্রয়িংবুকে থাকে পেয়ালা, কেটলি, ঘটী ও মগের ছবি—ছেলেদের তাই দেখে নকল করতে হয়। পর্য্যবেক্ষণ, কল্পনা ও হাত এই তিনের সংযোগে হবে কাজ। শুধু নকলে তা সম্ভব হয় না। শিক্ষকের কর্ত্তব্য শুধু ড্রয়িং শেখান নয়, ছবি আঁকার ঔৎসুক্য জাগান, এবং দেশী বিদেশী ছবি বুঝতে সাহায্য করা। যে ধরণের ড্রয়িংমাষ্টার সাধারণতঃ স্কুলে দেখে থাকি, তাদের দ্বারা হয়ত একাজ সম্ভব হয় না। তারা নিজেরাই হয়ত ছবি বোঝে না, এবং অপর শিল্পীদের কাজের খোঁজ রাখে না, তারা বোঝাবে কি? আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে চিত্র-শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিলেই সব ধীরে ধীরে হবে।

এ বিষয়ে দোষ যে শুধু বিদ্যালয়ের পরিচালকদের তা নয়, অভিভাবকদেরও। তাঁরা মনে করেন, ছেলে ছবি আঁকা শিখে কি করবে? ছেলে ছবি আঁকতে বসলে, হয়ত মনে করতেন, সময় নষ্ট হচ্ছে। কাজেই যে ছেলের মনে একটু ঔৎসুক্য আছে, কোনো দিক থেকে একটু জল বাতাস না পেয়ে তা শুখিয়ে যায়। যদি বা কোনো ছেলেকে চিত্র সম্বন্ধে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, সেটা সস্‌পেইন্টিং পর্য্যন্ত। সেগুলি সযত্নে ফ্রেম করে বসবার ঘরে বাঁধিয়ে রাখা হয়।

আজকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔৎসুক্য দেখা যায়, বিশেষত মেয়েদের। কারণ সঙ্গীতটা নিছক যে আনন্দের ব্যাপার তা নয়, কনে দেখা ব্যাপারেও এর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, কাজেই কন্যার পিতা সঙ্গীত সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না।

গৃহকে সুন্দর করে সাজাবে মেয়েরা; সুতরাং ছাত্রীদের বেশী ঝোঁক থাকা উচিত চিত্র সম্বন্ধে, ছাত্রদের থেকে। তারা এমব্রয়ডারি করে, টেবিল-ক্লথ, ঘরের পর্দা, ব্লাউজ্‌ পিসে নানা নকসা ফুটিয়ে তোলে। তাদের যদি ডিজাইন করবার ক্ষমতা থাকে এ সকল কাজ আরো মনোরম হয়। সাধারণত বিলাতী বইর নকসা থেকে এসব এমব্রয়ডারি নকল করা হয়।

আমাদের সামাজিক জীবনে মেয়েদের শিল্প নৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীনা ঠাকুরমারা জানতেন নানারকম শিল্পের কাজ। আর আজ তাঁদের নাতনীরা সে সব ভুলে কলেজে ইকনমিক্‌স্ ও সিভিক্‌স্ পড়ছে। ঠাকুরমারা কাঁথা সেলাই করতেন, অবসর সময়ে নানা কারুকর্ম্ম করে। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা এঁকে প্রাঙ্গণ সুশোভিত করতেন, বিয়ের পিঁড়ি আঁকতেন। পাথরের থালা নরুন দিয়ে খোদাই করে আমসত্ত্বের ছাঁচ তৈরী হয়। লতা পাতা ফুল মাছ পাখী প্রভৃতি নয়নমুগ্ধকর নকসায় আমসত্ত্ব খেলে, রসনার যে বিশেষ তৃপ্তি হয়, তা নয়, তবে এটা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনের চাহিদা। এই অহৈতুক কাজে শিল্পি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুরমাদের অশিক্ষিত হাতে সময় সময় এমন সব কাজ দেখা যায়, যা আর্টস্কুলে পাশ করা শিল্পীদেরও বিস্ময়ের বস্তু হতে পারে।

ছেলেবেলায় গ্রামে সুন্দর আলপনার পরিকল্পনা দেখেছি বিবাহ, পূজা, প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে। সহরে ওসব কিছু দেখতে পাই না, সহরে প্রতি বৎসর এত বিয়ে দেখেছি, কিন্তু কোথাও একটু সুন্দর আলপনা বা পিঁড়ি-চিত্র দেখতে পাই না। যে সব ছবি দেখি পিঁড়িতে—এমনকি অবস্থাপন্ন শিক্ষিত পরিবারের বাড়ীতেও—তা যেন, সমস্ত উৎসবকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। এই সামান্য কাজ—একটু আলপনা, পিঁড়িতে একটু চিত্র—এ যদি সুষ্ঠুভাবে না করা যায়, টেবিল চেয়ারে বসে বিয়ে করলেই হয়। ওরকম কুৎসিত আসনে বসতে বর কনে কেন যে ঘৃণায় আঁতকে ওঠে না, সেটা আশ্চর্য্য।

নাগরিক জীবন—বিশেষতঃ নতুন অভিজাত এবং নতুন ধনীদের, ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। আমি অবশ্য এটা দূষণীয় মনে করি না, এরকম হ'তে বাধ্য। ড্রয়িংরুম ইউরোপীয় রুচি অনুসারে সাজান। নিমন্ত্রণের সময় আর কুশাসন, পাত পড়ে না, তার যায়গায় টেবিল চেয়ার এসেছে, কলকাতার পক্ষে সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা সব সময় সঙ্গতি রক্ষা করে চলে কি? আর্ট বা সৌন্দর্য্যনীতির দিক থেকে এ প্রশ্ন বিশেষভাবে করছি। রাসবিহারী এভিনিউ অঞ্চলে, পঞ্চাশ হাজার টাকার বাড়ী উঠছে, দু এক হাজার টাকার ফার্নিচার আছে, কিন্তু বাড়ীতে ছবি টাঙান কি রকম? চার আনা দামের সস্‌পেইণ্টিং ঝুলছে।

আর্ট হওয়া উচিত সকলের জন্য—শুধু দুচার জন রাজা মহারাজা এবং স্ফীত ধনীর জন্য নয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক মনীষী রাসকিন ইউরোপে নতুন চিন্তাধারা এনেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আর্ট ইংলণ্ডের প্রতিঘরে এমনকি গরীবের কুঁড়েঘরেও স্থান পাবে। আর্ট কেবল বিলাসীর সম্পত্তি হবে না। তিনি লিখেছেন, "আর্ট হবে জনসাধারণের জন্য, আর্ট শুধু অভিজাত এবং কলওয়ালাদের জন্য নয়।"

আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের এক সময় ইচ্ছা হয়েছিল, গরীব কুলী মজুরদের জন্য ছবি আঁকবেন। দেব দেবীর ছবি এঁকে—শুধু লাইনড্রয়িং, তাঁর রাজাবাজারের (কলকাতা) বাসার সামনে টাঙিয়ে রাখতেন। দুআনা কি চার আনা করে বোধ হয় দাম রেখেছিলেন। কলফেরতা কুলীরা সন্ধ্যাকালে বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যেত, এবং দাঁড়িয়ে ছবি দেখত। একবার একজন কুলী একটা ছবি কিনেছিল। অবনীন্দ্রনাথ একথা জানতে পেরে সব ছবি কিনে নেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে M. A ক্লাসে Fine Arts সম্বন্ধে লেকচার দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। পুরাতত্ত্ব এবং মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধেও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এ বিষয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। এসব গবেষণাকে শিল্প-সমালোচনা বলা চলে না। এসব লেখা থেকে ভারতীয় শিল্প বুঝতে সাহায্য করে কিনা জানি না। এতদিন ধরে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ফর্গুসন, হ্যাভেল, কুমারস্বামী প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের আলোচনা পণ্ডিতদের জন্য, শিল্পের সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব তাতে পাওয়া যাবে না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মিশর, পারস্য, চীন, জাপান বিশেষ করে চীন ও জাপানের শিল্প যে রকম বুঝেছেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সে রকম কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। তাঁরা ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্য সব শিল্প সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হলেও ভারতীয় শিল্পের ভাষা তেমন করে বোঝেন নি। আজকাল অবশ্য কেউ কেউ বুঝবার চেষ্টা করছেন—যেমন ফরাসী লেণন রেনেগ্রুসে এবং এলিফরের নাম উল্লেখ করা যায়।

শুধু পাণ্ডিত্য থাকলেই শিল্প সমালোচনা হয় না, একটি সহৃদয়তা চাই, যা শিল্পকে সহজে প্রকাশ করতে পারে, এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে খুলে দেখাতে পারে। বাংলা ভাষায় এ রকম বই করে হবে? অবনীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে শিল্পকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

চিত্র-পরিচয়

এই সঙ্গে যে ৪খানি ছবি দেওয়া গেল তা কলকাতা গভর্মেণ্ট স্কুল অফ আর্টের ছাত্রদের আঁকা। আমাদের দেশে লিথোগ্রাফ, উডকাট, এচিং এবং চিত্র আজকাল লোকপ্রিয় হচ্ছে। এসকল ছায়াচিত্রকে ইংরাজীতে বলে গ্রাফিক আর্ট (Graphic art)। ইউরোপে এ জিনিষের যথেষ্ট চাহিদা আছে, আমাদের দেশে এটা যদিও নতুন এসেছে। বিলাতে উচ্চ জাতীয় চিত্রাঙ্কনে উডকাটের ছবির যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে। হাফটোনব্লক সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে, ছবি ছাপতে হত কাঠের ব্লক থেকে। শিল্পীকে কাঠের উপরে ছবি খোদাই করে ছাপতে হত। হাফটোনের উদ্ভব হওয়াতে এজিনিষ প্রায় ডুবতে বসেছিল, অধুনা এ শিল্পের চাহিদা আবার বেড়েছে, শিল্প-রসিকরা বুঝেছেন যে এর একটা সৌন্দর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে, হাফ-টোন ব্লকে তা পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধ

শিল্পী—শ্রীবাসুদেব রায়

পদ্মাবক্ষে　　শিল্পী—শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার

গ্রন্থপাঠ (লিথো)

শিল্পী—শ্রীবাসুদেব রায়

গঙ্গার ঘাটে (লিথো)

শিল্পী—শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার
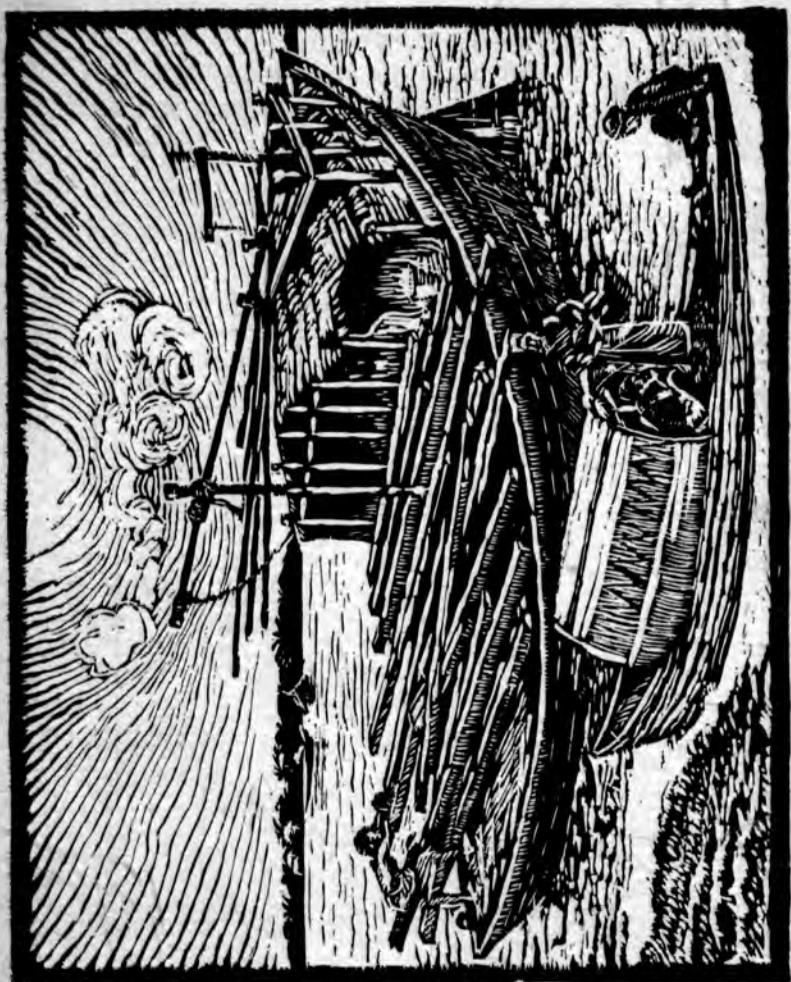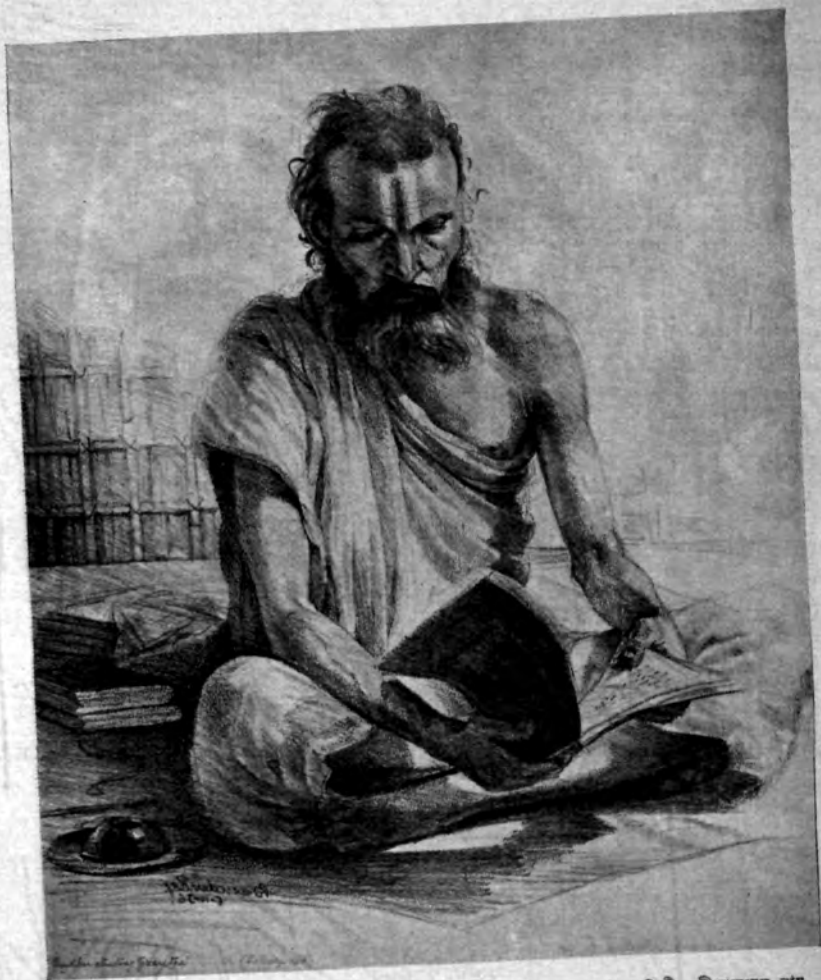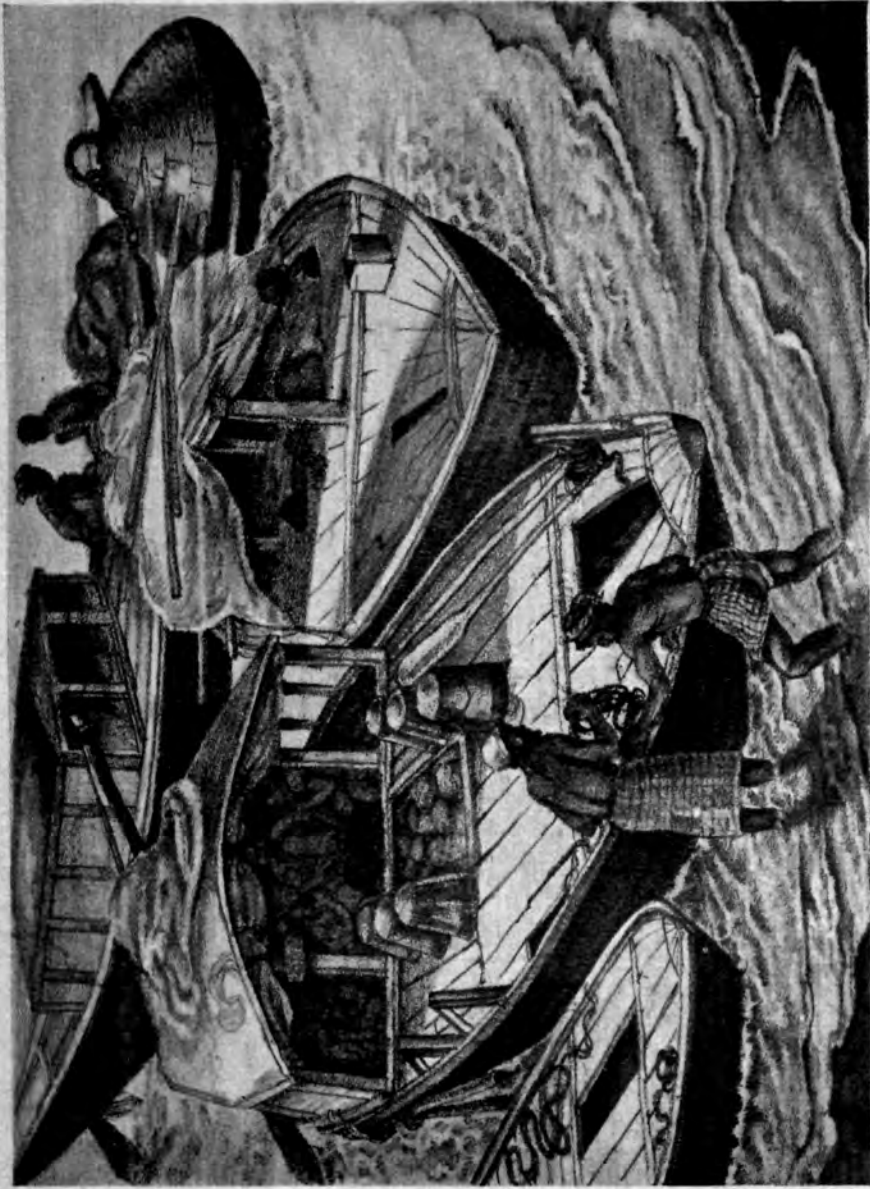
কবিবর ৶চৈতন্যদাস-রচিত মনসামঙ্গল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

আলোচ্য "মনসামঙ্গল" পুস্তকখানি অতি সংক্ষিপ্ত, ইহা চারিটী পালায় বিভক্ত। প্রথম পালায়—মনসার সহিত চাঁদ বেণের বিবাদ ও লখিন্দরের জন্ম হইতে তাহার বিবাহ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পালায়—লোহার বাসরে বেহুলার অন্ন-বন্ধন হইতে সর্প-দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু ও বেহুলার লখিন্দরের মৃতদেহসহ কলার মান্দাসে দেবপুরে যাত্রা; তৃতীয় পালায়—মান্দাস-সহ বেহুলার চাঁপাতলার ঘাটে উপনীত হওয়া হইতে দেবপুরে গিয়া লখিন্দর ও তাহার অপর ছয় ভ্রাতার প্রাণদান, চাঁদের তরণী উদ্ধার এবং চতুর্থ পালায়—বেহুলার পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন এবং চাঁদ কর্ত্তৃক মনসার পূজা এবং লখিন্দর ও বেহুলার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

কবি-পরিচয়—আলোচ্য পুস্তকের কোন হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধান এ যাবৎ পাই নাই। বটতলা হইতে মুদ্রিত একখানি পুস্তক অবলম্বনেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।* উক্ত পুস্তকের রচয়িতা চৈতন্যদাস।† চৈতন্যদাসের উপাধি সম্ভবতঃ "বিশ্বাস" ছিল। নিম্নোক্ত ভণিতা হইতে তাহাই যেন মনে হয়।

"বিশ্বাস বলয়ে হরি কোথা মা গো বিষহরি
বাথ পদে করো না বঞ্চন।
তোমার চরণ সেবি, লিখি এই নব কবি
মনোদুঃখ করি নিবারণ॥" পৃঃ ২৮

পুস্তকখানিতে বিভিন্ন প্রকারের ভণিতা দৃষ্ট হয়। "চৈতন্যদাসের দাস কৃষ্ণপদে মন" ভণিতা পাঠ করিয়া পুস্তকের অংশবিশেষ চৈতন্যদাসের কোন শিষ্য-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া সন্দেহ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সমস্ত পুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে ইহা যে এক কবিরই রচনা, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কবি বিনয়বশতঃ বহু স্থলে "চৈতন্য বৈষ্ণব দাস কৃষ্ণপদে মন" [পৃঃ ৮৫, ৮৬, ৯৩ দ্রষ্টব্য] বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। "চৈতন্যদাসের দাস কৃষ্ণপদে মন" ভণিতা হইতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ই প্রকাশ পাইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার মাতৃভাষা-প্রীতির যে পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীর শ্রদ্ধা পাইবেন সন্দেহ নাই।

(১) "চৈতন্য ভাষায় রচি পুরায় বাসনা।" পৃঃ ৫০

(২) "চৈতন্য ভাষায় লিখি মহানন্দ পান।" পৃঃ২২

(৩) "চৈতন্য মনসা পদে করিয়া প্রণতি।
লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া ভকতি॥"

পৃঃ ৭৫, ৯৫

প্রভৃতি ভণিতায় তাঁহার মাতৃভাষা-প্রীতিই মূর্ত্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কবিদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পুস্তক জনসাধারণ-কর্ত্তৃক আদৃত না হইতে পারে

* মুদ্রিত পুঁথির আখ্যাপত্রখানি উদ্ধৃত হইল—"মনসা-মঙ্গল—প্রথম হইতে চতুর্থ পালায় সম্পূর্ণ। লখিন্দর, বেহুলা, নেতো এবং মা মনসার জন্মবৃত্তান্তাদি। নানা লীলা বর্ণন ও চাঁদবেণের মনসা-পূজা। কবিবর ৶চৈতন্যদাস কর্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। প্রকাশক—শ্রীতারাচাঁদ দাস। ৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৶০ ছয় আনা। পৃষ্ঠসংখ্যা—৶০ + ১০৪, আকার ৪৸০" × ৮।০" ইঞ্চি।

† "চৈতন্যদাস করি কৃষ্ণপদে মন" পৃঃ ৭ অথবা—"চৈতন্য মনসা-পদে রচিল সুন্দর" পৃঃ ৯ "চৈতন্যদাসের আশ ভক্তিপথে মন," পৃঃ ১১, "চৈতন্য মনসা-পদ করিয়া স্মরণ।" পৃঃ ১৫, "চৈতন্য দাসের সদা পদ্মাপদে মন," পৃঃ ১৯, "চৈতন্য-দাসের আশ কৃষ্ণপদে মন।" পৃঃ ৩১—প্রভৃতি ভণিতা দ্রষ্টব্য।

এরূপ আশঙ্কা করিয়া, তাহা দেবাদেশে রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মভীরু জনসাধারণ দেবতার আদেশে রচিত পুস্তক অবহেলা করিতে পারিবে না—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সম্ভবতঃ দেবাদেশের অবতারণা করা হইয়া থাকে। আমাদের চৈতন্যদাসও এই বহু-প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করেন নাই। তিনিও (১) "চৈতন্য লিখিল গ্রন্থ মনসার বরে।" পৃঃ ২৭

(২) "হয়ে স্থির মতি কবিয়া প্রণতি
মনসা চরণ আশে।
যা লেখান লিখি তিনি মাত্র সাথি
চৈতন্যচরণ দাসে॥" পৃঃ ৪২

প্রভৃতি ভণিতা দ্বারা দেবীর আদেশের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন। অপরপক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভণিতা-দ্বয়ের এরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে—দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কবির পক্ষে সাধ্যাতীত, কেবল দেবীর অনুগ্রহ ও কৃপাবলেই তিনি এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন।

বাসস্থান-নির্ণয়—আলোচ্য গ্রন্থের কোথাও গ্রন্থকারের বাসস্থানের উল্লেখ না থাকায়, তিনি কোন্ জেলার অধিবাসী, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে বলা কঠিন। তবে গ্রন্থের আভ্যন্তরিক প্রমাণাদি-দ্বারা তাঁহার বাসস্থান-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। তাহা হইতে মনে হয়, কবি সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান জেলারই অধিবাসী ছিলেন। নিম্নে আমাদের ধারণার পরিপোষক কয়েকটী যুক্তি দেওয়া হইল—

[১] লখিন্দরের বিবাহের সময় চাঁদ সদাগরের নিমন্ত্রণ পাইয়া যে সব আত্মীয় আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সকলই বর্দ্ধমানবাসী।

"যত বেণেগণ, পুলকিত মন,
বর্দ্ধমানে নিবসতী।
লয়ে বহু ধন, করে আগমন
চাঁদ গৃহে দ্রুতগতি॥" পৃঃ ৪১

[২] লখিন্দরের মৃতদেহসহ বেহুলা কলার মান্দাসে ভাসিয়া যে সব স্থান দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমানের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি "কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের" বেহুলা যে পথ দিয়া তাঁহার স্বামীর মৃতদেহসহ কলার মান্দাসে ভাসিয়া গিয়াছেন—চৈতন্যদাসের বেহুলাও অনেকটা সেই পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

[৩] রাঘব বোয়াল কর্ত্তৃক লখিন্দরের মালাই-চাকি-ভক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি কয়েকপ্রকার মাছের নাম করিয়াছেন, এই নাম কয়টী রাঢ়ে বিশেষভাবে বর্দ্ধমান অঞ্চলেই প্রচলিত।*

[৪] আলোচ্য গ্রন্থে স্ত্রী-আচার ও সংস্কারাদির উল্লেখ যাহা আছে, তাহাও বিশেষভাবে বর্দ্ধমানেই প্রচলিত।

[ক] বিবাহের রাত্রে নববিবাহিতা বধূর ভাত খাইতে নাই—

"আজি মম বিবাহ হৈল ওহে প্রাণেশ্বর।
খাইতে নিষেধ আছে শুন অতঃপর॥" পৃঃ ৪৮

[খ] বিবাহের প্রাক্কালে শাশুড়ী ভাবী জামাতার মাথায় গুড়-চাল ছড়াইয়া দেন এবং বরকে তাহা খাইতে হয়—

"অমলা বৈনেনী নিজ কুলাচার মতে।
গুড় চাল ফেলি মারে নখায়ের মাথে॥
নখিন্দরে গুড় চাল করায় সেবন।" পৃঃ ৪৪

[গ] কন্যা-সম্প্রদানের সময় ব্রাহ্মণ কন্যার হস্তে সূতা বান্ধিয়া দেন এবং কন্যাদাতা একটা পানের খিলি কন্যার হস্তে অর্পণ করিয়া সেই হস্ত বরের হস্তে সমর্পণ করেন।

"একটি তাম্বূলে করি গুয়া সংযোটন।
বেহুলার হস্তে সাধু করিল অর্পণ॥

* কাওলা, মৌরলা, চুণা, রোহিত, কড়চা, শাল, পাব্দা, রাইখড়, মাগুর, চান্দুর, শিঙ্গি, টেংরা, চাঁদকুড় প্রভৃতি।

বেহুলার হস্ত দিল নখায়ের হাতে।
পুরোহিত বলাইল মন্ত্র বিধিমতে॥" পৃঃ ৪৪

[ঘ] বিবাহের পূর্ব্ব দিবসে অধিবাসক্রিয়া হইয়া থাকে। ঐ দিবস বরকে "আইবড়" ভাত খাইতে হয়। "আইবড় ভাত দেও বাছা নখিন্দরে।" পৃঃ ৪০

[ঙ] নবজাত সন্তানের ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। এই ষষ্ঠীপূজায় অনেক "স্ত্রী-আচার" আছে। ঐ দিবস সূতিকাগৃহে একটী গোমুণ্ড আনিয়া পুতিয়া রাখা হয় এবং ইহাতে সিঁদুর ঢালিয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থলে গোমুণ্ডের পরিবর্ত্তে গোবর রাখা হয়, তাহাতে সিঁদুর ঢালিয়া সেই সিঁদুর-মিশ্রিত গোবরের দ্বারা প্রসূতি ও নবজাত শিশুকে তিলক দেওয়া হয়।

"যথাবিধি ষষ্ঠীদেবী করিয়া স্থাপন।
অক্ষয় প্রদীপ ধনী জ্বালিল তখন॥
পাত্রে পাত্রে সেই সব সাজায় হবিষে।
গোহাড়ে সিন্দুর ঢালে মজি স্নেহাবশে॥" পৃঃ ৬

(চ) সন্তান-জন্মের ২১ দিন পরে প্রসূতি প্রথম পুষ্করিণীতে গিয়া স্নান করে। (এতদিন তাহাকে তোলা জলেই স্নান করিতে হইত।) স্নান করিয়া প্রথমে জলদেবতা এবং তাহার পরে পর্য্যায়ক্রমে গোপৃষ্ঠে ষষ্ঠী, বটবৃক্ষ, আন্দকান্দনী, চপেটাষষ্ঠী ও একুশষষ্ঠী প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

"একুশ দিনের দিন হ'লো সমাগত॥
হরিদ্রা মাখিয়া সতী গিয়া সরোবরে।
স্নান করে বিধিমতে সরসীর নীরে॥
তীরে বসি জলদেব করিল পূজন।
গোপৃষ্ঠে ষষ্ঠীর পূজা করিল তখন॥
অষ্টাঙ্গ লুটিয়া পরে করিলা প্রণতি।
প্রণমিয়া বটবৃক্ষে আনন্দিত মতি॥
আন্দকান্দনীর পূজা করিলা পরেতে।
শীলাপরি ষষ্ঠীদেবী পূজিলা শেষেতে॥
চপেটা ষষ্ঠীরে পরে করিলা অর্চ্চন।
একুশ ষষ্ঠীর পূজা ক্রমে সমাপন॥" পৃঃ ৬

কালনির্দ্দেশ—কবির সময়-নির্দ্দেশ করার মত বিশেষ কোন ইঙ্গিত মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। গ্রন্থের ভাষা আধুনিক। মূল পুঁথি অথবা প্রাচীন কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলে, প্রকাশক মূলের কতটুক সংস্কার করিয়াছেন, বলা সাধ্যাতীত। এ যাবৎ যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয়, বাঙ্গালায় মনসা-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদির মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থই সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হয়।* গত ৯০ বৎসরের মধ্যে ইহার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে প্রকাশক কবির রচনার উপর হস্তক্ষেপ তো করিয়াছেনই, অধিকন্তু তাঁহাদের সুবিধামত অংশবিশেষ, এমন কি পালা পর্য্যন্ত বাদ দিয়াছেন। এইসকল সংস্করণে কবির পরিচয় সংক্রান্ত যে অংশটুকু ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাই বটতলার প্রকাশকদের হাতে কবির রচনার কতটুকু সংস্কার হইয়াছে, তাহা না জানা পর্য্যন্ত কবির 'কাল-নির্ণয়'-সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না। তবে আলোচ্য গ্রন্থের রচনা রীতি ও ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করিলে কবি দেড়শত বৎসরের অনধিককাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না।

গ্রন্থ-সমালোচনা—সচরাচর অন্য কবিতে দৃষ্ট হয় না এমন কয়েকটী বৈশিষ্ট্য চৈতন্যদাস তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত ও অল্পপরিসর গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সতর্ক-শিল্পী। যাহা যখন বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা নিখুঁত করিয়াই বলিয়াছেন। তাঁহার পাঠকদের পক্ষে কোন প্রশ্ন করিবার সুযোগ রাখেন নাই। লখিন্দরের জন্ম-কাহিনী বলিতে বসিয়া, সে দিনে কি রাত্রে জন্মিয়াছে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দশ মাস দশ দিন যবে পূর্ণ হৈল।
অতি সুসন্তান এক প্রসব করিল॥

* ১৮৪৪, ইং ১৮৫৭ ইং, ১২৫১ বাং, ১২৫৭ বাং মুদ্রিত কেতকাদাসের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

রাত্রিতে ছেদিল নাড়ী সুন্দর সন্তান।" পৃঃ ৫

লখিন্দর ও বেহুলার বিবাহ সাব্যস্ত হইয়াছে, জ্যোতিষ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের প্রথমেই মনে জাগিবে পাত্র-পাত্রীর রাশি ও গণের মিল হইয়াছে কি না? কবি বলিতেছেন—

"বিছা রাশি নখিন্দর বৃষ যে বেহুলা।" পৃঃ ২৩

পাত্রের রাশির সপ্তমে কন্যার রাশি হওয়ায় "রাজ-যোটক" হইয়াছে।* কোন্ মাসের কোন্ তিথিতে কখন বিবাহ হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আষাঢ়েতে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।

গোধূলিতে বিভা হবে কহি তব স্থানে॥" পৃঃ ৩১

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুইটী হইতে কবির যে জ্যোতিষ-বিদ্যাও জানা ছিল, তাহা বুঝা যায়। লখিন্দর বিবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় পুরোহিত জনার্দ্দন বলিলেন—

"প্রজাপতি নাম বাছা করহ স্মরণ"

আমরা জানি, যাত্রাকালে "বামন" নাম লইতে হয়।† কিন্তু বিবাহকালে প্রজাপতির নাম লওয়ার বিধান আছে। সম্ভবতঃ বিবাহোপলক্ষে যাত্রা বলিয়া কবি প্রজাপতির নাম স্মরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও কবির সতর্কতার অন্ত নাই।

বংশীদাস প্রভৃতি কয়েকজনের মনসা-মঙ্গলে মনসার বিভিন্ন নামের তালিকা দৃষ্ট হয়। চৈতন্য দাসও মনসার ষোড়শ নামের‡ এক তালিকা দিয়াছেন; ইহা কেবল নামের তালিকা নহে, ইহা মনসার মাহাত্ম্য-প্রচারকও বটে। কবি মনসার বিভিন্ন নামকরণের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী উদ্ধৃত হইল—

(১) পাতালকুমারী [৩]

"পাতালকুমারী নাম পাতালেতে হৈলা"

(২) পদ্মকুমারী [৪]

"জন্মি পদ্মপত্রে পদ্মপত্রে জল পান।

পদ্মকুমারী নাম তেঁই সে আখ্যান॥"

(৩) বিষহরি [৫]

"শিবকণ্ঠ হৈতে বিষ উগারিযে ছিল।

সেই হেতু বিষহরি নাম মম হইল॥"

(৪) মুনিপত্নী [৯]

জরৎকারু পতি মোর মুনিপত্নী তেঁই।"

(৫) জগাতি [১২]

জগতজননী হেতু জগাতি প্রচারী॥"

(৬) বিষবিভাগিনী [১৫]

"বিষ বাটিয়া নাম যে বিষবিভাগিনী।"

কবি তাঁহার এই অল্পপরিসর রচনার মধ্যে মনসা ও নেতার জন্মবৃত্তান্ত, বেহুলা ও লখায়ের পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত, মনসার সহিত বিবাদের ফলে চাঁদের সপ্তডিঙ্গা-নিমজ্জন, ছয় পুত্রের মৃত্যু ও তাঁহার লাঞ্ছনার বিস্তৃত কাহিনী বলিবার অবকাশ পান নাই। অথচ এই সব কাহিনী মনসা-মঙ্গলের অপরিহার্য্য অংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার শ্রোতাদিগকে এই সব কাহিনী না বলিলে চলিবে কেন? কবি তাই এক নূতন ভঙ্গীতে অতি সংক্ষেপে এই সব কাহিনী শুনাইয়াছেন। সনকা ঝালুমালুর মায়ের নিকট মনসা-পূজার মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া নিজে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এমন সময়ে "নেড়া"র নিকট চাঁদ মনসা পূজার সংবাদ শুনিলেন। আর যায় কোথা – ক্রোধবশতঃ চাঁদ মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন—ইহাই চাঁদ-মনসার বিবাদের সূত্রপাত। সনকা ও চাঁদের মধ্যে মনসার মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া-

* যোটকবিচার। পৃঃ ৭৪

† "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥
* * *
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥"

‡ মনসা, কমলা, পাতালকুমারী, পদ্মকুমারী বিষহরি, ভুজঙ্গ-জননী, শিবদুহিতা, হরনন্দিনী, মুনিপত্নী, আস্তিকজননী, সঙ্কটনাশিনী, জগাতি, অসুর্য্যামনী, বিষবিনোদিনী, বিষবিভাগিনী, সিজুয়াবাসিনী।

ছিল, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে চাঁদ কর্ত্তৃক মনসার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রজক-ঘাটে ধোপিনী নেতার সহিত বেহুলার পরিচয় হইলে, নেতা বেহুলাকে প্রসঙ্গচ্ছলে মনসা ও তাহার জন্মকাহিনী বলিয়াছেন। চাঁদের নির্দ্দেশানুসারে লৌহ-কলাই পাক করিবার পূর্ব্বে, বেহুলা স্নান করিতে গেলে তাহার পায়ের জল ছদ্মবেশী মনসার গায়ে লাগিয়াছিল; মনসা সেই সময় বেহুলা বিবাহ-রাত্রিতে বিধবা হইবে বলিয়া শাপ দেন এবং প্রসঙ্গতঃ বেহুলা ও লখিন্দরের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। নিছনী নগরে সায় সদাগরের সহিত চাঁদ লখায়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করার সময়, ছয় পুত্রের মৃত্যু, সপ্ত ডিঙ্গা নিমজ্জন ও তাঁহার লাঞ্ছনার কাহিনী বলিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সনকা ও লখিন্দরকে গ্রন্থকার প্রথমাবধি মনসার সেবকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সনকা চিরদিনই মনসা-পূজার পক্ষপাতী। মনসা-পূজা লইয়া স্বামি-স্ত্রীতে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। গর্ভাবস্থায় মুখের অরুচির দরুণ সনকা—

"মনসার দ্রব্য আনি খাওয়াও আমারে।" পৃ ৪

বলিয়া ঝাণ্ডা দাসীকে আদেশ করিতেছেন। চাঁদ লখায়ের বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সনকা সর্ব্বাগ্রে মনসার পূজা দিতে বলিতেছেন। সনকার এই মনসা ভক্তি অপরাপর মনসা-মঙ্গলসমূহে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। লখায়ের শিশুখেলায়ও বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সকল বালকসহ মনসার মূর্ত্তি গড়িয়া লখাইকে পূজা করিতে দেখিতে পাই।

"কভু সবাকারে বলে শিশু নখিন্দর।
চল ভাই বিষহরি পূজিব সত্বর॥
শুনি যত শিশুগণ আনন্দে মগন।
মনসা মূরতি করে মাটিতে গঠন॥
মনসা স্থাপন করি মায়ের আসনে।
মৃত্তিকার সর্প বেড়ে আনন্দিত মনে॥
মৃত্তিকার দিব্য ঘট করিল স্থাপন।
মাটির ভুজঙ্গ চারি পাশে আচ্ছাদন॥
* *
চাঁদের তনয় বৈসে পূজা করিবারে।
ইচ্ছা মত পূজা করি পুষ্পাঞ্জলি পরে॥"

লখাইকে কেন্দ্র করিয়া সনকার যে বাৎসল্য-রস উৎসারিত হইয়াছিল, তাহার একটী অতি সুন্দর চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। মা স্নানে চলিয়াছেন, ছেলে মায়ের সঙ্গে স্নানে যাইবার বায়না ধরিল। মা কত নিষেধ করেন, কিন্তু সে কোন কথাই শুনিবে না, স্নানের ঘাটে গিয়া হয়তো জলে পড়িয়া লুটোপুটি খায়, আবার পরমুহূর্ত্তেই তীরে বসিয়া গায়ে মুখে কাদা মাখিয়া একাকার করিয়া বসে। মা অতি সাবধানে যাদুকে স্নান করাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন, কিন্তু কয়েক পা হাঁটিয়াই হয়তো সে মায়ের কোলে উঠিয়া বাড়ী যাইতে চায়। যাদুর আব্দার রাখিতে হয়। এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্যে মা ও সন্তানের চিত্রটী উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্র ছায়া-শীতল বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে আমরা বহুবার দেখিয়াছি, তাই তাহার মাধুর্য্য আমাদিগকে এত মুগ্ধ করে।

বাসরে লখিন্দর ও বেহুলার যে কথোপকথনের চিত্রটী কবি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহা অন্যান্য মনসা-মঙ্গল রচয়িতার চিত্র হইতে স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বেহুলা লখাইকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন, লখাই সেগুলির উত্তর দিতেছেন। বেহুলার প্রশ্নগুলি অনেকটা হেঁয়ালি-জাতীয়। এই জাতীয় হেঁয়ালির প্রচলন একসময় সমগ্র বাঙ্গালাতেই ছিল। বর্ত্তমানে ইহার প্রচলন বড় একটা নাই। বেহুলার একটী প্রশ্ন ও লখায়ের উত্তর উদ্ধৃত হইল—

প্রশ্ন—'ঘোর লাল হয় দেখে ঢুলয়ে নয়ন।
কহ হেন ছয় দ্রব্য নামের কথন॥"
উত্তর—"সিন্দুর জাবক কাঁচি আর তো হিঙ্গুল।
পক্কবিম্ব পক্ক আর ছয়ে জবাফুল॥" পৃ৫৭

মন্ত্রতন্ত্র ও তাহার শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারাও আলোচ্য গ্রন্থ হইতে কয়েকটী সংবাদ জানিতে পারিবেন। গারুড়ী, রামসার, ক্ষেতিসার প্রভৃতি মন্ত্রবলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ সমগ্র দেহ হইতে ক্ষতস্থলে আনীত হইত। বেহুলা এইসব মন্ত্র জানিতেন, বিবাহরাত্রে লখিন্দর যখন কালিনীনাগিনীর দংশনে অচেতন-প্রায়, তখন বেহুলা এইসব মন্ত্রদ্বারা বিষ ক্ষত-স্থানে আনয়ন করেন। কিন্তু মনসা চালনী মন্ত্রে বিষ সমস্ত দেহে ছড়াইয়া দিলা ধন্বন্তরি-মন্ত্রে তাহা কটিদেশে স্থাপন করেন—

"নখায়ের কটিতটে বিষ বন্ধ কৈল।"

এবার বেহুলা শত চেষ্টা করিয়াও বিষ নামাইতে পারিলেন না।

মনসা যেসব মন্ত্রে লখায়ের মৃতদেহের বিষ নষ্ট করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি এইসব স্থলে সাপ ও সাপের বিষকে অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। যে-সব প্রাণী সাপের শত্রু তাহারা বিষেরও শত্রু বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। বক, ময়ূর, গরুড় প্রভৃতি সাপের শত্রু, এইসব মন্ত্রে ইহাদিগকে বিষেরও শত্রু বলা হইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তন্মধ্যে মেয়েদের সতীত্ব ও পুরুষদের সত্যনিষ্ঠার বা সাধুতার প্রমাণস্বরূপ নানা প্রকারের পরীক্ষার উল্লেখ অন্যতম। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যসমূহে ইহার উল্লেখ বহু স্থলেই দৃষ্ট হয়। গোপীচন্দ্রের গানেও বহু পরীক্ষার উল্লেখ আছে। এইসব পরীক্ষা ভারতের প্রাচীন বিচারপদ্ধতির মধ্যে গণ্য। আলোচ্য গ্রন্থে এই জাতীয় বহু পরীক্ষার উল্লেখ পাইয়াছি। লৌহ তণ্ডুল পাকের কথা প্রায় সব মনসা-মঙ্গলেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ব্যতীত আলোচ্য গ্রন্থে এমন কয়েকটী পরীক্ষার উল্লেখ আছে, যাহা কিছুকাল পূর্ব্বে ঝাঁপানের সময় অনুষ্ঠিত হইত। শাণিত নরুণ ও ক্ষুরের উপর নৃত্য করা বা তীক্ষ্ণধার অসির উপর নৃত্য করার প্রথা সুপ্রাচীন। সর্পপরীক্ষা, চালনীতে জল-আনয়ন-পরীক্ষা, তুলাদণ্ড-পরীক্ষা, তপ্ত লৌহ-পরীক্ষা ও অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি আরও কয়েকটী পরীক্ষা বেহুলাকে দিতে হইয়াছিল।

পরীক্ষার আবার অনেক জাতিভেদ আছে। ভাবী নিদর্শন-পরীক্ষা তাহাদের অন্যতম। বেহুলা মৃত পতি লইয়া সাগরে ভাসিবেন, তাঁহার কোন সংবাদ শ্বশুর-শাশুড়ীর জানিবার সুযোগ হইবে না, এই অবস্থায় বেহুলা কয়েকটী নিদর্শন-পরীক্ষার উল্লেখ করিতেছেন।

"কড়ার তৈলেতে তুমি প্রদীপ জ্বালিবে।
সিদ্ধ করি সেই ধান্য বাসরে স্থাপিবে॥
ছয়মাস সেই তৈল দীপ যদি জ্বলে।
জিয়ার আমার পতি জানিবে অন্তরে॥
সিদ্ধ ধানে যবে মাতঃ হেরিবে অঙ্কুর।
সেই দিন প্রাণ পাবে ছয়টি ভাশুর॥
তিতির ময়ূর আঁকা রয়েছে বাসরে।
উড়িয়া যে দিন মাতঃ যাইবে অন্দরে॥
সপ্ততরী সেই দিন হইবে উদ্ধার।
নিবেদিনু সার কথা চরণে তোমার॥
ছয়মাস মধ্যে যদি এসব না ঘটে।
জানিবে বিপদ মম ঘটেছে ললাটে॥"

সমগ্র গ্রন্থখানি পয়ার ও ত্রিপদীতে পূর্ণ। উপমা, রূপক, যমক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে খুব বেশী নাই।

গ্রন্থের অসঙ্গতি—গ্রন্থকার চাঁদের চরিত্রটী অনেকস্থলে অহেতুক হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। চাঁদ-চরিত্রের নির্ভীকতা ও তাঁহার পৌরুষের প্রতি সামঞ্জস্য রাখিয়া গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কবি বহু-স্থলে চাঁদকে অত্যন্ত হীনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ কলার মান্দাসে করিয়া গাড়ুরের জলে ভাসাইবার

জন্য চাঁদ আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার ভৃত্য নেড়া মান্দাস প্রস্তুতের জন্য "মর্ত্তমান" কলার গাছ কাটিয়া আনিয়াছে—

"মর্ত্তমান গাছ দেখি চাঁদ সদাগর।
হাহাকার করি করে রোদন বিস্তর॥
বলে নেড়া কি করিলি কেন না সুধালি।
এ সাধের মর্ত্তমান কেন রে কাটিলি॥
বামরম্ভা ছিল কত কে করে গণন।
সে সব কদলি নাহি করিলি কর্ত্তন॥
একে আমি পুত্রশোকে হয়েছি কাতর।
বৃক্ষ কাটি দুঃখ দিলি তাহার উপর॥"

চাঁদের এই উক্তির সহিত তাঁহার শোকগ্রস্ত মনের কোন সামঞ্জস্য নাই, ইহাই বলিতে হইবে। কবির লেখায় বেহুলা-চরিত্রও তেমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, অসঙ্গতিই দৃষ্ট হয়। বেহুলা তাঁহার স্বামীকে লইয়া দেবপুরে যাইতে চান, চাঁদ অনুমতি দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি যে সতী, মৃতপতিকে "জিয়ান" যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, তাহার জন্য নানা পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। অগ্নি-পরীক্ষা তাহার অন্যতম। এই পরীক্ষাতেও যখন উত্তীর্ণ হইলেন, সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল —

"ধন্য ধন্য করে সবে সভার ভিতর॥
তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে বেণের নন্দন।
বেহুলারে অগ্নি হতে কৈল নিষ্কাশন॥
নাচিতে লাগিল সতী তুলি দুই কর।"

বেহুলার এই নৃত্য তো জয়ের নৃত্য নহে। ইহা অপ্রাসঙ্গিক।

উদ্বোধন

শ্রীরামেন্দু দত্ত

একি আনন্দ হে মোর স্রষ্টা,
একি এ আশীর্ব্বাদ!
অন্তরে দিয়ে সুখ অনন্ত
মিটা'লে আমার সাধ!

জনমে জনমে মরণের কূলে
যুগ যুগ ধরি' পড়িলাম ঢুলে,
এত দিনে কিগো শ্রবণে পশিল
আতুর-আর্ত্তনাদ?

কতদিন তব চবণ ছাড়িয়া
চলিয়া এসেছি ভেসে,
দেখেছি নূতন কত শত মুখ,
এসেছি কত না দেশে !

যখনি পবন বয়েছে মধুব
ফুটিয়াছে ফুল, উঠিয়াছে সুর,
মুগ্ধ হৃদয়ে পুলক বিভোল
অমনি উঠেছি হেসে।

কখনো এ চিত ছিল সুকুমাব,
গলিত পরেব দুখে,
বোগ-শোকাতুবে প্রেমেব আবেগে
চাপিযা ধ'বেছি বুকে।

কখনো আবাব সকলি ভুলিয়া
বৃথা গৌববে উঠেছি ফুলিয়া,
হেবেছি নিখিলে অবহেলা ভবা
ঘৃণা-সুকঠিন মুখে !

পাপে ও পুণ্যে কেটে গেছে দিন
ছিলাম তোমায় ভুলি'
আজি হৃদয়ের কোন্ বাতায়ন
কেমনে কে দিল খুলি'।

সেথা দিয়া পশি' দিব্য কিবণ
চকিতে হরিল সাবা প্রাণ মন,
ক্ষণিক পুণ্য-আলোকে হেবিনু
কত জমিয়াছে ধূলি !

ভ্রান্ত ধাবণা, নশ্বর মোহে
শান্তি ছিল না কিছু
উন্মাদ সম ছুটিতেছিলাম
অন্ধকারের পিছু—

কৃপা করি' তুমি মঙ্গলময়
দেখা দিলে যদি এমন সময়,
নিখিল-শরণ-চরণে রাখ গো
চিরতরে মাথা নীচু ॥

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃত পথ কি ?

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

পরমহংসদেবের আবির্ভাবের সময় হইতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের একটা প্রবৃত্তি মানব সমাজে জাগরূক হইয়াছে। আর এজন্য প্রায় সর্ব্বদেশেই নানারূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দেখা যাইতেছে। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃত পথ কি, এজন্য বিশেষ চিন্তা কয়জন ব্যক্তি করিয়া থাকেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। এস্থলে সমন্বয় অর্থ—বহুর মধ্যে একের সত্তা দর্শনদ্বারা বিরোধ পরিহার বুঝায়।

আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের তিনটী পথ আছে, একটী—একের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া; দ্বিতীয়—সকল ধর্ম্মেই সত্য লাভ হয়—অর্থাৎ যত মত তত পথ, এবং তৃতীয়—সকলের নিজ নিজ ধর্ম্মই সকলের ধর্ম্ম—এইরূপ জ্ঞান। দেখিতে পাই—এই তিনটী উপায়েই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্ভবপর, আর এই তিনটী উপায়ই স্মরণাতীতকাল হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এইবার দেখা যাউক—এই তিনটী উপায়ের প্রকৃতি কিরূপ? বলা বাহুল্য, ধর্ম্মসমন্বয় না হইলে জগতে জাতীয় সুখ শান্তি সুদুর্লভ হইয়া উঠে, জাতীয় সুখ শান্তি সম্ভব যদি হয় ত ইহাতেই হয়।

প্রথম উপায়টী যাহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন—তাঁহাদের এই সমন্বয়সাধনের প্রণালী—ছলে বলে কৌশলে অপরকে স্বধর্ম্মে আনয়ন অর্থাৎ এক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মগ্রহণ। যেমন খৃষ্টান ও মুসলমানগণ অপরকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়া থাকেন। বলপ্রয়োগটী বাদ দিলে আমাদের মধ্যেও এই প্রথম উপায়টী অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যেমন শাক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী বৌদ্ধ জৈন ও শিখ প্রভৃতি সমাজে দেখা যায়। ইঁহারা অপরকে স্বদলে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ না করিলেও ছল ও কৌশল যে অবলম্বন করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহারা ভাবেন—অপরকে কোনরূপে স্বধর্ম্মে আনিয়া একেবারে মিশিয়া গেলেই বিরোধ অন্তর্দ্ধান করিবে, সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে, তাহারও যথার্থ উপকারই করা হইবে। ধর্ম্ম ও তদনুসারী আচার ব্যবহার বেশভূষা প্রভৃতিই বিরোধের মূল, সেই বিরোধমূল অপনীত হইলেই সুখ শান্তি অবশ্যম্ভাবী। এস্থলে ধর্ম্ম বলিতে কর্ম্ম ও জ্ঞান, অর্থাৎ পূজা উপাসনা অনুষ্ঠান আচার ব্যবহাররূপ বহিরঙ্গসাধন এবং জ্ঞানরূপ অন্তরঙ্গ-সাধন উভয়ই বুঝায়। তন্মধ্যে বহিরঙ্গটী প্রধান, অন্তরঙ্গটী গৌণ বলা যায়।

দ্বিতীয় উপায়টী—সকল ধর্ম্মে চরম সত্য লাভ হয় বলিয়া সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, অথচ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান বুঝায়। ইহাতে অপরকে অন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আবশ্যকতা নাই, এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেও আপত্তি বা বাধা নাই। অথবা স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম্ম গ্রহণেও বাধা নাই। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক, পথই কেবল বিভিন্ন; কারণ, সকল মনুষ্যের চরিত্র, সকল মনুষ্যের সংস্কার, সকল মনুষ্যের শক্তি বিভিন্নই হইয়া থাকে। অধিকারিভেদে "যত মত তত পথ"—ইহাই এই দ্বিতীয় উপায়ের মূল মন্ত্র। এরূপ মনোভাব লইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলে অপরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারেনা, সুতরাং জগতে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে। এই দ্বিতীয় উপায়টীকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত

করা যায়। একটী মতে বলা হয়—সকল ধর্ম্মই সকলকে শেষ পর্য্যন্ত চরম সত্যে লইয়া যায়। যেমন রাজবাটীতে লোকে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি নানাপথ দিয়াই প্রবেশ করিতে পারে। অর্থাৎ সকল ধর্ম্মই শেষ পর্য্যন্ত সমান, কেহ উৎকৃষ্ট বা কেহ নিকৃষ্ট নহে। সকল অধিকারীকেই শেষ পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মই সেই চরম সত্যে উপনীত করিয়া দেয়। এমন কি অধিকারিভেদ থাকিলেও প্রত্যেক ধর্ম্মেই তদুপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। কোন ধর্ম্মই কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য বা কেবল মধ্যমাধিকারীর জন্য বা কেবল উত্তম অধিকারীর জন্য নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই অতি নিম্ন অধিকারীকে ধীরে ধীরে উচ্চাধিকারী করিয়া সেই চরম সত্যে উপনীত করে। কোন ধর্ম্মই কোন অধিকারীকে অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবার আবশ্যকতা আছে বলে না। এক কথায় সকল ধর্ম্মই সকল প্রকারেই সমান। এজন্য মহিম্নস্তোত্রের বচনটী স্মরণ করা যাইতে পারে—"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" অর্থাৎ নদী সমূহের পক্ষে সমুদ্রের ন্যায় তুমিই গম্য স্থল।

এই দ্বিতীয় উপায়ের মধ্যে অপর মতে বলা হয়—সেই সার সত্যে উপস্থিত হইবার একটী মাত্রই পথ, কিন্তু সেই পথে আসিবার জন্য আবার নানা পথ আছে। সুতরাং এই মতে সেই সার সত্যের সমগ্র পথটী এক দৃষ্টিতে একটী পথও বলা যায়, অথবা অন্য দৃষ্টিতে বহু পথও বলা যায়। অর্থাৎ প্রথমে পথ বহু থাকে, কিয়দ্দূর গিয়া সেই পথগুলি মিলিত হইয়া একটী মাত্র পথে পরিণত হয়। যেমন দার্জ্জিলিঙ্ যাইবার রেলপথ শিলিগুড়ি হইতে একটী পথ,কিন্তু সেই শিলিগুড়ি যাইবার একাধিক রেলপথ আছে, তদ্রূপ বলা যায়। এই বিষয়টী জ্ঞান ও ভক্তি-পথের বিচার স্থলে বেঙ্কটনাথ ব্রহ্মানন্দ-গিরি নামক গীতার টীকায় সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মতে জ্ঞান-পথই শেষ পথ, কিন্তু প্রথমে ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথ পৃথক্ই থাকে।

অতএব এই দ্বিতীয় উপায়টী দুই প্রকার হইল—লক্ষ্য পর্য্যন্ত নানা পথ, কিংবা লক্ষ্যস্থলের নিকট একটী পথ, কিন্তু সেই একটী পথে উপস্থিত হইবার জন্য আবার নানা পথ। "যত মত তত পথের" এই দুই প্রকার ভেদ থাকিতে পারে। এই দুইটী স্থলেও ধর্ম্ম বলিতে বহিরঙ্গসাধন পূজা উপাসনা আচার ব্যবহারাদি এবং অন্তরঙ্গসাধন জ্ঞান উভয়ই সমান ভাবে বুঝায়। কোনটী গৌণ কোনটী মুখ্য ইহা বুঝায় না।

তৃতীয় উপায়টী—লক্ষ্যস্থলে পহুছিবার একটী মাত্রই পথ, কিন্তু তাহাতে পূজা উপাসনা আচার ব্যবহাররূপ বহিরঙ্গসাধনগুলি গৌণপ্রয়োজন, এবং জ্ঞানরূপ অন্তরঙ্গসাধনটী মুখ্যপ্রয়োজন হয়। অর্থাৎ প্রথম উপায়টী কর্ম্ম বা উপাসনাপ্রধান এবং জ্ঞানটী গৌণ হয়, দ্বিতীয় উপায়টীতে উভয়ই সমান, এবং তৃতীয় উপায়টী জ্ঞানপ্রধান বা ভাবপ্রধান কর্ম্ম-উপাসনাদি অপ্রধান বা গৌণ। সুতরাং এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের এই তৃতীয় উপায়ে সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের আচার অংশ পালন করিবেন, কিন্তু মনে ভাবিবেন—এই সকল ধর্ম্মই আমারই ধর্ম্ম, অর্থাৎ আমারই ধর্ম্মের আকার বা প্রকারভেদ মাত্র। যেমন একই আত্মা নানা জীব ও জগতে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ একই ধর্ম্ম নানা ধর্ম্মরূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান উপাসনা গৌণ হয়, এবং একই ধর্ম্ম একই আত্মার ন্যায় বহুরূপ হইয়াছে, এই ভাবনা বা জ্ঞানই মুখ্য হয়। পিতামাতা যেমন নিজ বহু পুত্র কন্যাকে আমারই রূপ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সহিত নিজের বিরোধ অনুভব করে না, পুত্র কন্যাগণ পরস্পর বিরোধ করিলেও সেই বিরোধকে বিরোধ বলিয়া গণ্য করেন না, তদ্রূপ এই তৃতীয় উপায়ে যাঁহারা ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করেন, তাঁহারা সকল ধর্ম্মকেই আমার ধর্ম্মেরই রূপান্তর বলিয়া সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে

পরস্পরের বিরোধকে বিরোধ বলিয়াই গণ্য করেন না। তাঁহারা ভাবেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥" ৯।২৩

সুতরাং এই পথে সকল ধর্ম্মই আমার ধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া একটী সমন্বয় সাধিত হয়। এইভাবে একজন শৈব অপর শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য সৌরগণকে নিজ ধর্ম্মের উপাসক বলিয়া জ্ঞান করিবেন, একজন শাক্ত শৈবাদি অপর সকলকে নিজ ধর্ম্মের উপাসক বলিয়া জ্ঞান করিবেন, এইরূপ বৈষ্ণব ও সৌরাদি অপর সকলকে নিজ ধর্ম্মেরই উপাসক বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কেবল ইহাই নহে, ভক্ত যোগী জ্ঞানী ও কর্ম্মীও এইরূপ ভাবিবেন, বৌদ্ধ জৈন ক্রীশ্চান মুসলমানও এইরূপ ভাবিবেন, সকলেই ভাবিবেন—আমার ধর্ম্মই সকলে অনুষ্ঠান করিতেছেন, সকলের ধর্ম্মই আমার ধর্ম্মের রূপান্তর। আর ইহাতে অপরের ধর্ম্মের সঙ্গে আমার ধর্ম্মের ভেদ না থাকায় সকল ধর্ম্মেরই সমন্বয় সাধিত হইল। সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে আত্মপ্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা যায়।

বস্তুতঃ, ধর্ম্মসমন্বয়ের যত প্রকার উপায় বা কৌশল বা পদ্ধতি আছে বা হইতে পারে, তাহা এই তিন বা চারি প্রকার হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না, সকল প্রকার কৌশল বা উপায়কে এই তিন বা চারি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে উদারতা বা সার্ব্বভৌমিকতার মাত্রা বিবেচনা করিলে প্রথমটীকে তামসিক উপায়, দ্বিতীয়টীর মধ্যে প্রথমটীকে তমঃপ্রধান রাজসিক, দ্বিতীয় মধ্যে দ্বিতীয়টীকে সত্ত্বপ্রধান রাজসিক, এবং তৃতীয়টীকে সাত্ত্বিক উপায় বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। ফলতঃ এই তিন বা চারি প্রকার উপায়ভিন্ন ধর্ম্মসমন্বয়ের সম্ভাবনা ও কল্পনা করা যাইতে পারে না। সমন্বয়তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটী বা চারিটী উপায়ই পাওয়া যায়, এতদতিরিক্ত অন্য উপায় বোধহয় আর নাই বা হইতেই পারে না।

এখন এই তিনটী বা চারিটী উপায়ের প্রকৃতি যদি আরও বিচার করা যায়, তাহা হইলে কি পাওয়া যায়, দেখা যাউক। আমরা দেখিতে পাই—প্রথম উপায়টী যাঁহারা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্ত দ্বৈতবাদের অনুকূল, তাঁহারা দ্বৈতসিদ্ধান্তেই অভিনিবিষ্ট, কারণ তাঁহারা ভাবেন আমার ধর্ম্ম ভিন্ন অপরের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, প্রকৃত কল্যাণ আমার ধর্ম্মেই সম্ভব, অন্যত্র নহে, অপর সকলে আমার ধর্ম্মে আসুক, সুতরাং ইহাদের সমন্বয় দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক।

দ্বিতীয় উপায়টীর যাঁহারা প্রথমকল্প অবলম্বন করেন, অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত নানা পথ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের চিত্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল; তাঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তেই অভিনিবিষ্ট, কারণ, তাঁহারা লক্ষ্য এক বলিলেও লক্ষ্যবস্তুর দিগ্‌ভেদ স্বীকার করেন, রাজপ্রাসাদের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিকের নানা পথের ন্যায় সেই এক লক্ষ্যবস্তুরও নানাপ্রকার পথ স্বীকার করেন। সুতরাং এক লক্ষ্যের দিগ্‌-ভেদনিবন্ধন দিগ্‌বিশিষ্ট লক্ষ্যবস্তু হইল, আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হইল।

আর দ্বিতীয় উপায়টীর যাঁহারা দ্বিতীয় কল্প অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সমগ্র পথের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নানা পথ, কিন্তু তৎপরে লক্ষ্যের দ্বার পর্য্যন্ত একপথ স্বীকার করেন, তাঁহাদের চিত্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদেই অভিনিবিষ্ট; কারণ, তাঁহারা লক্ষ্য এক বলিলেও লক্ষ্য বস্তুর দিগ্‌ভেদ স্বীকার করেন, তবে লক্ষ্যবস্তুমধ্যে প্রবেশ দ্বারের নিকট পথকে একই পথ বলেন। এ জন্য লক্ষ্য বস্তুতে 'নানা দিক্' বিশেষণ না হইয়া একটী দিকই বিশেষণ, 'নানা দিক্' উপলক্ষণস্থানীয় হইয়া গেল। বিশেষণ ও উপলক্ষণে ভেদ এই যে, বিশেষণটী বিশেষ্যে নিত্য-

যুক্তই থাকে, আর উপলক্ষণটী নিত্যযুক্ত থাকে না। যেমন "ত্রিশূলযুক্ত মন্দির" বলিলে ত্রিশূলটী হয় বিশেষণ, এবং "যে মন্দিরে কাক বসিয়াছিল সেই মন্দির বলিলে" কাক হয় উপলক্ষণ। ফলতঃ দুই প্রকার দ্বিতীয় উপায়মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতভাবই প্রধানভাবে থাকে।

কিন্তু তৃতীয় উপায়টী অবলম্বন করিলে সকলেই ভাবিবে—আমার ধর্ম্মই সকলে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং বিরোধ নাই। এইভাবে ধর্ম্মসমন্বয় করিলে অদ্বৈতভাবেরই প্রাধান্য বুঝাইয়া থাকে। কারণ, ইহাতে নিজের ধর্ম্মেরই রূপান্তর অপরের ধর্ম্ম বলিয়া ভাবা হয়, সুতরাং ধর্ম্ম একটীই হইতেছে। ধর্ম্মের পক্ষে ইহাই অদ্বৈতবাদ। আর যাহা রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়াও নিজ রূপ অক্ষুণ্ণ রাখে তাহাই সত্য হয়, তাহার রূপান্তরগুলিই মিথ্যা হয়। বাস্তবিক অদ্বৈতবাদে ইহাই বলা হয় যে, এক আত্মাই বহুরূপ হইয়াও তেমন একরূপই থাকে, রূপান্তরপ্রতীতিকালের পূর্ব্ববৎই থাকে, যেমন রজ্জুতে সর্পদর্শনকালেও রজ্জু রজ্জুই থাকে, ক্ষণকালের জন্যও সর্প হয় না। অতএব আমার ধর্ম্মই অপর সকলের ধর্ম্মের আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে—ভাবিলে একমাত্র আমার ধর্ম্মই সত্য হইল, আর সকলের ধর্ম্মের প্রাতীতিক সত্তাই সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ মিথ্যাই হইল কিন্তু তাহার উপযোগিতা অস্বীকার করা হইল না। সুতরাং বিরোধ আর কোথায় থাকিল? ধর্ম্মসম্বন্ধে অদ্বৈতভাবই সিদ্ধ হইল।

এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল - ধর্ম্মসমন্বয় করিতে হইলে তিনটী পথ আছে; একটী অন্য ধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া একটী ধর্ম্ম স্থাপন, দ্বিতীয়—সর্ব্বধর্ম্ম সংরক্ষণ ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান এবং তৃতীয়—একই ধর্ম্ম আছে, অন্য ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বা নাই এই জ্ঞান করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহাদের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ, এবং দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেষ্ঠ। প্রথমটীতে অন্যকে স্বমতে আনিয়া অন্যের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা হয়, দ্বিতীয়টীতে আমি ও অন্য উভয় থাকিয়া পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা হয়, এবং তৃতীয়টীতে আমিই সব বলিয়া অপরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং প্রেমের মাত্রা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। আর আমার নিজকে আমি যত ভালবাসি এত অপরকে ভালবাসি না বলিয়া এই তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হয়, ইহাই বলিতে হয়। সুতরাং ইহাতেই সমন্বয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল—এই তিনটী উপায়ের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ।

এখন দেখা যাউক—পরমসমন্বয়াচার্য্য পরমহংস-দেব কোন্ পথটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে প্রথমটী উপদেশ করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। অপরকে নিজের ধর্ম্মে আনিয়া ধর্ম্মবিরোধ দূর করিতে তিনি উপদেশ দেন নাই। তাঁহার উপদেশ 'যত মত তত পথ' ইহাই প্রসিদ্ধ। তিনি ঠিক্ এই ভাষাটী উচ্চারণ না করিলেও এই অর্থই তাঁহার কথার অভিপ্রায়—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, দেখিতেছি কেহ কেহ বলিতেছেন তিনি "যত মত তত পথ" এই শব্দগুলি ঠিক্ ওভাবে ব্যবহার করেন নাই। তবে তাঁহার কথার অভিপ্রায় তাহাই, পরে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এইরূপ ভাষাটী রচনা করিয়াছেন। যাহাহউক, এই প্রভেদে কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

আমরা দেখিতে পাই, দ্বিতীয় পন্থাটী তাঁহার নামে প্রচলিত হইলেও তৃতীয় পন্থাই তাঁহার হৃদ্গত ভাব। কারণ, বলা হয়, তিনি মায়ের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সকল ধর্ম্ম-মতেরই অনুষ্ঠান করিয়া সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য যে একই, ইহা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিয়া সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অদ্বৈতবাদী ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। ইহার কারণ, প্রথমতঃ

যিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার আর অন্য কোন সাধন অপেক্ষিত হয় না। যে কোন ধর্ম্মে যদি "যথার্থ সিদ্ধিলাভ" হয়, তাহা হইলে সেই সিদ্ধপুরুষের জ্ঞাতব্য আর অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিলে আর যথার্থ সিদ্ধি লাভ হয় না। পর্ব্বত শিখরে উঠিবার পাঁচটী পথ থাকিলে একপথ দিয়া যদি কেহ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য সকল পথ তাহার তখন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সে পথে শিখরে উঠা যায় কিনা, তাহা আর তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তিনি যখন সকল মতেই সাধন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট পথের বিশেষত্ব আর ছিল না, ভালমন্দ সব একই হইয়া গিয়াছিল —ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সকল বিশেষত্ব কিসে নষ্ট হয়? তাহা হইলে বলিতে হইবে—যে ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ বস্তুলাভ করিয়াছেন, যাঁহারই নিকট সকল বিশেষ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, তিনিই লোকশিক্ষারূপ লোক-প্রারব্ধ অনুসারে তাহাই করিয়া থাকেন, জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ ভোগ করেন, কোন প্রতিকার করেন না। বামদেব যেমন নীরবে মান্ধাতার পাল্কী বহন করিয়াছিলেন, তদ্রূপই জ্ঞানিগণ পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ ভোগ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ম্মাচরণ, তাহা, জীবসমষ্টিরূপ যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বররূপের তিনি অবতার বলিয়া তাঁহার ব্যষ্টিরূপ যে জীব, সেই জীবপ্রারব্ধই তাঁহার কর্ম্মাচরণের হেতু হইয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। ৩৷২২

অর্থাৎ আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছুই নাই তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। অতএব পরমহংস-দেবের "যত মত তত পথের" উপদেশ তৃতীয় প্রকার সমন্বয় পন্থাবলম্বনেই উপদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, তিনি সিদ্ধিলাভের পর অন্য ধর্ম্মানুসারে সাধন করিয়াছিলেন। আর সিদ্ধের অবশিষ্ট কিছুই থাকে না বলিয়া, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যায় বলিয়া, ইহা তাঁহার ব্যষ্টিভূত লোক সকলের প্রারব্ধজন্য লোকশিক্ষা মাত্র। পরমহংসদেবের উক্ত "যত মত তত পথের" এই জাতীয় ব্যাখ্যা তত প্রবল নহে, দেখা যায়, উহার ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় উপায়ের প্রথম কল্পের উপরই জোর দেওয়া হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এইটীই পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব বলিতে বাধ্য হইতে হয়। তাঁহার অপর ধর্ম্মমতের সাধনের অনুষ্ঠান লোকশিক্ষার নিমিত্ত, নচেৎ তাঁহার সিদ্ধির পূর্ণতা সাধনের জন্য নহে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিদ্ধি হইলে আর সংশয় বিপর্য্যয় থাকে না, কোন অপূর্ণতাই থাকে না। সংশয় বিপর্য্যয় লেশমাত্র থাকিলেও তাহা আর সিদ্ধি নহে। অতএব

"মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্॥" ৪৷১১

এই ভাবটীই তাঁহার লোকশিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল, ইহাই বলিতে হয়—এইটীই তাঁহার ভাব বলিতে হইবে, আর তাহা হইলে তাঁহার কৃত ধর্ম্মসমন্বয় পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পথেই ধর্ম্মসমন্বয়, অন্য উপায়ে নহে—ইহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ সকলেই ভাবিবে সকল ধর্ম্মই আমারই ধর্ম্মের রূপভেদ-মাত্র, অতএব এইভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ। ইহাতেই সর্ব্ববিরোধ অন্তর্হিত হয়।

তাহার পর দ্বিতীয় উপায়ে যে ধর্ম্মসমন্বয়, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ, তাহা সম্পূর্ণরূপ সমন্বয় নহে, যেহেতু লক্ষ্যসম্বন্ধেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখা যায়। লক্ষ্যবিষয়ে অদ্বৈতবাদীর যে সিদ্ধান্ত, তাহা দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত নহে, এবং তাঁহাদের যে সিদ্ধান্ত, তাহা অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত নহে। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, ক্রিশ্চান-

দেরও লক্ষ্যবিষয়ে যে সিদ্ধান্ত, তাহা পরস্পর বিভিন্ন। সকলের ঈশ্বরই সমানলক্ষণাক্রান্ত নহেন। অতএব পরমহংসদেব বৈদিক পথে মায়েব উপাসনা করিয়া যে চরম সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা কিন্তু অন্য মতে লভ্য হয়—এ কথা তিনি বলিতে পারেন না—যে পথে কাশী যাওয়া যায়, সে পথে কি কাঞ্চী যাওয়া যায় না? অতএব লক্ষ্যভেদ হওয়ায় সকল ধর্ম্ম একই স্থানে লইয়া যায় ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তবে সকল ধর্ম্মই নিজ নিজ লক্ষ্যে সাধককে উপনীত করে—ইহা বলা যায়। সুতরাং উক্ত দ্বিতীয় বা প্রথম উপায়ে ধর্ম্মসমন্বয় সম্পূর্ণ হয় না।

তবে যদি বলা যায়—সকল ধর্ম্মই কিয়দ্দূর অগ্রসর করিয়া দেয়, পরে ভগবান্ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দেন। যথা নৃসিংহ তাপনীয়োপনিষদে—

"স্ত্রীপুংসোর্ব্বা স ইহৈব স্থাতুম্ অপেক্ষতে স সর্ব্বৈশ্বর্য্যং দদাতি, যত্র কুত্রাপি ম্রিয়তে দেহান্তে দেবঃ পরংব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে, যেন অসৌ অমৃতী ভূত্বা সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি।" (নৃঃ উঃ পূঃ ১)

গীতায় আছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি
শাশ্বতম্। ১৮।৬২

সুতরাং সকল ধর্ম্মের ভগবানই তাঁহার ভক্তকে লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য সহায়তা করেন। সকলের ভগবান্ বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইলেও জগৎকারণ, জগন্নিয়ন্তা জগদ্বিধাতা অংশে মতভেদ না থাকায় সকলের ভগবানের মধ্যে কেবলই ভেদ থাকিল না, সকলের ভগবানে একটী সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়; আর সেই সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত ভগবানই তাঁহার ভক্তগণকে যথার্থ লক্ষ্যস্থলে যাইবার উপদেশ দেন ও সেই উপদেশবলে সকলেই সেই চরমসত্যলাভে সমর্থ হয়। সুতরাং জগৎকারণ ভগবচ্ছরণই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উপায়। কোনও মূর্ত্তি-বিশেষ, কোনও গুণ বা শক্তিবিশেষ উক্ত ভগবানে আরোপ না করিয়া কেবল ঈশ্বর বা ভগবান্—এই জ্ঞানে তাঁহার শরণাগতিই প্রকৃত ধর্ম্মসমন্বয়ের পথ। আর তজ্জন্য এই পথটী ধর্ম্মসমন্বয়ে দ্বিতীয় প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথম কল্পই বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেই সেই চরম সত্য লাভ হইতে পারে—এই জ্ঞানে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃষ্ট পথ, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—না তাহা নহে. ভগবান্ যখন শেষকালে একটী পথ দেখাইয়া দেন, ইহা স্বীকার্য্য, তখন ভগবৎপ্রদর্শিত পথটীই আসল পথ, আর অন্যগুলি পথের পথমাত্র, বা উপপথ মাত্র। বস্তুতঃ এক অদ্বৈততত্ত্ব ভিন্ন অর্থাৎ দ্বৈতের মিথ্যাত্বসহকারে অদ্বৈতের সত্যতা ভিন্ন চরমসত্যে উপনীত হওয়া যায় না—ইহাই শেষ ও একমাত্র পথ, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতের মিথ্যাত্ব ভিন্ন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্পূর্ণরূপে পাবে না। সেই চরম লক্ষ্যের সেই ভগবৎপ্রদর্শিত একটী পথ ভিন্ন আর কোন পথই নাই, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সকল মতবাদগুলিই সেই অদ্বৈত পথের পক্ষে উপপথ, অন্য সকল পথই অদ্বৈত পথে মিলিত হইয়া থাকে। উপনিষদের বাক্যে বলিতে হইবে—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ শ্বেঃ উঃ ৩।৮

তাঁহাকে জানিয়া অতিমৃত্যু লাভ হয়, অন্য পথ আর নাই। অতএব পরমহংসদেবের "যত মত তত পথ" পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় উপায়। তাহাই অদ্বৈত পথ। গীতাতেও এই কথা আছে—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমাম্॥ ৯।২৫
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

সুতরাং এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, নানা পথ থাকিলেও একটী সাধারণ পথও আছে। অন্য সকল পথ পরিণামে একই পথে মিলিত হয়। সেইটীই সাধারণ পথ। ইহাই সেই অদ্বৈত পথ। অন্য সব পথ মিলিত হইবার পর এই পথ বলিয়া ইহার ন্যায় আর অন্য পথ নাই, আর তজ্জন্য ইহাকে অদ্বৈত পথ বলা হয়। যদি অন্য পথ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহা মিথ্যাই হইয়া যাইবে। এই অদ্বৈত পথে আরূঢ় হইবার জন্য বহু পথ আছে। সেই সমস্ত পথের সঙ্গে অন্য উপপথগুলি মিশিয়া যে বহু পথের কল্পনা করা যায়, সেই সকল উপপথকে লক্ষ্য করিয়াই "যত মত তত পথ" বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই উপপথের পর যে পথ তাহা একই পথ, তাহা সেই জীবব্রহ্মৈক্যবোধরূপ একটী মাত্র পথ, তাহাই অদ্বৈতবাদীর পথ। বস্তুতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে নানা পথ ও একটী পথ এই দ্বিবিধ নির্দ্দেশের সার্থকতা থাকে না, তাহাই পরমহংসদেবের লক্ষিত পথ। যথার্থ ধর্ম্মসমন্বয় এই পথেই সম্ভব, অন্য পথে তাহা কখনই যথার্থ সমন্বয় নহে, তাহা আপাত সমন্বয় বটে। ভেদ থাকিলে সমন্বয় পূর্ণ হয় না, ভেদে মিথ্যা জ্ঞান করিলেই যথার্থ সমন্বয় হয়। উপধেয় সত্য, উপাধি মিথ্যা—না বলিলে সমন্বয় অসম্ভব। শরীরে ভেদ, আত্মায় ভেদ নাই—না-বলিলে সমন্বয় অসম্ভব। আমিই সব, সবই আমার রূপ, সবই আমার কল্পনা, সবই আমাতে আশ্রিত—না-বলিলে সবকে আমার মত সত্য জ্ঞান করিলে, সবই সত্য সত্য আমা হইতে ভিন্ন ও সমসত্তাক বলিলে তাহাতে কখনই পূর্ণরূপে ভালবাসা হয় না, সুতরাং সমন্বয়ও হয় না। আমি আমাকে যেরূপ ভালবাসি সেরূপ অপরকে ভালবাসিতে পারি না। স্ত্রী-পুত্রাদিকে যে ভাবে ভালবাসি, সেভাবে ভালবাসিতে পারি, কিন্তু আমি আমার নিজেকে যেভাবে ভালবাসি, স্ত্রীপুত্রাদিকে সেভাবে ভালবাসিতে পারি না, এজন্য সত্যতানির্দ্দেশ দ্বারা যে সমন্বয়, অথবা ভালবাসার দ্বারা যে ধর্ম্মসমন্বয় তাহাই প্রকৃত সমন্বয়। আর এই সমন্বয়ই পরমহংসদেব প্রদর্শন করিয়াছেন।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে পরমহংসদেবের অভিপ্রেত ধর্ম্মসমন্বয়ের অর্থ—ধর্ম্মসমন্বয়ের পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় উপায়টী কি করিয়া বলা যায়? কারণ, দ্বৈতাদি মতবাদগুলি অদ্বৈত মতবাদের উপপথ বলা হইল, যেহেতু অন্য সকল মতই অদ্বৈত পথে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে বলা হইল। বস্তুতঃ অন্য সকল পথ আসিয়া ভগবৎপ্রদর্শিত পথে মিলিয়া একটী পথ হইলে তাহাত পূর্ব্বপ্রদর্শিত উপায় তিনটীর মধ্যে দ্বিতীয় উপায়ের দ্বিতীয় কল্পেই হইয়া গেল? অতএব আমার ধর্ম্মই সকলে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে—এই প্রকার ভাবনাকে ধর্ম্মসমন্বয়ের তৃতীয় উপায় যে বলা হইয়াছিল, তাহাই পরমহংসদেবের অভীষ্ট কি করিয়া বলা যায়?

তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় উপায়ের দ্বিতীয় কল্পটীর সহিত তৃতীয় উপায়ের কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। দ্বিতীয় উপায়ের দ্বিতীয় কল্পে সকল পথই সত্য, তবে তাহারা শেষে একটী পথে মিলিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা উপপথ—এইরূপ ভাবনা করিবার উপদেশ আছে, সেই মিলিত পথ পরিশেষে ভগবানই প্রদর্শন করেন, অথবা শাস্ত্রই বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু তৃতীয় উপায়ে প্রথম হইতেই অন্য পথের স্বাতন্ত্র্যকে মিথ্যা বলা হয়; কারণ, ইহাতে মনে করা হয়—সকল ধর্ম্মই আমার ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। বস্তুতঃ এক নিত্য বস্তুর রূপান্তরতাই মিথ্যাত্ব। অতএব দ্বিতীয় উপায়ের দ্বিতীয় কল্পের সহিত তৃতীয় উপায়ের

প্রভেদ বর্তমান। পরমহংসদেব সিদ্ধিলাভের পর অন্য ধর্মের সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ধর্মসমন্বয়ের পথটী পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় উপায়ই বলিতে হয়। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে তিনি এইরূপ পথ প্রদর্শন করিলে ইহাকে দ্বিতীয় উপায়ের দ্বিতীয় কল্প বলিতে হইত। অতএব তাঁহার "যত মত তত পথ" উপদেশের অর্থ—নিজ ধর্মই অপরে রূপান্তরে সাধন করিতেছে এই ভাবিয়া স্বধর্মানুষ্ঠানে সকলের প্রতি প্রেম প্রদর্শন বুঝায়।

কেহ হয়ত বলিবেন আমিই যদি সব হয়, সবই যদি আমার কল্পনা হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা বস্তুর প্রতি ভালবাসা কিরূপে হইবে? মিথ্যা বস্তুকে কি কেহ ভালবাসে? সুতরাং এভাবে ধর্মসমন্বয় কি করিয়া হইবে?

সত্য, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এ সন্দেহ থাকিবে না। মিথ্যাকে যখন আমরা দেখি, তখন সত্য বলিয়াই দেখি, বিচারে মিথ্যা বলিয়া বুঝি। মিথ্যা বলিয়া দেখিলে অন্য কিছুই দেখা যায় না, সুতরাং তখন ভালবাসা থাকে না, কিন্তু অন্য কিছু দেখিলে তাহাতে সংস্কারবশে সত্য বোধ হয় বলিয়া তখনই ভালবাসার কথা উঠে। নচেৎ আনন্দস্বরূপ বস্তু কাহাকে ভালবাসিবে, কাহাকে পাইয়া আর আনন্দ করিবে? ভালবাসা যতক্ষণ সম্ভব হয়, ততক্ষণ যে ভালবাসা, তাহা সবই আমার রূপ বলিলে যেমনটী হয়, সবই আমার অঙ্গ বা সবই আমা হইতে ভিন্ন বলিলে সেরূপ হয় না। অদ্বৈত অভ্যাসকালেই এই ভালবাসার কথা সঙ্গত হয়, অদ্বৈত হইলে আর ভালবাসা থাকে না। অতএব অদ্বৈতবাদীই অপরকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতে পারেন। অদ্বৈতবাদীই সর্ব্বধর্ম্মই আমার ধর্মের রূপ বলিয়া সকল ধর্মের মধ্যে একতাসূত্র দেখিতে পান এবং অপরকেও নির্দ্দেশ করিতে পারেন। এজন্য ধর্মবিরোধ সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদীর নিকটেই অন্তর্হিত হইবার কথা। ইহাই ধর্মসমন্বয়ের তৃতীয় উপায়। পরমহংসদেব এই ভাবেই "যত মত তত পথ" বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। অতএব যুক্তির দ্বারা এবং তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃত পথ সকলই আমার রূপ, সকল ধর্মই আমার ধর্মের রূপভেদ—এই জ্ঞানে স্বধর্মানুষ্ঠান। দ্বিতীয় উপায়েও সমন্বয় হয়, অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেই সত্য লাভ হয়, সকল ধর্ম্মদ্বারা যে অবস্থা হয়, সে অবস্থায় ভগবানই পথকে দেখাইয়া দেন ইত্যাদি ভাবে যে সমন্বয়, তাহা এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট উপায়। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পরমহংসদেব সিদ্ধিলাভের পর সকল ধর্ম্মের সাধন করিয়া আবার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এই কথায় তৃতীয় উপায়টী পরমহংসদেবের অভিপ্রেত ধর্ম সমন্বয়ের পথ।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে—একজন অপরের ধর্ম্মকে কি করিয়া আমারই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে? একজন হিন্দু কি ক্রিশ্চান ও মুসলমানের ধর্ম্মকে তাহার নিজের ধর্ম্মের প্রকারভেদ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে, তদ্রূপ একজন ক্রিশ্চান ও মুসলমান কি হিন্দুধর্ম্মকে তাহার নিজের ধর্ম্মের প্রকারভেদ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে? যাহাদের মধ্যে এত বিরোধ যে দেশময় অশান্তির বহ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত হইয়াই রহিয়াছে, তাহাদের সে বিরোধ কি অপনীত করা যায়?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহা শিক্ষা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে। বিচার করিলে যখন এক আত্মারই বিলাস এই জীব জগৎ বলিয়া নিশ্চিত হয়, এক আত্মা ভিন্ন সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অন্য কথায় যখন সকলই আমাতে কল্পিত, আমার সত্তা ও জ্ঞানে যখন যাবদ্ দৃশ্যপ্রপঞ্চের সত্তা ও জ্ঞান বলিয়া সিদ্ধ হয়, তখন যে ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের মনে এই ভাবের প্রবাহ উৎপন্ন হইতে পারে, সেই ধর্ম্মেরই রূপান্তর অপরের ধর্ম্ম ইহা কি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না? এই ভাবের দৃঢ়নিশ্চয় হইলেই অপরের ধর্ম্ম আমারই ধর্ম্মের বিবর্ত্ত বা রূপান্তর বলিতে কোন বাধাই হইতে পারে না। অবশ্য এই দৃঢ়নিশ্চয়টী অতি সুদৃঢ় নিশ্চয়রূপ হওয়া আবশ্যক। যেমন দুই আর দুই মিলিত করিয়া চারি হয়, পাঁচ বা ছয় কখনই হয় না—ইহা একটী সুদৃঢ় নিশ্চয়, লোকে যতরূপই বোঝাক না, তাহা কাহারো হৃদয়ে স্থান পায় না, পুনঃ পুনঃ বেদান্তবিচারদ্বারা এই সমুদায় দৃশ্য আমাতেই কল্পিত, সুতরাং ইহারা মিথ্যা, ইহাও তদ্রূপ সুদৃঢ় নিশ্চয় হয়, পুনঃ পুনঃ বিচারের ফলে নিশ্চয়টী প্রত্যক্ষজ্ঞানের ন্যায় সুদৃঢ় হয়। শাস্ত্রে ইহাকেই পরম তপস্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন ঘটপটাদি দেখিবামাত্র তাহাতে

সত্য বোধ অজ্ঞাতসারে উদিত হয়, এই বিচারাভ্যাস দ্বারা তদ্রূপ সেই ঘটপটাদিই দেখিবামাত্র মিথ্যা বা আমাতে কল্পিত বলিয়া আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে। এই বিচারের নামই মনন। ইহার দ্বারাও যাহাদের নিশ্চয় সুদৃঢ় হয় না, প্রত্যক্ষবৎ হয় না, তাহাদের জন্য নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের উপদেশ। ইহার ফলে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান অবশ্যই হইয়া থাকে। অতএব এই বিচার ও ধ্যান যাঁহারা অভ্যাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে আমার ধর্ম্মই অপর সকলের ধর্ম্ম বলিতে কোন দ্বিধা বা সংকোচ বোধ হইতে পারে না। অবশ্য হিন্দু যেমন ইহা সহজেই বেদান্তবিচারদ্বারা সাধন করিতে পারেন, ক্রিশ্চান মুসলমান প্রভৃতিও তাহা করিতে পারেন। কারণ, বিচারে সকলেরই অধিকার আছে। মুসলমানগণের মধ্যে সুফিধর্ম্মে এই ভাবেরই সাধন আছে, ক্রিশ্চান প্রভৃতি অপর ধর্ম্মেরও সম্প্রদায়বিশেষে এই ভাবের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বিচারশীল প্রকৃতির পক্ষে এইরূপ নিশ্চয় লাভ করা দুরূহ নহে। বস্তুতঃ এই বিচারবলেই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে পূজিত হন, এই বিচারবলেই বহু আমেরিকাবাসী তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং বহু তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন। এই বিচারবলেই বৌদ্ধগণ এক সময়ে চীন হুন তাতার এবং ভারতে বৈদিকগণকে বৌদ্ধ করিয়াছিল, আবার পরবর্ত্তী সময়ে হিন্দুগণ বৌদ্ধগণকে হিন্দু করিয়াছিল, বহু বৌদ্ধ আজকাল শূন্য ও বিজ্ঞানবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করিতেছেন, বুদ্ধের শূন্যকে সৎ ও বিজ্ঞানকে প্রকারান্তরে স্থির বলিতেছেন। তাহাও এই বিচারের প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিচার সকল জাতির সম্পত্তি, সকল মানবের আদরের বস্তু। অতএব বিচারদ্বারা যে যতই বিরুদ্ধবাদী হউন, একদিন তাঁহাকে সত্যের পথে আনিতে পারাই যায়। অতএব আমার ধর্ম্মই অপরে অন্য আকারে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, অপরের ধর্ম্ম আমার ধর্ম্মেরই রূপান্তর, ইহা অসম্ভব অভ্যাস নহে। অতএব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এই পথ বা এই আদর্শকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা বৃথা চেষ্টা নহে। ইহার অল্পও মহোপকার করিয়া থাকে। ভগবান বলিয়াছেন—(গীতা ২।৪০)

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

সুতরাং অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্ভব হয়, অন্য সিদ্ধান্ত দ্বারা এই পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় সম্ভবপর হয় না। অতএব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলমন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ উপায়, নিজের নিষ্ঠার ধর্ম্মকেই অপরেরও ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করা, অপরের ধর্ম্মকে নিজ নিজ ধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া জ্ঞান করা। অতএব ধর্ম্মসমন্বয়ের তৃতীয় উপায়টীই প্রকৃত উপায় বা প্রকৃত পথ, আর তাহাই সমন্বয়াচার্য্য পরমহংসদেবের উপদেশ।

যদি বলা যায়, লক্ষ্য বস্তুকে অলৌকিক বলিবার আবশ্যকতা কি? উহাকে লৌকিক বলিলে কি দোষ হয়? শাস্ত্রের ব্যর্থতাহেতু লক্ষ্যকে অলৌকিক বলিব কেন? তাহা হইলে বলিব—লক্ষ্যকে যদি লৌকিক বলা যায়, তাহা হইলে সেই লক্ষ্যবস্তু আর নিত্য হইতে পারেন না, তাহা আর অবিকার অবিনশ্বর বলিতে পারা যায় না। কারণ, এই দৃশ্যমান লৌকিক জগৎ যাহা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহাও তাহা হইলে এই জগতের ন্যায় অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর ও বিকারী হইতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ যে লক্ষ্য অনিত্য বিনশ্বর তাহাকে লক্ষ্য বলিয়া লাভ কি? এরূপ বস্তুকে লক্ষ্য বলিলে সংসারের স্ত্রীপুত্র ধনৈশ্বর্য্য কি দোষ করিল? অতএব আমাদের লক্ষ্য নিত্য অবিকারী সুতরাং অলৌকিক হওয়া আবশ্যক। বস্তু না থাকিলে আকাংক্ষা হইবে কেন? এই সর্ব্বজীবসাধারণ আকাংক্ষার অনুরোধেও আমাদের লক্ষ্য অলৌকিক হওয়া আবশ্যক।

বস্তুতঃ পরমহংসদেবের যে উপদেশ তাহা সবই বিচারসঙ্গত ও শাস্ত্রসঙ্গতই ছিল। এইজন্যই সকলে তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিত, স্বামিজীর কথাও জগদ্বাসী গ্রহণ করিত। এ সকলই বিচারমূলকতার ফল। অতএব বিচার দ্বারা ধর্ম্মসমন্বয় অসম্ভব নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, এই বিচার মৌখিক বা পণ্ডিত্য মাত্র হইলে কোন ফল হইবে না। বিচারানুযায়ী জীবন হওয়া চাই। অর্থাৎ তপস্যা ও বিচার এক সঙ্গে থাকা চাই। অতএব ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠতম পথ নিজের ধর্ম্মেরই রূপ অপরের ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান। সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মপালন।*

* এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় বিচার সাপেক্ষ। উঃ সঃ

নালন্দা ও রাজগীর

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

সেদিন ভোরের গাড়ীতেই সম্রাট অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) হতে রওনা হলাম—নালন্দা ও রাজগীর দেখবার জন্য। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত আশার সফলতার আভাস পেয়ে প্রাণে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের অবধি নাই। পাটনা হতে মাত্র দু একটী ষ্টেশন পরই আমরা নেমে পড়লাম বক্তিয়ারপুর জংশনে। নালন্দার দিকে যেতে হলে এখান থেকেই গাড়ী বদল করতে হয়। বিহার লাইট রেলওয়ের ছোট একটী রেল লাইন এখান হতে ভিন্ন পথে নালন্দা হয়ে রাজগীর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রত্যহই গাড়ী দু তিনবার করে আসা যাওয়া করে। পাটনা হতে নালন্দা রাজগীর মাত্র ছ'সাত ঘণ্টার পথ।

আমরা এখান থেকে সেই ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠলাম। একটু পরেই গাড়ী তার কর্কশ বংশীধ্বনি করে ছোট ইঞ্জিনের কালো চিম্‌নী থেকে ধূসর ধোঁয়া আকাশের গায় ছড়িয়ে দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে আমাদের নিয়ে চলল। প্রান্তরের মাঝদিয়ে ধূলিভরা পথটীর পাশ দিয়ে, গ্রাম্য পল্লীর সামনে দিয়ে এঁকে বেঁকে দোল দিতে দিতে গাড়ী চলছে। তার গতিশক্তি এত ক্ষীণ যে কোন লোক দৌড়ে এসে অতি সহজেই চলন্ত গাড়ীতে উঠতে পারে। মাঝে মাঝে আঁতকে উঠছি, মনে ভয় হচ্ছে যেন গাড়ীখানা উল্টে যাবে। চারদিকে বিহারের নীরব পল্লিশ্রীর শান্ত সৌন্দর্য্য—মাঠে মাঠে মকাই ভুট্টা গমের ক্ষেতের সবুজ শ্যামলিমা ছড়িয়ে আছে। দূরে ঐ প্রান্তরের গা থেকে নিস্তব্ধ গম্ভীর কালো পাহাড়ের সারি আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও লাইনের ধারে ফণিমনসার বন দেখা যাচ্ছে। গাড়ী এসে বিহারসরিফে থামল। এটী এদিককার একটী বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, পাটনা জেলার বিহার মহকুমার সদর। এখানে অফিস বাজার স্কুল পোষ্টঅফিস সবই আছে। এখান থেকে গয়া পর্যান্ত বাসে যাওয়া যায়।

অপর একখানা গাড়ী বিপরীত দিক হতে আসা পর্য্যন্ত, আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হল প্রায় পনর মিনিট। গাড়ীখানা এসে ছেড়ে চলে গেল। পরে আমাদের গাড়ী আবার তার পূর্ণ উদ্যমে পল্লীবাসীদের চমকিত করে ছুটে চলল। প্রায় তিনটায় আমাদের নিয়ে এল নালন্দা ষ্টেশনে। নেমে ষ্টেশনের চারদিকে চেয়ে দেখলাম ষ্টেশনটী ছোট। এখান হতে পশ্চিমদিকে প্রায় দেড়মাইল আম্রশাখা আচ্ছাদিত একটী গ্রাম্য পথে হেঁটে বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের সামনে উপস্থিত হলাম।

এই সেই বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে একদিন হাজার হাজার শ্রদ্ধাবান্ ছাত্র এবং অগাধ জ্ঞান-সম্পন্ন ভিক্ষু শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতেন! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকতেন। আজ সত্যিই মনে হয়—কোথায় গেল সে সব পণ্ডিতমণ্ডলী, জানতে ইচ্ছা হয়—তাঁদের চিন্তাধারা তাঁদের জীবন যাত্রার প্রণালীই বা কিরূপ ছিল। আজ যে তার কিছুই অবশেষ নাই। শুধু ওই কালের কঙ্কালস্বরূপ ঘর বাড়ী ও স্তূপশ্রেণী পুরাণো দিনের কতনা উজ্জ্বল স্মৃতি বুকে নিয়ে ভগ্ন

দেহে গৌরব-গর্ব্বে আজো মাটির উপর সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে মাটি খুঁড়ে এসব অট্টালিকা ও স্তূপশ্রেণী বার করা হয়েছে।

এবার আমরা বিদ্যাপীঠের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতেই একজন পথপ্রদর্শক বা এখানকার রক্ষী অতি আগ্রহে আমাদের সাথে ঘুরে ঘুরে অট্টালিকা বা সঙ্ঘারামশ্রেণী একটীর পর একটী দেখাতে লাগল। একতলা হতে তিনতলা পর্য্যন্ত খুঁড়ে বার করা হয়েছে, সেই অতীত দিনে ইঁট পাথরে গাঁথা সুদৃঢ় বাড়ীগুলো। তার হলের ভিতরে মোটা থামগুলো সবই খুব মজবুত ভাবে তৈরী। প্রত্যেক বাড়ীর মাঝে প্রশস্ত এক একটী আঙ্গিনা, চারধারে ছোট ছোট অনেক কক্ষ, তাতেই ছাত্রগণ বাস করত। কক্ষ মধ্যে দেয়ালের গায়ে বই রাখবার কুলুঙ্গি ও বাঁধান বিশ্রাম-আসন রয়েছে, সব ঘরেরই ভিন্ন দুয়ার এবং আঙ্গিনার বাইরে যেতে সবার জন্যে একটী উন্মুক্ত পথ একদিকে আছে। বাড়ীগুলো কাছে কাছে তৈরী হলেও প্রত্যেকটী আলাদা। মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে রাজগণ এক একটী তৈরী করেছেন। মাঝের খোলা আঙ্গিনায় বসেই অধ্যাপক ছাত্রদের পাঠ শিক্ষা দিতেন। ধারেই জলের কূপ ও জল নিকাশের নালার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। নীচুতে রান্নাঘর স্নানের যায়গা ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি রয়েছে। পথপ্রদর্শক একটী কক্ষ দেখিয়ে বললে, "এতে কিছু পোড়া চাউল এবং এ ছাড়া এখানে ওখানে অনেক নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ ও বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, সবই কাছের ঐ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।" এ সব সঙ্ঘারামের দেয়ালে উৎকীর্ণ ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাসম্বলিত মূর্ত্তিগুলো দেখে বিস্মিত হতে হয়। মাঝে মাঝে দু একটী ঘরে বুদ্ধমূর্ত্তির অপরূপ শান্ত সৌন্দর্য্যের কাছে শ্রদ্ধায় আপনিই মন প্রাণ নত হয়ে আসে। এত সুন্দর! পথ দেখানো সাথী আমাদের নীচে উপরে অট্টালিকার সারি ও অগণিত কক্ষ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা এসব দেখে নির্ব্বাক বিস্ময়ে একেবারে যন্ত্রচালিতবৎ তার পিছু পিছু চলেছি।

এবার স্তূপমন্দিরশ্রেণী দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম। অট্টালিকা বা সঙ্ঘারাম ও স্তূপমন্দির শ্রেণীর ব্যবধানে দুদিকেই উঁচু দেয়াল, মাঝ দিয়ে চলে গেছে এক প্রশস্ত পথ। ছোট ছোট চৈত্যবেষ্টিত অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম শিল্প-সৌন্দর্য্যে ভূষিত বিরাট স্তূপমন্দির সারি সারি একটীর পর একটী দাঁড়িয়ে আছে। এখনো কতকগুলো স্তূপের মাটি খোঁড়া হয় নি। যে কয়টী খুঁড়ে বার করা হয়েছে তার গঠন-চাতুর্য্য ও সূক্ষ্ম শিল্প-প্রতিভা আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের দক্ষ শিল্পীর প্রাণেও অনেকখানি বিস্ময় উদ্রেক করে তোলে। কত যে বুদ্ধমূর্ত্তি কত সুন্দর সব চিত্র রেখা কঠিন পাথরের বুকে জীবন্তরূপে প্রকাশ হয়ে আছে! জাতকের অনেক ছবি এতে উৎকীর্ণ রয়েছে। এসব বিরাট মন্দিরের ভিত্তি লৌহ ও পাথরে খুবই মজবুত করে তৈরী। নীচু হতে আবার সোপান শ্রেণী মন্দিরের উপর পর্য্যন্ত উঠেছে। আমরা উপরে উঠে দেখে এলাম। চারদিকে চেয়ে মনে হয় নালন্দা বিদ্যাপীঠ অনেকটা জায়গা জুড়েই ছিল। আজো আশে পাশে তার পূর্ব্বোল্লিখিত আম্রকানন দেখা যায়। সব দিকটায় ঘেরা ছিল শক্ত দেয়ালে এবং প্রবেশ-পথ বোধ হয় এক দিকেই ছিল।

যতই দেখছি বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে পড়ছি আর শ্রদ্ধায় মন প্রাণ অবনত হয়ে আসছে তাঁদের প্রতি —যাঁরা অকাতরে অর্থব্যয় করে এরূপ জ্ঞান-মন্দির তৈরী করেছিলেন। জানি না, আবার কবে ভারতের সে গৌরবময় দিন ফিরে আসবে, যে দিন জ্ঞানের বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে দিকে দিকে ছুটবে জ্ঞানিগণ—মানুষের অজ্ঞান অন্ধকার হৃদয়ে জেলে দিতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো, আর দিগ্ দিগন্ত হতে আগ্রহশীল শ্রদ্ধাবান্ ছাত্রগণ আসবে জ্ঞান

আহরণ করতে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। বৌদ্ধ যুগের কত কাহিনী কত কথাই মনে ভেসে উঠল, আবার মনের কোণেই মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে নালন্দার স্মৃতিতীর্থ হতে এগিয়ে গিয়ে হাজির হলাম সবকারবক্ষিত যাদুঘবটীতে। এখানে নালন্দায় প্রাপ্ত জিনিষগুলো বক্ষিত আছে। একজন উপযুক্ত কর্ম্মচাবীও আছেন। দু আনা দক্ষিণা দিয়ে ভিতবে প্রবেশ কবে একটীব পব একটী দেখতে লাগলাম নালন্দাব স্মৃতি ও শিল্প চাতুর্য্যেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইঁট মাটি পাথব তামায় কত যে মূর্ত্তি লতাপাতা ফুল কতই নিখুঁত সৌন্দর্য্য ফুটে আছে, যা আজও জীবন্ত বলে মনে হয়। বুদ্ধ জীবনের কত ভাবেব যে মূর্ত্তি চক্রপাণি, পদ্মপাণি, অমিতাভ, স্বস্তিকাসনে বুদ্ধ, আবাব লক্ষ্মী, তাবা, যম, ষষ্ঠী ইত্যাদি অগণিত মূর্ত্তি। প্রত্যেকটীব ভিতব কঠিন পাথবে শিল্পী তাব দক্ষতাব পবিচয় দিয়ে প্রাণময় কবে তুলেছিল। আজও দেখলে মনে হয় মূর্ত্তিগুলোব অফুবন্ত শান্ত সৌন্দর্য্য যেন ঝরে পডছে। আবার মাটিব তৈবী হাঁড়ি থুরি ঘডা কলসী ভৃঙ্গাব শিল বাতি, তামাব পাতে লেখা উৎসর্গ-পত্র, লোহাব তালা চাবি দা কোদাল, কত যে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ এখানে আছে ঘুবে ফিবে দেখলাম। এসব দেখে তাঁদেব নিত্য জীবনধারাও যে সভ্যতাব কত উঁচু স্তবে ছিল তাব আভাস পাওয়া যায়। মনে পড়ল, এই নালন্দা মহাবিদ্যাপীঠেই একদিন দেশ বিদেশেব কত যে জ্ঞানপিপাসু প্রাণেব প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে আসত। কেউ বিফলতায় ফিবে যেত আবাব কেউ সফলতার আনন্দে গর্ব্বভবে নালন্দাব ছাত্র বলে পরিচয় দিত।

চীন পরিব্রাজক য়ুআন চোআঙ এর ভ্রমণ-কাহিনীতেই আমবা প্রথম এবং বিস্তাবিতভাবে নালন্দার বিববণ জানতে পাবি। মেজব কানিংহাম এর মতে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে য়ুআন চোয়াঙ নালন্দা এসে প্রায় দু'বছর বাস করেছিলেন। তাছাড়া বহু চীন ও কোরিয়াবাসী পবিব্রাজকদের ভ্রমণ-কাহিনীতে নালন্দাব উল্লেখ আছে। তাঁবা সকলেই নালন্দার বিদ্যাপীঠে এসে ছাত্ররূপে কিছু না কিছু শিক্ষা করেছিলেন।

নালন্দা-সঙ্ঘাবাম নির্ম্মাণ সম্বন্ধে য়ুআন চোআঙ লিখেছেন, প্রথমে এখানে একটী আম্র কানন ছিল—বুদ্ধ-ভক্ত পাঁচশত বণিক একসঙ্গে দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ইহা কিনে বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ কবে কৃতার্থ হন। বুদ্ধদেব এখানে থেকে তিনমাস ধর্ম্মপ্রচাব কবেছিলেন। তাঁব নির্ব্বাণলাভেব বহুদিন পবে এদেশের বাজা শক্রাদিত্য এখানে সঙ্ঘাবাম তৈবী কবেন। পবে তাঁব পুত্র বুদ্ধগুপ্ত পিতাব নির্ম্মিত সঙ্ঘাবামেব ধাবেই অপব একটী তৈবী কবেন। তাব পব বাজা তথাগুপ্ত, বাজা বালাদিত্য ও বজ্র সবাই এক একটী বিবাট সঙ্ঘাবাম পব পব তৈবী কবেন এবং অপব বাজবংশের এক বাজা সব চেয়ে বড একটী সঙ্ঘাবাম তৈবী কবে সব সঙ্ঘাবামগুলো ঘিবে চাবদিকে দেয়াল দিয়ে একটী মাত্র প্রবেশদ্বাব বাখেন।

এখানে পবিত্র চবিত্র হাজাব হাজাব জ্ঞানী ভিক্ষু ও শ্রমণ বাস কবতেন। নিদ্ধাবিত বিশ্রাম সময় বাদে সাবাদিন তাঁবা ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রেব গভীব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। এখানে বৃদ্ধ হতে বালক সবাই একে অপবের কাজে সাহায্য করতেন। যাঁবা ত্রিপিটক আলোচনায় অপাবগ ছিলেন তাঁরা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন।

নালন্দা-বিদ্যাপীঠ এক সময় এত প্রসিদ্ধিলাভ কবেছিল যে, দেশবিদেশেব পণ্ডিতগণ সমস্যা সমাধান কবতে এখানে আসতেন। আবাব এমন লোকও যথেষ্ট ছিল যাবা সবার নিকট সম্মান কুড়াবাব জন্য নালন্দার ছাত্র বলে পবিচয় দিতেন। কথিত আছে, বিদেশ হতে কেউ কোন বিষয়

আলোচনা করতে আসলে প্রথমে দ্বাররক্ষক তাকে কয়টী কঠিন প্রশ্ন করত। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে দুয়ার হতেই তাকে বিফল মনে ফিরে যেতে হত।

এখানে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, শীগ্রবুদ্ধ ও শীলভদ্র প্রভৃতি জ্ঞানী আচার্য্য বাস করতেন।

ইচিঙ নামক অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক বোধ হয় ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে নালন্দার পাঠ্যতালিকা ও নিয়মাবলী এবং ছাত্রগণকে প্রথমে কোন কোন পুস্তক পড়তে হত তারও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

যুআন চোআঙ নালন্দার নাম সম্বন্ধে বলেন, দেশের পুরানো কাহিনীতে আছে, এই সঙ্ঘারামের কাছে আম্রকাননের পুকুরে নালন্দা নামে এক নাগ বাস করত। তার নাম অনুসারেই এস্থানের নাম নালন্দা হয়েছে। অপর মত—অতীত যুগে এখানে বোধিসত্ত্ব নামে এক রাজা ছিলেন এবং এখানেই তাঁর রাজধানী তৈরী হয়। জীবদুঃখে কাতর হয়ে তিনি সর্ব্বদা তাদের দুঃখ-মোচন করতেন। এ জন্য লোকে তাঁকে ন-অলম্-দা নামে ডাকত। তাই সঙ্ঘারামের নামও ঐ নাম হতেই নালন্দা হয়েছে। ইহা জাতকের বর্ণনা, কিন্তু মেজর কানিংহাম নাগ-নালন্দাই বিশ্বাস করেন।

ঐতিহাসিকগণ এ নালন্দার কথা নিয়ে কতই না গবেষণা করেছেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আজ আমার শুধু মনে হয় সেই বৌদ্ধযুগের জ্ঞান-গরিমার কথা। অতীত ভারতের কি বিপুল জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য নিয়েই না এ নালন্দার বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছিল। বৌদ্ধভারতের জ্ঞানী গুণী ও বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানানুশীলনের এক প্রধান স্থান ছিল এই নালন্দা। এখানেই একদিন দশহাজার বিদ্যার্থী ভিক্ষু শ্রমণ রাজঅর্থে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

আজও যেন সেই পীত বসন পরিহিত সৌম্য শান্ত বৌদ্ধভিক্ষুগণের মূর্ত্তি অলক্ষ্যে মানস চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমরা তাঁদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে ধন্য হচ্ছি। আজ নালন্দা বিদ্যাপীঠের কিছুই অবশিষ্ট নাই, শুধু ওই বিরাট প্রতিভার শ্মশানে যেন কঙ্কালসদৃশ ধ্বংসপ্রায় স্তূপ ও অট্টালিকা শ্রেণী, আর আছে সেদিনকার জীবন্ত সাক্ষী ঐ নালন্দার চারদিককার আম্রকানন। আজো তারা বাতাসের সাথে পত্রমর্ম্মর-ধ্বনিতে দর্শক ও যাত্রিগণকে এ পুণ্য পীঠে মহাবিদ্যালয়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা যাদুঘর হতে বাইরে এসে নিকটেই একটী ধর্ম্মশালার কাছে বৃক্ষতলে বসে নালন্দার স্মৃতি কথা ভাবছিলাম। ওদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত দিনের দেবতা তালগাছের ফাঁক দিয়ে আমবাগানের পাশে ঢলে পড়লেন পশ্চিম দিগন্তের গায়। তাঁর অস্তরাগের আলোর শিখাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল।

পরদিন সকালের গাড়ীতেই নালন্দার স্মৃতির আনন্দ বুকে নিয়ে রওনা হলাম ইতিহাস-বিখ্যাত রাজগীরের পানে। ছোট গাড়ীখানা যথাশক্তিতে টেনে নিয়ে একটা ষ্টেশন পরই আমাদের রাজগীর এনে পৌছে দিলে। এটাই লাইনের শেষ ষ্টেশন। গাড়ী হতে নেমে পড়লাম। চেয়ে দেখছি আশেপাশে দূরে কাছে ঘিরে আছে সব উঁচু কালো পাহাড়ের ঢেউখেলান সারি, আর নির্ব্বাক বনানীর শ্যাম শোভায় ছাওয়া চারিদিক। ঐ গম্ভীর পাহাড়শ্রেণীই বোধ হয় এখানকার স্মৃতিগুলোকে আরো ভাবগম্ভীর করে রেখেছে। এখানে এসে কবির সেই স্মরণীয় কবিতাটী মনে পড়ল,—

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।

স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্প শোভার সার।

এই সেই স্থান। আর স্মরণ হল চীন পরিব্রাজকের কথা, এই সেই পুরাতন রাজগৃহ যার পাহাড়ে গুহায় সমতলে ছড়িয়ে আছে বুদ্ধদেবের কত না স্মৃতি।

আগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ষ্টেশনের কাছেই বর্ম্মা বৌদ্ধসন্ন্যাসিদের সুন্দর ধর্ম্মশালাটীতে আশ্রয় নিলাম। বর্ম্মাসাধুটী অনেক কাল পরে তাঁর মাতৃভাষায় দুচারটী কথা শুনে শুষ্ক প্রাণে যেন রসের সাড়া পেলেন। তিনি আমার সাথে তাঁর ভাষায় কথা বলে খুবই ভাব জমাতে লাগলেন। এখানে আরো কয়টী ধর্ম্মশালা আছে। কাছেই বিহারীদের দরিদ্র পল্লী ও দু চার খানা দোকান। চাউল ডাল ছাতু আটা লুচি পেয়ারা দুধ দৈ সবই এখানে পাওয়া যায়।

ষ্টেশন হতেই একজন পাণ্ডা আমাদের সাথে এসেছিল এ স্মৃতিতীর্থ দেখাবার জন্য। আমরা একটু বিশ্রাম ও কিছু জলযোগ করে তার সাথেই বেরিয়ে পড়লাম রাজগৃহ দেখতে। পাহাড়ী অসমতল কাঁকরময় পথে চললাম এবং অনেকটা হেঁটে গিয়ে রাজা বিম্বিসারের রাজধানীতে উপস্থিত হলাম। চারদিকে বড়ই সুন্দর শোভা। বিপুলাচল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, সোনগিরি, ও বৈভার নামে পাঁচটী উঁচু পাহাড়ে ঘেরা ছিল পুরাতন রাজগৃহ। আজ তার কিছুই নাই, আছে শুধু ধ্বংসস্তূপ। স্মৃতির শ্মশান নীরব বনানীর গিরির শোভায় ছেয়ে আছে। কিন্তু চারদিকের ঐ পাহাড় শ্রেণী সেদিন হতে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে বিস্মৃত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অদূরে সুদৃঢ় দুর্গ-দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ। আরো সব ভগ্নপ্রস্তর-ভিত্তি মাটির বুক আঁকড়ে পড়ে আছে অতীতের স্মৃতি নিয়ে। একদিন এখানে সবই ছিল, অগণিত জনগণের আনন্দ-আমোদ-মুখরিত তেজস্বী ধার্ম্মিক রাজার বিরাট রাজধানী—রম্য প্রাসাদের চূড়ায় সকাল সাঁঝে বেজে উঠত নহবতের সুমধুর সুর-লহরী, রাতের আঁধার কালিমা দূর করে ছড়িয়ে পড়ত শত শত দীপাবলীর আলো। আজ তার সব শেষ হয়ে মিশে গেছে ঐ ধ্বংসস্তূপে। কালের কি গতি। সব গ্রাস করেছে, কিন্তু বিশ্বমনে যে স্মৃতির মন্দির গড়ে উঠেছে, তা কি কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? না, তা কি কখনো হয়?

পাণ্ডা আমাদের এই নিবিড় বন-বেষ্টিত স্থানে ঘুরিয়ে আরো সব স্মৃতি-স্থান দেখাতে লাগল। একটী যায়গা দেখিয়ে বললে, এখানেই ভীম আর জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ হয়েছিল। এখনো পালোয়ানগণ শ্রদ্ধায় এখানকার মাটি গায়ে মাখে। মহাভারতীয় যুগে জরাসন্ধ এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজগৃহের নাম ছিল তখন গিরিব্রজ বা কুশাগ্রপুর।

তারপর আমরা সোনভাণ্ডার দেখতে গেলাম। ইহা পাথরের একটী বিরাট গুহা। এর ভিতরের দেয়ালটী একটী দুয়ারের মত। তাতে যে কি কতকগুলো লেখা আছে, সে ভাষা আজও কেউ উদ্ধার করতে পারেন নি। প্রবাদ, উহা একটী গুপ্ত কোষাগার, বহু ধনরত্ন ওতে রক্ষিত আছে। এটী কোন্ রাজার সময়কার, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মত রয়েছে। আরো হেঁটে একটী কূপের কাছে উপস্থিত হলাম। পাণ্ডা বললে, এটী নির্ম্মলী কুয়া। এতে পূজার নির্ম্মাল্য ফেলা হত। এর গায় অনেক কারুকার্য্যময় পাথর ছিল; সে সব আজ স্থানান্তরিত হয়েছে। কূপটী দেখে খুবই পুরাতন বলে মনে হয়। এখানে সবদিকটায়ই নিবিড় বন ও পাহাড়ের নিস্তব্ধতায় ঘিরে আছে। এবার এলাম সেই প্রসিদ্ধ বেণুবনের কাছে। একদিন রাজা বিম্বিসার এই বন ভগবান তথাগতকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যরূপে দান করে ধন্য হয়েছিলেন।

আমরা এতটা ঘুরে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। রোদের তাপও বেড়ে উঠেছে, তাই এবেলা ফিরে পাণ্ডাজীর সাথে ঐ পাহাড়ি কাঁকুরেপথে বৈভার পাহাড়ের পাদদেশে রাজগীরের বিখ্যাত উষ্ণ সপ্তধারার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। পাথরের সাতটী ঝরণা বেয়ে পাহাড় হতে অবিরত গরম জল পড়ছে। একটু পরেই নেমে পড়লাম ঐ সপ্তধারার জলকল্লোলে। শ্রান্তির পর গরম জলে স্নান করে বেশ আরাম বোধ হল। শরীরের সব গ্লানি দূর হয়ে গেল। ধারেই আবার ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নেমে পড়লাম। এতেও উষ্ণজলস্রোত নীচু হতে টগ্‌বগ্‌ করে দিন রাত উঠছে। চারদিকটা বাঁধান, জলের গভীরতাও বেশ। সবাই মিলে আবার আরামে ডুবদিয়ে স্নান করা গেল। এই সপ্তধারা ও কুণ্ডের জলে স্নান করতে দূর দূরান্ত হতে লোক আসে। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও নাকি এই জলে স্নানে আরোগ্য হয়। এখানে কয়টী মন্দিরে হিন্দুর দেববিগ্রহ নিত্য দর্শকদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করছেন।

আমরা তারপর ধীরে ধীরে অজাতশত্রুর রাজধানী নূতন রাজগৃহের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে আমাদের আশ্রয় স্থল বৌদ্ধধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। বিম্বিসারের পুরানো রাজগৃহের অনতি দূরেই অজাতশত্রু এই নূতন রাজধানী তৈরী করেছিলেন। সম্রাট অশোকও একদিন এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে তাহা পাটলিপুত্র বা পাটনায় স্থানান্তরিত হয়।

বৈকালের দিকে সবাই মিলে পাণ্ডাজীর সাথে বৈভার পাহাড়ে জৈন-মন্দির ও সপ্তপর্ণিগুহা দেখতে চললাম। আবার সেই সকালের পরিচিত পথে খানিকটা গিয়ে পরে এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলাম। খানিকটা উঠে ধারেই ফাহিয়ানের বর্ণিত পিপ্পলিভবন গুহা দেখতে পেলাম। মধ্যাহ্নে আহার গ্রহণের পর এই গুহায় বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন থাকতেন। পরে আরো উপরে উঠে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় জৈনমন্দিরের সামনে উপস্থিত হলাম। এখান হতে পুরাতন রাজগৃহের কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে। বর্ত্তমানে চারদিকের পাহাড়ের শিরে এক একটী জৈনমন্দিরের অমল ধবল শান্ত সুন্দর শোভা দেখে মনে হয় যেন নীল আকাশের গায় সুদক্ষ শিল্পীর চিত্র-চাতুর্য্য মানুষকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। রাজগীর জৈনদেরও এক মহাতীর্থ। জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর বিম্বিসারের রাজত্বকালে এই রাজগৃহের বিপুলাচল পাহাড়ে বহুদিন বাস করেন। রাজা বিম্বিসার তাঁর একজন ভক্ত ছিলেন। মহাবীরের পরে ভগবান বুদ্ধদেব এখানকার বৈভার পর্ব্বতে আগমন করেন। রাজা বিম্বিসার ও রাজ্যের অনেকে তাঁর ধর্ম্ম উপদেশ শুনে একান্ত অনুগত ভক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অজাতশত্রুও পরে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দিরের ধার দিয়ে একটু অপ্রশস্ত পথে নেমে গিয়েই "সপ্তপর্ণি বিরাট গুহা" পেলাম। ফাহিয়ানের গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, ভগবান তথাগতের দেহত্যাগের পর এখানেই রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক এই গুহা ও বিরাট মণ্ডপ তৈরী হয় এবং এখানেই সর্ব্বপ্রথম পাঁচশত বৌদ্ধভিক্ষু একত্রিত হয়ে বুদ্ধের বাণীকে প্রথম সূত্রাকারে গ্রথিত করেন। সে ভিক্ষুসভায় আচার্য্য মহাকাশ্যপ একধারে একটী আসনে বসতেন, উপালি ও আনন্দ মাঝের আসনে বসে "বিনয় ও ধর্ম্ম" আবৃত্তি করতেন। এই পবিত্র স্থানটী দেখে সেই স্মরণীয় দিনের কথাই মনে হল, যেথান হতে ভগবান্ তথাগতের অমূল্য বাণী সংগৃহীত হয়ে জগতে অহিংসা মৈত্রী ও করুণার ভাব চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে মানুষকে নির্ব্বাণ-শান্তির পথ দেখিয়ে দিলে।

বেলা নেমে এল, অস্তরাগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার

উজ্জ্বল সিঁদুরে রঙে উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলো চুম্বন করবার সাথেই দিনান্তের ক্লান্তরবি পশ্চিম দিগন্তে আকাশের গায় লুকিয়ে গেল। আমরা ধীরে ধীরে নেমে এলাম পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে।

পরদিন প্রভাত-সূর্য্যের সোনালি কিরণ-রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। পাহাড়ের চূড়াগুলোও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সামনে। পাখীর কলকাকলী মুখর করে তুলেছে জনমানবহীন পুরাতন রাজগীরকে। উৎফুল্ল মনে চলেছি নৃপতি বিম্বিসারের রাজধানীর উপর দিয়ে গৃধ্রকূট পাহাড়ে। আজ কেউ কোথাও নাই, সাড়াশব্দ কিছুই নাই, চারদিক শূন্য নীরব নিস্তব্ধ। যেতে যেতে মনে হল, এখানেই ত জনমুখরিত বিম্বিসারের রাজধানীতে কুমার সিদ্ধার্থ ঐ গৃধ্রকূট হতে নিত্য ভিক্ষাগ্রহণ করতে আসতেন। কত ব্যগ্রবাহু উৎসুক হয়ে থাকত তাঁর ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দেবার জন্য। ভারে ভারে আসত আহার্য্য। সন্ন্যাসী শুধু পরিমিতটুকু নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যেতেন।

ভাবতে ভাবতে গৃধ্রকূটের চূড়াটী লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি। পাণ্ডাজী সঙ্গেই আছেন। প্রায় দু মাইল হেঁটে এসে এবার আরো গহন বনের ভিতর দিয়ে বাকি দুমাইল পাহাড়ে উঠা আরম্ভ হ'ল। পাথরে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে সন্তর্পণে চলেছি উপরে। কারো মুখে কথা নাই, ক্রমেই যেন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছি। স্থানটী বড়ই মনোরম, প্রকৃতির নীরব গাম্ভীর্য্যই আরো ধ্যান-গম্ভীর করে রেখেছে। জগতের সকল চঞ্চল কোলাহল যেন এখানে এসে নীরবে স্থির হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! একেবারে স্তব্ধতার রাজ্য, কোথাও কোন শব্দ নাই—সব স্থির। শুধু দূরে গভীর বনানীর অন্তরাল হতে দু একটী ঝিল্লিরব মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। গৃধ্রকূটের উপরে শ্রদ্ধানত অন্তরে লুটিয়ে পড়লাম ঐ শিখর-চূড়ার পাদমূলে। ধারেই কয়টী গুহা। এখানেই ত একসময় সংসারত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এরই কোন একটী গুহায় বসে সত্যান্বেষণে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে কতদিন কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, কত কঠোর সে তপস্যা দিনের পর দিন চলেছিল। নীরব ধ্যানে কুমারের মনে কত সত্য রহস্যই না উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু রাজপুত্র চাইলেন শুধু প্রকৃত সত্যের সন্ধান। প্রাণে সত্য তত্ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর বিরাম ছিল না, দিনরাত অজ্ঞাতভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কেটে গিয়েছিল।

এই গৃধ্রকূটের সাথে বুদ্ধদেবের প্রিয়শিষ্য আনন্দের একটী স্মৃতি জড়িত রয়েছে। এই পর্ব্বতশিখরে আনন্দ তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন, মার ভীষণ শকুনিরূপে আনন্দের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করবার জন্য তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। শিষ্য ভীত শঙ্কিত হয়ে পড়ায় বুদ্ধদেব তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন। জানি না, এ জন্যই এ পর্ব্বতের নাম গৃধ্রকূট হয়েছে কি না।

এখানে এসে আমরাও যেন ধ্যানগম্ভীর হয়ে পড়লাম। মনের ভিতর জেগে উঠল বুদ্ধ-জীবনের পুণ্য পবিত্র স্মৃতি। প্রাণের একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অঞ্জলি সাজিয়ে নীরবেই এই গুপ্ত গুহায় দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। সেই অতীত ভাবতে সাঁঝের এক ঘন অন্ধকারে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের মনের ভিতর যে গভীর বেদনা জেগে উঠেছিল, তার স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের সামনেও ভেসে উঠল। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে, তিনি একদিন অজাতশত্রুর রাজধানী থেকে রওনা হলেন বিম্বিসারের পুরাতন রাজগৃহের দিকে গৃধ্রকূট দেখবার জন্য। রাজগৃহে তিনি লোকালয়ের কোন চিহ্ন পেলেন না। হাতে তার ধূপ দীপ ও পুষ্প। গৃধ্রকূটে উপস্থিত হয়ে তিনি বুদ্ধদেবের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে একান্ত শ্রদ্ধায় পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে নিবেদন করলেন। সন্ধ্যা নেমে এল গুহা দ্বারে। ফাহিয়েন গুহায় ধূপ দীপ

জেলে দিলেন। প্রাণের বেদনায় তাঁর দুনয়নে অশ্রুজল গড়িয়ে এল, মনে হল—হায়, তিনি বুদ্ধের জীবিতকালে কেন জন্মগ্রহণ করলেন না, তবে ত তাঁর মুখের অমিয় বাণী শুনতে পেতেন! চোখের জলে তাঁর ধূলিমাখা পা দুখানি ধুইয়ে দিতে পারতেন, ছায়ার মত সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে নিত্য শতবার ঐ প্রশান্ত সুন্দর মুখশ্রী দেখে নয়নের সাধ মেটাতে পারতেন। এরূপ কত কথাই তাঁর মনে এল। মনের বেদনা দিয়েই তিনি সেদিন স্মৃতির পূজা সমাপ্ত করলেন।

আমরাও এই স্মৃতি-তীর্থ হতে মর্ম্মদাহী বেদনার বোঝা নিয়েই নেমে এলাম। ফেরবার পথে মনে হল, এ পথেই ত শত শত ভিক্ষু শ্রমণ রাজা প্রজা অগণিত যাত্রী দিনের পর দিন শ্রীবুদ্ধের চরণ সকাশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করতে আসত, আজ আমরা যেমন এসেছি। আরও কত কাল কত নরনারীর এ পথে যাওয়া আসা চলতে থাকবে—কে জানে!

সঙ্ঘ ও সম্প্রদায়

অধ্যাপক শ্রীঅধরচন্দ্র দাস, এম্‌-এ, পি-আর্‌-এস্‌

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জগতের হিতকামী মনীষিগণ অনেকভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আজকালও যে অনেকে এই সংকীর্ণতার মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন না, তাহা বলা যায় না। সাম্প্রদায়িকতা মনুষ্য-সমাজকে দলে বিভক্ত করে। দলাদলিতে মানুষ যে কিরূপে ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণ ভাবে বলিতে পারি যে, সাম্প্রদায়িকতা মানুষের জাগতিক স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। কোন সাংসারিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যখন একাধিক ব্যক্তি চেষ্টা করে, তখন সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, এবং এই সংঘাতের ফলেই দলের সৃষ্টি হয়। ইহাও সত্য বটে যে, দলসৃষ্টি হয় পূর্ব্বে এবং সংঘাত সংঘটন হয় পরে। অন্ততঃ রাজনীতিক্ষেত্রে দলের সৃষ্টি হয় সম্মান, শক্তি এবং বিত্তের মধ্যে এক বা একাধিককে আশ্রয় করিয়া। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজনীতিক্ষেত্রে অপরের বিরোধিতা দলের প্রধান লক্ষণ না হইলেও ইহা যে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলির উপকারিতাও আছে, কারণ চিন্তা এবং কর্ম্মমূলক বিরোধিতা দ্বারা পরস্পরের কার্য্যের গুণাগুণের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যখন মানুষের ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবনে দেখা দেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ এবং সময় সময় সংঘাতের সৃষ্টি করিয়া কেবল মনুষ্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে পণ্ড করিয়া দেয় তাহা নহে, সাংসারিক এবং সামাজিক জীবনকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে; যেহেতু আধ্যাত্মিক জীবন সামাজিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতা এবং ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম-পথ ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং সমাজে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাদের উৎপত্তি কাল এবং স্থান পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেকেই এক একটা আদর্শ উপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শনানুকূল ভাবধারা এবং তদনুযায়ী কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ লইয়া আবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই গোড়াপত্তনে কাল, দেশ, সমাজোপযোগী ভাবধারা এবং কর্ম্মপন্থা বিদ্যমান থাকায় মানুষের পক্ষে উহার গ্রহণ সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, ধর্ম্মবিশেষ উদ্ভব কালেই সমাজ কর্ত্তৃক সমষ্টিভাবে গৃহীত হয়। নূতন যে কোন ভাবের প্রতি অনুদারতা সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। প্রকৃতি যে এই অনুদারতার সাহায্যে আমাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতির উদ্দেশ্য সহায়ক হউক আর না ই হউক, আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহা দ্বারা মানব-সভ্যতার—তথা মানুষের চিন্তাধারা এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মপ্রণালীর ক্রমাভিব্যক্তির স্ফুরণ অনেকাংশে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে, ক্রমাভিব্যক্তি পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পরিবর্ত্তন ক্রমাভিব্যক্তির একটি অঙ্গবিশেষ—একটি বহির্লক্ষণ মাত্র। অভিব্যক্তি শব্দের মর্ম্মার্থ বিশেষভাবে লক্ষিত হয় যখন আমরা নূতনের মধ্যে পুরাতনের সন্ধান পাই। নূতনের কাছে পুরাতনের দাম এবং দাবী কত তাহার বিশ্লেষণ এবং বিচার হয় নূতনের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে। কিন্তু আমাদের ইহাও ধারণা করিতে হইবে যে, সময়োপযোগী সমাজ, চিন্তাধারা, কর্ম্মপ্রণালী এবং নূতনের পরিকল্পনার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু পুরাতনাধীন ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়াই নূতনের আবির্ভাব হয়। এই বিশ্লেষণের ফলে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নূতন পুরাতনের অন্তস্তল হইতে আবির্ভূত হয়, এবং এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা সময়োপযোগী চিন্তাধারার অগ্রদূত, তাঁহারা বাস্তবিক জীবনে অগ্রণী না হইতে পারেন কিন্তু তাঁহারাই কেবল নূতনের আহ্বান শুনিতে পান এবং সানন্দে নূতনকে বরণ করেন। বর্ত্তমান আবশ্যকতার সম্বন্ধে নূতন কল্পিত হয়, ভবিষ্যৎ এই কল্পনার বাস্তবতার ক্ষেত্র। নূতনের সঙ্গে সম্বন্ধেই অতীত এবং বর্ত্তমান পুরাতন বলিয়া প্রতীত হয়। অনেক সময় নূতন পুরাতনকে বিপর্য্যস্ত বা গ্রাস করিয়া বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হয়। নূতন ও পুরাতনের বিরোধিতায় এমন ভাবে সংঘাত সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, যখন প্রতিক্রিয়ামূলক আরও একটি নূতনের আবির্ভাব হয়, তখন পূর্ব্বনূতন পুরাতনে পর্য্যবসিত হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে, এই ভাবেই মানব-সমাজে উদারপন্থী, সনাতনপন্থী ইত্যাদি দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

পক্ষান্তরে উপরোক্ত প্রণালী দলসৃষ্টির একমাত্র পন্থা নহে। আরও একটি বিশেষ পন্থা আছে এবং তাহা হইতেছে সঙ্ঘবদ্ধতা। সঙ্ঘই যে সম্প্রদায়ের উৎস ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেকে বলিতে পারেন যে, সঙ্ঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য রেখাটানার কি প্রয়োজন? সঙ্ঘের মধ্যে সম্প্রদায় ভাব প্রকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান। অন্যদিকে কেহ বলিতে পারেন যে, সঙ্ঘ সম্প্রদায়ের বাহিরের জিনিস এবং সঙ্ঘ-ভাবে সাম্প্রদায়িকতার ছায়ামাত্রও নাই, অতএব সঙ্ঘ হইতে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা বলিতে পারি যে, এই দুইটির প্রত্যেকটিই সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই। ইহার অর্থ এই—যদিও সঙ্ঘের উৎপত্তিকালে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার লেশমাত্র থাকে না, তথাপি

সঙ্ঘবদ্ধতার ফলেই কালে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং প্রসার হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সঙ্ঘ এবং সম্প্রদায় একার্থবাচক। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক।

সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, যখনই আমরা একই শত্রুর সম্মুখীন হই এবং ফলে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন বিপন্ন হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা একত্ববোধ জাগরিত হয় এবং আমরা পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া যাই। কিন্তু ইহার স্থিতিকাল কোন সুচিন্তিত আদর্শবাদের কল্পনার উপর নির্ভর করে না। একটা আকস্মিক বাহ্যিক ঘটনা ইহার উদ্দীপক। এই অবস্থা হইতে আমরা একটা বাস্তবতামূলক কল্পনা করিতে পারি। যখন বাহিরের জীবজন্তু ও বস্তু-সম্পর্কে অনাত্মবোধ আমাদিগকে ক্লান্ত করিয়া থাকে, তখন আমরা একাত্মবোধের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি এবং এই একাত্মবোধের দ্বারাই অনাত্মবোধের নিরাস করিবার প্রয়াস পাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি কেবল আঙ্গিক সামঞ্জস্য বিধানের উপর নিবদ্ধ থাকে। এইরূপ আঙ্গিক সামঞ্জস্যমূলক সমষ্টি নিয়াই মানব-সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল। সঙ্ঘবদ্ধতার ক্ষেত্র কিন্তু আরও উপরে। প্রত্যেক ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রারম্ভে তিনটি বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে, আদর্শ, তদুপযোগী ভাবধারা এবং কর্ম্মপন্থা। যাহারা ঐ সকল দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাদের ভাব, দীক্ষা শিক্ষা ও কর্ম্মপ্রণালী এক। সমষ্টি-জীবনে এক আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে সঙ্ঘ-জীবন আরম্ভ হয়। একই আদর্শে একই ভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ যখন সেই আদর্শ উপলব্ধির চেষ্টায় একত্র মিলিত হন এবং পরস্পরের অনুকরণ, সাহায্য সহানুভূতি ও ভালবাসা-পরিপুষ্ট একই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পান, তখনই সঙ্ঘের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রারম্ভে সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টিপ্রবণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ঐক্যবদ্ধ জনগণের সম্মিলিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় তাহাদের জীবন প্রণালীতে একটি আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং তাহারা সঙ্ঘের বহির্ভূত মানুষের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। আমরা বলিতে পারি যে, প্রাচীনতম মনুষ্য-সমাজ যেরূপে আরম্ভ হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপেই সঙ্ঘের আরম্ভ হয়, কারণ একত্ব-বোধ উভয়েরই ভিত্তি। কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্ঘ এবং সমাজ এক নহে। বস্তুতঃ সমাজ এবং সামাজিক জীবন ব্যতিরেকে সঙ্ঘের উৎপত্তি অসম্ভব; যেহেতু, মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ইহার বাহক, এবং পরস্পরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি ইত্যাদি সামাজিক জীবনপ্রসূত সম্পদ ইহার উপাদান। এই সকল সামাজিক সম্বন্ধ সঙ্ঘশক্তি-গঠন ব্যাপারে ইট পাথর। সঙ্ঘ এবং সমাজ যে ভিন্ন, অন্যদিক্ হইতেও ইহা প্রতীত হয়। যদিও একত্ববোধ উভয়ের ভিত্তি, তথাপি উভয় ক্ষেত্রে একত্ববোধ এক নহে। আঙ্গিক একত্ববোধ লইয়া সমাজ সৃষ্ট হয়। সঙ্ঘে একত্ববোধ এক আদর্শ, এক ভাবধারা ও এক কর্ম্মপ্রণালীর বোধ। আমরা বলিতে পারি যে, সঙ্ঘের ভিত্তি একাত্মবোধ, এবং এই একাত্মবোধ চিন্তামূলক। যখন সঙ্ঘ সৃষ্টি হয়, তখন ইহার শক্তি আদর্শবিশেষের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। উহাতে বিরোধী আদর্শের স্থান নাই। সঙ্ঘশক্তি ঐক্য-প্রসূত, বিরোধিতা ইহার ত্রিসীমার বাহিরে।

কিন্তু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় তখন, যখন সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আদর্শকে পশ্চাতে রাখিয়া 'আমি'-কে লইয়া মত্ত হইয়া পড়েন, এবং তখনই আরম্ভ হয় বিচার, বিসম্বাদ, সমালোচনা ও বিরোধিতা। সঙ্ঘের প্রারম্ভে আত্মোপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শন এবং তদ্বিষয়ে অনুপ্রেরণা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত

করে, কিন্তু সময়ের প্রভাবে এমন অনেকে সঙ্ঘের মধ্যে আসিয়া পড়েন, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা পরবর্ত্তীকালে মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং 'আমিত্ব' বা 'অহমিকা' তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে। এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিক জীবন মুখের কথায়, ধর্ম্ম জল্পনায় এবং সঙ্ঘ দলে পর্য্যবসিত হয়।

আমাদের সাংসারিক জীবনে এবং সাধারণ জ্ঞানক্ষেত্রে, 'আমি'ই কেন্দ্রস্থান। এই শরীরাত্মক 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের জগৎ প্রকটিত। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় এই জীবনের ভিত্তিকে উলট্ পালট্ করিয়া। ইহার অর্থ এই নয় যে, ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভেই আমরা এই আমিত্বের গড় ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হই। জগতের এবং জীবনের কেন্দ্র যে 'আমাতে' নাই, ইহার বিচার বা বিশ্বাসমূলক ধারণা এবং ইহার সম্যক্ উপলব্ধির চেষ্টা ব্যতীত আধ্যাত্মিক জীবনের কল্পনাও আসিতে পারে না। যে ভাবের বিনাশকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়, সেই ভাবের পুনরাভিব্যক্তিমূলেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায় সঙ্ঘের প্রতিযোগী মাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক জীবনেরও পরিপন্থী।

আজকাল পৃথিবীতে কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম-পন্থা বিদ্যমান, এবং ইহাদের অনুবর্তিগণের মধ্যে একে অন্যের আদর্শ এবং কর্ম্ম-প্রণালীর বিরোধিতা তাঁহাদের ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ বলিয়া মনে করেন। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম্মমতকে একমাত্র পথ বলিয়া ধারণা করেন। ইহা যে অজ্ঞানপ্রসূত এবং অহমিকার বিভীষিকা মাত্র, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক মহাপুরুষ তাঁহার জীবন এবং সাধনা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা বাস্তবিকই মূঢ়, আমরা বুঝিতে পারি না যে, যিনি এই বিশ্বসৃষ্টির মূল এবং বিশ্বগতির গম্যস্থান, যিনি বিশাল, অনন্ত এবং অসীম, তিনি আমাদের দ্বারা উদ্ভাবিত কোন পন্থায় সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, এই হেতু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং দেশে সময়োপযোগী চিন্তাধারানুযায়ী ধর্ম্মপন্থার উদ্ভব হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও যে কত ধর্ম্ম-পন্থার উদ্ভব হইবে তাহা বলা যায় না। আমাদের মোহ আরম্ভ হয় তখন, যখন আমরা ভুলিয়া যাই যে, আত্মোপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শনই ধর্ম্মপন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-পন্থা এক, কারণ প্রাণের আবেগই একমাত্র শক্তি, যাহা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গশৃঙ্গে লইয়া যাইতে পারে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সাম্প্রদায়িকতার উৎখাত হইবে তখন, যখন আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রাণে প্রেরণা অনুভব করিব। অতএব আধুনিক কালে ধর্ম্ম কি, আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা কি, জগতের লোকের বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। আমরা যদি শান্তি চাই, যদি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহের মধ্যে একতা, সহানুভূতি, মৈত্রী এবং ভালবাসা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে উহা কোন রাজনৈতিক বা বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধিদ্বারা সিদ্ধ হইবে না। ব্যবহারিক জীবনের সমস্যার সমাধানমূলে অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করিলে আমরা যে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইব, ইউরোপের আধুনিক ঘটনাবলী তাহা প্রমাণ করিতেছে। আমাদিগকে গূঢ়তম প্রদেশে যাইতে হইবে, মনুষ্য-প্রকৃতির মূলরহস্যের ধারণা এবং উহার উদ্‌ঘাটনকে ভিত্তি করিয়া আমাদিগকে বিশ্বশান্তির সৌধ সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাতে শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু দেহের নয়,—মনের প্রাণের—আত্মার—কবে সেই শক্তি আসিবে, যাহা সঙ্ঘসমূহের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে বিদূরীত করিয়া বিশ্বমানবতার জয়ডঙ্কা ঘোষণা করিবে? তাহা এখনও সুদূর বলিয়া মনে হয়।

আগমনী

শ্রীমীরা দেবী

আজি মধুর শরতে
মধুর হাসিতে
ভরে গেল কেন ধরার মুখ,
কাঁর আগমনে
সকল পরাণে
উথলি উঠিছে বিমল সুখ।

কাঁহার চরণ
পরশ কারণ
পড়িছে শেফালি ঝরিয়া,
কমলিনী দল
জনম সফল
ভাবিছে কাঁহার লাগিয়া।

সারা বরষের
নিরাশ কাতর
আর্ত্তমৃত অবশ হিয়া,
কাঁর পরশনে
চমকিত মনে
উঠিল চকিতে জাগিয়া।

ওমা উমাধন
মেনকা-জীবন
এলে কি গো মা বরষ পরে,
তাই বুঝি ধরা
হ'য়ে আত্মহারা
চুমিছে শ্রীপদ বারে বারে।

এসেছ জননী
করুণারূপিণী
পরাও সন্তানে নূতন বেশ,
নবীন আলোকে
নূতন পুলকে
জাগিয়া উঠুক (এ) অভাগা দেশ।

এসেছ সারদে
এস মা বরদে
ভকতি বিশ্বাস কর গো দান,
কোলে তুলে নাও
জীবন জুড়াও
এই ভিক্ষা আজ মাগিছে প্রাণ।

শিবানন্দ-বাণী

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

বেলুড় মঠ—৬ই অক্টোবর, ১৯৩২

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সমাগতা। শারদশ্রী সৌন্দর্য্যের সম্ভার লইয়া বঙ্গের দ্বারে আসিয়াছে। ভরা নদীর বুকে সাদা পাল তোলা নৌকায় মাঝি আগমনীর গান গাহিয়া আনন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে কুমুদ-কহ্লারের মেলা। শেফালিকার বীথিকা হইতে পূজার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে নবীন উৎসাহের বাণী। বাংলার আকাশ বাতাস যেন মায়ের আগমন আশায় পুলকিত।

মঠেও মায়ের আরাধনা হইবে, মহাপুরুষ মহারাজ তাই খুবই আনন্দিত। নীচে প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে। তিনি প্রত্যহই বিশেষভাবে তাহার খোঁজ লইতেছেন। তাঁহার ঘরেও প্রায়ই আগমনী গানের বৈঠক বসিতেছে। সাধুবৃন্দ সুললিত কণ্ঠে গাহিতেছেন—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা আমার বড় কেঁদেছে।
আমি দেখেছি স্বপন নারদ বচন,
উমা মা মা ব'লে কেঁদেছে।
সোনার বরণী গৌরী আমার,
ভাঙ্গের ভিখারী জামাই তোমার,
উমার বসন ভূষণ সব আবরণ,
তা ও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে।

সকলের প্রাণেই মায়ের আগমনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পূজার সব বিষয়ের জোগাড় হইতেছে। মহাপুরুষজী প্রত্যেক বিষয়ে নিজেই ব্যবস্থা করিতেছেন। সর্ব্বোপরি লক্ষ্য করিবার জিনিষ সব কাজেই তাঁহার একটা তন্ময়ভাব। মায়ের নামে আত্মহারা বালকের ন্যায় সর্ব্বদাই 'মা মা' করিতেছেন। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মায়ের চিন্তাই চলিতেছে, মা ছাড়া মুখে অন্য কোন কথা নাই। অনেক সময় তিনি নিজেই প্রাণের আবেগে আগমনী গান গাহিতেছেন—

গিরি, গণেশ আমার শুভকরী।
পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী, চাঁদের মালা যেন
চাঁদ সারি সারি।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন.
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।

ইত্যাদি অনেক আগমনী গান কখন গুন্ গুন্ সুরে কখনও বা উচ্চ স্বরে প্রাণের আনন্দে গাহিতেছেন। আবার কখনও বা তিনি মঠের কোন কোন সাধুকে নূতন আগমনী গান শিক্ষা দিতেছেন—

গিরি, প্রাণ গৌরী আন আমার,
উমা বিধুমুখ না হেরে বারেক—
এ ঘর লাগে আঁধার। ইত্যাদি

মা আসিবেন, তাঁহার প্রাণের বিমলানন্দউৎস যেন সহস্র ধারে উৎসারিত। কাল শ্রীশ্রীমায়ের বোধন হইয়া গিয়াছে। সকালে স্বামী তপানন্দ স্বরচিত একটী গান খুব ভাবের সহিত গাহিলেন—

আনিবে কবে ভবনে, মোর উমাধনে।
সব জ্বালা সুশীতল হবে আঁধার হৃদয় আলো
গৌরীর সেই নিরমল মুখচন্দ্র দরশনে। ইত্যাদি

সঙ্গে ভগবান সেন আস্তে আস্তে তবলায় ঠেকা দিতেছেন। গান খুবই জমিয়া গিয়াছে। গায়ক যেন প্রাণের সুরে গাইতেছেন। মহাপুরুষজী মধ্যে মধ্যে ভাবে তন্ময় হইয়া 'আহা আহা' করিতেছেন, আর নিজকে সামলাইতে পারিতেছেন না, কান্না আসে আর কি! অনেক কষ্টে ভাবসম্বরণ করিয়া নিজেই গায়ককে বলিলেন—"যা, যা, পালা পালা, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলি! এ যেন শুক্‌নো দেয়াশলাইর কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে' তাই হয়েছে।" এই প্রকারে নানা কথা বলিয়া নিজকে সামলাইতেছেন। মায়ের আগমনীর সময় বলিয়াই ভাব এত ঘনীভূত। নিজের ভাব চাপিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া যেন একটু লজ্জিতও হইয়াছেন।

আজ শুভ সপ্তমী তিথি। ভোর ৪টা হইতেই নহবতে প্রাণমাতান আগমনী সুর বাজিতেছে। পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ঠাকুরঘরে আগমনী গান হইতেছে—

শারদ সপ্তমী উমা গগনেতে প্রকাশিল।
দশদিক আলো করে দশভুজা মা আসিল। ইত্যাদি

মহাপুরুষজী মধ্যে মধ্যে ঐ গানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতেছেন এবং আত্মহারা হইয়া মা মা করিতেছেন। পরে নিজেই গান ধরিলেন—

আর জাগাস্‌নে মা জয়া, অবোধ অভয়া
কত করে উমা এই ঘুমাল—
মা জাগিলে একবার ঘুম পাড়ান ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।
কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে
কি জানি কিরূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্ব্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।
উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যা বেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল।
উমার সঙ্গে জয়া যদি করবি খেলা
খেলবি গো জয়া জাগিলে মঙ্গলা,
দ্বিজ রাধিকা বলে উমা না জাগিলে
জগতে কে জাগিবে বল।

ক্রমে পূজামণ্ডপে পূজার আয়োজন হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই কর্ম্ম-ব্যস্ততা, সমগ্র মঠ উৎসব মুখরিত। ভগবানচন্দ্র সেন মায়ের মণ্ডপে বসিয়া দেবীর সম্মুখে মত্ত হইয়া পাখোয়াজ বাজাইতেছেন—হরগৌরীর স্তব, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল ইত্যাদি নানাপ্রকার বাজনা। ক্রমে পূজক ও তন্ত্রধারক প্রভৃতি মহাপুরুষজীর চরণে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া মায়ের পূজায় ব্রতী হইলেন। মঠের সাধুবৃন্দ ও বহু ভক্ত নরনারী দলে দলে আসিতেছেন। মহাপুরুষজী সকলকেই খুব আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আর বলিতেছেন, "খুব আনন্দ কর, মা এসেছেন। এখন আনন্দ, খালি আনন্দ।"

পূজা কতদূর অগ্রসর হইল, প্রতিমুহূর্ত্তে মহাপুরুষজী খুব ব্যস্তভাবে খোঁজ লইতেছেন। ক্রমে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিজে পূজার মণ্ডপে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া সেবকগণ পূজামণ্ডপে লইয়া আসিলেন। 'মায়ের শিশু' করযোড়ে মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে যে কি দৃশ্য, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। দেবীমণ্ডপ সাধুবৃন্দে পরিপূর্ণ, সকলেই ধ্যানাদিতে রত। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে মহাপুরুষজী মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উপরে আসিলেন। খুব গম্ভীর ভাব এবং তাঁহার মুখমণ্ডল একটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রদীপ্ত।

সারাদিন লোকের ভিড়। আজ অবারিত দ্বার,

মহাপুরুষজী সকলকেই প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তগণ ফিরিয়া যাইতেছেন। প্রসাদেরও বিরাট আয়োজন হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক পরিতোষপূর্ব্বক মায়ের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল।

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিকের পর মায়ের আরতি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরাত্রিকের শেষে সাধুবৃন্দ সমস্বরে দেবী-প্রণাম গাহিলেন—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
শরণাগত-দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

'জয় দুর্গামাইকী জয়' 'জয় মহামাইকী জয়' ধ্বনিতে মঠ প্রাঙ্গণ মুখরিত।

অতঃপর মঠের সাধুগণ কালী-কীর্ত্তন করিতেছেন। মা যেন সকলের প্রাণে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া সকলকে আনন্দ দিতেছেন। মঠের দুই চারি জন সাধু মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত। মহাপুরুষজীর আজ মোটেই ক্লান্তি বোধ নাই, সারাদিনই আনন্দে মাতোয়ারা। নিকটস্থ সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন, দেখ, মঠে মায়ের পূজো যেমন হয় তেমনটী আর কোথাও হয় না। এখানকার পূজো ঠিকঠিক ভক্তির পূজো। আমাদের কোন কামনা নেই, আমরা কেবল মায়ের প্রীতির জন্য এই পূজো করি। আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে, মা তুমি প্রসন্না হয়ে আমাদের ভক্তি বিশ্বাস দাও আর সমগ্র জগতের কল্যাণ কর। আমাদের অন্য কোন কামনা নেই। আহা, বল কি? এত সব শুদ্ধসত্ত্ব সাধুব্রহ্মচারী প্রাণপাত করে মায়ের আরাধনা করছে, মা কি প্রসন্না না হয়ে থাকতে পারেন? তোমরা সব সর্ব্বত্যাগী মুমুক্ষু, তোমাদের কাতর আহ্বানে মা সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? এখানে মায়ের যেমন প্রকাশ এমনটী আর কোথাও পাবে না। বাবা, ঠিক বলছি। লোক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে, কিন্তু এমন ভক্তি বিশ্বাস কোথায় পাবে? আমাদের হল সাত্ত্বিক পূজো। আহা, অ—খুব প্রাণদিয়ে এসব পূজাদি করে। শাস্ত্রে, আছে, প্রতিমা সুন্দর হলে, পূজক ভক্তিমান হলে এবং যিনি পূজা করাচ্ছেন তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ও নিষ্কাম হ'লে তবে সেই পূজায় ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হয়। এখানে সবই আছে, তাই মায়ের এত আবির্ভাব। মঠে সব ঠিক ঠিক হয়। আমাদের ঠাকুর এসেছিলেন ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য। এসব পূজাদি তো মাঝে এক রকম লোপ পেয়েই গিছিল। ঠাকুর এসে যেন এসবে একটা নূতন স্পিরিট দিয়ে গেলেন। তাই সব এখন পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে। এখন পুনরায় বহুলোক এসব পূজাদির অনুষ্ঠান করছে। আমাদের সেই বরানগর মঠ থেকেই স্বামীজি এ দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। তখন অবশ্য ঘটে মায়ের পূজো হ'ত। সেখানে একবার পাঠা বলিও হয়েছিল। সুরেশ বাবু সে পাঠাটা দিয়েছিলেন। তার পর সব পাঠাটা দিয়ে হোম করা হল। সে বলি দেওয়াতে মাষ্টার মশাই প্রভৃতি ভক্তদের প্রাণে খুব লেগেছিল। তাঁরা সকলে মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়ে ওবিষয় বলেন। তাতে মা বলেছিলেন, 'এদের প্রাণে যখন কষ্ট হচ্ছে, তা বলি না-ই বা দিলে,' এবং সেই থেকে আমাদের আর পাঠাবলি দেওয়া হয় না। তারপর মঠে স্বামীজিই প্রথম প্রতিমায় পূজো করেন। পূজোর কয়দিন মা-ঠাকরুণও এসে পাশের বাড়ীতে ছিলেন। তখন মা বলেছিলেন, প্রতি বৎসরই মা দুর্গা এখানে আসবেন।

জনৈক সন্ন্যাসী। আচ্ছা মহারাজ, পাঠাদি বলি ছাড়াও তো পূজো হতে পারে?

মহারাজ। তা কেন হবে না? তিনিই তো

বৈষ্ণবী শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের মঠে তো বলি হয় না, এখানে সাত্ত্বিক পূজো। শাস্ত্রে মানুষের প্রকৃতিভেদে ভিন্ন প্রকার পূজার ব্যবস্থা রয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক পূজায় বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নেই, তেমন কোন ঘটা নেই, খালি ভক্তির পূজো, নিষ্কাম ভাবে দেবীর প্রীতির জন্য পূজো। আমরাও সেই ভাবেরই পূজো করি। আর যারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক তাদের পূজাদিও সেই ভাবের সকাম পূজো—খুব জাঁকজমক করা চাই। তাদের জন্য শাস্ত্রে পশুবলি প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। সার কথা কি জান? তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করা। এসব পূজাদির উদ্দেশ্যও তো তাই। মাকে যদি একবার হৃদয়-মন্দিরে ঠিকঠিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় তাহলে এসব বাহ্যিক আড়ম্বরের আর দরকার হয় না। এখন মা এসেছেন, মাকে নিয়ে আনন্দ কর। আমাদের বাবা, বিসর্জ্জন নেই। মা আবার কোথায় যাবেন? মা এখানেই সদা বিরাজমানা। ঐ যে "সংবৎসরব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ" এসব বাইরের কথা, সাধারণ লোকের কথা। আমরা জানি যে, মা সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয় মন্দিরে রয়েছেন।*

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজের গুরুভক্তি এবং গুরুসেবা

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাহা, এম্‌-এস্‌সি

শ্রীগৈণিনাথ হইতে শ্রীনিবৃত্তিনাথ যে উপাসনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি জ্ঞানেশ্বর মহারাজকে দিয়াছিলেন। আদিনাথ হইতে গৈণিনাথ পর্য্যন্ত যে পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ যোগমার্গ সম্বন্ধীয়।

শ্রীনিবৃত্তিনাথ নিজ গুরুদেবের আজ্ঞায় আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনা নিজের ভ্রাতাদিগকে শিক্ষাদান করেন, এবং সেই হইতে মহারাষ্ট্র দেশে ভাগবত সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ভক্তিমার্গের প্রচার হইয়াছে। শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ যোগাভ্যাসে রত থাকিয়াও মহারাষ্ট্রদেশে ভাগবত-ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক। তিনি মহিষের মুখ হইতে বেদ উচ্চারণ করাইয়া এবং মৃত্তিকাকে চলচ্ছক্তি দান করিয়া যোগের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১২।১৬ শ্লোকের উপর যে টীকা করিয়াছেন তাহা যোগপ্রধান। কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিবার নিয়মাদির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া তিনি যোগের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞানসাধ্য যে শ্রীহরি তাঁহাতে পরম প্রেমসম্পন্ন ও তন্ময় হইয়া যাওয়া এবং জগৎ কৃষ্ণময় অনুভব করাই এমতে মুখ্য ভাগবতধর্ম্ম। এই উপদেশ গৈণিনাথ শ্রীনিবৃত্তিনাথকে এবং শ্রীনিবৃত্তিনাথ শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজকে দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নাথসম্প্রদায় কেবল যোগক্রিয়ায় রত থাকিতেন এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব অথবা ভক্তিমার্গ তাঁহারা যাজন করিতেন না, এরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। যোগমার্গের উপরই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল বটে কিন্তু শ্রীনিবৃত্তিনাথ এবং তাঁহার শিষ্যদের ভক্তিমার্গের উপর আস্থা কম ছিল না। খুব অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেই যোগমার্গ সাধন সম্ভবপর হয়। ভক্তিমার্গ অনেক সহজ বলিয়া জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এবং ছোট ও বড় সকলেরই অধিকার আছে। শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ শ্রীকৃষ্ণোপাসনার রহস্য অবগত হইয়া

* পূজার পূর্ব্বেই পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে। প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

ছিলেন। যে গুরুদেবের কৃপায় তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুগ্রহে তিনি জগৎ কৃষ্ণময় বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি যে নামামৃত আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার গীতাভাষ্য রচনায় পরিস্ফুট। এক্ষণে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজের চরিত্রে গুরুভক্তির প্রাধান্য বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। নেবাস গ্রামে শ্রীগুরু নিবৃত্তিনাথের সমক্ষে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ তদীয় "জ্ঞানেশ্বরী" পাঠ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবৃত্তিনাথের প্রসাদে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জ্ঞানেশ্বরীর প্রত্যেক অধ্যায় ব্রহ্মতত্ত্বে ভরপুর। শ্রীগুরুর কৃপায় পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিয়া "পরে হইলাম" বলিয়া তাঁহার অনুভব হইয়াছিল। গুরু-কৃপা ব্যতীত সকল সাধন ব্যর্থ হয় এবং এই এক সাধনায়ই সর্ব্বসাধন সিদ্ধ হয়, এই প্রকার তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ, ভস্মলেপন, জটা ধারণ, জপ তপ, যজ্ঞ দান, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়ন ইত্যাদি অনেক প্রকার সাধন আছে সত্য, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের পদ্ম-হস্ত মস্তকের উপর না পড়িলে এই সকল ফলপ্রদ হয় না।

(১) জ্ঞানেশ্বরীর মঙ্গলাচরণের ২২-২৪ পয়ারে জ্ঞানদেব বলিয়াছেন, "আমাকে যিনি এই সংসার-বন্যার ভীতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরু-দেব আমার অন্তঃকরণ অধিকার করায় আমার বিবেক জাগ্রত হইয়াছে। যেমন দিব্যাঞ্জন নয়নে লাগাইলে মানুষ অননুভূতপূর্ব্ব দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় এবং ফলে ভূমিমধ্যস্থ বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা চিন্তামণি হস্তগত হইলে যেমন মনোরথ পূর্ণ হয়, সেইরূপ শ্রীনিবৃত্তিনাথ কর্ত্তৃক আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। অতএব শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বদাই ভক্তি করিবে। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে উহার পত্র পল্লব সতেজ হয়, কিম্বা যেমন সাগরে স্নান করিলে ত্রিভুবনস্থ সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়, অথবা অমৃত গ্রহণে যেমন সর্ব্বরসের অনুভব হয়, সেইরূপ যিনি আমার ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।"

(২) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহারাজ বলিয়াছেন, "আমার উপর শ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপাহেতু বুদ্ধিরও অগম্য ইন্দ্রিয়াতীত যে কৈবল্য তাহা আমি নয়নে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিব এবং অরূপ অতীন্দ্রিয় যে ব্রহ্মজ্ঞানামৃত তাহাও আমি পান করিতে পারিব।" (৩২।৩৬ পয়ার)।

এই অধ্যায়ের শেষে তিনি একটী সুন্দর উপমা দিয়াছেন, যখন শ্রীজ্ঞানদেব শ্রীনিবৃত্তিনাথ ও সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজের জ্ঞান-বীজ বপন করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি সদ্‌গুণের বৃষ্টি করিয়া ত্রিবিধ তাপের আবর্জ্জনা ধৌত করত আমাদের অন্তঃকরণকে উর্ব্বর করিয়া আমার হাতের উপর তাঁহার হাত রাখিয়া জ্ঞান-বীজ জগতে ছড়াইলেন।"

(৩) দশম অধ্যায়ের প্রস্তাবনায় "আরাধ্য লিঙ্গ" যে শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে তিনি স্তুতি করিয়া (১।৯ পয়ার) বলিয়াছেন—

"হে গুরু মহারাজ! অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিদ্যারূপী কমলার বিকাশ আপনি। পরা-প্রকৃতি তরুণীর সহিত আপনি সুখ-ক্রীড়া করেন। সংসাররূপ অন্ধকার নাশ করিতে আপনি সূর্য্য-স্বরূপ। আপনার স্বরূপ অসীম। আপনার সামর্থ্যও যথেষ্ট। আপনি তূর্য্যগাবস্থার অর্থাৎ আত্ম-সমাধির লালনপালন সহজে করিতে পারেন। আপনি সর্ব্ব জগতের পালক, শুভ-কল্যাণরূপ রত্নের সংগ্রহ। সজ্জনবনকে সুগন্ধযুক্ত করিতে আপনি চন্দন-স্বরূপ। চন্দ্র যেমন চকোরকে শান্ত

করে, সেইরূপ আপনি ভক্তের চিত্তকে সন্তুষ্ট এবং শান্ত করেন। আপনি বেদ-জ্ঞান-রসের সাগর এবং সর্ব্ব জগতের মন্থনকারী যে কাম তাহাকেও আপনি মন্থন করেন অর্থাৎ আপনি মদন-মোহন। বিদ্যাপতি গণেশের কৃপায়ই আপনার প্রসাদ যখন লাভ হয়, তখন মূক বালকও বাগ্মী হয়। আপনার প্রেম-বাণীতে আকৃষ্ট হইলে মূর্খও প্রত্যক্ষ বৃহস্পতির সহিত গ্রন্থ-রচনা কার্য্যে স্পর্দ্ধা করিতে পারে। আপনার কৃপা-দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে অথবা আপনার কোমল হস্ত যাহার উপর রাখেন, সে জীব হইলেও শঙ্করের তুল্য হয়। অতএব আপনাকে আমি বারংবার নমস্কার করি।"

(৪) ভক্তিযোগের দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি সদ্-গুরুর কৃপা-দৃষ্টির স্তুতি করিয়াছেন। এখানেও নিজের যোগানুভবের উল্লেখ করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছেন। মহারাজ বলিয়াছেন, "হে সদ্‌গুরু-কৃপা-দৃষ্টি! আপনি শুদ্ধ, সুপ্রসিদ্ধ, উদার ও অখণ্ড-আনন্দ-বৃষ্টিকারক। আপনি অখিল প্রেম-ময় বলিয়া আপনার সেবকের ব্রহ্মানন্দে এবং আত্মসাক্ষাৎকার লাভের ইচ্ছা আপনি পূর্ণ করেন। মূলাধার চক্ররূপী শক্তির কোলে শিষ্য বালককে লইয়া যাইয়া কৌতুকের সহিত তাহাকে বৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং হৃদয়াকাশরূপ দোলনায় তাহাকে আত্ম-জ্ঞানের দোল দেন, তাহা হইতে জীব-ভাব সংকর্ষণ করিয়া লইয়া মন এবং প্রাণবায়ু তাহাকে খেলিবার জন্য দেন, পূর্ণামৃত তাহাকে পান করান। "অনাহত" নামক চক্রের সঙ্গীত পান করান এবং সমাধি দ্বারা তাহাকে শান্তি দান করেন। হে সদ্‌গুরু-কৃপাদৃষ্টি! আপনি বৈভবশালী, আপনি সেবকের কামনাপূর্ণকারী কল্পলতা সদৃশ। আমাকে গ্রন্থ-নিরূপণ করিতে আজ্ঞাদান করুন। নাস্তিকের দল, বিতণ্ডারূপ বক্রপথ, কুতর্করূপ হিংস্র শ্বাপদ সকলকে নষ্ট করিয়া দিন।" ইত্যাদি।

(৫) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "অমানিত্বম্" ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া "আচার্য্যোপাসনং" পদ উচ্চারিত হইবা মাত্রই জ্ঞানেশ্বর মহারাজ শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

"আচার্য্যোপাসনং" এই পদ শ্রুতিগোচর হইবা মাত্রই অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া গুরুভক্তির যে স্রোত বক্তৃতারূপে বাহির হইল, তাহা তিনি ৯২ পয়ারে বলিয়া গেলেন। গুরু-সেবার মহত্ত্ব বলিয়া গুরুভক্ত কিরূপে গুরু-প্রেমে লীন হইয়া যায়, সে গুরুকে কি প্রকারে স্মরণ করে, গুরুর ধ্যান পূজা কিরূপে করিতে হয়, গুরু পাদ-সেবা কিরূপে সম্পন্ন হয়, গুরুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজের উৎকট প্রেমে গুরু-পূজার সর্ব্বস্ব উপকরণ নিজেই কি প্রকারে হইয়া যায়, গুরুর গুণগানে কিরূপে লীন হইয়া যাইতে হয়, প্রেমোন্মত্ত হইয়া ইহার যে বর্ণনা তিনি করিয়াছেন, তাহা মূল পয়ারের অনুবাদ হইতেই আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব-জল-সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, কিম্বা সর্ব্ব মহাসিদ্ধান্ত-সহ বেদ-বিদ্যা যেমন ব্রহ্মবিদ্যায় পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ যে নিজের সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিয়াছে, সে প্রেমের সাহায্যে নিজের অন্তঃকরণে শ্রীগুরুর মূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া ধ্যান দ্বারা তাঁহার উপাসনা করে (৩৭২।৩৭৪)। আত্মা-নন্দের মন্দিরে শ্রীগুরুর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সে তাঁহার উপর ধ্যানামৃতের ধারা দিতে থাকে (৩৮৭)। ত্রিসন্ধ্যা শাস্ত্রোক্ত সময়ে জীবভাবের ধূপ জ্বালিয়া জ্ঞান-দীপে সে সর্ব্বদাই গুরুদেবকে আরতি করিতে থাকে (৩৮৯)। পরে ব্রহ্মৈক্যের নৈবেদ্য অর্পণ করেন। এই প্রকারে সে নিজে পূজারী হয় এবং শ্রীগুরু আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি হন।" ইত্যাদি।

হৃদয়-শুদ্ধি দ্বারা আনন্দ-মন্দিরে সে কিরূপে শ্রীগুরুকে ধ্যানামৃতের অভিষেক করে তাহা দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"কোন সময়ে সে শ্রীগুরুকে জননীরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে নড়িতে চড়িতে থাকে এবং স্তনপানের সুখ অনুভব করে। জ্ঞান বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শ্রীগুরুকে ধেনুমাতা কল্পনা করিয়া সে নিজেই তাঁহার বৎস হয়, আবার কোন সময় সে মনে করে, শ্রীগুরুদেব কৃপাজলসদৃশ, সে তাহাতে সন্তরণকারী মৎস্য। আবার কখনও মনে করে— শ্রীগুরু মাতা-পক্ষী, তাহার চঞ্চু হইতে সে আহার লইতেছে" (৩৯৬।৩০১)। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত শ্রীগুরুর ধ্যান ও গুরু-ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইল। এখন শ্রীগুরুর বাহ্যসেবা সম্বন্ধে বলা হইতেছে। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—

"শ্রীগুরুর সর্ব্ব পরিবার আমি সেবা করিব, এইরূপ উৎকট উৎকণ্ঠা সে পোষণ করে। শ্রীগুরুর ভূষণ আমিই হইব, দ্বারও আমিই হইব, দ্বারপালও আমিই হইব, ছত্র ও ছত্রধরও আমিই হইব, ইত্যাদি। শ্রীগুরুর আসন, অলঙ্কার, বস্ত্র, চন্দনাদি আমিই হইব। আমি পাচক হইয়া অন্নের মহানৈবেদ্য পরিবেশন করিব এবং আমার আত্মা দ্বারা তাঁহাকে আরতি করিব। শ্রীগুরুদেব যখন ভোজন করিবেন, তখন তাঁহার সহিত আমিই বসিব এবং ভোজনান্তে আমিই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে তাম্বূল প্রদান করিব, তাঁহার প্রসাদী থালা আমিই ধুইব, তাঁহাকে শয্যায় আমিই শোয়াইব, পদসেবাও আমিই করিব, ইত্যাদি। যাহাতে শ্রীগুরু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি করিবেন, সেই সেই রূপ আমিই ধারণ করিব, তাঁহার রসনাতে যে রস মিষ্ট লাগিবে, তাঁহার নাসিকায় যে সুবাস ভাল লাগিবে, সেই রস এবং সেই সুবাস আমিই হইব। এই প্রকারে সর্ব্ববস্তু আমি হইয়া সকল প্রকারে গুরুসেবা আমি একাই করিব" (৪২১।৪৩০)।

তিনি জীবিত থাকাকালীন শ্রীগুরুকে কি প্রকারে সেবা করিবেন, এবং তাঁহার নশ্বর দেহ পাত হইলেও শ্রীগুরুর চরণ হইতে তিনি দূরে থাকিবেন না। কিরূপে? তৎসম্বন্ধে মহারাজ বলিতেছেন—

"এই দেহপাত হইলে এই দেহের মৃত্তিকাংশ শ্রীগুরুদেব যে স্থানে দণ্ডায়মান থাকিবেন সেই স্থানে মিশাইয়া রাখিব, আমার শ্রীগুরুদেব যে জলকে সকল সময়েই সহজে স্পর্শ করিয়া থাকেন সেই জলে আমার জলীয়াংশ এবং যে বাতি দ্বারা শ্রীগুরুকে আরতি করা হয় সেই বাতির তেজে আমার দেহের তেজাংশ মিশাইয়া রাখিব। শ্রীগুরুর চামর এবং পাখা যে স্থানে থাকে, সেই জায়গায় আমি আমার প্রাণবায়ুকে রাখিব, তাহা হইলে শ্রীগুরুর মূর্ত্তি সেবা ও স্পর্শ দুই-ই লাভ হইবে। যে যে স্থানে শ্রীগুরুর মূর্ত্তি থাকিবে সেই স্থানের আকাশে আমি আমার দেহের আকাশাংশ স্থাপন করিব (৪৩২-৪৩৬)।" ইত্যাদি।

গুরুভক্তে গুরুনিষ্ঠা কিরূপ অসীম এখন তাহাই শ্রীজ্ঞানদেব দেখাইতেছেন—

"গুরু-সেবাতেই যে নিজের জীবন ক্ষয় করে, যে গুরু-প্রেমে পুষ্ট হয়, যে গুরুর আত্মার একমাত্র আধার, যে গুরুকুলের যোগে নিজে কুলীন বোধ করে, যে গুরু-ভ্রাতাদের সহিত সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করে, গুরু সেবাই যাহার কার্য্য, গুরু-সম্প্রদায়ের নিয়ম যাহার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গুরুভক্তি যাহার নিত্যকর্ম্ম, গুরুই যাহার ক্ষেত্র, দেবতা, মাতা, পিতা ইত্যাদি এবং যে গুরুসেবা ব্যতীত নিজের হিতসাধনের উপযোগী কোন কর্ম্ম জানে না, শ্রীগুরুর দ্বারই যাহার সর্ব্বস্ব, যে গুরুর সেবকের সহিত নিজের ভ্রাতার মত প্রেমের সহিত ব্যবহার করে। যাহার বাক্য হইতে গুরুনামের মন্ত্র নিরন্তর উচ্চারিত হয় এবং গুরুবাক্য ব্যতীত যে অন্য কোন শাস্ত্রের ধার ধারে না, গুরুর চরণামৃত ত্রিভুবনের সর্ব্বতীর্থ হইতে যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, শ্রীগুরুদেব চলিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পদ হইতে যে ধূলিকণা পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয় তাহার

একটী মাত্র কণাও যে মোক্ষ-সুখের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতে উৎসুক" (৪৪৬-৪৫১)। ইত্যাদি।

(৬) চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপের বর্ণনা করিতেছেন—

"হে আচার্য্যদেব! আপনি সমস্ত দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞা-প্রভাতের সূর্য্য, এবং সকলের বিশ্রাম স্থান। আত্ম ভাবনার সাক্ষাৎকার আপনিই করাইয়া দেন। এই নানা পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির তরঙ্গ যাঁহার উপর উঠে সেই সমুদ্র আপনি। আপনি অখণ্ড কৃপার সমুদ্র শুদ্ধ আত্মবিদ্যার স্বামী। পৃথিবী, রবি, চন্দ্র, অনিল, বায়ুর প্রকাশক এবং প্রেরক আপনি। যে পর্য্যন্ত আত্ম-স্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ না হয় সে পর্য্যন্ত বেদের বর্ণনা-শক্তি খুব ভাল রকমে চলে, কিন্তু কোন রকমে সেই আত্ম-শক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেদ এবং আমি দুই-জনেই নিস্তব্ধ হইয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়ি" (১-১৫)।

এই প্রকারে পরমপুরুষ শ্রীগুরুদেবের স্তুতি করিয়া পরে বলিতেছেন—

"হে বিশ্বের বিশ্রামস্থান শ্রীগুরুদেব। আপনার অনুগ্রহ-চন্দ্রদ্বারা আমার স্ফূর্ত্তির পূর্ণিমার উদয় হউক, সেই পূর্ণিমার দর্শনলাভ ঘটিবামাত্রই আমার জ্ঞান-সাগরে বান ডাকিয়া উঠিবে এবং নূতন রসের প্রবাহ উঠিয়া তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইবে (২৩-২৪)।" এই প্রসঙ্গের প্রথম ১৫ পয়ার গুরুস্তুতি এবং শেষ ১৫ পয়ার গুরু-শিষ্য-সংবাদ। এই দুই ভাগের একত্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্রীনিবৃত্তিনাথের সগুণ মূর্ত্তিতেও বিশ্বাত্মক পরাৎপর পুরুষোত্তম পরমাত্মার পূর্ণ তাদাত্ম্য শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ অনুভব করিয়াছিলেন। পরব্রহ্ম বস্তু, বোধক শ্রীগুরু ও বোদ্ধা শিষ্য এই তিন জনের মধ্যে যে পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহা সেই ঐক্য-বেদীর উপর হইতে দর্শন না করিলে 'জ্ঞানেশ্বরীর' গুরু-স্তবনের রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। উপাস্য এবং উপাসকের পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানে উপাসনা ভাঙ্গিয়া যায়, দ্বৈত-পণ্ডিত এইরূপ আশঙ্কা করেন। অভেদ ভক্তির মাহাত্ম্য জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজের গ্রন্থের অনেক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন (১৮শ অধ্যায় ১১৫১ পয়ার)। অদ্বৈত-ভক্তি-সুখ অনুভব যোগ্য এবং বর্ণনাতীত। এ সম্বন্ধে মহারাজ "অমৃতানুভবে" এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পর্ব্বত-গাত্রে যেরূপ দেব, মন্দির এবং পার্ষদাদি ভক্তগণ অঙ্কিত করা যায়, সেইরূপ একত্বে ভক্তির ব্যবহার কি জন্য হইবে না? তরঙ্গ যেমন সর্ব্বতোভাবে সাগরের সঙ্গে অভিন্ন থাকে, সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরি অর্থাৎ শ্রীগুরুর সহিত অভিন্ন থাকাই হইতেছে বাস্তবিক ভক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু, ব্রহ্মবোধক শ্রীগুরু এবং বোদ্ধা শিষ্য এই তিনের পূর্ণ ঐক্যভাবই প্রকৃত ভক্তি।

(৭) পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রস্তাবনাতে (১-২৮) শ্রীগুরুর চরণ-মানস-পূজা করিয়া থাকিলেও শ্রীগুরুর কৃপাতে নিজের বাক্য-বৈভব এবং সৌভাগ্য কিরূপ অলৌকিক হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতেছেন—

"হৃদয়রূপ মঞ্চের উপর শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্থাপন করিব, ঐক্য-ভাবের অঞ্জলি করিয়া সর্ব্ব ইন্দ্রিয়রূপ পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিব, একনিষ্ঠতা-রূপ জল দ্বারা ধৌত করিয়া নির্ম্মল বাসনারূপ চন্দন লেপন করিব, প্রেম রূপ পাকা সোনার নূপুর করিয়া শ্রীগুরুদেবের সুকোমল চরণে পরাইব, অব্যভিচার ভাব দ্বারা শুদ্ধ যে প্রেম, সেই প্রেমের আংটী শ্রীগুরুদেবের পদনখে পরাইব, আনন্দ সুবাসপূর্ণ অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রস্ফুটিত অষ্ট-দল কমল তাঁহার উপর স্থাপন করিব, অহংকাররূপ ধূপ জ্বালিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে "সোঽহম্"রূপ নিরঞ্জন দ্বারা আরতি করিব, ঐক্যভাব দ্বারা আলিঙ্গন দান করিব, আমার দেহ ও প্রাণ এই দুইটী কাষ্ঠ-পাদুকা (খড়ম) শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে রাখিয়া ভোগ ও মোক্ষ বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিব"। ইত্যাদি।

মনোযোগপূর্ব্বক এই সমস্ত আলোচনা করিলে তন্ময়তা আসে।

(৮) ষোড়শ অধ্যায়ের প্রস্তাবনা অত্যন্ত লম্বা। ইহা সবিস্তার আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ লম্বা হইয়া পড়িবে, সেইজন্য সংক্ষেপে দুই চার কথা বলিয়া শেষ করিব। মহারাজ বলিতেছেন—

"জগদ্রূপ প্রতিভাসকে নাশ করিয়া অদ্বৈতরূপ কমলের প্রকাশক শ্রীগুরুদেব উদয় হইয়াছেন। সেই সূর্য্য অজ্ঞান রূপ রাত্রিকে নাশ করিয়া জ্ঞান এবং অজ্ঞান-নক্ষত্রদ্বয়কে গিলিয়া ফেলিয়া জ্ঞানী পুরুষের নিকট আত্মবোধের সুদিন আনিয়া দেন। সেই সূর্য্যের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইলে জীবরূপ পক্ষী আত্ম-জ্ঞানের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া দেহ-ভাবের বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সেই সূর্য্যের উদয় হইলে বাসনাজড়িত দেহরূপ কমলের কোষে বন্দীকৃত চৈতন্যরূপ ভৃঙ্গ একেবারে বন্ধনমুক্ত হয়। (ভেদ-ভাবরূপ নদীর উভয় তীরে) শাস্ত্রাদি শব্দরূপ কর্দ্দমে আটকাইয়া, অজ্ঞানরূপ সায়ংকাল সময়ে বুদ্ধি ও বোধরূপ চক্রবাক পক্ষিযুগল বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব ও ঈশ্বররূপ নদীর উভয়কূলে বিয়োগজনিত দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকে, সেই বুদ্ধি ও বোধরূপ চক্রবাকযুগল ব্রহ্মরূপ আকাশে এই সূর্য্যোদয়ের প্রকাশ দ্বারা একত্র হইয়া আনন্দিত হয়। সেই সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেদ-বুদ্ধিরূপ অন্ধকার-রাত্রি শেষ হইয়া যোগমার্গের প্রবাসী আত্ম-প্রত্যয়ের রাস্তাতে বাহির হইয়া পড়ে। সেই সূর্য্যের বিবেকরূপ কিরণ-স্পর্শ হইলে জ্ঞানরূপ সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া পড়ায় সংসাররূপ জঙ্গল পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, ইত্যাদি। সেই সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা কৈবল্য-মুক্তির শুভ দিবস নিরন্তর লাভ হয়। দিন রাত্রের প্রান্তের অতীত সেই জ্ঞান সূর্য্য দেখিবার কাহার অধিকার আছে? তিনি স্বপ্রকাশ। এই প্রকার চৈতন্যরূপ সূর্য্য যে শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজ তাঁহাকে আমি বারংবার নমস্কার করি; কারণ, বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিলে বাক্যের দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।"

(৯) সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রস্তাবনা ছোট হইলেও তাহা আবাধ্য শ্রীগুরুদেবের স্তুতিতে পূর্ণ, যথা—

"হে শ্রীগুরু মহারাজরূপ গণেশ! এই নাম-রূপাত্মক বিশ্বের ধান্দা আপনার যোগসাধনার দ্বারা দূরে পলায়ন করে, অতএব আপনাকে নমস্কার। ত্রিগুণরূপ তিন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জীবদশায় বদ্ধ আত্মা আপনার স্মরণে মুক্তিলাভ করে। আপনার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অজ্ঞান, তাহার নিকট আপনি "বক্রমুখ" (গণেশের বক্রমুখ), কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন তাহার নিকট সর্ব্বদাই আপনি সরল। আপনার দিব্যদৃষ্টি দেখিলে বোধ হয় যে, তাহা অত্যন্ত লাজুক ও সূক্ষ্ম, কিন্তু সেই দৃষ্টির উন্মীলনে এবং নিমীলনে আপনি উৎপত্তি ও প্রলয় স্বভাবতঃই ঘটাইয়া থাকেন। আপনি প্রবৃত্তিরূপ কাণ নাড়িলেই মদ-রস দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, সেইজন্য জীবরূপ কাল-ভৃঙ্গ গণ্ডস্থলে বাস করে। তাহাতে যেন মনে হয় যে, নীলকমল দ্বারা আপনার পূজা করাই তাহাদের ইচ্ছা। ইহার পর আপনি নিবৃত্তিরূপ অন্য কাণ নাড়িলে অন্তর্মুখী বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া সেই সর্ব্ব পূজার শেষ হয় এবং আপনি আত্মরূপে ভাসমান হন, ইত্যাদি। আপনি সর্ব্ববন্ধনের নাশ করিয়াই জগদ্বন্ধু, এই প্রকারের ভাব উৎপন্ন হইয়া ভক্তের আনন্দ-বৃত্তি আপনার শরণ গ্রহণ করে। হে মহারাজ! দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ায় তাহার নিজের দেহভাব পর্য্যন্ত থাকে না, কিন্তু যে আপনাকে ভিন্ন বোধ করে এবং যে নিজের দৃষ্টির সমক্ষে রাখিয়া আপনাকে প্রাপ্তির জন্য নানা প্রকারের যাগ-যজ্ঞাদি করে, তাহার নিকট হইতে আপনি দূরে থাকেন। আপনার জন্ম-পত্রিকা হইতে "মৌন' ই আপনার নাম হইয়াছে, সেইজন্য

আপনাকে স্তুতি করার ইচ্ছাই বা কেন? যাহা যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা যদি সকলেই মায়া-জনিত, তবে আপনার ভজন থাকে কোথায়? আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে করিয়া আপনার পূজা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে ভেদভাব মানিলে আত্মদ্রোহ উপস্থিত হয়, এমতাবস্থায় আপনার সম্বন্ধে কিছু না করাই হইতেছে আপনার পূজা"। ইত্যাদি।

(১০) অষ্টাদশ অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণ (১।২৯) অত্যুৎকৃষ্ট। মহারাজ বলিতেছেন—

"হে নির্দ্দোষ পরমেশ্বর। আপনি সর্ব্ব প্রকার ভক্তের কল্যাণকারী, জন্ম-জরারূপ মেঘমণ্ডলের বিনাশক প্রভঞ্জন, সর্ব্ব অমঙ্গল বিনাশক, বেদ শাস্ত্ররূপ বৃক্ষের ফল। হে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেব। আপনি বিরাগী জনের প্রেমদাতা, কালের প্রচণ্ড বেগবাধাদানকারী হইয়াও সর্ব্ব কালের অতীত। হে স্বয়ংপ্রকাশদেব। এই জগদ্রূপ মেঘকে আশ্রয়দানকারী আকাশ আপনি। যে মূলস্তম্ভের উপর এই বিশ্ব দণ্ডায়মান, সেই স্তম্ভও আপনি। আপনি জন্ম-জরারূপ সংসারের বিনাশক, জ্ঞানরূপ উদ্যাননাশক হস্তী, শম দম সাধন করিয়া কাম-মদের নাশক এবং দয়ার সাগর। কামরূপ সর্পের দর্প আপনি হরণ করেন, আপনি ভক্ত-মন্দিরে প্রজ্বলিত দীপ। হে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর! কল্পনাতীত অদ্ভুত ফলদাতা কল্পবৃক্ষ আপনি। আত্মজ্ঞানরূপ বৃক্ষের বীজ উদ্গম হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার স্থল আপনি। যাঁহার বিশিষ্ট লক্ষণ মনও জানিতে পারে না কিম্বা বাক্য দ্বারাও উচ্চারণ করা যায় না, এই প্রকার যে আপনি, সেই আপনাকে উদ্দেশ করিয়া নানা প্রকারের শব্দ রচনা করিয়া কত রকমে আপনার স্তুতি করিলাম। আপনার বিশেষ লক্ষণ বলিবার জন্য যে যে বিশেষণের প্রয়োগ করা হইল, সে কিছুই আপনার সত্য-স্বরূপ নয়, ইহা মনে করিয়া এই বর্ণনা দ্বারা আমি কেবল লজ্জিতই হইলাম।"

তবে এতক্ষণ এত রকমে স্তুতি করা হইল কেন? তাহার উত্তরে মহারাজ বলিতেছেন—

"যে পর্য্যন্ত চন্দ্র উদিত না হয়, ততক্ষণ যেমন সাগর নিজের সীমাতে বদ্ধ থাকে, চন্দ্র যেমন সোমকান্ত মণি দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করাইয়া লয়, বসন্তের সমাগমে যেমন বৃক্ষরাজির অজ্ঞাতে তাহাদের অঙ্গে পল্লবের নূতন নূতন অঙ্কুর বাহির হয়, সূর্য্য-কিরণ স্পর্শে যেমন কমলিনীর সঙ্কোচ দূরীভূত হয় কিম্বা জলসঙ্গে যেমন লবণের দেহভাব নষ্ট হয়, সেইরূপ হে গুরু মহারাজ! আপনার স্মরণ হওয়া মাত্রই আমি নিজকে নিজে ভুলিয়া যাই, পরে পেট ভরিয়া আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়া মনুষ্য যেমন ঢেকুর তোলে, হে গুরু মহারাজ! আপনিও আমার দশা সেইরূপ করিয়াছেন এবং বাক্য কেবল আপনার স্তুতি করিবার জন্যই লাগিয়া থাকে।"

জ্ঞানেশ্বরীর উপসংহারে গ্রন্থকর্ত্তা অভিমান পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—

"যাহা হইতে সমুদ্রের জল, জলের মিষ্টত্ব, মিষ্টত্বের সৌন্দর্য্য, বায়ুর গতিরূপ বল, আকাশের বিস্তার, জ্ঞানের উজ্জ্বল রাজ বৈভব, বেদের সুমিষ্ট বাণী, সুখের উৎসাহ, সংক্ষেপে সর্ব্ব বিশ্বরূপাকার প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের উপর উপকার করেন, সেই সমর্থ সদ্‌গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথ আমার অন্তরে বিরাজমান, এমতাবস্থায় আমি মারাঠী ভাষায় গীতার যথাসাধ্য বিচার করিয়াছি তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শ্রীগুরু-নামের পর্ব্বতের উপর মাটীর দ্রোণাচার্য্য-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া একলব্য ধনুর্ব্বিদ্যাতে দক্ষ হইয়া ত্রিজগতে বরেণ্য হইয়াছিলেন, চন্দনের (in point of lustre) সহবাসে বৃক্ষরাজিও চন্দনের মত সুগন্ধযুক্ত হয়, বশিষ্ঠের রক্তবস্ত্র (loin cloth) তেজে সূর্য্যের সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, এ সমস্তই প্রসিদ্ধ আছে। আমি ত সচেতন মানব এবং আমার সদ্‌গুরু এত বলবান যে, কেবল নিজের কৃপা-কটাক্ষে শিষ্যকে আত্মপদের উপর বসাইতে পারেন। প্রথমে দৃষ্টি পরিষ্কার থাকা দরকার, এবং তাহাতে সূর্য্যের সাহায্য লাভ হইলে দেখা যাইবে না এরূপ বস্তু থাকিতে পারে কি?"

প্লেটোর কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

"Plato is philosophy and philosophy is Plato"

প্লেটো জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং সক্রেটিশের প্রধান শিষ্য। সক্রেটিশের মতই তিনি প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁহার জীবনও ছিল হিন্দুঋষিদিগের ন্যায় উচ্চচিন্তায় পূর্ণ। প্লেটো ও ক্যান্ট অধ্যয়ন করিলেই পাশ্চাত্য দর্শনের মর্ম্মগ্রহণ করা যায়। প্লেটোর জীবন ও দর্শন অভেদ ছিল। সক্রেটিশ ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ, সুতরাং তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের জীবন যে সত্যানুভূতিতে উদ্ভাসিত হইবে উহা আশ্চর্য্য নহে। ডেলফির দৈববাণী সক্রেটিশকে গ্রীসের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিলেও আমিত্বশূন্য জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, "কেবলমাত্র আমি এইটী জানি যে, আমি কিছুই জানি না।" "আত্মানং বিদ্ধি" এই বেদ বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া সক্রেটিশ বলিলেন, "Gnothi Seanton" (Know thyself), "নিজেকে জান," কারণ তাঁহার মতে নিজেকে জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। প্লেটো সক্রেটিশের নিকট এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে, বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব হইলেও মানুষের আত্মজ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব। আলশিবাইডিস্ (Alcibiades) বলেন যে, একবার সক্রেটিশ চব্বিশ ঘণ্টা আত্মানুভূতিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সক্রেটিশের মন অধিকাংশ সময় উচ্চচিন্তারাজ্যে বিচরণ করিত।

সক্রেটিশের মত ঋষির সংস্পর্শে আসিয়া প্লেটোর জীবনে মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। প্লেটোর বয়স যখন মাত্র আটাশ বৎসর তখন তাঁহার গুরু দেহত্যাগ করেন। কিন্তু সক্রেটিশের প্রভাব প্লেটোর জীবনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। প্লেটো সক্রেটিশের এত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি অসভ্য না হইয়া গ্রীক, পরাধীন না হইয়া স্বাধীন, এবং স্ত্রীলোক না হইয়া পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সর্ব্বোপরি আমি যে সক্রেটিশের সময়ে জন্মিয়াছি, সেইজন্য আমি ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ।" প্লেটো তাঁহার গুরুর চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়াছেন। সক্রেটিশ ও প্লেটোকে একই মুদ্রার উভয় পার্শ্ব বলিলে অতিরঞ্জিত হইবে না। প্লেটোর 'রিপাব্লিক' (Republic)) ফিডো (Phaedo) প্রভৃতি পুস্তক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত। কোরাণ সম্বন্ধে ওমর যাহা বলিয়াছেন, "রিপাব্লিক" সম্বন্ধে এমার্সনও তাহাই বলিয়াছেন। ওমর কোরাণ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার গ্রন্থাগারসমূহ দগ্ধকর, তাহাদের মূল্য এই একটী পুস্তকের (কোরাণের) মধ্যে নিহিত। কবি শেলির মতে প্লেটোর লেখার মধ্যে ন্যায়, কবিতা, দর্শন ও নীতির অপূর্ব্ব সমাবেশ সঙ্গীতের ঝঙ্কারের ন্যায় ধ্বনিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪২৭ অব্দে প্লেটো এথেন্সের কোন ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং অশীতিবর্ষ বয়সে ৩৪৭ অব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জ্ঞান-বৃদ্ধ প্লেটোর মৃত্যু-বিবরণ অতিশয় অদ্ভুত। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে তাঁহার বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে প্লেটো শিষ্যগৃহে উপস্থিত হইয়া আমোদ-

প্রমোদকারীদের সহিত মিলিত হইলেন। রাত্রিতে সকলে যখন আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল, তখন বয়োবৃদ্ধ দার্শনিক গৃহের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন। তিনি একটী চেয়ারে নিদ্রিত হইলেন। প্রাতে বন্ধুগণ তাঁহাকে জাগাইতে আসিয়া দেখেন প্লেটো মহানিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। নীরবে নিশীথে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন! এথেন্সবাসী তাঁহার মৃতদেহের অনুগমন করিয়া যথাযোগ্য সৎকার করিল। তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল ছিল বলিয়া তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। ক্যান্টের মত তিনি বোধ হয় চিরকুমার ছিলেন, কারণ তাঁহার বিবাহ বা দারাপুত্রের উল্লেখ কোথাও নাই। তাঁহার সবল ও প্রসারিত স্কন্ধদ্বয়ের জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল পেটো। তিনি যোদ্ধারূপে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দুইবার প্রতিযোগিতামূলক খেলায় তিনি পুরস্কার লাভ করেন। পেটো ঐশ্বর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হন। তিনি একজন শক্তিশালী ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। সক্রেটিশকে মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দেশের গণতান্ত্রিক নেতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ নহে মনে করিয়া বন্ধুগণ তাহাকে বিদেশ ভ্রমণে যাইতে পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী প্লেটো খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে বিদেশযাত্রা করেন। তিনি প্রথমে মিশর ও পরে সিসিলি ও ইটালী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি প্যালেষ্টাইন এবং ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কাল ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। কথিত আছে যে, তিনি গঙ্গাতীরে হিন্দু সাধুদের নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। প্লেটোর মতবাদ ও উপাখ্যানগুলির সহিত হিন্দু-দর্শন ও পুরাণের সাদৃশ্য দর্শনে প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ স্যর উইলিয়াম জোন্স বলেন, বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না যে, গ্রীসদেশীয় পিথাগোরাস ও প্লেটো এবং ভারতীয় ঋষিগণ একই উৎস হইতে তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দর্শনের ইতিহাস লেখকগণের মতে 'ভাববাদ' (Doctrine of Ideas) চিন্তাজগতে প্লেটোর প্রধান আবিষ্কার। মাতা শিশুর জন্য প্রাণদান করে, যোদ্ধা দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করে এবং দার্শনিকও স্বীয় মতবাদ প্রচার ও প্রমাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। মাতা, যোদ্ধা ও দার্শনিক এই তিনজনের যে একটী সাধারণ ভাব আছে তাহা সদ্‌ভাব (Idea of the Good); এই ভাবই সকলের অনুপ্রেরণার উৎস। সদ্‌বস্তু বা সদ্‌ব্যক্তির সত্তার বিদ্যমান। সদ্‌বস্তু বা সদ্‌ব্যক্তি বিনাশশীল কিন্তু সদ্‌ভাবটী নিত্য। সুন্দর ফুল, সুন্দর মুখ ও সুন্দর আকাশের অন্তরে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা অধিকতর সত্য ও স্থায়ী। ভাব হইতেই বস্তুর উৎপত্তি। সত্য শিব ও সুন্দরের ভাবময় সত্তার সন্ধান প্লেটো মানুষকে দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্লেটো আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্লেটোর মতবাদ (Platonism) হইতেই খ্রীষ্টান 'মিষ্টিসিজ্‌ম' এবং 'নিও প্লেটোনিজ্‌মের' জন্ম। সুতরাং প্লেটোর প্রভাব পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম ও দর্শনের উপর গভীর ভাবেই রেখাপাত করিয়াছে। রাজনীতি বিষয়েও প্লেটোর চিন্তারাশি সম্পূর্ণ অভিনব। আমরা যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি, তিনি এইরূপ এক 'উটোপিয়া'র (Utopia) কথা বলিতেন। গণতন্ত্রে তাঁহার আস্থা ছিল না। জনসাধারণ চিন্তাশীলতাবর্জ্জিত। তাহারা শাসকগণের পথানুসরণ করে মাত্র। তাই তিনি বলিতেন যে, যতদিন জ্ঞানী ও দার্শনিক রাজা দেশ শাসন না করে, সমাজ বা শহর হইতে ততদিন অসৎ ও

অন্যায় দূরীভূত হইবে না। মানুষের প্রকৃত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ তাঁহারাই অবগত হইতে সমর্থ। রাজা বা নেতার জীবনে রাজনীতি ও তত্ত্বজ্ঞান সম্মিলিত না হইলে সমাজেও শান্তি বিরাজ করিবে না। যে রাজা রাজ্য অপেক্ষা দার্শনিক জ্ঞান বেশী ভালবাসিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিতে সক্ষম। প্লেটোর রামরাজ্যের স্বপ্ন অসম্ভব হইলেও উহা অলীক নহে। শুনা যায়, রোমসম্রাট মার্কাশ অরোলিয়াস্ এইরূপ একজন দার্শনিক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য-সম্পদ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান এত অধিক ভালবাসিতেন যে, যে যুদ্ধে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হন, সেই যুদ্ধে গমন করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় প্রাসাদে রোমস্থ প্রধান পণ্ডিতগণের সঙ্গে তিনদিন যাবৎ ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। সংকল্পিত 'উটোপিয়া' গঠনের সুযোগ পাইয়া প্লেটো একবার নিজেকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৭ অব্দে সিসিলির রাজা ডাইওনিসিয়াস সিসিলিকে 'উটোপিয়া'তে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্লেটোকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু ডাইওনিসিয়াস প্লেটোর উপস্থিতিতে প্রমাদ গণিলেন। তিনি দেখিলেন, প্লেটোর পরামর্শমত চলিলে হয় তাঁহাকে দার্শনিক হইতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ ঘটিল। রাজ্যহানির ভয়ে রাজা প্লেটোকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন। প্লেটোর বন্ধু ও শিষ্য আন্নিসেরিশ শেষে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। সে যাহাই হউক, প্লেটোর আদর্শ কিয়ৎপরিমাণেও অন্ততঃ কার্য্যে পরিণত না করিলে যে রাষ্ট্রের কল্যাণ অসম্ভব এই বিষয়ে মনীষিগণ একমত। শাসকের দৃষ্টি কেবল মাত্র জড়-জগতের উপর নিবদ্ধ থাকিলে তিনি শাসিতের কেবল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতেই সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু মানুষ ত কেবল শরীর নহে, তাহার একটা মন এবং সর্ব্বোপরি তাহার একটা আত্মাও আছে। অন্নচিন্তা না থাকিলে যদি মানুষ শান্তির অধিকারী হইত, তবে আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মেনি ও রাসিয়া প্রভৃতি দেশে এত অশান্তি কেন? প্রাচীন ভারতের রাজা বা দেশ-শাসকগণ সকলেই প্লেটো-কল্পিত জ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। রাজা অশোক, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির এবং বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর জীবনে প্লেটোর রাজনৈতিক আদর্শ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। রাজার জীবন আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞানালোকে আলোকিত না হইলে প্রজার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে। হিট্‌লার, মুসোলিনি, লেনিন, ষ্টালিন, ডিভ্যালেরা প্রভৃতি দেশনায়কগণের জীবনে রাষ্ট্র-নৈতিক প্রতিভার প্রাচুর্য্য, অথচ জ্ঞানসাধনের একেবারে অভাব বলিয়া তাঁহাদের শাসিত দেশে অন্যায়, অসাম্য, অত্যাচার ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

'রিপাবলিক' পুস্তকের পঞ্চম ভাগে প্লেটো 'মতম্' (opinion) এবং 'তত্ত্বম্' (science) এর মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে অপরাবিদ্যা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহাই 'মতম্', আর 'তত্ত্বম্' হইতেছে পরাবিদ্যা বা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান। উক্ত গ্রন্থের সপ্তম পুস্তকে প্লেটো উভয় প্রকার জ্ঞানের বিষয় নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন: মনে করুন, ভূগর্ভে একটী গুহা আছে। গুহার যে গভীর প্রদেশে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, তথায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নির পরপার্শ্বে একটী নিম্নপ্রাচীর। এই প্রাচীরের উপর মানুষ ও পশুর মূর্ত্তি যাতায়াত করিতেছে। মূর্ত্তিগুলির ছায়া গুহার প্রস্তরময় প্রান্তে পতিত হইতেছে। পশ্চাতে মুখ ফিরাইতে অক্ষম কতকগুলি কারারুদ্ধ ব্যক্তি দিনের পর দিন এইগুলি দেখিয়া মনেকরে যে, ইহারা বাস্তব। প্রাকৃত জনের নিকট এইরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সত্য বলিয়া

প্রতীত হয়, উহাদের মধ্যে একজন কয়েদী মুক্ত হইয়া যখন জ্বলন্ত অগ্নি দর্শন করে, তখন তাহার ভ্রান্তি দূর হয়। এবং যখন সে গুহার উপরে উঠিয়া সূর্য্যালোকে পৃথিবীর সবকিছু দেখে, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যেন মানুষকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সত্যের অনুভূতি ও আলোক আসিয়া যখন মানুষকে অসীম জ্ঞান-সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তখন সে বিস্ময়াপ্লুত হয়।" প্লেটো বলেন যে, এই উচ্চতম জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাভ করা যায় না। পঞ্চেন্দ্রিয় যখন ধীর, স্থির ও নিষ্ক্রিয় থাকে এবং মন ইন্দ্রিয়সকল বিযুক্ত হইয়া একাকী পারমার্থিক সত্তার অন্বেষণ করে, তখনই এই জ্ঞান (introvision) উপস্থিত হয়। তিনি বলেন যে, আত্মার বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তর্মুখী করাই শিক্ষা ও সাধনার চরম উদ্দেশ্য।

'রিপাব্লিক' গ্রন্থে প্লেটো জীবাত্মার তিনটী অংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক-গণের মত তিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার দর্শনের সহিত বেদান্তের নিকট-সাদৃশ্য দেখা যায়। প্লেটোর মতে আত্মার তিনটী অংশের নাম, the wisdom-loving, the honour loving and the gain-loving এই গুলিকে হিন্দুদর্শনের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গীতায় যেমন দেহ ও দেহীর মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ প্লেটো দেহকে জড় ও নশ্বর এবং আত্মাকে চৈতন্য ও চিরস্থায়ী বলিয়াছেন। 'ফিডোতে' (Phaedo) সক্রেটিশের প্লেটো দেহসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন: "আহার ব্যতীত শরীর স্থায়ী হয় না, আবার আহার-গ্রহণের জন্য শরীরে নানা রোগ জন্মে। সেইজন্য সত্যান্বেষণে বিঘ্ন হয়। শরীরের প্রতি আসক্তি বশতঃ ভয়, দুঃখ ও দৈন্য প্রভৃতি নির্বুদ্ধিতায় মন পূর্ণ হয়। শরীর ধারণের জন্যই বাসনার উৎপত্তি ও অর্থোপার্জ্জনের প্রয়াস। আর অর্থের অন্বেষণ করিতে গিয়াই জীবনে ও সমাজে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। কাজেই ইহজীবনে দেহজ্ঞান বিমুক্ত না হইলে আত্মার সাক্ষাৎলাভ হয় না। দেহের প্রতি অনুরাগ যতই কম হইবে ততই সত্যের দিব্য কিরণে জীবন জ্যোতির্ম্ময় হইবে।" প্লেটোর কথাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি একজন হিন্দু ঋষি ছিলেন। যোগীদের ন্যায় প্লেটো সত্যলাভের জন্য মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া একাগ্রতাসাধন করিতে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। প্লেটো বলেন, "তখনই শ্রেষ্ঠচিন্তা মনে জাগ্রত হয়, যখন দর্শন ও শ্রবণ এবং সুখ ও দুঃখ মনে স্থান না পায়। শরীরের চিন্তা মনে যখন একেবারেই উদিত হয় না, তখনই মানুষ সত্যের সম্মুখীন হয়। দেহের চিন্তাই আমাদের আত্মচিন্তা ভুলাইয়া দেয়। দেহের দ্বারাই মন জগতের সহিত যুক্ত হয়, সুতরাং দেহ ভুলিতে পারিলেই জগৎ-সম্বিৎ তিরোহিত হইবে। চিত্তশুদ্ধি অর্থে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করা। দেহ-বন্ধনই আত্মার অশুদ্ধি সম্পাদন করে। দেহ-কারাগারে আত্মা বন্দী। বিদেহাবস্থায় আত্মা স্বীয় মহিমায় মগ্ন।" মৃত্যু সম্বন্ধেও প্লেটোর বাণী বেদান্তবাণীর ন্যায় সহজ ও সরল। প্লেটো বলেন: "মৃত্যুর সময় মানুষের নশ্বরাংশ বা শরীরই বিনষ্ট হয় কিন্তু অবিনশ্বর বা আত্মা নিরাপদে অন্য লোকে গমন করে। দেহ গ্রহণের পূর্ব্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল, সুতরাং দেহত্যাগের পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে।" আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হইলে ইহজীবনের পূর্ব্বজন্ম ও পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করিতে হয়। যাহা আদিঅন্তহীন তাহা অগ্র পশ্চাৎ সমান ভাবেই সীমাহীন। প্লেটো বার বার জন্মগ্রহণ বা আত্মার শরীর ধারণে বিশ্বাস করিতেন। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হইলে মানব জীবনের অধৈর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা অনেক

পরিমাণে কমিয়া যায়। সম্মুখে যখন অনন্ত জীবন বিস্তৃত রহিয়াছে, তখন ইহজীবনে যাহা লাভ হইল না তাহা পরজীবনে লাভ করা সম্ভব, সুতরাং অস্থিরতা অনাবশ্যক। প্লেটো বলেন যে, যে মানুষ বা জাতি আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, তাহার মঙ্গল ও মুক্তির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ। প্লেটোর মতে মৃত্যুর দ্বারাই মানবের জ্ঞান পরীক্ষা হয়। মৃত্যুর আগমনে মানুষ যদি শোকমগ্ন হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি জ্ঞানী নন, তিনি দেহে আসক্ত। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিশ্চয়ই সম্পদ এবং সম্মানেও অনুরক্ত, তাহা ব্যতীত শোকের কারণ আর কি হইতে পারে? তাই সক্রেটিশ ও প্লেটো উভয়েই জীবিতাবস্থায় মৃত্যু অভ্যাস করাকেই ধ্যান বলিতেন।

জার্ম্মান বেদবিৎ মোক্ষ মূলার তাঁহার "Chips from a German Workshop" নামক পুস্তকে বলেন যে, তুলনামূলক পৌরাণিক উপাখ্যান অধ্যয়নের পক্ষে বেদের মূল্য অসীম। বেদ ব্যতীত এই বিদ্যা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইত। বিভিন্ন দেশের উপকথা পাঠে দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিরাজমান। এই সাদৃশ্য দর্শনে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, একই উপাখ্যান যেন সামান্য বিকৃতভাবে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে বোধহয় 'ভারতবর্ষে' আয়ারলণ্ডের উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে, রামায়ণ মহাভারত হইতেই উহা গৃহীত হইয়াছে। 'ইসপ্‌স্ ফেবল' গুলি আজ ইংরাজি ভাষায় এত জনপ্রিয় হইলেও এইগুলি ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। প্লেটোর উপাখ্যান গুলিতে ভারতীয় ভাব পরিস্ফুট। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে মৃত্যুর পর আত্মার গতি বিষয়ে একটী উপাখ্যান আছে: পাম্ফিলিয়ান আর্ম্মিনিয়াসের পুত্র আর (Er) কোন যুদ্ধে নিহত হয়। কয়েক দিন পর তাহার মৃতদেহ ভস্মীভূত করার জন্য চিতার উপর রক্ষিত হইলে যেন আরের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হয় ও তখন সে প্রেত লোকের বিবরণ দিতে আরম্ভ করে। সৎকর্ম্ম ও সৎচিন্তা দ্বারা মানুষ কিরূপে স্বর্গে গমন করিয়া শান্তিতে থাকে এবং পাপও অন্যায়াচরণ দ্বারা লোকে কিরূপে দুঃখ ও কষ্টে পতিত হয়, তাহা বিশদরূপে উক্ত উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। প্লেটো যে হিন্দুদের ন্যায় কর্ম্মবাদ এবং পুনর্জ্জন্মবাদ বিশ্বাস করিতেন, তাহা উক্ত উপাখ্যান হইতে জানা যায়। গল্পের শেষে প্লেটো গ্লোকনকে (Glaucon) লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন, "এস, আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মা অমর, জীবনের ভাল মন্দ সবই তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারেন। আমরা যদি ইহলোকে উন্নত জীবন যাপন করি, পরলোকে আমরা সুখ ও শান্তির অধিকারী হইব।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সময় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, পতি পত্নীকে, পিতা পুত্রকে এবং মানুষ মানুষকে যে এত ভালবাসে তাহা কামজনিত দৈহিক আকর্ষণ নহে। সর্ব্বভূতে একই আত্মা অবস্থিত আছেন, আত্মার এই সর্ব্বব্যাপিত্ব ও ঐক্য দেহমনের দ্বারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া পুনর্মিলিত হইতে চাহেন। প্রেম মিলন চাহে, কিন্তু তাহা শরীরের বা মনের মিলন নহে। আত্মার মিলনই প্রেমের উদ্দেশ্য। প্লেটো তাঁহার 'সিম্পোসিয়াম' (Symposium) গ্রন্থে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রেম দৈহিক ক্ষুধা বা ইন্দ্রিয় লালসা নহে, উহা আত্মার একীভূত হইবার ইচ্ছা মাত্র। প্রেমের এই আধ্যাত্মিক অর্থ অবগত হইলে প্রেমের প্রকাশ অন্য আকার ধারণ করিবে। প্রেম পশুত্ব নহে, উহা দেবত্বের বিকাশ।" প্লেটো বলেন, "আমরা এক ছিলাম, কর্ম্ম দোষে বহু হইয়াছি।

বহুত্ব হইতে একত্বে যাইবার আত্মার যে অভিলাষ তাহাই প্রেম নামে অভিহিত।"

'সিম্পোসিয়ামে' প্লেটো পারমার্থিক সত্য অন্বেষণের কথা বলিয়াছেন। বস্তুর অন্তরে যে ভাব বা 'আইডিয়া' বিদ্যমান, তাহা উপলব্ধি করাই সাধনার লক্ষ্য। ধর্ম্ম জীবনে গুরুর আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সাধনার প্রারম্ভে সৌন্দর্য্যানুরাগ বিঘ্ন রূপে দেখা দেয়। প্লেটোর মতে এই বিঘ্ন দূর করিতে হইলে একটী সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ সমস্ত সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। প্রেমের পরিধি যতই বৃহৎ হয়, ততই মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হয় কিন্তু উহার পরিধি ক্ষুদ্র হইলে উহা বন্ধনের কারণ হয়। প্লেটো বলেন: "ধীরে ধীরে মনকে আত্মার সৌন্দর্য্যের অভিমুখে লইয়া যাইতে হইবে। দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আত্মার সৌন্দর্য্য যে অধিক উহা হৃদয়ঙ্গম করিলে সৌন্দর্য্যাগার ঈশ্বরের দিকে মন আকৃষ্ট হইবে। যদি আমরা সত্যসত্যই সৌন্দর্য্যপ্রিয় হই তবে কুৎসিত দেহস্থ সদ্‌গুণ ব্যক্তির প্রতিও আমাদের অনুরাগ হইবে। সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা ঈশ্বরকে সাধকের প্রথমাবস্থায় ভালবাসা সম্ভব নহে বলিয়া প্রথমে সদ্‌গুণব্যক্তিকে ভালবাসা আবশ্যক। মানুষ কুশ্রী হউক বা সুশ্রী হউক, তাহাতে যদি সদ্ভাব বা সদ্‌গুণ থাকে তাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত।"

প্লেটো বলেন: "সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে হইবে। তাহাই আমাদের গম্যস্থান। কারণ, সৌন্দর্য্য বস্তু বা ব্যক্তিতে, স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে থাকে না, উহা আত্মার গভীরতম প্রদেশে শ্রবণ দর্শন ও স্পর্শনাতীত স্থানে অবস্থিত।" প্লেটোর সংজ্ঞা "Beauty is in Itself," বেদান্তের শিবসুন্দরের সংজ্ঞার মতই। আকৃতি পরিবর্ত্তিত এবং দেহ বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি বা নাশ নাই। ম্যান্টিনার স্ত্রীলোকের মুখে প্লেটো সক্রেটিশকে বলিতেছেন যে, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শনই মানুষের শ্রেয়ঃ। উহা ব্যতীত জীবন অর্থহীন ও মূল্যহীন। এইরূপ দর্শকই অমৃতত্ব লাভ করেন। প্লেটোর নিকট সত্য, সৌন্দর্য্য ও শিব একে তিন, তিনে এক।

প্লেটোর শেষ জীবন শান্তিপূর্ণ ছিল। তখন তাঁহার শিষ্যগণ গ্রীসের সর্ব্বত্র সমাদৃত। তাঁহার প্রধান শিষ্য এরিষ্টটল দীর্ঘ পনের বৎসর তাঁহার নিকট দর্শনশিক্ষা করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল ম্যাসিডোনিয়ার সম্রাট আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেটের গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্লেটো তাঁহার 'একাডেমি' নামক বিদ্যালয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। বীর একাডেমাসের নামানুসারে প্লেটোর স্কুলের নাম রাখা হইয়াছিল 'একাডেমি'। এথেন্সের পশ্চিম প্রান্তে বৃক্ষলতা, প্রস্তরমূর্ত্তি ও মন্দিরাদি পরিশোভিত সুবৃহৎ উদ্যানে 'একাডেমি' অবস্থিত ছিল। বহু শতাব্দী যাবৎ উক্ত 'একাডেমি' প্লেটোনিক স্কুলের অধীন ছিল। এরিষ্টটলও প্লেটোর মত 'লিসিয়াম' নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'এপেলো-লিসিয়াসের' মন্দিরের নিকটে এই শিক্ষালয় স্থাপিত হওয়ায় উহার নাম 'লিসিয়াম' হইয়াছিল। উদ্যানের শীতল ছায়ায় এরিষ্টটল বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য-দিগকে দর্শনের উপদেশ দিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে ভ্রমণশীল শিক্ষক Peripatotic বলিত। এজন্য তাঁহার দর্শনকেও লোকে 'পরিপেটোটিক দর্শন' বলে। প্লেটোর শিষ্য হইলেও এরিষ্টটল গুরুর দর্শন হুবহু গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য লজিক বা ন্যায়দর্শনের স্রষ্টা ছিলেন এরিষ্টটল। ইহার দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে গৌতমের 'ন্যায়' প্রচলিত হয়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এরিষ্টটল স্বীয় ছাত্র আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সহিত ভারতা-গমন করিয়া ভারতীয় ন্যায় ও দর্শন অধ্যয়ন করেন।

গ্রীসের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শোলনের বংশধর ছিলেন প্লেটো। উইল ডুরান্ট (Will Durant) তাঁহার "Story of Philosophy" পুস্তকে প্লেটোর সম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি শোলনের মত শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং সক্রেটিশের মত শিক্ষা দিতেন। বিদেশ ভ্রমণকালে ইটালিতে তিনি পিথাগোরাসের এক নিরামিষভোজী শিষ্য সম্প্রদায়ের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া তাঁহাদের সংযম ও ত্যাগের জীবনের সহিত পরিচিত হন। পিথাগোরাসের প্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই। দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন ছিল যীশু খ্রীষ্টের নীতি। নীট্‌শের মতে বলবানের সাহসিকতাই নীতি, কিন্তু প্লেটো বলেন যে, সমষ্টির সাম্য বিধানই নৈতিক আদর্শ। প্লেটোর 'রিপাব্‌লিক্' গ্রন্থের দশটী অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে, উহাদের সহিত হিন্দু-দর্শনের কিরূপ নিকট সাদৃশ্য আছে তাহা আরউইক সাহেব তাঁহার "Message of Plato" নামক পুস্তকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রীসদেশের অন্যান্য দার্শনিকগণের সহিত হিন্দু-দর্শনেরও অদ্ভুত ঐক্য আছে। বেদান্তের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়নে আমাদের দর্শনজ্ঞান আরও পরিপক্ক হইবে। দর্শন রাজ্যের শেষ কথা বেদান্ত বলিয়া দিলেও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার ক্রম ও বিচার পদ্ধতি দ্বারা বেদান্তের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইবে। পশ্চিম দেশীয় দর্শনও বেদান্তের দ্বারা পরিপুষ্ট হইবে এবং তাহাদের যে সকল অভাব আছে, তাহাও দূরীভূত হইবে। একমাত্র বেদান্তই পূর্ণ প্রস্ফুটিত দর্শন-কুসুম। অন্যান্য দর্শন যেন উহার আংশিক বিকাশ মাত্র। অবশ্য অন্যান্য দেশের দর্শনগুলির গম্যস্থানও এক, কিন্তু উদারতার অভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতে অক্ষম। 'আইডিয়া'বাদকে প্লেটোর প্রকৃত দর্শন বলিলে প্লেটোকে ভুল বুঝা হইবে। প্লেটোর অন্তরের খবর পাইতে হইলে তাঁহার বর্ণিত আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্ব, কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতিকে 'আইডিয়ার' উপরে স্থান দিতে হইবে।

সৃজনের আনন্দ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন, বি-এ

সৃজনের যে আনন্দ বিজনে বসিয়া সেই শুধু জানে
ডুবাইয়া এ নিখিল বিস্ময়ের মাঝে আপনার ধ্যানে
কাটায়েছে যেই জন প্রহরে প্রহরে পাগলের প্রায়
নদীতটে কি পর্ব্বতে নিতান্ত একাকী ভুলি আপনায়।
কোন্ ক্ষণে ধীরে ধীরে অতি সঙ্গোপনে প্রাণের সৈকতে
হিমকণা সম ঝরে সত্যের সন্ধান সিক্ত কোথা হ'তে।
শিহরণ সর্ব্ব অঙ্গে আশিস্ সিঞ্চন কি যেন পরশে!
এতক্ষণ রুদ্ধ বাক্ ছিল যেই জিহ্বা কি যেন হরষে,
উদ্গ্রীব কহিবারে অজানা কতই কথার ঝঙ্কার,
এই বুঝি প্রকৃতির অনাহত নাদ প্রচ্ছন্ন ওঙ্কার?
সে মুহূর্ত্তে ভাগ্যবান স্পন্দিত আত্মার করে উদ্ঘাটন,
মহানন্দে ক'রে ফেলে শব্দিত মোহন সুর উচ্চারণ;
সেই বাক্য কাব্য হয় সুন্দর মঙ্গল সত্য ও অমর,
সৃজনের পূর্ণানন্দ বিকসিত তার প্রত্যেক অক্ষর।

ভরত-মিলন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর

বাল্মীকির রামায়ণে ভরতের চরিত্র আদর্শ স্থানীয়। 'রামায়ণী কথা'য় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে ভরতের চরিত্র নিখুঁত। অন্য চরিত্রে কোনও না কোনও দোষ স্পর্শ ঘটিয়াছে। কিন্তু ভরতের চরিত্র সর্ব্ব বিষয়েই অনবদ্য। মহর্ষি বাল্মীকির রোপিত রামায়ণ-কল্পতরুর অমৃত ফল এই ভরত চরিত।

মহাকবি তুলসীদাসের রাম চরিত-মানসে এই চরিত্র যেন আরও আস্বাদ্য, আরও উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে প্রাণের কি অসীম দরদ দিয়া তিনি রাম চরিত গড়িয়াছেন। তিনি বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভক্তির রঙে তুলিকা ডুবাইয়া তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে কোথাও মিলে না। মহর্ষির রাম মহাপুরুষ, শৌর্য্য বীর্য্য ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ মণ্ডিত মহামানব। তুলসীদাসের রাম পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি পরমাত্মা, পরমপুরুষ। বাল্মীকির রাম আদর্শ মানব। তুলসীদাসের রাম স্বয়ং ভগবান। বাল্মীকির ভরত আদর্শ ভ্রাতা, তুলসীদাসের ভরত আদর্শ ভ্রাতা এবং আদর্শ ভক্ত। এই ভক্তির অন্তঃস্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মানবীয় আদর্শের বহু উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছে। ভরত ভক্তচূড়ামণি, রাম কে তাহা তিনি চিনিয়াছেন। কাজেই পৃথিবীতে এমন কোনও দুঃখ ক্লেশ যাতনা নাই, যাহা তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

বাল্মীকির গ্রন্থে, ভরত যখন মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে রাম লক্ষ্মণ সীতা মাতার ষড়যন্ত্রে নির্ব্বাসিত, পিতা সেই শোকে পরলোকগত, তখন তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, কৈকেয়ী যখন বলিলেন তিনি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। "ত্বৎপ্রিয়ার্থং ময়া কর্ম্ম কৃতমেতৎ জুগুপ্সিতম্।" তখন তিনি মানবেরই মত ক্রোধে অধীর হইলেন। কৈকেয়ীকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় নির্ম্মমভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সে তিরস্কারে ভরতের বিজাতীয় ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি মাতাকে 'বাপ তুলিয়া' গালাগালি দিতেও ত্রুটী করিলেন না। ন ত্বং কেকয়রাজস্য দুহিতা বিজিতাত্মনঃ। কিন্তু তুলসীদাসের রামায়ণে ভরত অল্প কথায় বলিলেন, 'তাঁহার এমনই দুর্ভাগ্য যে তিনি কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন'। 'সূর্য্য-বংশে যার জন্ম দশরথ যার পিতা, রাম যার জ্যেষ্ঠ, বিধাতা কেন কৈকেয়ীকে তাহার জননী করিলেন ?'

হংসবংশ দসরথু জনকু রাম লখণু সে ভাই।
জননী তুঁ জননী ভঈ বিধিসন কছু ন বসাই॥

বশিষ্ঠ যখন তাঁহাকে রাজপদ গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন তিনি উত্তর করিলেন,

গুরু বিবেক-সাগর জগু জানা।
জিন্হহি বিশ্ব কর-বদর সমানা॥
মো কহঁ তিলক সাজ সজ সোউ।
ভয়ে বিধি বিমুখ বিমুখ সব কোউ॥

অযোধ্যাকাণ্ড

'গুরু জগতে বিবেক সাগর বলিয়া বিখ্যাত তাঁহার নিকট বিশ্ব করামলকের (বদরী) ন্যায়, তিনি আমাকে রাজতিলকে সাজাইতে চাহিতেছেন!

ইহাতে বুঝিলাম যে বিধাতা যখন বিমুখ তখন সকলেই বিমুখ।' পরে তিনি বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম যাত্রা করিলেন। রাণীরা (কৈকেয়ী পর্যন্ত) সেই সঙ্গে গেলেন। সৈন্য সামন্ত, অশ্ব গজ চতুরঙ্গ বাহিনী চলিল। সমস্ত অযোধ্যা উজাড় করিয়া নরনারী সেই সঙ্গে ছুটিল। গঙ্গাপার হইবার কালে শৃঙ্গবের-পুর (নিষাদের রাজ্য) যাইতে হইল। নিষাদ মনে করিলেন, ভরত রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য রামের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন। তিনি তখন সৈন্য সাজাইলেন, ভরতকে বাধা দিবেন। এ পর্যন্ত বাল্মীকির রামায়ণে এবং তুলসীদাসের রামায়ণে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু তুলসীদাস গুহককে দেবচরিত্র করিয়া আঁকিয়াছেন। গুহক ভরতাগমনের সংবাদ পাইয়া তাহার নিজের স্বল্প সংখ্যক বনচর সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সব নৌকা সরাইয়া লও, দেখি ভরতের কটক কেমন করিয়া পার হয়। ভাই সকল, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ভরতকে পার হইতে দিব না; রামের কোনও অনিষ্ট হইতে দিব না। সাহস করিয়া দাঁড়াও, আজকার যুদ্ধে একজনও ফিরিব না।" সৈন্য সাজনা হইতেছে ইতিমধ্যে বামে হাঁচি পড়িল। যাহারা ইহার অর্থ জানে তাহারা বলিল, 'কই, অমঙ্গলের চিহ্ন ত দেখিতেছি না। যুদ্ধ হইবে না। ভরত কোনও দুরভিসন্ধি লইয়া যাইতেছেন না।' তথাপি নিষাদ সতর্ক রহিলেন। কিন্তু ভরতের প্রেম দেখিয়া তিনি গলিয়া গেলেন। রাম যেখানে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সীতার অঞ্চলের স্বর্ণরেণু যেখানে তখনও পড়িয়াছিল, ভরত সেই স্থান দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। যে তরুতলে তাঁহারা রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, ভরত সে শিশু তরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; চরণচিহ্নের ধূলি চোখে লাগাইয়া লইলেন। তখন নিষাদ বুঝিতে পারিলেন যে রাম কেন ভরতকে অতুলনীয় মনে করিতেন। রাম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন 'নাথ সপথ পিতু চরণ দোহাঈ। ভয়উ ন ভুবন ভরত সম ভাঈ॥' বুঝিলেন রাম ভরতের নাম জপ করেন কেন এবং ভরতই বা রাম নাম জপ করেন কেন? ভগবান ও ভক্ত কেহই কম নহেন। মনে হয়, সময়ে সময়ে ভক্তের রূপের অন্তরালে গিয়া ভগবান লুকাইয়া রহেন, যাহাতে ভক্তের রূপ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে!

নিষাদের নিকট ভরত সর্ব্ব প্রথম শুনিলেন, রাম বলিয়াছেন ভরতের মতো ভাই বহু তপস্যার ফ'ল মিলে। এতদিন ভরত সন্দেহে সংশয়দ্বিধায় কাল যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার মনের ধারণা এই যে, তাঁহার মাতার কুকীর্তি লোকে তাঁহারই প্ররোচনার ফল বলিয়া মনে করিতেছে। এত বড় রাজ্যটা তিনি পাইয়া গেলেন, ইহা কি শুধু কৈকেয়ীর মন্ত্রণার ফল? কে তাহা সহসা বিশ্বাস করিবে? সুতরাং অযোধ্যায় তিনি মহা অপরাধীর মতো অনাহারে অনিদ্রায় কাল কাটাইয়াছেন। নিষাদের মুখে যখন শুনিলেন যে তাঁহার আবাল্য বন্ধু, তাঁহার জীবনের আদর্শ, সহায় সুহৃৎ ও অবলম্বন রামচন্দ্র ভরতগত-প্রাণ, তখন তাঁহার নৈরাশ্যের মধ্যে সান্ত্বনার বিদ্যুচ্চমক খেলিয়া গেল।

চিত্রকূটের শান্ত তপোবনে রাম ও ভরতের সাক্ষাৎ হইল। বাল্মীকির রামায়ণেও এই ভরত-মিলন একটি পরম রমণীয় ঘটনা। ভরত যত প্রকারে পারেন, রামকে বুঝাইলেন, রাজ্য পরিচালন করিতে তিনি অসমর্থ জানাইলেন, জ্যেষ্ঠের পাদমূলে হৃদয়ের সমস্ত প্রার্থনা লইয়া লুন্ঠিত হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ধার্ম্মিকদের আদর্শ, তিনি পিতৃসত্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না, ভরতের ন্যায় সর্ব্ব গুণের আধার ভাইয়ের জন্যও নহে। বাল্মীকির রাম বলিতেছেন, 'হে রাজন্ (ভরত অযোধ্যার রাজা ত বটে) তুমি ধর্ম্মানুসারে, ন্যায়ের বিধানে, পিতৃ-

পিতামহদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজ্য পালন কর, ফিরিয়া যাও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি সমস্ত কুশল হইবে। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া আমি তোমার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যতম পতিরূপে রাজ্য পালন করিব।' তখন জাবালি নামক ঋষি নানা প্রকার কুতর্কজালের অবতারণা করিয়া রামকে ফিরিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাম ধর্ম্মের সেই বিকৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। তিনি জাবালির উপদেশের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। তখন বশিষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিতে সলিল নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশে রামের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা ও তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী বিবৃত করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন যে, ঋষি জাবালি রামের মত লওয়াইবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অযোধ্যার রাজবংশতিলকেরা কখনও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। এমন সময়ে বনের সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ঋষিগণ রামের সত্য-সংকল্পের সমর্থন করিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাম সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভরতও বুঝিলেন যে, অতঃপর রামকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা বৃথা। তখন তিনি বলিলেন, 'আমার আর একটি নিবেদন আছে। বনবাসের কাল অতীত হইলে ফিরিয়া তুমি তোমার রাজ্যভার গ্রহণ করিবে, বল? তাহা হইলে আমি ন্যাসরক্ষার ন্যায় রাজ্য পালন করিতে পারি।' রাম বলিলেন, 'তাহাই হউক'। ঠিক সেই সময়ে বনের ঋষিগণ রামের জন্য কুশ-পাদুকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন, 'এই পাদুকা তোমার দাদার পায়ে পরাইয়া দেও এবং পরে তাহা লইয়া তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। এই পবিত্র পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তুমি রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারিবে। ইহাই মূলতঃ বাল্মীকির রামায়ণের ভরত-মিলন প্রসঙ্গ। কিন্তু মহাত্মা তুলসীদাস এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তির মন্দাকিনী বহাইয়াছেন। ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিয়া এত অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে কিছুই বলিতে পারিলেন না। এক এক বার চেষ্টা করেন, আর প্রেমে গলিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হায় হায়! আমি ত কিছুই তোমাকে বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। তোমার সম্মুখে আমি কি বলিতে পারি? ইচ্ছাময় তুমি, তোমাকে আমি কি বলিয়া অন্যথা করাইব? তবে তুমি অন্তর্যামী। তুমি ত সকলই জানিতেছ প্রভু। যাহা ভাল হয়, তাহাই কর। তাহাই আমাকে বলিয়া দাও। তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইবে? আমি বাঁচিব না।' রাম ভরতের মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার জীবন স্বরূপ। তোমার তুলনা জগতে এক মাত্র তুমি। বলিতে সংকুচিত হইতেছ কেন? তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া দেবগণ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ইন্দ্র সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, দোহাই তোমার একবার ভরতের রসনায় অধিষ্ঠিতা হও, নহিলে সৃষ্টি থাকে না। রাক্ষস-সংহার হয় না, যাগযজ্ঞ থাকিবে না। কৃপা কর। সরস্বতী বলিলেন, "তুমি ক্ষেপিয়াছ? ভরতকে টলাইতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও আছে? ভরত খাঁটি সোনা। আমি পারিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি গালি পাড়িতে পাড়িতে চলিয়া গেলেন। তুলসীদাসের ভরত-চরিত্র সূর্য্য-কিরণের ন্যায় নির্ম্মল। তাঁহার কাতরতায় সে দিন বোধ হয় পাষাণও গলিয়াছিল। কিন্তু রামের ধৈর্য্য টলিল না। রামকে ভরত বলিতেই পারিলেন না যে তুমি কিছুতেই বনে যাইতে পারিবে না। তিনি বলিলেন,

'আমিই পিতৃসত্য রক্ষার জন্ম বনে যাইতেছি। অথবা, যদি বল, আমরা তিন ভাই বনবাসে যাই। তুমি সীতাকে লইয়া ফিরিয়া যাও, অযোধ্যার অধিবাসী তোমাদের ছাড়া আর কাহাকেও চাহে না। তাহারা বলিয়াছে—

বিনু সিয়রাম ফিরব ভল নহীঁ।

সীতা ও রাম কে না লইয়া আমরা ফিরিব না।' রামচন্দ্র ভরতকে অনেক ধর্মোপদেশ দিলেন কিন্তু ভরত কিছু অবলম্বন বা নিদর্শন না পাইলে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, শান্তি পাইলেন না।

বিনু অধরে মন তোষ ন সাঁতী।

তখন ভরতের স্নেহের বশ হইয়া প্রভু আপন পায়ের খড়ম দিলেন।

প্রভু করি কৃপা পাবরী দীনহী।
সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হী॥

ভরত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কাহারও মধ্যস্থতা নাই। ভরত সেই খড়ম পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেঁ।
অস সুখ জস সিয়রাম রহে তেঁ॥

আনন্দ বিহ্বল ভরতের মনে হইল যেন সীতা রাম কাছে থাকিলে যে সুখ হইত, তাহাই পাইলেন।

গঙ্গা

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্

আমাদের দেশে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ কেহ বিদেশে সমুদ্রপারে পাড়ি দিয়াও সনাতনী রীতি ছাড়েন নাই, সঙ্গে গঙ্গাজল লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে নবীনসমাজে একটা চাপাহাসির শব্দ শোনা গিয়াছে, কেহ বা স্পষ্ট বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সম্ভাব্য বিদ্রূপের উত্তর দিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গাজল সঙ্গে রাখার সনাতনী রীতির পক্ষে বলিয়াছেন, "গীতা গঙ্গা হিন্দুর হিন্দুয়ানী"। আমরা কলিকালে বেদবেদান্ত জানি না, জ্ঞানমার্গের উচ্চকাণ্ডে আরোহণ করা আমাদের, সকলের কেন, অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি এই বিচার-বিতর্কের যুগেও গঙ্গাকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহি, গঙ্গাজলের ছিটে ফোঁটা দিলেই আমাদের যে সকল অশুচি দূর হয়, যাহা মলিনতায় পূর্ণ ছিল তাহাও যেন শুদ্ধ হইয়া যায়, যখন ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার সময় হয়, সকল ইন্দ্রিয় যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন আমরা সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করিবার কথা ভাবি, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রে ঐ নাম দিয়াই আমাদের আরম্ভ করিতে হয়। গঙ্গা আমাদের সকল তীর্থের কেন্দ্র, ব্যাপকতায় পাবনতায় যুগ যুগ ধরিয়া বহুলোকের ভক্তিচিহ্ন-ধারণে গঙ্গার সমান আর কোথায় পাইব?

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

আমাদের স্নান তর্পণের সময়েও এই ভাবে আমরা গঙ্গাকে পরম সমাদরে আহ্বান করিয়া লই, —যদি তীরে বাস করিবার সৌভাগ্য না-ই হয় তথাপি যেন কল্পনায় সাক্ষাৎকার লাভ করা চাই, —নহিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার নহে, যতখানি শুদ্ধি শুচিতা প্রয়োজন ততখানি যেন লাভ করিতে পারি নাই, আর ঐ নামেই যে সকল দুঃখ মিটিবে।

সাধক শুধু মাকে পাইয়া কিন্তু তীর্থকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, সে আরও উর্দ্ধের অবস্থা, তখন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় ?

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদের গানের দুইটি কলি বাতাসে ভাসিয়া আসে,—

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

গঙ্গা বিষয়ে গবেষণা আমাদের দেশের কোনও পণ্ডিত করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু প্রয়াগের জনৈক পণ্ডিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। গঙ্গার উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে যে সমস্ত প্রবাদ প্রবচন কাহিনী চলিত আছে, সাহিত্যে যে সব বিশেষ বিশেষ উল্লেখ আছে, তিনি তাহাদের একত্র সংগ্রহ করিতে চাহেন। আমাদের গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য জ্ঞানের গণ্ডী বিস্তার, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জাগতিক ব্যাপারে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া, প্রাবীণ্যের পরিচয় দেওয়া, আর তাঁহার উদ্দেশ্য একটু অন্য প্রকার, তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একত্র করিতে চাহিতেছেন, আর আমরা ও দুইটা পৃথক রাখিতে চাই। জানি না, তাঁহার কার্য্য কতদূর হইয়াছে, তবে তিনি দেশভ্রমণের দ্বারা, পণ্ডিতদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের দ্বারা, পত্র-প্রচার দ্বারা, কয়েক বৎসর ধরিয়া যে এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাহা জানি; আর ভরসা আছে, তাঁহার এই একাগ্র ও অকপট সাধনা আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষা না রাখিয়াও পূর্ণ হইবে, কারণ তাঁহার প্রেরণা অন্তর্লোকের বহির্লোকের নহে, বাহিরের তাগিদে বিষয় খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, শুনিয়াছি, কোন বিষয়ের এখন বাজারে বেশি চাহিদা তাহার খোঁজ লইয়াও কেহ কেহ "গবেষণা"য় প্রবৃত্ত হন! আমাদের বিদ্যাচর্চ্চায় এতই খাদ আসিয়া মিশিয়াছে, অন্তরের যোগ মূলে এতই কম। তবে বর্ত্তমানে বাহিরের প্রয়োজন ভিন্ন অন্য মাপকাঠিতে যদি আমাদের "গবেষণা"র বিচার হয়, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে একথা বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার এই গঙ্গানুসন্ধান ব্যর্থ হইবে না, তাহাতে অর্থাগমের উপায় না হইলেও পরমার্থ মিলিবার পথ দেখাইবে, এবং সেই অর্থে সার্থকও হইবে।

বাঙ্গালীর সাহিত্যে গঙ্গাকে স্মরণ করা হইয়াছে কি? সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা গঙ্গা কতটুকু দিয়াছে? নদীমাতৃক দেশে আমাদের জন্ম, "গাঙ্" আমাদের নিকটে সকল নদীর সাধারণ নাম। জীবনের প্রতিবিম্বরূপে সাহিত্যকে যদি ধরিয়া লই, তাহা হইলে অনেক বিষয়ে অনেক ফাঁকি তো ধরা পড়িবে,—আমাদের ভক্তিবিশ্বাস কত গভীর তাহাও জানিতে পারিব, সুতরাং আমাদের কাব্য-জগতের একটা পরিচয় এই ব্যাপারে লইলে মন্দ হয় না। প্রাচীন কাব্যে ও পুরাণে সৃষ্টির কথা বলিতে বলিতে কবিকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ব্যাপারও বর্ণনা করিতে হইত। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখা যাক। 'সুরধুনী কাব্য' এখন আধুনিক সাহিত্যের 'আত্মকথা'র মধ্যে গিয়াছে। প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র এখনও স্মৃতির অন্তরালে সরিয়া যান নাই। তাঁহার কথা দিয়া আরম্ভ করিলে দেখিতে পাইব,—হেমচন্দ্রের জাতীয়তার নবযুগের অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও গঙ্গার কথা বলিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। "হরি নামামৃত পানে বিমোহিত সদা আনন্দিত নারদ ঋষি" গঙ্গা-প্রশস্তি গাহিয়াছেন, রামনগরে কাশীরাজ-ভবনে গঙ্গার মূর্ত্তি দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়া সে মূর্ত্তির স্তব করিয়াছেন,—

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা কাহার রচিত মূরতি অই!
চন্দ্রবিভাস বদনমণ্ডলে করপুরে যেন শশী খেলই?

আবার পরম আত্মীয় মনে করিয়া গঙ্গার সহিত কবি আলাপ করিতেছেন,—যেন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ

পরিচয়, সেই সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের ছবি আঁকিয়াছেন, ছন্দও যেন সঙ্গে সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

কোথায় চলেছ তুমি গঙ্গে ?
শাল পিয়াল তাল
তমাল তরু রসাল
ব্রততী বল্লরী জটা
সুলোল ঝালর ঘটা
ছায়া করি সুশীতল
ঢেকেছে তোমার জল
চলেছে অচলরাজি ধরা-নীর অঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে আরও কত বঙ্গীয় কবি গঙ্গার স্তব বা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার সংগ্রহ হইলে আমাদের গঙ্গা-প্রীতির একটা বাস্তব পরিচয় পাওয়া যাইত। লোকক্ষয়কৃৎ কালের মাহাত্ম্যে অতীতের কত লেখক বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছেন, আবার কত লেখা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না! মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্র-লালের সেই গঙ্গাবন্দনা, যাহার অপরূপ রূপ ও অভিনব সুর গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ ও আমাদের অন্তিম ইচ্ছাকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছিল, এখন লোকে ইহাও ভুলিতে বসিয়াছে!

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত
অন্তিম শয়ানে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলধারা বরিষ
সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত
মম অঙ্গে—
—মা ভাগীরথী জাহ্নবী সুরধুনী
কলকল্লোলিনী গঙ্গে॥

প্রকৃতির প্রত্যেক অংশই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, তাহার মধ্যে নদীপ্রীতির কথা তিনি তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পদ্মার সঙ্গেই তাঁহার যোগের ইতিহাস মনে করি, গঙ্গার কথা ভুলিয়া যাই। শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তির পরিচয় দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝ'রে পড়্‌চে"। জীবনের সায়ংকালে কবি অতীত শৈশবের স্মৃতি বহন করিয়া বলিয়াছেন, "সেই আমাদের পুরানো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত-সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে,—ছোট শিশু যেমন ক'রে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুল্‌বো না।" গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ভাষায় প্রকৃতিতে আমরা যে সুষমার পরিচয় পাই, তাহা কি তবে আশৈশব সযত্নে পোষিত এই সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রতিচ্ছবি? বঙ্গভূমির কথা বলিতে গিয়া তিনি গঙ্গার কথা ভুলিতে পারেন নাই, ইহা অবশ্য স্বাভাবিক, শস্যশ্যামল দেশের কথায় "গঙ্গার তীর স্নিগ্ধসমীর" আপনি আসিয়া পড়ে; কিন্তু গঙ্গাতরঙ্গের পাবন প্রভাব কতখানি কবির ও পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাঁহার রচনার মধ্যে মিশিয়া তাহাকে সরস-সুমধুর করিয়া তুলিয়াছে, কে তাহার পরিমাপ করিতে পারিবে? যাহা হউক, কবির এই ঋণ-স্বীকৃতি যে কবিহৃদয়ের একটা সম্পূর্ণ নূতন দিক আমাদিগকে দেখাইল তাহাতে পাঠক মাত্রেই আনন্দিত হইবেন, এবং যাঁহারা সমালোচক তাঁহারা কবি-প্রকৃতিকে আর এক দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টিত হইবেন।

ভারতীয় নদী সম্বন্ধে সুপরিচিত দেশসেবক প্রবীণ কর্ম্মী কাকা কালেলকর একখানি সুন্দর পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহার হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাতে

সপ্তসরিতের কথা আছে, তাহারা সপ্তলোকমাতা। নদী মাতার মত পালন করে, দুগ্ধ পান করাইয়া পুষ্ট করে, সন্তানকে অদৃশ্য প্রভাবে কান্তিমান করিয়া তোলে—আর প্রত্যেক নদীরই স্বতন্ত্র রূপ আছে। মার্কণ্ডী সখীস্বরূপা, যমুনা রাণীর মত, গঙ্গা কিন্তু মাতৃরূপা। গঙ্গার প্রকৃতিও বিচিত্র! গঙ্গোত্রীর নিকটে সলীল ক্রীড়ায় সে কন্যাস্বরূপা, উত্তর-কাশীর দেবদারু-বহুল কাব্যময় প্রদেশে তাহার অন্য রূপ, কানপুর হইতে বাহির হইয়া ইতিহাসবিশ্রুত গঙ্গাপ্রবাহ, তীর্থরাজ প্রয়াগে যমুনার সহিত মিশিয়া লোকপাবন ত্রিবেণী-সঙ্গম,—প্রত্যেকটী শোভা নয়নকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। আবার প্রয়াগ হইতে বাহির হইয়া যখন গঙ্গা চলিতে আরম্ভ করিল, তখনই বা তাহার কি শোভা-সৌন্দর্য্য! কাকা কালেলকর গঙ্গাতে তখন গম্ভীর ও সৌভাগ্যবতী কুলবধূর ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। তখন হইতেই নানা দিক হইতে কত নদী আসিয়া গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করিতেছে,—মথুরা-বৃন্দাবনের স্মৃতি লইয়া যমুনা আসিতেছে, অযোধ্যা হইতে আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের স্মৃতি লইয়া সরযূ আসিয়াছে, দক্ষিণ হইতে আসিয়াছে চম্বল-নদী রাজা রন্তিদেবের কীর্ত্তিগাথা বহন করিয়া। তাই পাটনায় দেখিতে পাই কূলে কূলে ভরা পূর্ণতার কান্তিতে উদ্ভাসিত গঙ্গা, সুবিস্তীর্ণ প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের কথা মনে করাইয়া দিতেছে। তাহার পর গণ্ডকী আসিল তাহার বহুমূল্য কর-ভার লইয়া। তখন গঙ্গা যেন একটু সংশয়ে পড়িল,—কোন দিকে যাই, এতদিন পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে, কিন্তু ওদিকে আবার আসাম হইতে ব্রহ্মপুত্র ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার গতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে—মিলন তো অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অগ্রসর হইবে কে? উভয়েই যেন একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল; একটু যেন বিচার করিয়া লইল। দুই দিক হইতে দুই সম্রাট পরস্পর মিলিতে আসিতেছেন, দুই দেশ হইতে দুই জগদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ হইবে। তাহার পর বিচার শেষ হইলে উভয়েই দক্ষিণের পথ ধরিল,—দাক্ষিণ্য গুণেরই জয় হইল, পার্ব্বত্য উগ্রতা আর নাগরিক সমৃদ্ধি উভয়ে আসিয়া মিশিল সাগরের কোলে,—সীমাহীন অন্তহীন দুর্ব্বার অতল-স্পর্শ সাগরে আত্মদান করিল, আর সাগরে আসিবার পথে উভয়ের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইল, ভক্তি ও নম্রতা, বিনয় ও আত্মলোপ-প্রবৃত্তি আসিয়া পরস্পর সাক্ষাতের পথ সহজ করিয়া দিল—তখন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বহুমুখে সাগরে আসিয়া মিশিতে পারিল—"হরে মুরারে! হরে মুরারে!" ধ্বনি করিতে করিতে প্রবল জল-তরঙ্গ শত ঐরাবতের শক্তি ব্যর্থ করিয়া ছুটিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়?
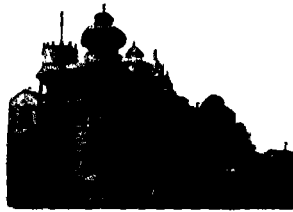
পরলোকে প্রমথচন্দ্র কর (পল্টুবাবু)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি প্রমথচন্দ্র কর (পল্টুবাবু) মহাশয় গত ২রা আগষ্ট, সোমবার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঠকবর্গের নিকট "পল্টু" সুপরিচিত। তিনি স্কুলে পাঠ করিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া বাল্যকালেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য দর্শন এবং সংসর্গ লাভ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় 'পল্টু'কে বলিতেছেন—"তোরও হবে। তবে একটু দেরীতে হবে।"

কম্বুলিয়াটোলার পরলোকগত রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র কর মহাশয় পল্টুবাবুর পিতা। পল্টুবাবু কলিকাতার অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দুস্থ জনসাধারণের হিতার্থে বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের একজন অকপট বন্ধু ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদ

ফিজি দ্বীপে স্বামী অবিনাশানন্দ—

ফিজি দ্বীপবাসী বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে স্বামী অবিনাশানন্দ বেদান্ত-প্রচার উদ্দেশ্যে গত ২৫শে এপ্রিল কলম্বো হইতে "মূলতান" নামক জাহাজে ফিজি দ্বীপে রওনা হন এবং অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বন্দরে পৌছিয়া ট্রেণযোগে সিডনি উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অষ্ট্রেলিয়ান শিষ্য ব্রহ্মচারী বিবেকচৈতন্য (মিঃ ওয়েলস্)-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৩ই মে তারিখে সিডনি হইতে তিনি "নিয়াগর" নামক জাহাজে নিউজিল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়া অক্ল্যাণ্ড সহর পরিদর্শনান্তর ২১শে মে তারিখে ফিজি দ্বীপের রাজধানী সুভা বন্দরে অবতরণ করিলে এই দ্বীপের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—মিঃ এম্-মুদলিয়র, সাধু কুপ্পুস্বামী, পণ্ডিত বিষ্ণুদেও, মেসার্স এম্-ডব্লিউ নাইডু, এম-টি খান, মরপ্পা গাউণ্ডার, কে-এস্ মুদলিয়র, কৃষ্ণাম্মা, অরুণাচলম্ পিলেই, মুরগাপ্পা রেড্ডি, নারায়ণ নায়ার, দেশীকান্, সদাশিবম্, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, পার্থসারথি মুদলিয়র, দুরাইস্বামী, রঙ্গস্বামী নাইডু, ভেনকাম্মা, পণ্ডিত খুদন সিং প্রভৃতি।

সঙ্গীতাদিসহ একটী বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজিকে শ্যামলাল বর্ম্মনের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তিনি অবস্থান করেন। তাঁহার উপস্থিতির পর হইতে দলে দলে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আসিতে থাকেন। তিনি বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হলে একটী বিরাট সভায় তিনি "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২শে মে অপরাহ্নে একটী বিরাট সভায় তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২৩শে মে প্রাতে তিনি মটরযোগে মকুবাণী (র) বওনা হন এবং রাস্তায় নওসুবি ও অন্যান্য অনেক স্থানে

স্বামী অবিনাশানন্দ

বহু লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে মাল্যাদিব দ্বাবা অভিনন্দিত করেন। মকুবাণী হইতে বকিরকি নামক স্থানে পৌঁছিলে তথায় সঙ্গম-স্কুলেব বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে একটী বিবাট সভায় স্বামীজিকে মানপত্র প্রদান করা হয়। তিনি এখানে তামিল, তেলেগু এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

এখান হইতে রওনা হইলে তাভুয়া, তগিতগি, বা, লোভু, নামুলি, লুম্বলুমা, মার্টিনটাব (নদী) নামক স্থানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবা হয়। শেষোক্ত স্থানে সঙ্গীতাদিসহ একটী বিরাট শোভাযাত্রা সহব প্রদক্ষিণ করিয়া একটী মন্দিরে আগমন করে। এখানে একটী মহতী সভায় স্বামীজিকে মানপত্র প্রদান কবা হয় এবং তিনি সকলকে ধন্যবাদ প্রদানান্তব হিন্দুস্থানী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মজীবন ও সাধন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৫শে মে এখানকার সঙ্গম-স্কুলের প্রাঙ্গণে একটী বিবাট সভায় স্বামীজিকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। ডাঃ মুখার্জ্জি এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখী কার্য্যের উল্লেখ করিয়া সকলের নিকট স্বামীজিব পরিচয় প্রদান করেন। স্থানীয় বালকগণ কর্ত্তৃক শ্রীবামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী সঙ্গীত গীত হইলে মেথডিষ্ট মিশনের মিঃ যোহন তামিল ও তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজিব একটী সুচিন্তিত বক্তৃতার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

প্যারিসে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ—

রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় ভক্তগণের অনুরোধে বেদান্ত প্রচারেব উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে স্বামী সিদ্ধেশ্ববানন্দ গত ১৭ই জুলাই বম্বে হইতে প্যারিস যাত্রা কবিয়াছেন।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১৯২০ অব্দে মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান কবেন। কয়েক বৎসর তিনি মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মুখপত্র 'বেদান্ত কেশরী'র সম্পাদকীয় বিভাগেব কার্য্যে ছিলেন। পরে তিনি মহীশূরে

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ

প্রেরিত হইয়া তথাকার আশ্রমেব সভাপতিরূপে প্রশংসাজনক কার্য্য করেন। অতঃপর মান্দ্রাজ

মঠের অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দ বেদান্ত-প্রচার উদ্দেশ্যে ইউরোপে প্রেরিত হইলে তিনি মাদ্রাজে আসিয়া তত্রত্য মঠের পরিচালন-কার্য্যে সাহায্য করেন। প্যারিসে রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের সম্পর্কে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, অনাড়ম্বর অমায়িক ব্যবহার এবং ঔদার্য্যগুণে মুগ্ধ। আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে তাঁহার বেদান্ত প্রচার-কার্য্যে সাফল্য কামনা করি।

ঘটিকার সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্তা মানদাসুন্দরী বসু রায় নব নির্ম্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজির প্রতিকৃতি সুদৃশ্য সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া যোড়শোপচারে পূজা, পাঠ, হোম ও ভোগাদির পর বহু ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সমগ্র দিনব্যাপী ভজন-কীর্ত্তনে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। পরদিন প্রায় চারি হাজার দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয় এবং ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট, (খুলনা)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট (খুলনা)—

—আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৮

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সাধনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন বিধান করেন। প্রবন্ধ পাঠ ও পারিতোষিক বিতরণের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

মহাকালী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্নপূর্ণা মা আমাব অন্নরিক্তা কেন হ'লে,
কেন নৃত্য ভিখারীব বুকে ?
ডাকিনী প্রেতিনী লয়ে একী রঙ্গ মহামায়া
মুক্তকেশী উন্মাদ কৌতুকে ?
অগ্নিময় জটাভারে আববিয়া কৃষ্ণাকাশ
ক্রূর অট্ট অট্ট হাস্যে জাগাতেছ একী ত্রাস ?
খসি' পড়ে উল্কাপিণ্ড, বিদ্যুৎ জিহ্বায় দেবী,
কার রক্ত করিছ লেহন ?
চিৎকারিছে ফেরুপাল হে বিরাট সিংহীরূপা
জলে ক্ষিপ্ত নখরে দহন ॥

কাম-পিশাচের রক্তে পঙ্কিল শ্মশানভূমি
গর্জ্জে মৃত্যু ঘোর অন্ধকারে,
জলে চিতা ধূমাবতী, লেলিহলোলুপ বহ্নি
সর্ব্বধ্বংসী ভয়াল হুঙ্কারে ;
কালকান্তা হে করালী লুকাইয়া মাতৃরূপ,
রাক্ষসীর মত কেন ভীম দন্তে মৃত্যু-যূপ ?
নিঃশ্বাসে তুলিয়া ঝঞ্ঝা হাহাশব্দে উন্মাদিনী
উলঙ্গিনী একী অভিযান ?
হে মহা ডামর মূর্ত্তি ডম্বরু নিনাদে কাঁপে
ভবিষ্যৎ, ভূত, বর্ত্তমান।

দাম্ভিক দৈত্যের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি দেবী,
জয়ঘণ্টা বাজায়ে চণ্ডিকা,
রক্তবৃষ্টি করিতেছ শৃগাল কুকুর কাঁদে
আর্ত্তনাদে একী প্রহেলিকা !
শুম্ভ নিশুম্ভের রক্তে পান করি রক্তবীজ,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে মূর্চ্ছা যায় মনসিজ,
গ্রাসিবে কি মহাকালী অসীম বিশ্বের সত্তা
উদরস্থ করি দেশকাল ?
স্নেহ দয়া মায়াশূন্যা তাই কি আকাশে ওড়ে
রক্তবর্ণ রুক্ষ জটাজাল ?

সিংহীরূপা হে রুদ্রাণী, কোটি কৃষ্ণ হীরকের
দ্যুতি জ্বলে কাল অঙ্গে তব,
উন্মত্ত চরণ তলে শিবাত্মা হিরণ্যগর্ভ
নির্ব্বিকার একী অভিনব ?
অধর্ম্মারণ্যের বুকে জ্বলে ধুধু দাবানল,
পশুর বীভৎস স্বরে উঠে তীব্র কোলাহল
দনুজদলনী তব শাণিত নখরাঘাতে
ছিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন মায়াজাল
খল খল ব্যঙ্গ হাসি হাসিছে প্রেতাত্মাদল,
ছায়ামূর্ত্তি, কুৎসিত কঙ্কাল ॥

বুঝেছি মা অম্বিকা স্বহস্ত সৃজিত সৃষ্টি
কেন কর স্বহস্তে সংহার।
আপনার মুণ্ড কাটি কেন হও ছিন্নমস্তা
বুঝেছি মা বুঝেছি এবার।
যখনি তোমার সৃষ্টি স্পর্দ্ধায় তুলিয়া শির
ভুলে যায় ধ্বংস স্মৃতি কোটি গত শতাব্দীর,
তখনি মা অন্নপূর্ণা স্নেহশূন্যা মূর্ত্তি ধরি'
চূর্ণ কর মর্ত্ত্য-অহঙ্কার,
তাই কি আবার এলে সিংহীরূপে ভয়ঙ্করা
প্রেতভূমে ছাড়িয়া হুঙ্কার।

ঘোর রাত্রি অমাবস্যা তোমার আশ্রয় মাগি'
মর্ত্ত্যশিশু জ্বালায় দীপালী,
তুমি কি আশ্রয় দেবে পাগলিনী মা আমার
আশ্রয় কি দেবে মহাকালী ?
হ্রীং মন্ত্র উচ্চারিয়া ডাকে চিত্ত কাপালিক,
তামসিক শর্ব্বরীতে ভয়ত্রস্ত সর্ব্বদিক,
হে জীবপালিনী দুর্গে ভীতি-দুর্গবিঘাতিনী
হে সর্ব্বাণী লহ নমস্কার,
হে ব্রহ্মের দৈবীমায়া প্রসন্ন দক্ষিণ করে
লুপ্ত কর মৃত্যু-অন্ধকার।

নব্যবাংলার আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে রামকৃষ্ণ ও তচ্ছজ্বের প্রভাব

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, পুরাণরত্ন, বেদান্ত-ভাগবতশাস্ত্রী

বর্তমান বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধনে যে-কয়জন মহামানবের কর্ম, জ্ঞান ও অধ্যাত্ম শক্তির অবদান অপরিমেয়, বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁহাদের জীবনেতিহাসের বা ইতিবৃত্তেরই ক্রমিক বিকাশের ইতিহাস মাত্র,—মহামানব বা অবতারকল্প পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও রামকৃষ্ণ-সংঘের আংশিক জীবনেতিহাস ও ব্রাহ্ম ধর্ম সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের কীর্তিকলাপ উঁহার প্রধান উপকরণ। নব্য বাঙ্গালীর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সাধনের প্রথম কর্মী রাজা রামমোহন রায় সত্য কিন্তু বাঙ্গালীর তথা নব্যহিন্দু-জীবনের প্রকৃত আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমুন্নতির প্রেরণার কেন্দ্র মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য সুহৃৎ ও পার্শ্বচর সঙ্ঘ। দেড়শতাধিকবর্ষ পূর্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাৎকালিক ধর্ম নীতি, লৌকিক আচার ব্যবহার, সমাজ নীতি, শিক্ষা, বিচার পদ্ধতি, নারী জাতির অধিকার, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অভাবনীয় সংস্কার সাধন করিয়া ইতিহাসে "Raja Ram mohan Ray the Great Reformer" নামে সুপরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু একদিক দিয়া রাজার এই জাতীয় সংস্কৃতি-প্রচেষ্টা দোষদুষ্ট ছিল, তাই তাঁহার অবলম্বিত পন্থা বাংলার—তথা ভারতীয় জীবন-যাত্রা প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাদৃশ কার্যকরী হইতে পারে নাই। তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণের সংখ্যাধিক্য তাঁহার অবলম্বিত পথগামিগণকে সতত বাধা দান করিয়াছে ও অদ্যাপি করিতেছে।

হিন্দু ধর্মের মত সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক ধর্ম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন সত্য। যে যে-ভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন, হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতে ভক্তি মণ্ডিত পূজা হইলে সে পূজা কখনও ব্যর্থ হইবে না —ইহা তিনি স্বরূপত অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু তিনি হিন্দুর চিরাবলম্বিত অধিকারবাদানুগত সাকার উপাসনাকে নিকৃষ্ট, ভিত্তিহীন প্রচার করিয়া নিরাকার উপাসনাকে সার্বজনীন ও শাস্ত্রসম্মত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং চিরাচরিত হিন্দু-মূর্তি পূজা, মন্দির ও তীর্থাদির অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদেরও অপৌরুষেয়ত্ব নিরাকরণ করিতে সচেষ্ট হইয়া আর্য জাতির ষড়দর্শনের চির সিদ্ধান্তকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করিতে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক আচারাদিরও বিনাশাত্মক সংস্কার সাধনে (destructive reform) আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পরাধীন জাতির দৌর্বল্য, অসহায়তা, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, ভীরুতা, নীচতা প্রভৃতি তিনি স্বজাতির বৈশিষ্ট্য মনে করিতেন এবং জেতা ও জিতদের বিষম পার্থক্য তিনি সর্বতোভাবে অনুভব ও উদ্‌ঘোষণ করিতেন। বাংলার ও বিজিত বাঙ্গালীর এই আত্মিকহীনতামূলক আকৃতি (Inferiority Complex) আত্মস্বরূপাবরক অজ্ঞানের আবরণ শক্তির ন্যায় সর্বদাই বাঙ্গালীজাতির

ও হিন্দু সংস্কৃতির নিকৃষ্টতার বোধ তাঁহার চিত্তে সতত জাগরূক ছিল—এমন কি তৎপরবর্তী তন্মতাবলম্বিগণ শিক্ষিত বাঙ্গালীদেরও বহুদিন যাবৎ এই আত্মিকহীনতামূলক আকুতি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের অনেককিছুকেই তিনি ও তন্মতাবলম্বী নব্য শিক্ষিত সমাজ কুসংস্কার, অজ্ঞান প্রভৃতি মনে করিতেন।

পরমহংস ও তচ্ছিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে রামমোহন ও তৎপরিকরবেব প্রভেদ এই স্থানে। পরমহংসদেব বলিতেন—যে আপনাকে ছোট মনে করে সে সত্যই ছোট হইয়া যায়। এই উক্তি অতি মূল্যবান্। নিজকে ছোট বলিয়া ভাবাব মত ছোট হওয়ার এমন অমোঘ পথ আর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর হইতে আমরা এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম। পাশ্চাত্য জাতিকে আমরা গুরুর আসনে বসাইয়া আমরা সেবক, ভৃত্য ও দাসরূপে পাশ্চাত্য জাতিব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমরা অসভ্য, বর্বর, শঠ, কাপুরুষ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক। অশিক্ষিত তাই কুসংস্কাবের অচলায়তনে অন্ধবিগ্রহ। এই সকল কথা তাহাদের কাছে শিখিলাম। প্রাচীন ধর্ম, রীতি, নীতি, আদর্শ ও সভ্যতার উপর আমাদের মন বিরূপ হইয়া উঠিল। তাহাদের সবই সুন্দর উজ্জ্বল মনে করিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এইরূপ আত্মবিস্মৃত আমরা ক্রমে অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হইলাম। আত্মিক ন্যূনতাবোধ আমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ—এমন কি বিচার-বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ করিতে বসিল। Adam Smith তাঁহার Theory of Moral Sentiment গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"of all the calamities to which the condition of morality exposes mankind the loss of reason appears to those who have the last spark of humanity by far the most dreadful and they behold that last stage of human wretchedness with deeper commiseration than any other But the poor wretch who is in it laughs and sings, perhaps and is altogether insensible to his misery" যখন এই কুসংস্কার, জড়তা, আত্মিক অবিশ্বাস, চিন্তার দৈন্য, ভীরুতা দেশকে সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া ছিল তখন আবির্ভূত হইলেন রামকৃষ্ণ ও তাঁহার মন্ত্রের প্রচারক সাধকবীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল চলার পথের গান; তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল দেশের সর্বসাধারণের দুঃখে। তিনি দেখিলেন, দেশের যাহারা প্রাণ, জাতির যাহারা মেরুদণ্ড, তাহারা উপেক্ষিত অনাদৃত সর্বহারা। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জনসাধারণকে শেখান হইয়াছে তাহারা ছোট, তাহারা হীন, তাহারা অধম। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে তাহাদের কোন মূল্য নাই। * * * * শত শত বৎসর এই কথা শুনিয়া তাহারা সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের কর্ণে কেহ আত্মার কথা উচ্চারণ করে নাই। তাহাদের নিকট ঘোষণা কর আত্মার বাণী। যাহারা সকলের নীচে তাহাদের মধ্যেও আত্মা আছে। ধর্মবীর বিবেকানন্দ শক্তি-সঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃতকল্প হিন্দুধর্মকে নবভাবে পুনরুজ্জীবিত করিলেন।

স্বামীজি ঘোষণা করিলেন সেই আর্ষ-উপনিষদ্বাণী—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর এই আত্মস্বরূপবোধের উদ্দীপক রামকৃষ্ণপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলিতেন—আমাদের সর্ব প্রথম ও প্রধান কাজ দুর্বলতা পরিহার। উপনিষদের সেই 'অভীঃ' মহাবাণী। স্বামীজি বলিতেন যে, ভয়ের মত পাপ আর নাই। তাই

সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। তাই 'অভীঃ' হইতে হইবে। তিনি বলিতেন—"Believe! Believe! Fear not, for the greatest sin is fear Say not you are weak The spirit is Omnipotent Say not man is sinner, tell him that he is a God" ইহাই শক্তিমন্ত্র ও আত্মদর্শন। উপনিষদের ঋষিও একদিন উদাত্তকণ্ঠে জগৎবাসীকে বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

'তোমরা বিশ্বের অমৃতপুত্রগণ শোন, দিব্যধামবাসিগণ শোন, আমরা সেই আদিত্যবর্ণ তমোলোকের পারস্থিত পরমপুরুষকে জানিয়াছি, আমরা ক্ষুদ্র নয়, আমরা মহান্ অমৃতের পুত্র।' যে আপনাকে দুর্বল ভাবে সে অতি দুর্বল হইবে বিচিত্র কি? মনীষী টুর্গেনিভও বলিয়াছেন—"If you call yourself a mushroom you must go into the basket" "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এই জাতীয় আত্মবোধির পুনর্জীবন বাঙ্গালীর এই আত্মবিবেক ও তজ্জনিত আনন্দ পরমহংস ও বিবেকানন্দেরই দান।

ভারতীয় আর্যঋষিগণের স্থাপিত আর্যধর্ম আমাদের বিজেতা খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বিগণ ও মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণের নিকট তদ্ধর্ম অপেক্ষা অপকৃষ্ট সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুরা পৌত্তলিক, হিন্দুরা বহু দেবতাবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হিন্দুরা গাছ পাথর মাটির পূজক, জড়োপাসক প্রভৃতি কুসংস্কারই প্রকৃত হিন্দুধর্ম-বীজ, ইহা খৃষ্টীয় ও মোস্লেম এই দুইটী বৈদেশিক ধর্মীরা যেরূপ বলিয়াছেন, ভারতীয় আর্যধর্মেরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাহার স্তন্যধারা পুষ্ট বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীরাও ইহার নিন্দাবাদ ও বৈনাশিক সংস্কার সাধনে তদ্রূপই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বৈদেশিক ও দেশীয় উপধর্মের আন্দোলনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর যুববাংলা, নব্য-পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবাহ প্রবুদ্ধ বাংলা, তৎকালে দার্শনিকী চিন্তায় বৈদেশিক, সামাজিক আচারে উচ্ছৃঙ্খল ও আধ্যাত্মিক বিচারে আত্মবিমূঢ় জাতীয় কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহামানব পরমহংসদেবই তাৎকালীন বঙ্গীয় জাতীয়তার কেন্দ্রাতিগা গতিকে কেন্দ্রাভিগামিনী করিতে আবির্ভূত হইলেন। তিনি হিন্দুর চিরারাধ্য তাৎকালিক শিক্ষাভিমানিগণের নিকট অশ্লীলরূপে পরিজ্ঞাত মৃন্ময়ী কালী মূর্তিকে স্বীয় সাধন প্রভাবে চিন্ময়ী করিয়া প্রথম ঘোষণা করিলেন, আর্য হিন্দুর ধর্ম-সাধনা, উপাসনা কর্মমাত্র নহে, উহা অনুভূতি। মূর্তিপূজা জড়ে চিদনুভব ও তৎপ্রতিষ্ঠা বেদান্তের অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানে, উপনিষদের রস-স্বরূপোপলব্ধিতে, বৈষ্ণবীয় ভাগবতের রাসোৎসবে। তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—প্রতিমা পূজায় দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে অস্তি, ভাতি আর প্রিয় সেইখানেই তাঁর প্রকাশ, তিনি ছাড়া কোন জিনিষই নাই। তিনিই এই সব হয়েছেন। কোন কোন জিনিষে বেশী প্রকাশ। সুলক্ষণ শালগ্রাম, বেশ চক্র থাকবে, গোমুখী আর সব লক্ষণ থাকবে, তাহা হলে ভগবানের পূজা হয়। আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলে কত দিন? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামী সহবাস হয়। বিবাহ হইলে পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হইলে আর প্রতিমা পূজার দরকার? পরমহংসদেব হিন্দুর অবতারবাদের বিরুদ্ধবাদিগণকে নিজ কার্য্য দ্বারা অবতার সম্ভব বুঝাইলেন। কৃষ্ণের বাঁশীর আকর্ষণ গোপীগণকে পাগলিনী করিয়া রাসকুঞ্জে লইয়া যাইত। ভাগবৎকার বলিয়াছেন—"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" কৃষ্ণের বাঁশী 'কানের ভিতর দিয়া মর্মস্পর্শী হইয়া গোপীজনের মন হরণ করিল।' বিখ্যাত ভক্ত

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন—'আমি একজন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, সভ্যতাভিমানী, স্বার্থান্বেষী, অর্দ্ধসংশয়বাদী, শিক্ষিত, তার্কিক, আর তিনি দরিদ্র, মূর্খ, অসভ্য, অর্দ্ধ পৌত্তলিক (?) বান্ধবহীন হিন্দুসাধু। যে আমি ডিস্‌রেলি, ফসেট, ষ্টানলী, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকগণের বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি কেন? আমি খৃষ্টের একজন অনুরাগী, শিষ্য ও মতাবলম্বী, উদারচেতা খৃষ্ট-প্রচারকগণের বন্ধু ও প্রশংসাকারী, মুক্তিমার্গগামী ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও আনুষ্ঠানিক সভ্য, কেন আমি বাক্‌শূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকি? শুধু আমি বলিয়া নয়, আমার ন্যায় অনেকেরই এই অবস্থা। * * * তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে।' ইহাও কি "মনোহর" শক্তি নহে? বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের প্রতি এরূপ প্রভাব বিস্তার যদি সম্ভব হয়, পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গোপীগণের—যাঁহারা অধোক্ষজের পরম প্রিয়া—তাঁহাদের মনোহরণ অসম্ভব হইবে কেন? হিন্দুর গুরুবাদ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদিগণকে তিনি শুনাইয়াছেন, যদি কেউ তার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্য পরিচালক পায়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই সুবিধাজনক ও মহাসৌভাগ্য। এরূপ লোক তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। সে যে স্বচেষ্টায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে না এমন নয়, কিন্তু এরূপ লোকের সংসর্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক সহজ হয়। নদীবক্ষে তখন যে ষ্টীমারটী যাইতেছিল তাহা দেখাইয়া শুধাইলেন, ঐ ষ্টীমারটী কখন চুঁচুড়া পৌছিবে মনে কর? প্রশ্নকর্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিলেন, সন্ধ্যার আগে ৬টার সময়। রামকৃষ্ণ-দেব বলিলেন, ষ্টীমারের পিছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা নৌকা দেখছ? ষ্টীমারের সাহায্যে নৌকাটাও ঐ সময় চুঁচুড়া পৌছবে। কিন্তু ধর, নৌকাটা ষ্টীমার থেকে খুলে নেওয়া হ'ল এবং ষ্টীমারটার সাহায্য না নিয়ে যেতে হবে, তাহলে সেটা কখন চুঁচুড়া পৌছবে? শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, সম্ভবত কাল প্রাতঃকালের আগে নয়। তখন পরমহংসদেব বলিলেন—ঠিক সেই রকম মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তার দুর্বলতা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে বিনা সাহায্যে অগ্রসর হতে পারে—এতে বেশী সময় লাগে মাত্র। অন্যদিকে যদি সে কোন অগ্রসর আত্মার সঙ্গ ও সাহায্যের সুবিধা পায়, তা হলে সে দশ বার ঘণ্টার পথ চার ঘণ্টায় অতিক্রম করতে পারে।

প্রতিমা পূজা ও তীর্থমন্দিরাদির প্রয়োজনীয়তার মূলে হিন্দুর অধিকারবাদাদি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যেমন শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতা মনে পড়ে, সেইরূপ প্রতিমা দেখলে সেই চিন্ময়ী ঈশ্বরীরই উদ্দীপন হয়। প্রতিমা মা-র চিন্ময়ীরূপেরই প্রতিরূপ। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ্ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমা পূজা কর্তে কর্তে সত্যের উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখলেই তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানেই তাঁর আবির্ভাব হয়, আর তীর্থ সকল উপস্থিত হয়। প্রতিমায় ভগবানের আবির্ভাব হয়। আবির্ভাব মানতে হয়। প্রতিমায় আবির্ভাব হতে তিনটী জিনিষের দরকার। প্রথম পূজারীর ভক্তি (অর্চকস্য তপোযোগাৎ), দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই (আভিরূপাচ্চ মূর্ত্তীনাম্), তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি (অর্চিতস্যাতি-শায়নাৎ)। পূজার সময় প্রতিমাকে কাঠ মাটি বলে জ্ঞান করলে কাঠ মাটিরই পূজা হয়।

ফলতঃ এইরূপে পরমহংসদেব সংশয়বাদী জাতীয় ভাবকেন্দ্রাতিগ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয়-গণের আধ্যাত্মিক জীবনস্রোতকে আধ্যাত্মিকভাব-কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের সংশয় তর্ক

দ্বিধা অখণ্ড প্রত্যক্ষানুভূতিবলে দূর করিয়া যেরূপ একদিকে সনাতনভাবে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদদূষিত জাতীয় সন্দিগ্ধ আত্মাকে (নরেন্দ্রনাথাদি যুবককে) প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতির অধিকারী করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছেন। দ্বাপরের কুরুক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ অর্জুনের মোহ যেমন "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য চক্ষুদানে দূর করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষিত যুবকগণের মোহ ও নাস্তিক্য বুদ্ধি পরমহংসের আমি তুমি যেমন সত্য, তোমার হাতের পাখা খানা যেমন সত্য, ভগবানও তেমনি সত্য, প্রত্যক্ষ আমি দেখিয়াছি, তোমাকে দেখাইতে পারি, এই উক্তি ও প্রত্যক্ষানুভূত যোগপ্রভাবে "ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি" বিনষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালীর সমষ্টি-জীবন সংস্কৃতিতে মহামানব পরমহংসের এই প্রভাব অপরিমেয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবন সংস্কারক বৌদ্ধ প্রভাব খর্বকারী ভট্ট কুমারিল স্বামী, বৈদান্তিক আচার্য শঙ্কর ও সাংখ্যবেদান্তাচার্য সুরেশ্বর, মণ্ডনমিশ্র, বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রচারক রামানুজ স্বামী ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির চেয়েও পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের নিকট হিন্দু সংস্কৃতি শাস্ত্র ও জাতি অধিক ঋণী—বিশেষতঃ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাদেশ।

পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বাণীর প্রেরণাই চিকাগোর মহাধর্ম সম্মেলনে স্বামীজিকে বিশ্ব-বিজয়ে সামর্থ্য দিয়াছিল। চিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের অপূর্ব বিজয়ের মূল দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পণ্ডিত মিলার সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The great gifts of Hinduism to the world are the teachings of the immanence of God end the solidarity of mankind." সেই উপনিষৎবাণী "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্," "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" পরমহংসও ইহাই 'যত মত তত পথ' রূপে অতি সরল কথায় মীমাংসা করিয়াছেন। গণিতের ভাষায় বলিলে ভাগবতধর্ম বা মানবধর্ম জগতের সকল ধর্মের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (H. C. F. বা G C. M) নহে, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক L C M। ভেদের মধ্যে অভেদ দৃষ্টি। ভাগবতীয় নির্মৎসর মতের ধর্ম। চরিতামৃতে আছে—

"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহ করে নানাকার রূপ।
মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুত।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ।"

বৈদূর্যমণি যেমন স্থলভেদে নীল পীতাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ভগবান ও ধ্যানভেদে বিভিন্ন মনে হইতে পারেন, স্বরূপত নহেন। এই মানবধর্ম বা পারমহংস্য-ধর্ম সমন্বয়ী ধর্ম। পারসিক ধর্মের পবিত্রতা (purity), বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান (wisdom), খৃষ্টানের ত্যাগ (sacrifice), মুসলমানের দাস্য ও মহামানবতা (submission & magnanimity), বৈষ্ণব ধর্মের আনন্দ (Ecstacy), শাক্ত ধর্মের শক্তি (Energy) ও শৈব (বেদান্ত) ধর্মের আত্মানুভব (Immanence)-এর সমন্বয়ে এ পারমহংস্য-ধর্ম প্রচার লাভ করে। আর্যঋষি ধর্মকে অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাই তদ্ধর্মের বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রকার বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে সমত্ব ও সামঞ্জস্য (সর্বত্রদৈত্যা সমতামুপেত সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য, বিষ্ণুপুরাণ। সমত্বং যোগউচ্যতে)। বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির বর্তমান আধ্যাত্মিক জাগৃতির পুনরুজ্জীবন পরমহংস ও তচ্ছিষ্য পরিকরের অবদানের ফলেই সম্ভব হইয়াছে, ইহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য সন্দেহ নাই।

কালের আক্রমণ

সম্পাদক

সৃষ্টির সময় হইতে কালের আক্রমণে বিশ্বময় মানুষের জীবনধারা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইতেছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের (Biologists) মতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রের জোয়ারভাটাসম্ভূত ভাসমান ফেনা, জীবনের জড়ীয় ভিত্তির (Protoplasm) নিদর্শনরূপে প্রথমে দেখা দেয়। প্রাণি-বিজ্ঞান বর্ণিত 'অতি আদিম' (Neanderthal) মানুষকে বিভিন্ন অনার্য্য স্তরের ভিতর দিয়া আর্য্যস্তরে উপনীত হইতে অনেক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদী ডারউইন্ সৃষ্টিকার্য্যে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" (Natural Selection) এবং "অন্যের মৃত্যুর পর যোগ্যতমের জীবনধারণ" (the survival of the fittest) নীতির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রাণিজগৎ সর্ব্বত্রই তাহাদের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চালাইয়া নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার মতে দুর্ব্বল প্রাণীর জীবনের বিনিময়েই সবল প্রাণী জীবনধারণ করিতেছে। জগতের মনুষ্য সমাজেও দেখা যায়, যাহারা পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধশক্তির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারাই বাঁচিয়া আছে, এবং যাহারা কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে নাই, তাহারা উৎসন্ন গিয়াছে।

ভারতবর্ষ অনেক প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব এবং বহির্বিপ্লবের মধ্য দিয়া যুগে যুগে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই অনেক রূপান্তরিত হইয়াও আজ বাঁচিয়া আছে। ভারতের বৈদিক যুগের সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতীয় যুগের পার্থক্য ছিল, এই যুগত্রয়ের সঙ্গে বৌদ্ধ ও শাঙ্কর যুগের প্রভেদ ছিল আরও বেশী, আবার এই সকল যুগের সঙ্গে মুসলমান—বিশেষ করিয়া ইংরাজ যুগের আকাশ পাতাল বিভিন্নতা বিদ্যমান। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগসূত্র থাকিলেও কালের আক্রমণে ক্রমই তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির যমকে বলিতেছেন, "কাল মহামোহময় কটাহ মধ্যে সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠের সহায়তায় মাসঋতুরূপ দর্ব্বীর আলোড়নে ভূতসকলকে পাক করিতেছেন অর্থাৎ রূপান্তর ও অবস্থান্তরে পরিণত করিতেছেন।"

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, অতিবড় বীর্য্যবান এবং শক্তিমান জাতিও কালের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন পথে বাধা জন্মাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। "কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি," সকলে নিদ্রিত হইলেও কাল জাগরিত থাকে। এইজন্য কালের পরিবর্ত্তনকে বঞ্চনা করিবার সাধ্য কোন জাতি বা ব্যক্তির নাই। কালচক্র সতত পরিবর্ত্তনশীল — সৃষ্টি, বিনাশ, সংযোগ ও বিয়োগে বিরামবিহীন। কালের কশাঘাতে মানবজাতি বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয় লক্ষ্যের সন্ধানে চলিয়াছে। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরাও বলিতে পারেন না যে, এই অবিরাম গতির বিরাম কোথায়। কালের সংহার শক্তি তাহার পরিপন্থী বিষয়সমূহকে নির্ম্মমভাবে ধ্বংসমুখে

নিক্ষেপ করিতেছে এবং তাহার সৃজনী শক্তি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। বর্ত্তমান যুগেও ভারতের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনধারা অতি দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গে ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ তৎপ্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছিলেন, "কত পর্ব্বত শিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুর-তরঙ্গিনী রূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তি-প্রবাহ দেশ দেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া—নবরঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। * * যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—এই বেদ-বাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই কি অনাচার ছিল?" (ভাববার কথা)। স্বামীজির এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, যে সকল আচার বর্ত্তমান কাল স্রোতের পথে বাধাস্বরূপ ছিল, সেই গুলিই ভাসিয়া যাইতেছে, এবং যাহা বিলুপ্ত হইতেছে, তাহা প্রকৃতই আচারের নামে অনাচার ছিল। কারণ, উন্নত জ্ঞানের আলোকসম্পাতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, উহারা ভারতের জাতীয় অবনতি—তথা বর্ত্তমান দুরবস্থার অন্যতম উপাদান। এ স্থলে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, বর্ত্তমান কালের পরিপন্থী যে সকল আচার নিয়ম রক্ষণশীলতার দৃঢ় দুর্গে আবদ্ধ থাকিয়া আজও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, উহারাও কালের আক্রমণে যে বিধ্বস্ত ধ্বংসমুখে পতিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, "কালো হি বলবত্তরঃ।" আমরা এইরূপ কয়েকটী সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সত্যের অনুরোধে স্বীকার্য্য যে, অধিকারভেদে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করা হিন্দুসমাজের আদর্শ বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুসমাজ এই মহান আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। হিন্দুজাতি ধর্ম্মের দিক দিয়া যেরূপ অনন্যসাধারণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সমাজের দিক দিয়া সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। হিন্দুধর্ম্ম সাম্য, মৈত্রী, সমদর্শন ও অদ্বৈতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে ভরপুর, কিন্তু হিন্দুসমাজ অসাম্য অনৈক্য, বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের লীলাক্ষেত্র। হিন্দুধর্ম্ম পরমতসহিষ্ণু ও উদার, কিন্তু হিন্দুসমাজ অসহিষ্ণু ও অনুদার। হিন্দু-ধর্ম্ম চায় মানুষের সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত করিতে, কিন্তু হিন্দুসমাজ চেষ্টা করে মানুষের জীবনকে বন্ধনের উপর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে। হিন্দুধর্ম্মে মানুষের স্বাধীনতা আছে, এজন্য ইহা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া সম্মানিত, কিন্তু হিন্দুসমাজে মানুষের স্বাধীনতা নাই, এ জন্য ইহা স্বদেশের ভ্রান্তিস্থান এবং বিদেশের ঘৃণাস্পদ বলিয়া উপেক্ষিত। হিন্দুধর্ম্মে বলে, "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ", হিন্দুসমাজ বলে, "দূরমপসর রে চণ্ডাল"। অনেকে হিন্দুসমাজের এই বৈষম্যদোষের জন্য হিন্দুধর্ম্মকে দায়ী করিয়া থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক"* নামক মতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার

* "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—যখন লোককে বলা যায়,

আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে। ** চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শুন সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মার বহুরূপমাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। ** সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দু-ধর্ম্মের মহান্ উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি-স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ)।

হিন্দুজাতি যে স্মরণাতীত কাল হইতে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বগৃহে অনৈক্য বিরোধ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে চলিয়াছে, ইহার মূলকারণ তাহার আত্মঘাতী সমাজনীতি। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, সামাজিক গৃহবিরোধই হিন্দুর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ দৈন্য এবং দুর্দ্দশার মূলকারণ। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বগৃহে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐক্যবদ্ধ নেশনরূপে পরিণত হইতে না পারিলে হিন্দুজাতির আর বাঁচিবার উপায় নাই। হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হইতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দ্দেশ মত তাহার সমাজ-নীতিকে সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শন-মূলক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের নির্দ্দেশে নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে।

ধর্ম্মের অনুশাসনে সমাজ পরিচালিত না হওয়ার জন্যই ইহাতে অনেক গলদ প্রবেশ করিয়াছে। জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী জ্ঞানে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং ভেদনীতির কুফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদুভয়ের উপরই খড়্গহস্ত, পরিতাপের বিষয় যে, ভোগাধিকার বৈষম্যমূলক সেই বহুনিন্দিত ভেদনীতি দ্বারাই হিন্দুসমাজ পরিচালিত! ইহার ফলে সমাজের অন্তর্গত শ্রেণীসমূহের পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য বিরোধ ও বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা আজও নির্ব্বাপিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইদানীং সহরে বন্দরে এই বিরোধ অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেলেও বাংলার পল্লীগুলি এই আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। সিঁড়ির ধাপের মত উচ্চ নীচ পর্য্যায় বিভক্ত কৃষক, শ্রমিক, তন্তুবায়, মুদী, মহাজন, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, গোয়ালা, তেলী, নমশূদ্র, মালী, জালিক, চর্ম্মকার প্রভৃতি জাতি এবং তাহাদের বৃত্তির স্থান হিন্দুসমাজে আজও কোথায়? সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই জাতিসমূহের মধ্যে অনেক "অনাচরণীয়", অনেক কতকটা "আচরণীয়", এবং অবশিষ্ট একেবারে "অস্পৃশ্য"! যাহাদের পরিশ্রমে অভিজাতের আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য ও ধনধান্য সম্ভব হইয়াছে, সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? যাহাদিগকে লইয়া দেশ, যাহারা সমাজের অবলম্বন, যাহারা সমাজের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার উপকরণ যোগাড় করিতেছে, অকৃতজ্ঞ সমাজ তাহাদিগকেই

তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এইভাবে কার্য্য করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত হিংসা রহিয়াছে।"

শতভাবে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করিতেছে! সমাজের এই উৎপীড়ন সম্বন্ধে গত জুলাই মাসে বিহার "তপসিলভুক্ত জাতি" সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম, এম্-এল্-এ মহাশয় বলিয়াছেন, "আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি না, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানেও অবাধে যোগ দিতে পারি না। আমাদের বাড়ীতে কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুরাণ পাঠ বা কথকতা করিবে না, কোন পূজানুষ্ঠান করিবে না। * * সামাজিকভাবে আমরা অন্ত্যজ পতিত, গ্রামের বাহিরে আমাদের স্থান। বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ব্রাহ্মণদের সাহায্য পাই না। অনেক গ্রামে নাপিতেরাও আমাদের কামায় না। হিন্দুদের ধর্ম্মশালা, হোটেল, মিঠাইয়ের দোকান প্রভৃতির দ্বার আমাদের নিকট রুদ্ধ। হিন্দুদের কোন কূপ হইতে, এমনকি সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ হইতেও আমরা জল তুলিতে পারি না। গ্রামের সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ হইতে অহিন্দুরাও জল লইতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না। ডোবা, পুকুর, খাল, মরানদী প্রভৃতি হইতে কাদাগোলা জল আমাদিগকে প্রাণের দায়ে সংগ্রহ করিতে হয়। সমাজে আমাদের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি হেয় এবং অপমানকর। মুচি, মেথর, চামারের কাজ পেটের দায়ে আমাদিগকেই করিতে হয়।"

এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এবং ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রেণীর দুঃখদুর্দ্দশায় সমাজ কোন সহানুভূতি দেখায় না। এই জন্য যখন জগতের উন্নত জাতিসমূহের মনোমুগ্ধকর পণ্য-দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির বৃত্তিলোপ হইতে আরম্ভ করিল, তখন সমাজের অভিজাত শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট ইহারা কোন সাহায্য পায় নাই। সমাজের দৃষ্টিতে এই বৃত্তিগুলি নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত থাকায় উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত যুবকগণ জীবিকার্জ্জনের অন্য পথ না পাইয়াও এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে এতদিন অগ্রসর হন নাই। আজও তাঁহারা এই "ছোটলোকী" বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা অপেক্ষা বৈদ্যুতিক পাখার নীচে চেয়ারে বসিয়া সাহেবের কেরাণীগিরি করা আপনাদের শিক্ষার মহত্ত্ব এবং আভিজাত্য সংরক্ষণের উপায় মনে করেন! কিন্তু কালের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের পক্ষেও এখন সামান্য মাহিনার কেরাণী পদও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। ফলে শিক্ষিত যুবকগণও আজ দেশের সর্ব্বহারাদের মতই বেকার সমস্যায় ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কবির অভিশাপ—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সমান।"

—জাতির হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না! তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার?—আমি কি দেশশাসন করিতে পারি? এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। * * যেখানেই যাও জাতি বিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, এই অধিকার তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে নির্ম্মূল করিতে হইবে" (ভারতে বিবেকানন্দ)। হিন্দু যদি কালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে চায়, তাহা হইলে তাহার সমাজকে সাম্যের আদর্শে

পরিচালিত করিতেই হইবে। ইহাতে কোন জাতির কোন বিশেষ অধিকার থাকিবে না, অথচ প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তির সকল বিষয়ে উন্নতি করিবার সমান অধিকার থাকিবে। সময় থাকিতে যদি হিন্দু তাহার সমাজ সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী না হয়, তাহা হইলে কালের আক্রমণে বিপ্লবের ভিতর দিয়া তাহাকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেই হইবে।

জন্মগত বিশেষ বিশেষ ভোগাধিকারমূলে সমাজ পরিচালিত হওয়ার অন্ততম কুফলস্বরূপ হিন্দুসমাজের আট কোটি লোক আজ মনুষ্যোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত—অস্পৃশ্য। ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুসমাজ এই দুরন্ত ব্যাধি দ্বারা অল্পাধিক আক্রান্ত। দক্ষিণ-ভারতে প্যারিয়াদি অস্পৃশ্য শ্রেণীর অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তথায় অনেক স্থানে সাধারণের রাস্তা দিয়াও তাহাদের গমনাগমনের অধিকার নাই। ত্রিবাঙ্কোর এবং কোচিনে "অদর্শনীয়" নামে পরিচিত এক নিম্ন শ্রেণীকে দেখিয়া বর্ণহিন্দুগণকে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে দেখিয়াছি! অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তি শিক্ষা এবং অর্থে উন্নতির উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিলেও হিন্দুসমাজে তাঁহার সম্মানিত আসন লাভ করিবার উপায় নাই, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে অস্পৃশ্য হইয়াই থাকিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিদেশী ইংরাজের নিকট সমান অধিকার দাবী করিতেছেন এবং সাদা কালায় ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন কিন্তু আপনাদের স্বদেশবাসী স্বধর্ম্মাবলম্বী অস্পৃশ্য জাতিকে মনুষ্যোচিত অধিকার দান করিবার জন্য তাঁহারা তেমন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। স্বদেশে হিন্দু আপনার কোটি কোটি স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বীকে শতভাবে অধিকারচ্যুত ও অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই বিধাতার ন্যায়বিচারে সে আজ পরাধীন—আপন ঘরের বাহিরে সে অধিকার বঞ্চিত—অস্পৃশ্য। জগতের উন্নত জাতিসঙ্ঘের আসরে তাহার স্থান নাই। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানেডা প্রভৃতি দেশে হিন্দুমাত্রই কুলী বলিয়া গণ্য!

হিন্দুসমাজের নিগ্রহে অবনত শ্রেণীর জীবন-ভার দুর্ব্বিষহ হওয়ায় তাহারা দলে দলে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছে। ভীল, কোল, সাঁওতাল, নাগা কুকি, খাসিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে হিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া ক্রমে হিন্দুসংস্কৃতি অবলম্বন করিতে থাকিলেও হিন্দু ইহাদিগকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে; এজন্য ইহারা এখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা বন্ধ করিয়া খৃষ্টান ও মুসলমানের অঙ্গপুষ্ট করিতেছে। ভারতের প্রায় সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হইতেছে। সিংহল এবং দক্ষিণ ভারতের উপকূল প্রদেশে এমন গ্রাম খুব কমই দেখা যায় যেখানে কোন গির্জ্জা নাই। ত্রিবাঙ্কোর এবং কোচিনের এক তৃতীয়াংশ হিন্দু খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম যে মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই আচার্য্য শঙ্করের জন্মস্থান কালাডি গ্রামের নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিকাংশ হিন্দুই আজ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। বঙ্গদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই জানেন পূর্ব্ববঙ্গই বৌদ্ধগণের প্রধানকেন্দ্র ছিল, এখানে তাঁহারা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এই বৌদ্ধগণ বিজিত হইলেন, তখন শত শত পরাভূত বৌদ্ধনায়ক বঙ্গদেশ ছাড়িয়া নেপাল, ভোট ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য উপান্তভাগে আশ্রয় লইলেন। ছত্রভঙ্গ লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিগৃহীত হইলেন। তাঁহাদের শ্রমণগণ হাড়ী, ডোম ও মেথরে পরিণত হইলেন, কারণ তাঁহারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া গলিত শব

ও মলমূত্র ভক্ষণ করিতেন। এইভাবে নীচ জাতির যে কাজ ছিল, বিজয়ী ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধশ্রমণগণের দ্বারা তাহাই করাইতে লাগিলেন। যে সকল পল্লীতে বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণী থাকিত, নেড়া নেড়ীর পল্লী বলিয়া সেই সকল পল্লী একেবারে ত্যাজ্য হইল এবং তাঁহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল।

ইস্‌লামের ভ্রাতৃভাব ও উদারতা ও সমাজসাম্য অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা তখন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এ জন্য লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিল এবং এ জন্যই পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী" (হিন্দু ও মুসলমান, প্রবন্ধ)। স্বামী বিবেকানন্দও ইহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই" (ভারতে বিবেকানন্দ)। উদ্ধৃত বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অস্পৃশ্যতারূপ ব্যাধিই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের কারণ। হিন্দু যদি সময় থাকিতে তাহার সমাজ-শরীরের এই ব্যাধির প্রতিকার না করে, তাহা হইলে কালের আক্রমণে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে। বর্ত্তমানে অনুন্নত জাতিসমূহ বহুকালের মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া তাহাদের প্রতি উচ্চবর্ণের হৃদয়হীন লাঞ্ছনা এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। অধিকারনিরাকৃত অস্পৃশ্য জাতিসমূহ সমাজের নিকট তাহাদের জন্মগত স্বত্ব ও স্বাধিকারের দাবী করিতেছে। হিন্দুকে তাহার গৃহবিরোধ বিনষ্ট করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে হইলে এই দাবী অস্বীকার করিলে চলিবে না।

হিন্দুর সামাজিক ভোগাধিকার বৈষম্যের বিষময় ফলস্বরূপ দেশের আপামর জনসাধারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি উন্নত বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম ও বিদ্যা ছিল প্রধানতঃ গুরু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণাদি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কবলে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল জনকয়েক অভিজাতের দেউলে বা প্রাসাদে। সমাজের কোটি কোটি লোকের সঙ্গে এই জাতীয় সম্পদের কোন যোগাযোগ ছিল না। থাকিবেই বা কেমন করিয়া? তাহাদিগকে যে "ছোটলোক" বলিয়া এই রত্নরাজি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল! এ জন্য এই রত্নভাণ্ডারের সংরক্ষকদের উপর সমাজের আপামর জনসাধারণের কোন মমত্ব বোধ বা আকর্ষণ জন্মিতে পারে নাই। একজন্য স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতিও তাহাদের আন্তরিক প্রীতি জন্মিবার সুযোগ হয় নাই। এই কারণেই কোন বৈদেশিক শক্তির ভারতাক্রমণে তাহারা বাধা তো দেয়ই নাই, পরন্তু যে সকল বৈদেশিক তাহাদিগকে সমাজে সমান অধিকার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই তাহারা বরণ করিয়া লইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের অগণন জনসাধারণ যদি মুষ্টিমেয় বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগকে বাধাপ্রদান করিত, তাহা হইলে তাহারা কর্পূরের মত উড়িয়া যাইত! স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "তাঁহারা (ব্রাহ্মণেরা) গোড়া হইতেই সর্ব্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই কারণে সহস্রবর্ষ ধরিয়া যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে সেই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে" (ভারতে বিবেকানন্দ)। এইরূপে ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দেশের জনসাধারণকে ধর্ম্ম, বিদ্যা, সংস্কৃতি প্রভৃতি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার ফলেই আমাদের পতন হইয়াছে। অতএব ভারতের পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন এই সকল রত্নরাজি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে সমানভাবে বিলাইয়া দেওয়া। ভারতের এই জাতীয় সম্পদে ভারতবাসীমাত্রেরই যে সমান অধিকার, সমান স্বত্ব ও স্বামিত্ব এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে এবং এই সম্পদের গৌরবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত হইতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বিতরণের দায়িত্ব হিন্দুমাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই লক্ষ্য-সাধনে হিন্দুসমাজের সকলের একযোগ হওয়ার নামই হিন্দুর জাতীয়তা। ব্রাহ্মণাদি হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে স্থাপিত ব্যক্তিগণ এতদিন এই সম্পদ হইতে সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন, ইহা সকলের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কালের আক্রমণে

কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর একচেটিয়া ভোগাধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এ যুগে আর সমাজের সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর পক্ষে জাতীয় সম্পদ করতলগত করিয়া রাখা সম্ভব নহে। কাশী, কাঞ্চী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান এখন লণ্ডন, বার্লিন ও নিউইয়র্ক দখল করিয়াছে! সুতরাং "প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবে, উহা তত পচিবে আর উহার মৃত্যুও তত ভয়ানক হইবে" (ভারতে বিবেকানন্দ)। বিশ্বময় সাম্যবাদের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। এখনও অভিজাত জাতি যদি তাঁহাদের আভিজাত্যের সমাধি খনন করিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বর্ত্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের স্বদেশবাসীর তমসাচ্ছন্ন পর্ণকুটির আলোকিত না করেন, তাহা হইলে কালের আক্রমণে তাঁহাদের মৃত্যু যথার্থ ই ভয়ানক হইবে।

শত শত শতাব্দীর দাসত্বের পাষাণচাপে হিন্দুর জাতীয় দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং নানা-প্রকার রোগের জীবাণু ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। "আমরাই জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠজাতি" এই জাত্যভিমান ঐ রোগ-জীবাণুগুলির মধ্যে বিশেষ মারাত্মক! এই মিথ্যাভিমান ধর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুজাতিকে যে কতভাবে প্রতারিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। "আমরাই পবিত্র, জগতের সকলে অপবিত্র" এই মিথ্যাধারণামূলে হিন্দু আপনগৃহে অর্গলবদ্ধ হইয়া যে দিন বহির্জগতের সঙ্গে সকলপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিল, সেই দিন হইতে তাহার প্রকৃত অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। সেই অতীত যুগে অর্দ্ধসভ্য প্রতীচ্য জাতিসমূহ যখন সপ্তসমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতের উপকূল প্রদেশে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিতেছিল, তখন আমাদের এক শ্রেণীর অদূরদর্শী শাস্ত্রকারের নির্দ্দেশে হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইল। আমরা কূপমণ্ডূকত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভারতেতর দেশের অধিবাসিগণকে 'ম্লেচ্ছ' 'যবন' নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের সম্পর্ক ত্যাগ করিলাম এবং স্বগৃহে কৌলিন্য সৃষ্টি করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে লাগিলাম!

ঐতিহাসিকগণ বলেন, বঙ্গদেশের মধ্যে তমলুক ও চট্টগ্রাম জাহাজনির্ম্মাণ এবং বহির্বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র ছিল। এই দুইটী বন্দর হইতে অসংখ্য অর্ণবপোত বিবিধ পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া চীন, জাপান, বালী, সুমাত্রা ও ভারত-সমুদ্রের অন্যান্য উপদ্বীপে যাতায়াত করিত। ঐ সকল স্থানের হিন্দু বৌদ্ধের কীর্ত্তি বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐতিহাসিক জি-আর্ হাণ্টার সিন্ধু উপত্যকাস্থিত প্রাগৈতিহাসিকযুগের মহেঞ্জোদাড়োর সঙ্গে আমেরিকার উপকূলবর্ত্তী পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রমাণ করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে সুমেরিয়ার সহিত দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রপথে সংযোগ ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী কুইলন, আলেপ্পী, কোচিন প্রভৃতি বন্দর হইতে মালদ্বীপপুঞ্জ, পারস্য উপসাগর, আরব, চীন প্রভৃতি দেশে যে জাহাজ যাতায়াত করিত, তৎসম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী শাস্ত্রকারদের অনুশাসনে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিভিন্ন জাতির সহিত আমাদের ভাবের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গেল। ইতোমধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য দেশের অনেক জাতি যে সকল বিষয়ে দ্রুতগতিতে উন্নতির উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিল, আমরা ইহার সন্ধানও রাখিলাম না। জগতের উন্নতজাতিসমূহ যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে নিত্য নূতন জিনিষ আবিষ্কার করিয়া জগৎময় তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, আমরা তখন হাঁচিটিকটিকির ফল ও কাকচরিত্রের গভীর গবেষণায় মস্তিষ্কের প্রখরতা ব্যয় করিতে ব্যস্ত ছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা যে অপরাপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। * * জীবনের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে" (ভারতে বিবেকানন্দ)।

হিন্দুজাতি একদিন আপনার বহির্বাণিজ্যের সমাধি স্বহস্তে রচনা করিয়াছিল বলিয়াই আজ সে সর্ব্বহারা ভিক্ষুকরূপে অন্যের পরিত্যক্ত তণ্ডুল-কণা সংগ্রহ করিয়া অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে। আজ শিক্ষার আলোকে সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছে যে, সমুদ্রযাত্রা অর্ণব-পোত নির্ম্মাণ ও পরিচালন, বহির্বাণিজ্য এবং জগতের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে আদান প্রদান বন্ধ করিয়া এ যুগে কোন জাতি দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, দেহের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ রাখিবার জন্য দুর্দ্দশার একশেষ ভোগ করিয়াও হিন্দুর শিক্ষা হইতেছে না। আজ পর্য্যন্তও দেশ-বিদেশে জলযান পরিচালনের ভার চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর মুসলমানদের উপর অর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত আছে। হিন্দু অদ্যাবধি জাতিচ্যুতির ভয়ে বর্ত্তমান সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ উপাদান বর্জ্জন করিয়া আছে। হিন্দু দেখিয়াও দেখিতেছে না যে, যদি সমুদ্রযাত্রার জন্য আজ কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহা হইলে ভারতের অধিকাংশ রাজন্যবৃন্দ ও তাহার সমাজের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করিতে হইবে। ইদানীং লক্ষ লক্ষ চুক্তিবদ্ধ হিন্দু কুলী (Indentured Labour) জীবিকার্জ্জনের জন্য সমুদ্রের পরপারে অনেক স্থানে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া হিন্দুধর্ম্মপ্রচারকগণ ঐ সকল স্থানে যাইতেছেন না। এ জন্য এই নিরক্ষর হিন্দুগণ হিন্দুত্বহীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে এবং অধিকাংশই খৃষ্টান মিশনারীদের কবলে পতিত হইতেছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া হিন্দু যদি এখনও তাহার আত্মঘাতী কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া জলযানের ব্যবসা অবলম্বন না করে, তাহা হইলে কালের আক্রমণে ধরাপৃষ্ঠে অস্তিত্ব রক্ষা করা যে তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইবার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কালের নির্দ্দেশে প্রয়োজনের অঙ্কুশ তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজের জীবনধারা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র উন্নতিশীল জাতিসমূহ কালের সঙ্গে আপন আপন জাতীয় জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই বাঁচিয়া আছে। জগতের উন্নত জাতিমাত্রই কালোপযোগী পরিবর্ত্তনকে সাদরে বরণ করিয়া উন্নত হইয়াছে। এই জন্য প্রত্যেক যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্মৃতির পরিবর্ত্তন করিতে দূরদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং স্মৃতির সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধান দিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিবিরোধী না হইলে স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তনে "ধর্ম্ম গেল" মনে করিবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসেও দেখা যায় যে, অসভ্য মানব সমাজই স্থিতিশীলতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সুসভ্য মানবসমাজ সর্ব্বত্রই গতিশীল। এ যুগে বিশ্বের উন্নতজাতি মাত্রই প্রগতির পথে বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সময় আমরা যদি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর না হই, কেবল অতীতকে লইয়া মত্ত থাকিয়া বর্ত্তমানের বাস্তব প্রয়োজনকে অবহেলা করি, তাহা হইলে কালের করাল আক্রমণে আমাদের অস্তিত্ব বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। যোগ-দৃষ্টি সহায়ে এই দৃশ্য দেখিয়া অতীতের পূজা ছাড়িয়া বর্ত্তমানের পূজায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও' (ভাববার কথা)।

সেবিকা ও সেবকা

অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, সংস্কৃতকলেজ, কলিকাতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকরণে সেবক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সেবকা হয়, এইরূপ লিখিত আছে, আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে সেবিকা কথাটী খুবই প্রচলিত, সাধারণ নারীরাও কোন গুরুজনকে পত্র লিখিবার সময় নিজের নামের পূর্ব্বে সেবিকা শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকরণানুসারে এই সেবিকা শব্দটী অশুদ্ধ। কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকরণকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে। আমরা দেখাইব যে, সেবিকা ও সেবকা এই উভয় শব্দই বিভিন্ন অর্থে ব্যাকরণানুসারে শুদ্ধ।

কারক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যেরূপ কারিকা হয়, সেইরূপ অন্যান্য ঈদৃশ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গেও ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের স্থানে ইকার হওয়া সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু ইহার কতকগুলি অপবাদ আছে, যে স্থলে এই ইকার হয় না। সকল অপবাদের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এই সেবকা শব্দের সহিত সকল গুলির সম্বন্ধ নাই। এই বিষয়ে পাতঞ্জল মহাভাষ্যে একটী বার্ত্তিক আছে,—ক্ষিপকাদীনাংচ। ৭।৩।৪৪। ইহার অর্থ এই যে, ক্ষিপকা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গে আবন্ত শব্দের ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের স্থানে ইকার হয় না। ডাঃ কীলহর্ণের সম্পাদিত মহাভাষ্যে ইহার তিনটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—ক্ষিপকা, ধ্রুবকা, ধুবকা। কাশীর রাজরাজেশ্বরী প্রেসের প্রকাশিত অধুনা অপ্রাপ্য মহাভাষ্যে এই তিনটী ছাড়া আর একটী উদাহরণ আছে,—চটকা। বহুপূর্ব্বে কাশী হইতে প্রকাশিত ৺রাজারাম শাস্ত্রী ও ৺বালশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত মহাভাষ্যের লিথো সংস্করণেও এই চারিটী উদাহরণই আছে। ইংরেজী ১৮৯৮ অব্দে মুদ্রিত কাশীর লাজারস কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৺বালশাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত কাশিকাতে এই বার্ত্তিকের দুইটী মাত্র উদাহরণ আছে,—ক্ষিপকা ও ধ্রুবকা।

মহাভাষ্যে যে চারিটী উদাহরণ আছে, মাত্র সেই কয়েকটী উদাহরণকেই যদি এই বার্ত্তিকের উদাহরণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে কন্টকা শব্দটীর ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের ইকার হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে; এই জন্য মহাভাষ্যের উদাহরণ কয়টীকে দিগ্‌দর্শনরূপে ধরিয়া আরও এই জাতীয় শব্দকে এই ক্ষিপকাদির মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ আরও কতকগুলি শব্দকে ক্ষিপকাদির মধ্যে গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়; পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী প্রণয়ন করিয়া তাহার উপযোগী গণপাঠও নিজেই রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এরূপ করেন নাই, তিনি বার্ত্তিকগুলির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার উপযোগ্য কোন গণপাঠ রচনা করেন নাই, এই জন্য প্রাচীন পরম্পরা হইতে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে,—"বার্ত্তিকোক্তাগণা আকৃতিগণাঃ" অর্থাৎ বার্ত্তিকে যে সব গণের উল্লেখ আছে—বার্ত্তিকে আদি শব্দের দ্বারা যে শব্দ সমূহের গ্রহণ সূচিত করা হইয়াছে, যে গুলিকে তাহাদের আকৃতি অর্থাৎ রূপের দ্বারাই বুঝিতে হইবে (আকৃত্যাগণাতে জ্ঞায়তে ইতি আকৃতিগণঃ)। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা আকৃতি দেখিয়া প্রামাণিক প্রয়োগানুসারে বার্ত্তিকের উপযোগী এই সকল গণের নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। আজ কালকার

মুদ্রিত গণপাঠে পাণিনির সূত্রের গণপাঠ ছাড়া, বার্ত্তিকের উপযোগী গণপাঠও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গণপাঠ এইরূপেই সংগৃহীত হইয়াছে।

আজকাল নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত সিদ্ধান্ত-কৌমদীর সঙ্গে যে গণপাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গণপাঠ গণরত্নমহোদধি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। গণরত্নমহোদধিকার শ্লোকবদ্ধভাবে সূত্র ও বার্ত্তিকের উপযোগী গণগুলির সংগ্রহ করিয়া নিজেই তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, গণরত্ন-মহোদধিকারের নাম বর্দ্ধমান, ইনি নিজকে শ্রীগোবিন্দ সূরিশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার ব্যাখ্যায় উদাহরণরূপে অভিজ্ঞান শকুন্তল, বেণী-সংহার, শিশুপাল বধ প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইনি এই সকল গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী; ইনি যে সময়ের লোকই হউন না কেন, ইঁহাকে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতসমাজ প্রামাণিকরূপে আদর করিয়া থাকেন।

সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সঙ্গে মুদ্রিত গণপাঠ গণরত্ন-মহোদধি হইতে উদ্ধৃত হইলেও প্রমাদশূন্য নহে, কোন পুস্তকে ধ্রুবকা শব্দকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা ধ্রুবকা শব্দ দুইবার পড়া হইয়াছে, কিন্তু ধ্রুবকা শব্দের উল্লেখ নাই, অথচ মহাভাষ্য ও গণরত্নমহোদধি উভয় গ্রন্থেই ধ্রুবকা শব্দ পঠিত হইয়াছে। গণরত্নমহোদধিতে লহকা শব্দ পঠিত আছে, কোন সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর পাদটীকায় প্রমাদবশতঃ লহকা শব্দের স্থানে হলকা পঠিত হইয়াছে, কোথাও বা লহকা শব্দই পঠিত আছে।

গণরত্নমহোদধিতে ক্ষিপকাদিগণে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পঠিত হইয়াছে :—ক্ষিপকা, ধ্রুবকা, চরকা, সেবকা, করকা, চটকা, অবকা, লহকা, অলকা, কন্যকা, ধ্রুবকা, এড়কা। এই শব্দগুলি পড়িয়া গণরত্নমহোদধিকার লিখিয়াছেন, "আকৃতি-গণোঽয়ম্, তেন যথাদর্শনমন্যোঽপি ভবন্তীতি" (গণরত্নমহোদধি, প্রথম অধ্যায়)। অর্থাৎ ক্ষিপকাদি আকৃতিগণ, সেইজন্য প্রয়োগ দর্শনানুসারে উপরি লিখিত বারটী শব্দ ব্যতীত আরও অন্য শব্দ ক্ষিপকাদির অন্তর্ভূত ধরিতে হইবে।

এখানে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, গণরত্নমহোদধি ব্যতীত মহাভাষ্য প্রভৃতি কোন গ্রন্থেই সেবকা শব্দ ক্ষিপকাদিগণে পঠিত হয় নাই। সেবকা শব্দের বিবৃতি করিতে যাইয়া বর্দ্ধমান স্বয়ং লিখিতেছেন, "সেবা ভক্তিঃ, কুৎসিতা বা সেবা সেবকা।" এখানে এই "বা" শব্দ দেখিয়া মনে হয়, "সেবা ভক্তিঃ" এই অংশের পর কিয়দংশ ত্রুটিও হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোন প্রকার অসামঞ্জস্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সম্ভবতঃ এই অংশে "স্বার্থে কন্" এইরূপ লিখিত ছিল।

সেবা শব্দ হইতে কুৎসার্থে ক প্রত্যয়ে (অষ্টাধ্যায়ী ৫।৩।৭৪) অথবা স্বার্থে কন্‌প্রত্যয়ে (দ্রষ্টব্য ৫।৪।৪ কৈয়টনিষ্পন্ন নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ সেবক শব্দের উত্তর টাপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন সেবকা শব্দের ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের স্থানে ইকার হইবে না; "ক্ষিপকাদীনাং চ" এই বার্ত্তিকানুসারে ইকারের নিষেধ হইবে, ইহাই গণরত্নমহোদধিকারের মত এবং এ বিষয়ে ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, কারণ, এ বিষয়ে গণরত্নমহোদধিকার ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থকার কিছুই লেখেন নাই।

এখন দেখা যাইতেছে, সেবাকর্ত্তা এই অর্থে নিষ্পন্ন যে সেবক শব্দ (সেব+ণ্বুল্ অষ্টাধ্যায়ী ৩।১।১৩৩) তাহার স্ত্রীলিঙ্গে সেবাকর্ত্রী এই অর্থে সেবিকা পদই সিদ্ধ হয়। সেবকের স্ত্রী এই অর্থে সেবকী হইবে।

বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন

অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শনের ভেদ

আমরা শূন্যবাদী ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকের সহিত বেদান্তীর ভেদ দেখাইয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদের সহিত ভেদ থাকিলেও বেদান্তের অনেক অংশে সাম্যও তো বিদ্যমান। বাহ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব অংশে এবং জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা ও বাস্তবতা অংশে বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তদর্শনে কোন ভেদ নাই। শূন্যবাদের সহিতও অনির্বাচ্যতাবাদ বিষয়ে ঐক্য আছে। অতএব বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের একটী শাখা বলিয়াই গৃহীত হওয়া উচিত। এইরূপ আক্ষেপ পূর্ব্বে অনেকে করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও অনেকে করিতেছেন। কিন্তু ইহার উত্তর প্রাচীন আচার্য্যগণ যাহা দিয়াছেন, তাহা এখনও বলবৎ থাকিবে। শ্রীহর্ষ-প্রণীত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য বেদান্তদর্শনের বিজয়-বৈজয়ন্তীরূপে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। এই গ্রন্থের আনন্দপূর্ণাচার্য্য বিদ্যাসাগরী নামে এক টীকা লিখিয়াছেন। আনন্দপূর্ণ বেদান্ত বৌদ্ধসিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদক এবং তাহার সহিত বেদান্তের যে ভেদ তাহার দ্বারা বেদান্তদর্শনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারে না। এইরূপ আক্ষেপের উত্তরে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক দার্শনিকের প্রণিধান করা উচিত। আনন্দপূর্ণের উক্তির আমরা অনুবাদ করিতেছি—"যদি কিঞ্চিৎ সাম্য দেখিয়া বেদান্তদর্শন সুগতসিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদক ইহা বলিতে পারা যায়, তবে কুমারিল ও ক্ষপণকসম্মত ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দর্শনকে জৈনদর্শনের অবান্তরভেদ বলিতে হইবে। নৈয়ায়িকও পরতঃ প্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করেন বলিয়া বৌদ্ধমতেই প্রবেশ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত প্রমাণ বলিয়া সমস্ত মতেরই অভেদ কল্পনা করা যাইতে পারিবে। বৌদ্ধসিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তসিদ্ধান্তের সর্বাংশে সাম্য আছে ইহা কেহই দেখাইতে পারিবেন না।" বস্তুতঃ দার্শনিক-গণের বিবাদ সূক্ষ্মভেদ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—দার্শনিক স্থূলতার পক্ষপাতী নহেন। প্রাচীনগণ সিদ্ধান্ত লইয়া বিবাদ করিতেন, এখন শব্দ লইয়া বিবাদ। যদি এক প্রকার পরিভাষা দুই জন দার্শনিক স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের মতের যতই ভেদ থাকুক না কেন তাঁহাদিগকে এক-মতাবলম্বী বলিতে অনেকে সঙ্কোচ করেন না। কিন্তু কেবল শব্দের মাহাত্ম্য দার্শনিক স্বীকার করেন না—শব্দ লইয়া বিবাদ দার্শনিকও করেন, কিন্তু সে বিবাদ তাহার অর্থ লইয়া এবং সিদ্ধান্ত লইয়া। এক 'নিত্য' ও 'অনিত্য' শব্দ সমস্ত দার্শনিকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অর্থের ভেদ স্পষ্ট। তাই অর্থভেদ থাকে বলিয়াই শব্দবিষয়ে বিবাদ হয়—অর্থকে বাদ দিয়া শব্দ লইয়া বিবাদ দার্শনিকগণ অনুমোদন করেন না। অনেক বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থে আমরা বেদান্তদর্শনে ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই। কিন্তু কেবল পরিভাষার ঐক্য দেখিয়া উহাদের দার্শনিক মতবাদের ঐক্য কল্পনা করা অনেক সময়েই নিরাপদ্ নহে। প্রসঙ্গতঃ আমরা বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধির উল্লেখ করিতে পারি। বসুবন্ধু শুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা চরম ও পরম

তত্ত্ব বলেন। তিনি এই বিজ্ঞানের পরিণাম স্বীকার করেন এবং পরিণাম শব্দের অর্থ অন্যথাভাব। স্থিরমতি তাঁহার ভাষ্যে পরিণাম শব্দের অর্থ কারণ-ক্ষণনিরোধ সমকালিক কার্য্যক্ষণের উৎপত্তি বলিয়া নির্বচন করিয়াছেন। এই পরিণাম আবার তিন প্রকারের, আলয়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান সমস্ত বাসনার আধার এবং ইহা হইতেই মনোবিজ্ঞানরূপ পরিণাম উদ্ভূত হয়। এই মনোবিজ্ঞানের আলম্বন বা বিষয় এই আলয়বিজ্ঞান, এবং 'অহং' 'মম' এইরূপ জ্ঞান এই মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ। ষট্ প্রকার রূপরস প্রভৃতি বিষয়বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। গ্রাহ্য গ্রাহক লক্ষণবিজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শুদ্ধবিজ্ঞান মাত্রে অবস্থিতিই নির্বাণস্বরূপ। শুদ্ধ বিজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকে না। ইহা অচিত্ত অনুপলম্ভাত্মক জ্ঞান। চিত্তশব্দের অর্থ গ্রাহক এবং উপলম্ভ শব্দের অর্থ গ্রাহ্যার্থের জ্ঞান। এই লোকোত্তর জ্ঞান কুশল, ধ্রুব এবং সুখস্বভাব। বেদান্তমতের সহিত বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু কতক গুলি সংশয়ও এস্থলে অনিবার্য্যভাবে উপস্থিত হইতেছে এবং তাহাদের সমাধান না হইলে বসুবন্ধুর সিদ্ধান্ত শাঙ্করবেদান্তসিদ্ধান্তের সহিত অভিন্ন ইহা বলা যাইবে না। প্রথম সংশয় বিজ্ঞানের অন্যথাভাব, যাহাকে পরিণাম বলা হইয়াছে, তাহা সত্য কিনা। অর্থাৎ পরিণাম শব্দে শঙ্করের প্রচারিত বিবর্ত্ত বুঝিব না সাংখ্যসম্মত পরিণাম বা বিকার বুঝিব? যদি পরিণাম অর্থে বিকার বুঝা যায়—তবে বসুবন্ধুর বিজ্ঞান ও শঙ্করের ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন স্বভাবের বস্তু বলিতে হইবে। আর একটি সংশয়—ধ্রুব ও সুখ শব্দের অর্থ লইয়া। ধ্রুব শব্দের অর্থ নিত্য ও অক্ষয় ইহা স্থিরমতি বলিয়াছেন। কিন্তু 'অক্ষয়' ও 'নিত্য' বলিতে আমরা পরিণামী নিত্য বস্তুও বুঝিতে পারি। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পরিণামিনী হইয়াও নিত্য এবং অক্ষয়। প্রকৃতির ক্ষয় বা ধ্বংস নাই। যদি এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়—তবে এই বিজ্ঞানকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যাইবে না—যদিও উভয়ের শুদ্ধ-চৈতন্য-স্বভাবত্ব অংশে কোন ভেদ থাকিবে না। 'সুখ' শব্দের অর্থ আনন্দস্বরূপ কিংবা দুঃখাভাব মাত্র—ইহাও বিচার করিতে হইবে। যদি পূর্ব অর্থ গ্রহণ করা যায়—শাঙ্কর বেদান্তের সহিত বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের এই অংশে ভেদ থাকিবে না। কিন্তু স্থিরমতি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহাতে সংশয়ই থাকিয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যেহেতু অদ্বয় শুদ্ধ বিজ্ঞান নিত্য, ইহা সেইজন্য সুখ। কারণ যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখ [ধ্রুবো নিত্যত্বাদক্ষয়তয়া। সুখো নিত্যত্বাদেব—যদনিত্যং তদ্ দুঃখম্। অয়ং চ নিত্য ইত্যস্মাৎ সুখঃ। ত্রিংশিকা—৩০ কাঃ ভাঃ]। কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের সংশয়ের সমাধান হইল না। অবশ্য বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাকে 'তথতা' এবং ধর্মসমূহের পরমার্থ বলিয়াছেন। ইহা তথতা অর্থাৎ সর্বকালে একরূপভাবে অবস্থিত। এখন আশঙ্কা হইবে—এই তথতা ব্রহ্মের ন্যায় কূটস্থ নিত্য কিনা? স্থিরমতির ব্যাখ্যা হইতে মনে করিতে পারা যায় যে ইহা কূটস্থ নিত্য। স্থিরমতি ইহাকে আকাশের ন্যায় বিমল, একরস ও অবিকারী বলিয়াছেন (অথবা আকাশবৎ সর্বত্রৈকরসার্থেন বৈমল্যাবিকারার্থেন চ পরিনিষ্পন্নঃ স্বভাবঃ পরমার্থ উচ্যতে– ত্রিংশিকা ২৪১/২ কারিকা ভাষ্য)। যদি শুদ্ধবিজ্ঞান অবিকারী ও অপরিণামী নিত্য বস্তু হয় এবং যদি নানা চিত্তসন্তান মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ইহা বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন বলিয়াই গৃহীত হইবে। তবে সংশয়ের কারণ এইস্থলে যে বসুবন্ধু বা স্থিরমতি স্পষ্টভাষায় বিজ্ঞান পরিণামকে মিথ্যা বা অবিদ্যাকল্পিত বলেন নাই—যদিও গ্রাহ্যগ্রাহকভাবকে মিথ্যা বলা হইয়াছে।

গৌড়পাদ প্রণীত মাণ্ডূক্যকারিকা ও বৌদ্ধমত

সম্প্রতি অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়পাদকারিকা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকার বেদান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা অযৌক্তিক এবং অন্ততঃ চতুর্থ প্রকরণ, যাহা অলাতশান্তি প্রকরণ নামে বিদিত, তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক এবং ইহার বেদান্ত সিদ্ধান্তানুসারী ব্যাখ্যা অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। শাস্ত্রিমহাশয় গৌড়পাদকারিকার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত হইলেও তাহা শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত হইতে পারে না, এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে অলাতশান্তি প্রকরণটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ—ইহার সহিত অন্য তিনটি প্রকরণের কোন সঙ্গতি নাই। আমরা শাস্ত্রিমহাশয়ের যুক্তি বা সিদ্ধান্ত ইহার কোনটিকেই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। শাস্ত্রি-মহাশয়ের মতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যদি তাঁহার মত যথার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে শঙ্করের পূর্ব্বকালভাবী বেদান্তমত বৌদ্ধবাদেরই অনুবৃত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে এবং শঙ্করের অদ্বৈতমতও যদি পূর্ব্বপ্রচারিত বেদান্তমতের সহিত ভিন্ন না হয়, তবে তাহাও বৌদ্ধদর্শনের প্রস্থানান্তর বলিয়া গৃহীত হইবে এবং পদ্মপুরাণে শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈত-বাদের 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে' ইহা বলিয়া যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা যথাশ্রুত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পদ্মপুরাণের মধ্যে মধ্বাচার্য্য স্বকৃত তিন শত শ্লোক যোজনা করিয়াছিলেন ইহা 'যথার্থমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের হস্তলিখিত পুস্তক হইতে জানা যায় এবং ইহা পুরাণাচার্য্য নবসিংহঠাকুর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Indian Cultureএর January 1937 সংখ্যায় 'পদ্মপুরাণ' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয় এই তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন এবং 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্'—ইত্যাদি শ্লোক নিশ্চয়ই মধ্ব বা শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—প্রবন্ধলেখক হাজরামহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাহউক—আমাদের পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করা কর্ত্তব্য গৌড়পাদকারিকার বেদান্তবিরোধী বৌদ্ধমতের প্রতিপাদন করা হইয়াছে কিনা। শাস্ত্রিমহাশয় প্রথম তিনটি প্রকরণে বেদান্তমতই প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং চতুর্থ প্রকরণে বৌদ্ধমতই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার অভিমত। আমরা পূর্ব্বে বেদান্ত ও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্য-বাদের ভেদ দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছি। এখন বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদের সহিত অলাতশান্তি-প্রকরণের কোথায় সাম্য আছে তাহা বিচার করিতেছি। শাস্ত্রিমহাশয়—চতুর্থপ্রকরণের প্রথম শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁহার সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই প্রথম শ্লোকের অর্থ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। "জ্ঞানেনাকাশ কল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্। জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দেদ্বিপদাংবরম্॥" এই শ্লোকের স্থূল অর্থ "যিনি আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা গগনোপম ধর্মসমূহকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার জ্ঞান জ্ঞেয় (বিষয়) হইতে অভিন্ন, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে আমি বন্দনা করি।" এখন জিজ্ঞাস্য এই 'দ্বিপদ-শ্রেষ্ঠ' বলিতে কাহাকে বুঝিতে হইবে? পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থে 'দ্বিপদোত্তম,' 'নরোত্তম' 'পুরুষোত্তম' শব্দের দ্বারা বুদ্ধকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রিমহাশয় লিখিয়াছেন। মহাভারতে 'দ্বিপদাংবর' 'ধৃতরাষ্ট্র' ও 'নৈষধনলের' বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও শাস্ত্রিমহাশয় দেখাইয়াছেন। গীতায়

ভগবান্ নিজেকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়াছেন। শাস্ত্রি-মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রমাণ হইতেই পাওয়া গেল যে 'পুরুষোত্তম' প্রভৃতি শব্দ তাহাদের যৌগিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহারা বুদ্ধের সংজ্ঞারূপে গৃহীত হয় নাই, যদিও বৌদ্ধগ্রন্থে পুরুষোত্তম প্রভৃতি বিশেষণ বুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই এবং না হইবারই কথা; কারণ বুদ্ধ ভিন্ন অন্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম স্বীকার করিলে বৌদ্ধমতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। যাহাহউক, 'দ্বিপদাংবর' বা পুরুষোত্তম প্রভৃতি শব্দ অনন্যগামী হইয়া কেবল বুদ্ধের বিশেষণ বা সংজ্ঞারূপে গৃহীত হইবার কোন কারণ শাস্ত্রিমহাশয় দেখাইতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্য 'দ্বিপদাংবর' শব্দের দ্বারা 'নারায়ণ' বা 'বিষ্ণু' এখানে প্রতিপাদ্য ইহা বলেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে এ ব্যাখ্যা অসমীচীন। তাঁহার যুক্তি—নারায়ণের আকাশকল্প জ্ঞান আছে এবিষয়ে প্রমাণ নাই। আমরা এযুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে পারিলাম না। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ ইহা তো সর্ব্বজনবিদিত। যিনিই সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, তাঁহার জ্ঞান আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত হইবে ইহা তো জানা কথা। সর্ব্বজ্ঞ বলিতে কেবল বুদ্ধকেই বুঝিতে হইবে—ইহা কিরূপে জানা যায়? যদি কোন জৈন বা সাংখ্য দর্শনে সর্ব্বজ্ঞের জ্ঞান আকাশকল্প ইহা লিখিত হয়—তাহাতেও আমরা কোন অসঙ্গতি দেখিতে পাইব না। কারণ সর্ব্বজ্ঞের জ্ঞান আকাশকল্প না হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাই সিদ্ধ হইবে না। শাস্ত্রিমহাশয়—'জ্ঞেয়াভিন্ন' এই বিশেষণের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন জ্ঞান জ্ঞেয়ের সহিত অভিন্ন ইহা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর কথা। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানবাদী শূন্যবাদীর হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন। বেদান্ত মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অভেদ হইতে পারে—কিন্তু সে অভেদ আধ্যাসিক ও অবিদ্যাকল্পিত। পূর্ব্বে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে জ্ঞেয় অর্থে আত্মাকে বুঝিয়াছেন। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বাস্তব অভেদ স্বীকার করিতে হইলে আত্মাকেই জ্ঞেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন। কারণ আত্মা 'জ্ঞানস্বরূপ' বলিয়া জ্ঞানাভিন্ন হইবেন—অন্য কোন কল্পিত বিষয় জ্ঞানের সহিত পরমার্থতঃ অভেদাপন্ন হইতে পারে না, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর এস্থলে 'জ্ঞেয়' অর্থে আত্মাই বুঝিতে হইবে তাহা গৌড়-পাদাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন। "অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে। ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যম্ অজেনাজং বিবুধ্যতে"॥ (৩-৩৩)। এই কারিকায় অকল্পক অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞেয় কল্পনারহিত অজ (জন্মরহিত) জ্ঞানই অজ নিত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং এই অজ নিত্য ব্রহ্মই জ্ঞেয় এবং অজ নিত্য জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞাতা। গৌড়পাদ কারিকায় চিত্ত, বিজ্ঞান, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয় ৭ম পাদটীকায় লঙ্কাবতার সূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সহিত গৌড়পাদ কারিকার কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা 'জ্ঞেয়াভিন্ন' এই বিশেষণের দ্বারা বৌদ্ধ প্রভাব সূচিত হইতেছে—ইহা বুঝিতে পারিলাম না। কারণ 'সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো-নীলতদ্ধিয়োঃ'—এই সিদ্ধান্ত বেদান্তী গ্রহণ করিতে পারেন না এবং ইহা স্বীকার করিলে শূন্যবাদেই পর্য্যবসান হইবে। তৃতীয় প্রকরণের ৪৭ কারিকায়ও অজ জ্ঞেয়ের সহিতই অভেদই নির্বাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ বিচার করিয়া শাস্ত্রিমহাশয় বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই এখানে প্রতিপাদ্য ইহা বলিয়াছেন। শাস্ত্রিমহাশয় অথণ্ডনীয় প্রমাণ

সহকারে দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্ম শব্দ বস্তু বা দ্রব্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মাণ্ডূক্য কারিকায় ব্যবহৃত ধর্মশব্দেরও এই অর্থ। শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে ধর্মশব্দের 'আত্মা' এবং যে স্থলে এ অর্থ সমীচীন হয় না, সে স্থলে 'বস্তু' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রিমহাশয় বলিয়াছেন যে ধর্ম শব্দের 'বস্তু' অর্থে প্রয়োগ যখন বৌদ্ধগণই করিয়াছেন এবং গৌড়পাদও যখন বস্তু অর্থেই ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন গৌড়পাদ বৌদ্ধমতেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহা বুঝিতে হইবে। আমরা এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না। মানিয়াই লইলাম যে ধর্মশব্দের বস্তু অর্থে প্রয়োগ বৌদ্ধগণের পরিভাষা। কিন্তু এই পরিভাষা অন্য কেহ গ্রহণ করিলে তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেন ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? বর্তমানকালে বেদান্তী, মীমাংসক, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক প্রভৃতি সকলেই নব্যন্যায়ের পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতো মনে করা যায় না। তাহার কারণ সিদ্ধান্তের ভেদ। যদি সিদ্ধান্তভেদ না থাকে, তবেই দুই জন দার্শনিককে একমতাবলম্বী বলা যাইতে পারে। এখন যদি গৌড়পাদ কারিকার সহিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের সর্বাংশে অভেদ দেখাইতে পারা যায়, তবেই ইহা বৌদ্ধসিদ্ধান্ত প্রতিপাদক ইহা বলা যাইতে পারে। কেবল শব্দের বা পরিভাষার সাম্যদ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবে না। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে চতুর্থ প্রকরণে দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিক বৌদ্ধদার্শনিকদিগের মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। আর যাহার মত খণ্ডন করা হইবে, তাহার পরিভাষা দ্বারাই সেই মত খণ্ডন করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধ শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদীর মতের খণ্ডন চতুর্থ প্রকরণে দেখিতে পাই; কাজেই তাহাদের পরিভাষা অবলম্বন করাই যুক্তিসম্মত। শঙ্করাচার্য্য ধর্মশব্দের অর্থ বস্তু ইহা জানিতেন না ইহা শাস্ত্রিমহাশয় প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ধর্মশব্দের 'আত্মা' অর্থ হইতে পারে না ইহা কিরূপে বলা যায়? যে যে স্থানে 'ধর্ম' অজ, বিনাশরহিত, নিত্য প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট হইয়াছে, সে স্থানে ধর্মশব্দ আত্মাকেই বুঝাইবে; কারণ আত্মা ভিন্ন কেহই অজ হইতে পারে না এবং অজ বিজ্ঞান ও অজ বিজ্ঞেয় আত্মাই হইবে। 'আত্মা' শব্দের অর্থ বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারেনা। যে স্থলে ধর্মশব্দের অর্থ আত্মরূপ বস্তু হইতে পারেনা, সে স্থলে কেবল বস্তুরূপ অর্থই ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে কোন অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দেখি না।

শাস্ত্রিমহাশয়ের আর একটি অভিযোগ এই যে জ্ঞান আকাশকল্প এবং জ্ঞেয় গগনোপম কিরূপে হইতে পারে তাহার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করেন নাই—কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। "প্রকৃত্যাকাশবজ্ জ্ঞেয়াঃ সর্বে ধর্মাঃ স্বভাবতঃ। বিদ্যতে নহি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিঞ্চন (৪র্থ প্র, ৯১, কা)॥ এই কারিকার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার স্পষ্টতঃ আকাশের সহিত উপমার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—"পরমার্থতস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবত আকাশবৎ আকাশতুল্যাঃ **সূক্ষ্ম নিরঞ্জন-সর্বগতত্বৈঃ** সর্বে ধর্মাঃ আত্মানো জ্ঞেয়াঃ মুমুক্ষুভিরনাদয়ো নিত্যাঃ।" আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন ও সর্বগত বলিয়া ধর্ম সমূহ আকাশতুল্য এবং নিত্য। ধর্ম শব্দের অর্থ এস্থলে বিজ্ঞানৈকস্বভাব আত্মা ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। কারণ নিত্য, নিরঞ্জন, সূক্ষ্ম আকাশতুল্য বস্তু চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। চতুর্থ প্রকরণে ৯৬ কারিকায় জ্ঞানকে অসঙ্গ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার জ্ঞান অসঙ্গ বলিয়াই

আকাশকল্প ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—অসঙ্গং তৎ কীর্তিতমাকাশকল্পমিত্যুক্তম্।

আমরা প্রথম কারিকার সমস্ত পদের অর্থ আলোচনা করিলাম। এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে—এই কারিকার অর্থ বেদান্তসিদ্ধান্তের বিরোধী কি না? চৈতন্য একমাত্র বস্তু এবং ইহা আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ও ভেদবর্জ্জিত ইহা তো বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। এই অজের ভেদ মায়াকল্পিত এই কথা বলিয়া গৌড়পাদ বেদান্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন [মায়য়াভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন। ৩য় প্র, ১৯ কা]। এই মায়া চৈতন্যাশ্রিত এবং পরমার্থতঃ অসৎ ইহাই বেদান্তের নির্ণয় (২-১২) গৌড়পাদের এই উক্তি বেদান্ত-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী বা শূন্যবাদী স্পষ্টতঃ চৈতন্যই মায়ার আশ্রয় এবং চৈতন্যের ভেদ এবং তন্নিবন্ধন দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াকল্পিত এবং অদ্বৈতই সত্য ইহা বলেন নাই। বৈতথ্য প্রকরণে ১২শ কারিকায় "কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মাদেবঃ স্বমায়য়া। স এব বুধ্যতে ভেদান্ ইতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ।" ইহা বেদান্তের নিশ্চয় এই উক্তির দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিকগণ একথা বলেন নাই—ইহা সূচিত হইতেছে। "ধর্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ। জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে॥" ৪র্থ প্র, ৫৮ কা,—মায়া বস্তুতঃ অলীক এই উক্তি বেদান্তমতেরই পরিপোষক। অবশ্য শূন্যবাদীর মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় সমস্তই মায়াকল্পিত এবং মায়াও অসৎ ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই মায়া অদ্বয় একমাত্র সর্ববিধভেদরহিত চৈতন্যাশ্রিত এবং চৈতন্যই পরমার্থ ইহা মাধ্যমিক কারিকা বা তাহার বৃত্তিতে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। ইহা বলিলে ঔপনিষদ সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইবে এবং শূন্যবাদীর সহিত অদ্বৈতবাদের একবাক্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা বাহুল্য ভয়ে অধিক বচন উদ্ধৃত করিলাম না।

শাস্ত্রিমহাশয়ের আর দুইটি আক্ষেপের সমালোচনা করিব। তন্মধ্যে প্রথম আক্ষেপ মাণ্ডুক্য কারিকার চতুর্থ প্রকরণ পূর্বপ্রকরণত্রয়ের সহিত অসম্বদ্ধ ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং ইহাতে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী। কিন্তু ধৈর্য্য ও অভীপ্সার সহিত আলোচনা করিলে শাস্ত্রিমহাশয়ের সংশয় যে ভিত্তিহীন তাহা প্রমাণিত হইবে। গৌড়পাদ প্রথম আগম প্রকরণে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত ও মত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণে যুক্তি সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রপঞ্চ অবিদ্যমান এবং দ্বৈত মায়ামাত্র ইহা আগম প্রকরণের সিদ্ধান্ত [আগম প্রকরণ ১৬-১৮ কা]। বৈতথ্য প্রকরণে ইহাই অতি বিস্তৃতভাবে যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে ইহাই বেদান্তের নির্ণয়। প্রমাণ স্বরূপ—'স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা। তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং **বেদান্তেষু** বিচক্ষণৈঃ॥" ২-৩১, "বীতরাগভয়ক্রোধৈ র্মুনিভি **র্বেদপারগৈঃ**। নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ॥" ২ ৩৫, "তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।" ২ ৩৬ কারিকা উপস্থাপন করিলাম। তৃতীয় অদ্বৈতপ্রকরণে অজাতিবাদ সবিস্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং উপনিষদ্ বাক্য সমূহের ইহাই স্বরস ও সিদ্ধান্ত—ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটি প্রকরণ যে অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক এবিষয়ে সংশয়ের কোন সঙ্গত কারণ নাই এবং ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। 'তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানলোকং সমন্ততঃ'—(৩-৩৫) এই কারিকাও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদেরই গমক। এখন বিবাদের বিষয় চতুর্থ প্রকরণ। আমাদের মতে এই প্রকরণ পূর্ব-প্রকরণত্রয়ের সহিত অত্যন্ত সম্বদ্ধ এবং ইহা পূর্ব-প্রকরণত্রয়ের সিদ্ধান্তই বিরোধী মতবাদীদের মত

খণ্ডনপূর্ব্বক সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আমরা এখন প্রমাণ উপস্থাপিত করিব। চতুর্থ প্রকরণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের অনেক কারিকা অংশতঃ বা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা নিশ্চয়ই চতুর্থ প্রকরণ যে পূর্বপ্রকরণত্রয়ের অনুবৃত্তি এবং সমগ্র প্রকরণ চতুষ্টয় যে এক অখণ্ড গ্রন্থ তাহার পরিচায়ক। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কারিকাগুলির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চতুর্থ প্রকরণের প্রথম কারিকার 'জ্ঞেয়াভিন্ন' পদ তৃতীয় প্রকরণের ৩৩ কারিকার 'জ্ঞেয়াভিন্ন' পদেরই আবৃত্তি। ৪-২ কারিকার "অস্পর্শযোগো বৈ নাম" ইত্যাদি ৩-৩৯কাঃ "অস্পর্শযোগো বৈ নাম" ইত্যাদির শব্দতঃ এবং অর্থতঃ আবৃত্তি। ৪-৬কাঃ ৩-২০ কারিকার সহিত অর্থতঃ এবং প্রায়শঃ শব্দতঃ অভিন্ন। ৪-(৭-৮) কারিকা ৩ (২১-২২) কারিকার পুনরাবৃত্তিমাত্র। ৪-(৩১ ৩২) কারিকাদ্বয় ২-(৬-৭) কারিকাদ্বয়ের অবিকল আবৃত্তি। ৪-৩৩ কারিকা ২-১ কারিকার অর্থতঃ আবৃত্তি। ৪-৩৪ কারিকা ২-২ কারিকার দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত একরূপ এবং প্রথমার্দ্ধের সহিত একার্থক। ৪ ৮১ কারিকা 'অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্। সকৃদ্ বিভাতো যেবৈষ ধর্মো ধাতু স্বভাবতঃ॥ (৩-৩৬কাঃ) "অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকম-রূপকম্। সকৃদ্ বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন॥" এবং "অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" ১-১৬কাঃ — এই তিনটি কারিকার শব্দ ও অর্থগত সাদৃশ্য প্রণিধানের যোগ্য। ৪-৭১ কারিকা ৩ ৪৮ কারিকার পুনরাবৃত্তি।

পূর্বোদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারা প্রকরণত্রয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইল। কেবল বাক্য সংবাদের উপর আমরা নির্ভর করিব না। সিদ্ধান্ত-গত ঐক্যই উহাদের একবাক্যতা প্রমাণিত করিবে। চতুর্থ প্রকরণে তৃতীয় কারিকা হইতে ২৩ কারিকা পর্য্যন্ত কেবল তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণের অজাতি-বাদের সমর্থন করিতেছে। ইহা পুনরুক্তিমাত্র হইলেও নিরর্থক নহে—কারণ যাঁহারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের পারমার্থিকত্ব ও উৎপত্তির বাস্তবতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতের খণ্ডনই এখানে অভিপ্রেত। পুনরুক্তি যে স্থলে প্রয়োজনবিহীন, সেই স্থলেই দোষের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার আবশ্যকতা থাকিলে দোষ হইবে না। ৪-২৪ হইতে ৪-২৭ কারিকা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় চৈতন্থ প্রকরণের বিষয় মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করিতেছে। অতঃপর ৯৭ কারিকা পর্য্যন্ত আবার অজাতিবাদের এবং বিষয়রহিত শুদ্ধবিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণমাত্র।

আমরা আশা করিতে পারি যে, যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে চতুর্থ প্রকরণের সহিত পূর্ব প্রকরণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ ও একবাক্যতা সম্বন্ধে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সংশয় থাকিবে না। প্রথম প্রকরণত্রয়ের বেদান্তসম্মত অদ্বৈতবাদই প্রতিপাদ্য বস্তু ইহা শাস্ত্রিমহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। চতুর্থ প্রকরণও যে পূর্ব-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদক তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে এবং আমাদের অনুসৃত শৈলী অবলম্বন করিয়া যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই এই সমগ্র গ্রন্থের অখণ্ডতা ও একবাক্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবেন, এবিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের কোন সন্দেহ নাই। চতুর্থপ্রকরণে অনেকবার 'বুদ্ধগণ' ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন—ইহা উক্ত হইয়াছে এবং এই বুদ্ধশব্দের দ্বারা ইহাকে বৌদ্ধমত প্রতিপাদক বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে। বৌদ্ধগ্রন্থে উপলব্ধ অনেক বাক্যও গৌড়পাদ কারিকার বাক্যের সহিত অভিন্ন বা অত্যন্তসদৃশ। 'ধর্ম' শব্দের বস্তু অর্থে প্রয়োগ যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়,

তাহা অন্যত্র দুর্লভ। আমরা এসমস্ত কথাই মানিয়া লইব। কিন্তু ইহা বেদান্ত বিরোধী বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছে ইহা স্বীকার করিতে পারিব না। আমাদের মতে এই পরিভাষাসাম্য এবং বাক্যসংবাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্যপ্রকারের মনে হয়। যেমন পরবর্ত্তিকালে কবীর, দাদু, নানক প্রভৃতি ধর্মপ্রবক্তৃগণ আবির্ভূত হইয়া পরস্পর বিবদমান হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্মের অবিরোধ প্রতিপাদন করিয়া উভয় ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন, গৌড়পাদাচার্য্যও তেমনি বৌদ্ধ ও বেদান্তমতের মধ্যে অবিরোধ সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তমতের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা বিস্তার না করিয়া বৌদ্ধমতকে বেদান্তের মধ্যে যে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা নহে, বরং বুদ্ধপ্রচারিত মতের যথার্থ ব্যাখ্যা বেদান্তমতের অনুসারেই সম্ভবপর হয়—ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাহার প্রমাণ তৃতীয় প্রকরণের ২৭-২৮ কারিকা। এস্থানে সতের মায়িক জন্ম সম্ভবপর, অসতের মায়িক জন্মও হইতে পারেনা, ইহা বলিয়া বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা এবং শূন্যবাদের নিরাকরণ করা হইয়াছে। ৪—১৯ কারিকায় অজাতিবাদ বুদ্ধগণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া বৌদ্ধসিদ্ধান্ত গৌড়পাদাচার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু 'বুদ্ধৈঃ' এই বহুবচনান্তপ্রয়োগ তত্ত্বদর্শী অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বুদ্ধগণকে তত্ত্বদর্শী বলিতে গৌড়পাদ সঙ্কোচ করেন নাই। অদ্বৈতপ্রকরণে অজাতিবাদ যে বেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। একারণেই ৪।৫ কারিকায় গৌড়পাদ "খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্ বিবদামোনতৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধত"—এই বলিয়া বৌদ্ধবাদের সহিত অবিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। বুদ্ধপ্রত্যাখ্যাত শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদের অযথার্থতা ও অযৌক্তিকতা বেদান্তের সিদ্ধান্ত অবলম্বনেই উপপাদন করিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি নাই, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহার সম্বন্ধে উচ্ছেদ বা শাশ্বতবাদের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। "সংবৃত্যা জায়তে সর্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ। সদ্ভাবেন হ্যজং সর্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ॥" এই কারিকায় শূন্যবাদীর শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদের ব্যাখ্যা খণ্ডিত হইয়াছে। শূন্যবাদীর মতে অসতের বিনাশও নাই, শাশ্বতত্বও নাই। গৌড়পাদ বলেন, উৎপত্তি যখন মায়িক, তখন কাহাকেও শাশ্বত বলা যাইতে পারে না এবং যখন সমস্ত বস্তুই অজ ও অদ্বয় পরমার্থ চৈতন্যরূপে সৎ, তখন তাহার উচ্ছেদও কি প্রকারে হইবে? শাশ্বত ও অশাশ্বতের উক্তি অজ ধর্ম অর্থাৎ চৈতন্য বিষয়ে সর্বথা অপ্রয়োজ্য। ইহা মায়িক বিষয়েই উক্ত হইয়াছে। (৪-৫৭-৬০ কাঃ)। ইহাই গৌড়পাদাচার্য্যের ব্যাখ্যা এবং ইহা বেদান্ত-সিদ্ধান্তেরই অনুকূল।

[৪-৮০ কাঃ] অদ্বৈতচৈতন্যই চরম তত্ত্ব এবং দ্বৈত মায়া-কল্পিত। অজ নিত্য চৈতন্যে যে নিশ্চলা-স্থিতি তাহা বুদ্ধগণের বিষয়, গৌড়পাদের এই উক্তি বেদান্তবিরুদ্ধমত প্রতিপাদন করে না। তাহার কারণ, এই অভয়পদকে তিনি ব্রাহ্মণ্যপদ (৪-৮৫) এবং ইহা বিপ্রগণের বিনয় এবং স্বাভাবিক শম ইহাও বলিয়াছেন (৪-৮৫-৮৬)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধগণ প্রচারিত তত্ত্ব বেদান্ততত্ত্বের সহিত অভিন্ন। সমস্ত ধর্মই অনাদি, অনুৎপন্ন ও আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ইহা বুদ্ধের উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ কোথাও নাই—সমস্ত ধর্মই এক অদ্বৈত বস্তু। সমস্ত ধর্ম স্বভাবতই আদিবুদ্ধ অর্থাৎ নিত্যবোধস্বরূপ এবং সমস্ত ধর্মই সম ও অভিন্ন। এই অজ সাম্যই বিশারদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ তত্ত্ব। ভেদদর্শীদের এই বৈশারদ্য নাই। যাঁহারা অজ সাম্যে সুনিশ্চিত তাঁহারাই মহাজ্ঞানী। ইহার সহিত—'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে

স্থিতাঃ" (গীঃ) এই গীতাবাক্য তুলনীয়। এই সমস্ত উক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে তত্ত্বদর্শী বুদ্ধগণ-প্রচারিত তত্ত্ববাদের সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই। "বিবদামো ন তৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধতঃ"—এই অবিবাদই তিনি জ্ঞাপন করিতেছেন। কিন্তু এই অবিবাদ প্রচলিত শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ বা ক্ষণিকবাদের সহিত নহে। এই সমস্ত মতবাদ বুদ্ধ-প্রচারিত তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা—ইহা গৌড়পাদাচার্য্য পুনঃপুনঃ নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

"ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ। সর্বে ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্"—৪র্থ প্রকরণের ৯৯ কারিকার অর্থ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বুদ্ধের জ্ঞান ধর্ম অর্থাৎ বিষয়ান্তরে সংক্রমিত হয় না—যেহেতু বিষয়ের চৈতন্য হইতে পৃথক্ সত্তা নাই। যে চরম বিশারদপদ জ্ঞেয় এবং প্রাপ্য তাহা বুদ্ধ-জ্ঞান হইতে পৃথগ্ভূতবস্তু নহে এবং সমস্ত ধর্মও জ্ঞানবৎ কোথাও সংক্রমিত হয় না—যেহেতু সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ আত্মা এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ইহাই বুদ্ধভাষিত। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইবে না মনে করি। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অন্যরূপ—'তিনি বলেন যে তায়ী অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ বা পূজাবান্ বুদ্ধ অর্থাৎ পরমার্থদর্শীর জ্ঞান ধর্ম অর্থাৎ বিষয়ান্তরে সংক্রান্ত হয় না। সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ আত্মা এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় আকাশবৎ অচল ও অবিক্রিয়। যদিও বুদ্ধ (অর্থাৎ শাক্যমুনি) বাহ্যার্থ জ্ঞানমাত্রের কল্পনা বলিয়া নিরাকরণ করিয়াছেন এবং অদ্বৈতমতের সমীপবর্ত্তী মতবাদের উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি পরমার্থতত্ত্ব অদ্বৈতমত তিনি উপদেশ করেন নাই—ইহা বেদান্তের মধ্যেই জানিতে পারা যায়।' আমরা এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত ইহা বলিতে পারিব না। কারণ, ভগবান বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া যে মতের ব্যাখ্যা আমরা পরবর্ত্তী বৌদ্ধদার্শনিক গ্রন্থসমূহে উপলব্ধি করি, তাহা বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎসমূহের ন্যায় স্পষ্টতঃ অদ্বৈতমতের প্রতিপাদন করে না। করিলে কোন না কোন ব্যাখ্যাতা ইহা প্রচার করিতেন। যদি ভাষ্যকারসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা যায়—তাহাতেও ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি গৌড়পাদাচার্য্য অধিক্ষেপ করিয়াছেন—ইহা মনে করা ভুল হইবে। গৌড়পাদের আশয় এইরূপ হইতে পারে—ভগবান্ বুদ্ধ যদিও স্পষ্ট ভাষায় সম্পূর্ণ অদ্বৈতমতের উপদেশ করেন নাই, তথাপি এই মতেই যে তাঁহার স্বরস, তাহা যুক্তিদ্বারা তাঁহার বাক্যের গূঢ় আশয় বিচার করিলে পাওয়া যায়। গৌড়পাদাচার্য্যের আরও অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বুদ্ধের বাণীসমূহের নিগূঢ় ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন নাই। যদি উপনিষদ্ বাক্যের সহিত তাঁহার বাক্যের অবিসংবাদিতা উপলব্ধি করা না যায়, তবে বুদ্ধ যে গূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাতই থাকিবে।

আর একটী আশঙ্কার সমাধান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সিদ্ধান্তগত ঐক্য প্রদর্শন করিয়া এবং বেদান্তিসম্প্রদায়ের প্রচলিত ও গৃহীত মতানুসারে প্রকরণ চতুষ্টয়কে এক গ্রন্থ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, ইহা আমরা উপপাদন করিতে প্রয়াস করিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলে কেন গৌড়পাদ চতুর্থ প্রকরণের প্রারম্ভে স্বতন্ত্র মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মঙ্গলাচরণহেতু চতুর্থপ্রকরণকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই মনে করা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে, মঙ্গলাচরণ শাস্ত্রের আদিতে, মধ্যে, অবসানে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। কেহ আদিতে মঙ্গলাচরণ করেন এবং গ্রন্থের মধ্যে কোন প্রকরণ, অধ্যায় বা পাদের আদিতেও মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জয়ন্ত ভট্ট প্রণীত ন্যায়মঞ্জরী, শ্রীধরপ্রণীত ন্যায়কন্দলী, অমলানন্দবিরচিত বেদান্ত-কল্পতরুর প্রতি সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গৌড়পাদাচার্য্য পূর্বপ্রকরণত্রয়ের কোন স্থলে মঙ্গলাচরণ করেন নাই, মঙ্গলাচরণ না করার কৈফিয়ৎ অন্য। কিন্তু চতুর্থ প্রকরণের আদিতে মঙ্গলাচরণের দ্বারা বড় জোর ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে, ইহা পূর্বপ্রকরণত্রয়ের সহিত সর্বথা অসম্বদ্ধ ও স্বতন্ত্র, ইহা মনে করিবার কারণ দেখি না। শাস্ত্রিমহাশয় বসুবন্ধু ও ধর্মকীর্ত্তি প্রভৃতি যোগাচার দার্শনিকের সহিত গৌড়পাদ কারিকার সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে বৌদ্ধমত প্রতিপাদক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা বিপরীত সিদ্ধান্তই বা কেন গৃহীত হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। বড়ই আনন্দের বিষয় যে খৃষ্টীয় একাদশশতকে

আবির্ভূত অদ্বয়বজ্র নামক বৌদ্ধদার্শনিক তাঁহার "তত্ত্বরত্নাবলী" নামক গ্রন্থে সাকার ও নিরাকার বিজ্ঞানবাদভেদে দুই প্রকার বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ধর্মকীর্ত্তির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মতকে সাকার-বিজ্ঞানবাদ বলিয়াছেন এবং বসুবন্ধুর ত্রিংশিকাকারিকা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিরাকার-বিজ্ঞানবাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন (তত্ত্বরত্নাবলী, পৃঃ ১৮-১৯, গুইকোয়ার সিরিজ)। অদ্বয়বজ্র এই দুই মতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পরমার্থ সৎ নিত্য সাকার-বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া সাকার-বিজ্ঞানবাদী ভগবৎ-প্রতিষ্ঠিত বেদান্তমতেই প্রবেশ করিয়াছেন এবং নিত্য নিরাকার-বিজ্ঞানবাদী ভাস্করমতস্থিত বেদান্ত-বাদেই প্রবেশ করিয়াছেন। অদ্বয়বজ্র এই সমস্ত দার্শনিকগণকে বেদান্তমতাবলম্বী বলিয়া অধিক্ষেপ করিয়াছেন। গৌড়পাদপ্রচারিত বেদান্তমত—যাহার অনুরূপ মতকে অদ্বয়বজ্র ভগবৎমত সংস্থিত-বেদান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদকে যাহার অনুকরণ বলিয়া ধর্মকীর্ত্তি-প্রচারিত সাকার-বিজ্ঞানবাদ ও বসুবন্ধুপ্রচারিত নিরাকার-বিজ্ঞানবাদকে অদ্বয়বজ্র উপহাস করিয়াছেন, সেই বেদান্তমতকে বৌদ্ধমতের অনুকরণ মনে করিয়া শাস্ত্রিমহাশয় বিপরীত সিদ্ধান্তই করিয়াছেন, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যদি নিত্যবিজ্ঞান পরমার্থসৎ বলিয়া গৃহীত না হয়, তবেই ইহা বৌদ্ধসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহা অদ্বয়বজ্র স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিয়াছেন। গৌড়পাদ ব্যাখ্যাত তত্ত্ব কোন বৌদ্ধদার্শনিক গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা জানিনা। যদি গ্রহণ করেন, তবে গোঁড়া বৌদ্ধদার্শনিক ইহা অবৌদ্ধ বেদান্তমত বলিয়াই উপেক্ষা করিবেন এবং কার্য্যতঃ যে তাহাই করিয়াছেন, সে বিষয়ে অদ্বয়বজ্রের বাক্যই প্রমাণ।

প্রবন্ধের আকার বেশ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসু ও সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ইহা পাঠ করেন এবং বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এক কথায় সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতে গেলে বলিব—গৌড়পাদ কারিকায় বেদান্তের প্রতিকূল বৌদ্ধমতের প্রতিপাদন করা হয় নাই, বরং বুদ্ধদেব-প্রচারিত তত্ত্ববাদ বেদান্তের সহিত অভিন্ন এবং বেদান্ত মতানুসারেই তাঁহার বাণীর যথার্থতা নিরূপিত হইবে, ইহাই গৌড়পাদাচার্য্যের আশয় বলিয়া আমরা মনে করি। আর কারিকার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য প্রণীত নহে, শাস্ত্রিমহাশয়ের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভাষ্যকারের যে সুদৃঢ়, নির্ভীক ও সাধ্বসরহিত বচোভঙ্গী ও বিচার-শৈলীর সহিত আমরা পরিচিত, সেই বাগ্‌ভঙ্গী ও বিচারমল্লতা আমরা এখানেও উপলব্ধি করি। যদি শঙ্করের রচনা ইহা না হয়, তবে ইহাকে জাল বলিতে হইবে। সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, শঙ্করাচার্য্যের ইহা প্রথম রচিত ভাষ্য এবং ইহা সমীচীন যে আচার্য্য তাঁহার পরমগুরুর গ্রন্থের উপরে প্রথম ভাষ্য লিখিবেন। ইহা আরও প্রণিধান করা উচিত—শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে গৌড়পাদই মায়াবাদ প্রচার করেন এবং শাঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদই প্রধান উপজীব্য। এই কারণেই গৌড়পাদ কারিকার ভাষ্যের আদিতে ও অন্তে আমরা বিস্তৃত মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাই। ভাষ্যকার তাঁহার সমস্ত শ্রদ্ধা, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি পরমগুরুর চরণে অর্ঘ্য-রূপে দান করিয়াছেন। ইহার পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যতিরেকে অন্য কোথাও ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করেন নাই। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় যে মাণ্ডুক্যকারিকায় তাঁহার পরমগুরুর এবং তৈত্তিরীয় ভাষ্য প্রারম্ভে স্বীয়গুরুর বন্দনা করিয়া ভাষ্যকার চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। অন্যত্র এ মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই—অন্ততঃ তাহা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্য বিঘ্নধ্বংস ও শিষ্যশিক্ষা। তাহা মাণ্ডুক্য-কারিকা ও তৈত্তিরীয় ভাষ্য প্রারম্ভে কৃত মঙ্গলা-চরণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার মনে করিয়াছিলেন এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায়।

শ্রীমার কথা

স্বামী গিবিজানন্দ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মাকে যখন উদ্বোধন অফিসে দর্শন করি, এই সময় স্বামী সত্যকাম মার অনেকগুলি ফটো (মা ঠাকুবেব পূজা করিতেছেন, পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন) উঠান। তখন ১০।১৫ দিন মার নিকট ছিলাম।

আবার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৺কাশী হইতে উদ্বোধন অফিসে আসিয়া মাকে দর্শন কবি। যতদুর মনে হয়, এই বৎসর পূজনীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাকে দর্শন করিতে মাদ্রাজ হইতে মঠে আসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবিজয় নামক একটী কলেজেব ছাত্র মঠে থাকিতে চায়। পূজনীয় বাবুবাম মহাবাজ তাহাকে কিছুতেই মঠে রাখিবেন না। সেই ছেলেটীও কিছু না খাইয়া স্বামীজির মন্দিবের নিকট বেলগাছেব নীচে অভিমানে পডিয়া বহিল। বামকৃষ্ণানন্দজীব দয়া হইল, তিনি ছেলেটীকে বলিলেন, "মাদ্রাজ মঠে থাক্‌বে?" সুবেন্দ্রবিজয় অমনি স্বীকৃত হইল। রামকৃষ্ণানন্দজী তাহাকে লইয়া উদ্বোধন অফিসে যাইয়া মাকে বলিলেন, "মা এ ছেলেটী আমার সঙ্গে মাদ্রাজ যাচ্ছে, একে সন্ন্যাস দিয়ে দেবেন কি?" মা বলিলেন, "শরৎকে বল, সে সন্ন্যাস দিক্।" পূজনীয় শবৎ মহারাজ বলিলেন, "আমি কাব কি মনের ভাব বুঝিনা, আর সন্ন্যাস টন্ন্যাস মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দেন।" মা বলিলেন, "তা হলে ৺পুবীতে রাখালেব নিকট থেকে নেয় যেন।"

৺পুরীতেও মহারাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ছেলেটী কিছুদিন মাদ্রাজ মঠে থাকিবার পর ৺কাশীতে তাহার মাকে দেখিতে আসে ও পরে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পুনরায় পড়াশুনা কবে। মা তাহার সাময়িক বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে সন্ন্যাস দেন নাই।

আব একটী ঘটনা মনে পড়ে, একজন ব্রাহ্মণসন্তানকে মা গৈরিক-বসন দেন। ছেলেটী বিহার সেক্রেট্যারীয়্যাটে কেবাণী ছিল। বৈবাগ্য হওয়ায় চাকবী ত্যাগ করিয়া মার নিকট হইতে গৈবিক ধাবণ কবিয়া হরিদ্বার, ঋষিকেশ, উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানে তপস্যা করে। সন্ন্যাসীবা তাহাকে সন্ন্যাসোচিত বিবজা হোম করিতে বলেন। ছেলেটী মাকে বিরজাহোমেব কথা নিবেদন করে। মা তাহাকে পত্রে লিখেন, "বিবজাহোম অতি কঠিন ব্যাপার বলে আমি তোমাকে উহা কব্‌তে আদেশ দেই নাই।" প্রায় পঞ্চদশ বৎসব তপস্যাব পব উক্ত ছেলেটী গৃহীভাব গ্রহণ কবে। বুঝিলাম, ছেলেটী আজীবন ত্যাগব্রত রাখিতে পাবিবে না বলিয়াই মা তাহাকে সন্ন্যাসীদেব বিবজা হোম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একজন ব্রহ্মচারী ৺পুরীতে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাবাজেব নিকট হইতে দীক্ষা লইবাব আশায় পদব্রজে কলিকাতা হইতে ৺পুরী বওনা হয়। মহাবাজ যে কাবণেই হউক, দীক্ষা মন্ত্র (বীজমন্ত্র-সংযুক্ত) না দিয়া জপেব মত কিছু বলিয়া দেন। সে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতা চলিয়া আসে। একদিন উদ্বোধন অফিসে মাকে দর্শন কবিতে আসে। মা তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষা হয়েছে।" সে বলিল, "হাঁ, ৺পুরীতে মহারাজ আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন।" মা বলিলেন, "না, তোমার দীক্ষা হয় নি, রাখাল তোমাকে দীক্ষা দেয়নি।" তখন ছেলেটী বলিল,

"মা আপনি আমাকে দয়া করুন।" মা তাহাকে দীক্ষা দিলেন। কিন্তু ছেলেটী পরে অপরাপর বন্ধুদের নিকট বলিয়াছিল,—"মহারাজ আমাকে এই মন্ত্র দেন, মা আবার আমাকে এই মন্ত্র দিয়েছেন।" যখন সকলে তাহাকে বলিল, দীক্ষা-মন্ত্র বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তখন সে ভয় পাইয়া মার নিকট আসিয়া সব নিবেদন করিল। মা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ কি বোকা। বীজমন্ত্র কি কাউকে বলে? এই দেখনা, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ কত ছোট, কত নগন্ত, কিন্তু এই বিশাল বটবৃক্ষ এই ক্ষুদ্র বীজেই নিহিত রয়েছে। যত্নে এত বড় বৃক্ষটী এই ক্ষুদ্র বীজ থেকেই বেরোয়। সেইরূপ বীজমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত হলেও যত্ন করে সাধন করলে এর ভেতর দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ হয়।" মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাক্, আর কাউকে বলো না।"

১৯১২ সনে মা কাশী আসেন এবং প্রায় তিন মাস কাশীতে ছিলেন। আমি তখন কাশীতে পাণিনি ব্যাকরণ পড়ি। সঙ্গে কাব্য উপনিষদ্ সভাষ্য পড়িতেছি। পাঠে এতদূর মনোনিবেশ করিয়াছি যে, ধ্যান-জপের সময় পর্য্যন্ত ব্যাকরণের সূত্র, শব্দ, ধাতুরূপ প্রভৃতি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকিত। ব্যাকরণ যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ভগবদ্ ধ্যান আর হয় না। ভাবিলাম, মাকে জানাইয়া ইহার একটা প্রতিকার করিতে হইবে। যখন সাধুরা কেহ মার নিকট নাই এমন সময় মাকে বলিলাম, "মা আজকাল আমার মনটা বড়ই চঞ্চল, ধ্যান-জপ মোটেই হয় না।" মা বলিলেন, "তুমি কি কিছু পড়?" আমি বলিলাম, "হাঁ হিন্দুকলেজে সংস্কৃতবিভাগে আমি ব্যাকরণ ও উপনিষদ্ পড়ি আর দুপুরে অপর একজন পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ি।"

এই কথা বলা মাত্র রাধু-বলিয়া উঠিল, "তাই তো আমি ভাবি সাধু হয়ে আবার কলেজে রোজ বই নিয়ে যায় কেন?" তখন মা বেশ জোরের সহিত বলিলেন, "তুমি মনে করো না একথাগুলো তোমাকে একটী ছোট মেয়ে বল্‌ছে, তুমি জান্‌বে মা জগদম্বা রাধুর মুখ দিয়ে তোমাকে বল্‌ছেন।" আমি বলিলাম, "তবে কি লেখাপড়া ছেড়ে দেব?" মা বলিলেন, "একটা মন কোন্ দিকে দিবে, পড়ায় দিবে, না ভগবানে দিবে? পড়াশুনা ছেড়ে দাও।" গুরুর আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু পুত্রশোক হইলে মানুষের যা অবস্থা হয়, আমার প্রায় তদ্রূপ। ইতিপূর্ব্বে পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজও আমার পড়াশুনার উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন, "কিরে, পণ্ডিত হবি নাকি?" আমি তখন বলিয়াছিলাম, "আপনি বলেন তো পড়া ছেড়ে দি।" তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "শাঙ্কর ভাষ্যগুলো পড়ে নিস্।" মার কথার পর হইতে আমার পাণিনি ও কাব্যাদি পড়া ও কলেজে যাওয়া চিরদিনের মত বন্ধ হইয়াছিল।

মা "কাশীখণ্ড" শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি পাঠক হইলাম। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয়—এইকথা কাশীখণ্ডে লেখা আছে। একদিন রা—মাকে বলিল, "এই যে মাছিটা মরে পড়ে আছে, এটাও কি মুক্ত হল।" মা জোরের সহিত বলিলেন, "হাঁ ওটাও মুক্ত হল।" একদিন আমি মাকে বলিলাম, "মা এই যে কাশীতে কত গুণ্ডা রয়েছে, এরা এখানে মরে উদ্ধার হয়ে যাবে—আর অন্যত্র হয়তো একজন তপস্বী সামান্য কামনার জন্ম আটকে যাবে, এটা কি ঠিক?" আমি রাজা ভরত ও তাহার মৃগশিশুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম। আরো বলিলাম, "শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই মুক্তি হতে পারে না।" মা বলিলেন, "বাবা, তোমরা পড়েছ—ঘুরবে। ঠাকুর আমাদের বলে গেছেন, কাশীতে মলেই মুক্তি হবে। ভগবানের

এই তো অহৈতুকী কৃপা। সব জায়গায় সাধন করে মুক্তি হবে। এখানে তিনি বিনা সাধনেই জীবকে মুক্তি দেন।" পরে উপনিষদে ঠিক এইরূপ কথা পাই, "অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষু উৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ" (জাবাল উঃ ১)। "প্রাণ উৎক্রমণকালে রুদ্রদেব এইখানে জীবকে ত্রাণ-কারক মন্ত্র দান করেন, ইহা দ্বারা জীব মৃত্যুরহিত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। সুতরাং মুক্তি-ক্ষেত্র কাশীতে সর্বদা বাস করিবে। কাশীবাস ত্যাগ করিবে না।"

কাশী সেবাশ্রমের ব—মহারাজকে দীক্ষা দিবার জন্য আমি মাকে অনুরোধ করি। মা বলিলেন, "কাশীতে আমি কাউকে দীক্ষা দেব না। তুমি একটা ঠাকুরের নাম বলে দাও।" আমি বলিলাম, "বেশ কথা! আমি নিজেই কিছু বুঝিনা, আবার অপরকে বুঝাতে যাব?" মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, অপর জায়গায় দেব, এখানে না।" আমি কাশীতে দীক্ষা না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন, "কাশীতে যা করা যায়, তা অক্ষয় হয়। দীক্ষা দিয়ে আমি শিষ্যের পাপ গ্রহণ করি। পাপকে অক্ষয় করে নেব কেন?" পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজও একবার বলিয়াছিলেন, "এখানের একবার জপ অন্যত্রের শতবারের সমান। তোরা খুব জপ করিস।" কথাপ্রসঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, "কাশীর আধ্যাত্মিক প্রবাহটা (religious current শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন) অসির দিক্ দিয়ে গেছে।"

যিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া অতি যত্নের সহিত পাণিনি পড়াইতেন, তিনি একদিন মাকে দর্শন করিতে আসেন। পণ্ডিতজী বৃদ্ধ, প্রায় ৭০ বৎসর বয়স। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। মা-ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "আমাদের যে পাণ্ডিত্য ইহা আপনারই শক্তি—আপনি সরস্বতী।" শ্রীশ্রীঠাকুর মার সম্বন্ধে বলিতেন, "ও সরস্বতী, এবার রূপ ছেড়ে এসেছে জীবকে জ্ঞান দেবার জন্য।" বৃদ্ধ পণ্ডিতজী মাকে দর্শনমাত্র এই কথা বলিলেন, ইহা তাঁহার উপলব্ধি না অনুমান?

ঠাকুরের গুরু তোতাপুরীর সমসাময়িক একজন সাধু কাশীতে তখন ছিলেন—নাম চামেলীপুরী। চামেলী বাবা উলঙ্গ সন্ন্যাসী। আমি তাঁহাকে বয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "সওছে কুছ্ কম হ্যায়, আশীকা উপর (আশীর উপর, এক শতের কিছু কম)।" আমার মনে হইত ৯০।৯৫ বৎসর হইবে। একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মার দর্শন কি করিয়া পাইব।" তিনি বলিয়াছিলেন, "কলযুগমে ক্যায়া দর্শন হোতা হ্যায়, ইয়ে মায়ী দেখ্ লে।" (কলিতে কি দর্শন হয়? এই মা দেখে নে," এই বলিয়া তিনি ২।১টী ভক্ত স্ত্রীলোক দেখাইয়া দেন। আমি বুঝিলাম, স্ত্রীজাতির মধ্যে যে মা জগদম্বা রহিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। আমি পুনরায় বলিলাম, "আমাদের বাংলা দেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণদেব এঁরা তো এই কলিযুগেই মার দর্শন পেয়েছেন?" তিনি বলিলেন, "এম্নি কি দর্শন হয়? আমার গুরু এক গুহায় ৮০ বৎসর তপস্যা করেন, তবে ভগবতী কৃপা করেন।" চামেলী বাবা প্রৌঢ়াবস্থা পর্যান্ত নবরাত্রির নয় দিন অনাহারে মার পূজা করিতেন। শেষ বয়সে এই নয় দিনের মধ্যে মাত্র একদিন আহার করিতেন। তিনি বলিতেন, "এখন একটানা নয়দিন উপবাস আর পারি না।" নবরাত্রির সময় যখন মার পূজা করিতেন, তখন একখানা কাপড় পরিতেন। মা এই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহাকে একখানা কম্বল দান করেন। ইঁহাকে দর্শন করিয়া মা অন্য সাধু আর দেখিতে চান নাই।

সেবার কাশীতে মার জন্মতিথি। ভক্ত

নৃপেন বাবু মহাসমারোহে ইহা সম্পন্ন করেন। জন্মতিথির দিন মা একখানা কমলা রংয়ের রেশমী কাপড় মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দেন। মহারাজ কাপড়খানা পরিয়া বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে সেবাশ্রম হইতে অদ্বৈতাশ্রমে আসেন এবং পরে কিরণ বাবুর বাড়ীতে মাকে প্রণাম করিতে যান। একটু পরে আমিও মাকে প্রণাম করিতে যাই। রাসবিহারী মাকে বলিতেছে, "হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের কাপড় দুখানা কিন্তু মহারাজের কাপড়ের মত হল না।" মা বলিলেন, "তা হোক, রাখাল ছেলে।" আমার মনে খট্কা লাগিল, তবে কি ঠাকুরের অপরাপর শিষ্যেরা মার ছেলে নন? পরে বুঝিলাম, পঞ্চবটীতে মা-কালী মহারাজের স্বরূপকে ঠাকুরের মানসপুত্ররূপে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনাকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই মা বলিয়াছিলেন, "রাখাল ছেলে।" ঠাকুরের সহিত মহারাজের সম্বন্ধ ভাগবতী।

এই কাশীতেই আল অফ্ স্যাণ্ডুইচ্ ও তাঁহার পত্নী মাকে প্রণাম করিতে আসেন। আর্লপত্নী মিস্ ম্যাক্‌লাউডের বোন্‌ঝি। তাঁহার মা মিসেস্ লেগেট্ আমেরিকার কোটীপতি মহিলা। উভয় ভগ্নীই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। মা এদের দুই বোন্‌কে জয়া বিজয়া বলিতেন। আর্ল ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া মাকে প্রণাম করিলেন। আর্লপত্নীও মাকে প্রণাম করিলেন। মা আর্লপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জয়া বিজয়া (তাঁর মা ও মাসী) কেমন আছে। তিনি সব কুশল নিবেদন করিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া আর্লদম্পতি অদ্বৈতাশ্রমে আসেন। পূজনীয় হরিমহারাজ যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন আর্ল-পত্নী বালিকা। তিনি তাঁহাকে আলবার্টো বলিয়া তখন আদর করিয়া ডাকিতেন। তাঁহাকে স্বামিসহ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আর্লপত্নীও বাল্যের সরলতার সহিত নিঃসংকোচে হরিমহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আমার ছেলেরা খুব বেদান্তের ভাব—স্বামীজির ভাব নিচ্ছে। একদিন বড় ছেলে ছোট ভাইয়ের দস্তানা খুলে দিয়ে বললে, দেখ ভাই, তোমার দস্তানা খুলে দেওয়াতে যেমন তোমার কোন কষ্ট হয় না, তেম্নি জীবাত্মা যখন দেহ ছেড়ে যায়, তখন তার কোন কষ্ট হয় না।" হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "মেয়েটা দেখ্‌ছি ঠিক তেম্নি সরল আছে।" আর্লপত্নীর কথাগুলি আমার বেশ লাগিল, বুঝিলাম, ছেলেপিলের শিক্ষা মার উপর নির্ভর করে। ভাল মার ছেলেই ভাল হয়। আদর্শ জননীর গর্ভেই আদর্শ সন্তানের জন্ম হয়।

কয়েক বৎসর পর আবার কলিকাতা আসা হয়, যতদূর মনে হইতেছে, ত্রিপুরা জিলায় বন্যার কার্য্যোপলক্ষে। এবার মঠে দুর্গোৎসব। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ দুর্গোৎসব করিতেছেন। শ্রীমা এবং গোলাপমা, রাধু প্রভৃতি মেয়েরা মঠের পাশের বাগানে আছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, এই তিন দিন মার পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়া পূজা করি। স্নানান্তে পাশের বাগানে যাইয়া মার পায় অঞ্জলি দিয়া আসিতাম। একদিন প্রাতে মা ঠাকুর প্রণাম করিতে মঠে আসিয়াছেন। মা উপর তলার দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সঙ্গে গোলাপ মা। এই সময় আমি মার পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়া প্রণাম করিতেছি। তখন গোলাপ মা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মার পায় বেলপাতা দিওনা।" আমি বলিলাম, "ঠাকুর যখন ফুল বেলপাতা দিয়ে মাকে পূজো করেছেন, তখন আমরা করবো না কেন?" মা একটু হাসিলেন। আমি সানন্দে মার পূজা করিলাম। সন্ধিপূজার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।" ব্রহ্মচারীটী বুঝিলেন

উল্টা—তিনি মনে করিলেন, ৺দুর্গা প্রতিমার সামনে বোধ হয় দিতে বলিতেছেন। তিনি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য মহারাজকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ওবাগানে মা আছেন, তাঁর পায় গিনিটী দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হল।" মার পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইলে মা উদ্বোধনে চলিয়া গেলেন।

আমি মঠে অবস্থান করিতেছি। এক দিনের একটী ঘটনা লিখিতেছি। একটী ভক্ত মহিলা মাকে তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দিতে আমন্ত্রণ করেন। মা তাঁহার বাড়ীতে যান এবং ঠাকুরের পূজাদি করিয়া অন্নাদি ভোগ নিবেদনের সময় দেখিলেন, ঠাকুর কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিতেছেন না। মা ঠাকুরকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু গ্রহণ না করলে আমিও কিছু গ্রহণ করতে পারবো না। না খেয়ে গৃহস্থের বাড়ী থেকে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।" তখন মা দেখিলেন, ঠাকুরের মুখ হইতে একটী রশ্মি বাহির হইয়া পায়সান্নের উপর পতিত হইল। মা পায়সান্ন ছাড়া আর কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। কেবল-মাত্র প্রসাদস্বরূপ অল্প একটু মুখে দিয়া উদ্বোধনে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু উদ্বোধনে আসিবার পর মার বমন হইল, দু'এক দিন একটু জ্বরও হইল। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এই ঘটনা শুনিয়া বাসবিহারীকে বলিয়াছিলেন, "তোরা কেন মাকে যেখানে সেখানে নিয়ে যাস? এই ত্যাখ্ না, ওদের অন্ন মা পর্য্যন্ত হজম করতে পারলেন না।"

মার মধ্যম ভ্রাতা কালী মামা। তাঁর ছেলে ভূদেবের বয়স বৎসর পনর হইবে। শুনিলাম, তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। আমি মাকে বলিলাম, 'মা এতটুকু ছেলে ভূদেব, তার আবার বে' কি?" মা বলিলেন, "সে কি! ওরা ভোগ করতে সংসারে এসেছে। ওরা তো ত্যাগের জন্য আসে নি। ভোগ করতে এসেছে, ভোগ করুক।" বুঝিলাম, মা তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের জন্য শম, দম, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা রূপ ধন দান করিতেছেন, আবার ভোগী ভক্তদের জন্যও তাঁহাদের ভোগানুরূপ ফল দান করিতেছেন।

১৯২১ সালে আমাকে ভুবনেশ্বর যাইতে হয়। সেখানে দুর্ভিক্ষের জন্য সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে। পরে বর্ষার জল এমন বাড়িল যে, পল্লি-অঞ্চল সব ডুবিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে আছেন। ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রে মহারাজ আমাকে ডাকিলেন। আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহার ঘরে গেলাম। তিনি বলিলেন, "ত্যাখ তো একটা ইঁদুর বড় খট্ খট্ করছে।" আমি সারা ঘর খুঁজিয়া কোথাও ইঁদুরের সন্ধান পাইলাম না। মহারাজকে বলিলাম, "না, ইঁদুর তো দেখ্‌ছি না, বোধ হয় পালিয়েছে।" মহারাজ বলিলেন, "ত্যাখ্, একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখ্‌লুম। ত্যাখ্ তো ঘড়িটা, কটা বেজেছে?" আমি বলিলাম, 'এই একটা বেজে ৫।৬ মিনিট (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)।'

৬ই শ্রাবণ তার আসিল, মা ৪ঠা শ্রাবণ রাত ১।৩০ মিনিটে (কলিকাতা সময়) দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরশু রাত্রে কি এই স্বপ্নই দেখেছিলেন?"

মহারাজ বলিলেন "হাঁ, ত্যাখ্, মা চলে গেলেন, নিরাশ্রয় হয়ে গেলুম।" সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রাদ্ধাদি নাই, কিন্তু তথাপি মহারাজ মার সমস্ত শিষ্যদের বলিলেন, "তোরা সকলে ত্রিরাত্র হবিষ্য করবি।" মহারাজ নিজেও তিন দিন একবেলা আতপান্ন খাইয়া হবিষ্য করিলেন এবং জুতা প্রভৃতি পায় দিলেন না।

যাঁহারা শ্রাদ্ধকে অর্থহীন মনে করেন, এই ঘটনা হইতে তাঁহাদের অনেক শিখিবার আছে। শ্রদ্ধাই প্রকৃত শ্রাদ্ধ। শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধে যাঁহাদের অধিকার নাই, তাঁহারাও গুরুর প্রতি কি উপায়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাহা শিখিবার বিষয়।

কায়া

শ্রীঅপর্ণা দেবী

মরজগতের মাটির মানব
ভালবাসি মোরা কায়া,
হয়ত সে হোক ক্ষণিকের খেলা,
হয়ত হউক মায়া।
মোদের বিশ্ব কায়া দিয়ে ঘেরা,
অণু পরমাণু তনু দিয়ে গড়া,
জানি—চিনি শুধু কায়ারেই মোরা,
কায়া পূজি নিশিদিন ;
কায়াই মোদের মরমের মাঝে
বাজায় মোহন-বীণ্।

মর্ত্ত্য পূজারী—মূর্ত্তি-পূজারী—
ভালবাসি মোরা কায়া,
কায়ার জগৎ—সত্য মোদের,
কায়াহীন—সে ত ছায়া।
রুচির-প্রকৃতি—বররুচি ভরা
সৃষ্টি তাহার, তনু-রুচি ঘেরা,
অরূপ হেথায় হয়ে আত্মহারা
গাহিছে রূপের গান,
রূপের সাগরে গলিয়া মিশিয়া,
অরূপ লভেছে প্রাণ।

সাগরে, গগনে অনন্ত নীল,
ধরার শ্যামল ছবি,
চন্দ্র-তারার স্বপ্ন-মাধুরী,
ঊষার মোহন-রবি,
ফুলের সুরভি,—বিহগের গীতি,
রূপ-রসময়ী ধরণীর প্রীতি,
সুধার পসরা বিলাইছে নিতি ;
বিধাতার অবদান
কায়ারে ত্যজিলে, কেমনে বাঁচিবে
মরজগতের প্রাণ!

কায়ার আলোকে—হাসে ছায়ালোকে
মায়ালোক উদ্ভাসি',
কায়ার দেবতা চিরসুন্দর
বাজায় মোহন-বাঁশী।
ক্ষণতরে হাসি—'ক্ষণ'কে উজলি'
আঁধারের কোলে চিরতরে ঢলি',
মরজগতের যাহা যায় চলি',
স্মৃতি চিরজাগরূক
কে বাখিত তার?—বিহনে কায়ার
ভাষা হ'ত চিরমূক।

কায়ার বিহনে, মর্ত্ত্য কেমনে
হেরিত সে ভগবান।
চরণে কাহার প্রেম-উপহার
ভক্ত করিত দান।
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা জানেনা যে দেশ,
মন-বুদ্ধিপারে—অনাদি অশেষ,
চির সবিশেষ—তবু নির্ব্বিশেষ,
কে আনিত বাণী তার।
প্রণমি তোমারে, নরদেহধারী
বরণীয় অবতার!

জড় উপাদানে প্রতিমা গঠিয়া,
করি মোরা কায়াদান
চিন্ময় ভূপে, মৃন্ময় রূপে
প্রতিষ্ঠা করি প্রাণ।
আকুল হিয়ার শত কামনায়
বেঁধে আনি মোরা কায়ার মায়ায়
চির-চিন্ময় বরদেবতায়
লীলা মাঝে অভিনব!
হে কায়া-দেবতা। শিব-সুন্দর!
প্রণমি চরণে তব।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি

শ্যামপুকুরের বাড়ীর কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থানকালীন সকল ঘটনাই পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ ঘটনাই আমাদেরও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া ইহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে কেবলমাত্র দুই তিনটী ঘটনা, যাহা আমার মনে চিরদিনের জন্য একটী স্থায়িভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে এবং যে ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত আমার নিজের প্রত্যক্ষীভূত, এস্থলে কেবল সেই কয়টীরই উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তখন ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য প্রায় প্রত্যহই দেখিতে আসিতেন। শুনিয়াছি, ইহার বহুপূর্ব্বে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থানের সময় রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি সেই সময় ঠাকুরের কোন এক অসুখের চিকিৎসার জন্য মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া আনেন। ডাক্তার সরকার মহাশয় সেই সময় হইতে ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। কিন্তু সে বহুদিন আগেকার কথা, তখন ঠাকুরের সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণা তাঁহার দাঁড়াইয়াছিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠে তাহা মনে হয় না। কিন্তু এই শ্যামপুকুরের বাটীতেই যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখনকার তাঁহার একদিনের কথা হইতেএইটী আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। একদিন ঘরে ঢুকিবামাত্র তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হে, তুমি আমার কি করলে বল দিকিন।" তাহাতে ঠাকুর ঈষৎ হাসিমুখে বলিলেন, "কেন গো, কি করলুম আমি আবার?" হাসিতে হাসিতে সরকার মহাশয়ও বলিলেন, "করলে নাতো কি, সকাল সন্ধ্যে সমস্ত সময়েই কেবল রামকৃষ্ণ আর রামকৃষ্ণই চলছে। আমার সব কাজ গেল—সব গেল, সকল সময় ঠিকমত রোগীদের দেখতে যাওয়া পর্য্যন্ত ঘটে উঠে না। এ কি রকম বল দিকিন, কেবলই মনে হয়, কখন তোমায় দেখতে আসবো।' ঠাকুর পূর্ব্বের মতই হাসি হাসি মুখে যেন বলিলেন, "ওমা, সে কি গো।" 'যেন' বলিলাম এইজন্য যে, ঠাকুর এত আস্তে কথাটী বলিয়াছিলেন যে, স্পষ্ট শোনা যায় নাই। যাহা হউক, ইহার পর ডাক্তার সরকার মহাশয় ধীরে ধীরে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমায় এত ভালবাসি কেন জানো? স্পষ্ট বলতে কি, আমি বাপু তেমন ঠিকমত তোমার ও-ঈশ্বর ফিশ্বর মানিনে। আমি মানি এক Nature অর্থাৎ যাকে বলে প্রকৃতি। তা তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি যেন ঠিক Child of nature অর্থাৎ সেই প্রকৃতির ঠিক সন্তান। প্রকৃতিতে যেমন দেখি, এই ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়ে প্রলয়মূর্ত্তিতে সব ভেঙ্গে চুরে তচ্‌নচ্‌ করে দিলে, কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়লো,

কি ভয়ানক বেদনাপ্রদ দৃশ্য, পরক্ষণেই আবার দেখি, সব বদ্‌লে গেল—কেমন শান্তিময় প্রশান্ত ভাব। যেখানে এই একটু আগে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছে, তার পাশেই তখনি দেখি আবার কেমন ফুল ফুটে হাসছে। তেমনি যখন তখন তোমাকেও দেখি, এই যেন রোগের যন্ত্রণায় ছটফট্ করে হাত যোড় করে শিগ্‌গির সারিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করছ, ওমা, তখুনি দেখি আবার ফিক্ করে একটু হেসে একেবারে চক্ষু মুদে কোথায় দিলে ডুব। কোথায় বা সে যন্ত্রণা, কোথায় বা সে অস্থিরতা, কেমন শান্তিপূর্ণ মূর্ত্তি।" ঠাকুর সে কথার উত্তরে আর কিছু বলিলেন না, শুধু প্রসন্ন নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুর সেদিনকার কথা "ঠিকমত তোমার ও-ঈশ্বর ফিশ্বর মানি নে" বলিলেও তিনি যে একেবারে নাস্তিক ছিলেন না, তাহা তাঁহার অন্য দিনের কথা হইতে জানিতে পারি। যেদিন তিনি বৈজ্ঞানিকগণ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করিবার সময় এ কথাও বলেন, "আমি সেই সব নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের কথা ধরছি না—তাদের কথা বুঝতে পারি না, চক্ষু থাকতেও তারা অন্ধ।" সুতরাং তাঁহার এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি একেবারে নাস্তিক ছিলেন না; তবে যে আবার "তোমার ঈশ্বর ফিশ্বর মানি নে" বলিয়াছিলেন, এটা বোধ হয় কতকটা ব্যঙ্গচ্ছলে ও সাধারণে যেমন ঈশ্বর বলিতে কালী, দুর্গা, শিব বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া বুঝে, সে রকমটা তিনি মানিতেন না, ইহাই মনে হয়। সে যাহা হউক, এইরূপে যাতায়াতের মধ্যে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ক্রমশঃ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার ভাব দিন দিন উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত হইতে এবং তাঁহার পূর্ব্বেকার সকল ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেও দেখিয়াছিলাম। এই সময় ঠাকুরের অনেক দৈবশক্তি ও বিভূতির পরিচয়ও যে তিনি পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ইহাও যে একটী বিশেষ কারণ, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

এই সম্বন্ধে আর একদিনের বিষয় আমি উল্লেখ করিতেছি, যাহা শুনিলে পাঠকগণ আমার এ কথার যথার্থতা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। যে বৎসর ঠাকুর স্বরূপে প্রস্থান করেন, খুব সম্ভব তাহারই অগ্রবর্ত্তী কার্ত্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণ মাসের গোড়াতেই হইবে, ঠিক আমার এক্ষণে তেমন স্মরণ নাই। ঐরূপ সময় কলিকাতায় ও অন্য নানাস্থান হইতে একদিন রাত্রিতে ভীষণ উল্কাপাত দেখা গিয়াছিল। ঠিক তাহার পরের দিনেই ডাক্তার সরকার মহাশয় নিত্য যেমন ঠাকুরকে দেখিতে আসেন, তেমনি সন্ধ্যার সময় দেখিতে আসিয়াছিলেন। নানা কথার মধ্যে এই অস্বাভাবিক উল্কাপাতের কথাও উঠিল। অনেকেই তখন ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। কে কে ছিলেন তাহা এক্ষণে আমার ঠিক স্মরণ নাই। কিন্তু যাঁহারা তখন ঐ বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহারা কয়জনই ঐ বিষয় ইংরাজীতেই আলোচনা করিতেছিলেন, এই কথাটা আমার এখনও বেশ মনে আছে। ঠাকুর ইংরাজী জানিতেন না। সুতরাং ইংরাজী অজানা লোক যেমন ইংরাজী বলিতে শুনিলে সাধারণতঃ একটু ফ্যাল্কা মুখ হইয়া চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, ঠাকুরও ঠিক সেই রকম হইয়া তাঁহাদের মুখের পানে চাহিয়া সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই সমাধি ভঙ্গে তাঁহাদের দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ গো, তোমরা কিসের কথা বল্‌ছিলে? আমি দেখলুম, সেই চিন্ময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেন কত সব উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে, তোমরা কি এই সব কথা বল্‌ছিলে?" তখন ঠাকুরকে এই কথা বলিতে শুনিয়া অনেকেই পরস্পর মুখ

চাওয়া চাহি করিতে লাগিলেন। কথাটা তখন কে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু ঠাকুরকে সেদিন একথা বলিতে শুনিয়া সহসা ডাক্তার সরকার মহাশয় যে খুব বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি তাঁহার তৎকালীন মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ডাক্তার সরকার মহাশয়ের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি এবং সে কথার সমর্থনে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই যে অনেকটা ঠিক, তাহা তাঁহার আর একদিনের কথা হইতেও বেশ বুঝা যায়।

সেদিনও তিনি এসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব আরও সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঈশ্বরকে ভক্তি পূজাদি যাহা বল, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান যে মানুষ হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বোঝা কঠিন। ঐ নন্দনের দলটাই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে।" ঠাকুর এই কথা শুনিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এ বলে কি ? তবে হ্যাঁ, হীনবুদ্ধি গোঁড়ারা অনেকে তাঁহাদের বাড়াতে গিয়ে ঐ রকম করে ফেলে বটে।" ইহার পরও দেখিয়াছি, অবতারাদি সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাঁহাকে অনেক দিন বাদানুবাদ করিতে এবং একদিন ঐরূপ আলোচনার শেষে গিরিশ বাবু যখন বলিলেন, (গিরিশ বাবু যে ভাষায় অর্থাৎ যে কথাগুলির দ্বারা তখন তাঁহার এই অভিমতটী প্রকাশ করেন, তাহা এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ স্মরণ না থাকিলেও, সে কথার ভাবটী যেন অনেকটা এইরূপ) "দেখুন মহাশয়, আপনি যাই কেন বলুন না, মানুষ নিয়ে কথা নয়, কিন্তু এক জনের ভেতর যদি ঈশ্বরের সর্ব্বগুণাদির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তবে তাঁকেই তখন ঈশ্বর বলে মানব না কেন ? আর মানলে ক্ষতিই বা কি ? তখন বুঝব, সে ত আর সে নেই, সেই অর্থাৎ ঈশ্বরই হয়ে গিয়েছে।" গিরিশ বাবুর এই কথার পর মহেন্দ্র সরকার মহাশয় আর কোন উত্তর দেন নাই। তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বরং বোধ হইয়াছিল যে, কথাটা যেন তাঁহার প্রাণে কেমন একটু আঘাত দিয়াছে। ফলতঃ ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের নানাবিধ বিভূতি ও ঐশ্বরিক শক্তি দর্শনে মনে হয়, তাঁহার মনে তখন কেমন একটু দ্বৈধ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে তিনি ঠাকুরকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও, কেমন যেন একটু সন্দিগ্ধচিত্তে ক্রমশই ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে-ছিলেন এবং বিদ্যাভিমানের যে একটা স্বাভাবিক গর্ব্ব, তাহাও যেন তাঁহার দিন দিন আপনা হইতেই চলিয়া যাইতেছিল। এমন কি, একদিন অনীশ্বর-বাদী বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞানাভিমানের বিষয় আলোচনা কালে তাঁহাকে উত্তেজিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "হাঁ, দেখ, ওকথাটা অনেকটা সত্য বটে, কিন্তু ওটা কি জান ? ওটা হচ্ছে বিদ্যার গরম বা বদহজম, ঈশ্বরের সৃষ্টির দুচারটা বিষয় বুঝতে পেরেছে বলে তারা মনে করে যে, দুনিয়ার সবটাই তারা মেরে দিয়েছে। যারা অনেক পড়েছে, দেখেছে, ও দোষটা তাদের হয় না, আমি ত ওকথা কখনও মনে আনতেও পারিনে। আমি ত দেখি, প্রত্যেক মানুষই এমন অনেক বিষয় জানে যা আমি জানি না। সেজন্য কারুর কাছে কিছু শিখতে আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, এদের নিকটেও (যুবকভক্তগণ যাঁহারা তখন তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন) আমার শেখবার মত অনেক জিনিষ থাকতে পারে। এ হিসেবে আমি সকলের পায়ের ধুলো নিতেও প্রস্তুত। কি মনে করো পারিনে ?" এই বলিয়াই তিনি সকলের পায়ের ধূলি গ্রহণ

করিতে উদ্যত হইলে সকলে তাঁহার হাত ধরিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

এইরূপে যতই দিন যাইতে থাকে ততই ঠাকুরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। ডাক্তার সরকারকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি বাহিরে সরল ও হাস্যরসপ্রিয় হইলেও এমন একটী স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের ভাবে তিনি সকল বিষয়ে আপনাকে সামলাইয়া চলিতেন যে, ঠাকুরের প্রতি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোভাব যে কিরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল, তাহা বোঝা বা বলা অসম্ভব।

এক্ষণে আর দুই একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিবার আমার ইচ্ছা। যদিও ঐ ঘটনা কয়টীর সম্বন্ধেও বলিতে শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গে বাদ দেন নাই। যে কয়টা ঘটনা আমার অন্তরে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আমার পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহারই বিষয় বলিতে চাই। একটু পূর্ব্বেই যে ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, ঠাকুরের শুধু দৈবশক্তির পরিচয় দিবার জন্যই আমি এত কথা বলিয়াছি। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর আমার কৈশোর জীবনে এ শক্তির কতকটা পরিচয় পাইয়া ইহার একটু বিশিষ্টতা অনুভব করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তীকালে নিত্য এমন যখন তখন কতরূপে ও কতভাবে ঐ শক্তির বিচিত্র প্রকাশ দেখিলেও তাহাতে আর তেমনটী ঠেকে নাই। যেদিন ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে child of nature বলিয়া তাঁহার ভালবাসার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি জানাইয়াছিলেন, সেদিনের সে কথাটী আরও শতগুণে বিশেষভাবে আমার মনে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, সত্যের দিক হইতে এই কথাটী ইহার পরেও যখনই মনে পড়িয়াছে, তখনই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এই প্রকার কোন বিভূতির পরিচয় দেওয়া সাধুর পক্ষে তিনি চিরদিনই অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি তাঁহার মুখ হইতে স্পষ্ট এমন কথাও শুনিয়াছি, "দেখ্, যেখানেই দেখবি সাধুর কেবল ঐসব দেখাবার দিকেই মন, জানবি সে সাধুতে ধর্ম্মের 'ধ'ও নেই, সে কেবলই বুজরুকি।" একথা শুনিয়া পাঠকগণ হয়ত বলিতে পারেন, তবে আবার তোমরাও কেন ঐসব কথার উল্লেখ করিতে ব্যস্ত হও? না, ব্যস্ত একেবারেই নই এবং যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহাকেও কখন ইহার জন্য ব্যস্ত হইতে দেখি নাই। এই সকল বিভূতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যেরই মত তাঁহাতে এমন স্বাভাবিক-ভাবে প্রকাশ পাইত যে, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এ কথা যে সম্পূর্ণ ভাবেই সমর্থন করিবেন, ইহা আমি খুব জোরের সহিতই বলিতে পারি। যাহা হউক, এইবার ঠাকুরের এই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান কালীন এমন দুই একটী ঘটনার বিষয় বলিব যাহাতে পাঠকবর্গ সহজেই আমার এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী আন্দোলন

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন কালে উহার কার্য্যাবলীর এক বিরাট পরিকল্পনা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের নরনারী ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্দীপনার সহিত সভ্য জগতের সকল স্থানে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করিয়া উহাকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক আধ্যাত্মিক ঘটনার রূপ প্রদান করিয়াছে। শতাব্দী জয়ন্তীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানিবার ইচ্ছা অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। তন্নিমিত্ত উভয় গোলার্দ্ধে একবৎসরব্যাপী যে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করিতেছি।

বিগত ১৯৩৬ সনের ২৪শে জানুয়ারী বেলুড় মঠে শতবার্ষিকীর উদ্বোধন হইবার পর হইতে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের শতশত নগর ও সহস্র সহস্র পল্লীতে, এমন কি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সকল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য স্থানে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকল স্থানের নাম দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্সিস্কো, বোষ্টন, ওয়াসিংটন, প্রভিডেন্স, দক্ষিণ আমেরিকার বুইনাস্ এইরেস্, ইউরোপের লণ্ডন, পারিস, বার্লিন, রোম, ওয়ারসো, জেনিভা, অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি, আফ্রিকার জাঞ্জিবার, মোম্বাসা, টাঙ্গানিয়াকা এবং কেনিয়া, চীন ও জাপানের টোকিও ও সাংহাই, মালয় উপদ্বীপের সিঙ্গাপুর ও পিনাং প্রভৃতি স্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান ভারতবর্ষে উৎসব যেরূপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে উহা বর্ণনাতীত। প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্মসভা ও সম্মেলন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বসম্প্রদায়ের ও সর্ব্বমতের অসংখ্য নরনারী সানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। সময় অল্প, বিষয় বস্তু তথ্যবহুল ও সুদীর্ঘ, তজ্জন্যই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

শতবার্ষিকী উৎসব সর্ব্বভাব পরিপোষক ও সর্ব্বভাবগ্রাহী ছিল। উহা মানব জাতির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিয়াছে। শতবার্ষিকীর ভাব ও কার্য্যমূলক দুইটী দিক—কর্ম্ম ও উপাসনার সুমধুর সমাবেশ হইয়াছিল। একদিকে বিশেষ পূজা, হোম, যজ্ঞ, দরিদ্র-নারায়ণসেবা, ভজন সঙ্গীত, পৌরাণিক নাট্যাভিনয় প্রভৃতি, অপরদিকে প্রার্থনা, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা এবং বিশ্বসংস্কৃতির উপর উহাদের প্রভাব সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনাদি হইয়াছে।

কলিকাতা এবং বেলুড়মঠের উৎসবাদি

১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে শতবার্ষিকীর শেষ উৎসবাদি সম্পাদিত হয়। সাধারণ পরিকল্পনার কার্য্যসূচী অনুসারে শতবার্ষিকী সমিতি (১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে তীর্থ ভ্রমণের আয়োজন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের প্রায় অর্দ্ধলক্ষ ভক্ত, বন্ধু ও অনুরাগী এই তীর্থ-ভ্রমণে যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা

এবং আসাম হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিয়াছিলেন।

(২) ১৯৩৭, ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে সোয়ামাইলব্যাপী এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্ম, মত, ও সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতীক, ও বাণীসম্বলিত পতাকাসহ শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। সর্ব্বধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় শোভাযাত্রাটির অপূর্ব্ব শ্রী, গাম্ভীর্য্য ও সার্ব্বভৌমত্ব সম্পাদিত হইয়াছিল।

(৩) শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে নিখিল-ভারত-ব্রহ্ম-সিংহলব্যাপী গবেষণামূলক রচনা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। উহাতে সমগ্র দেশের ছাত্র, ছাত্রী ও সুধীগণ যোগদান করিয়াছিলেন। বাংলা, আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, ইংরাজী, গুজরাটী, মালয়ালম, উর্দ্দু, কেনারী, মারাঠী, সিন্ধী ব্রহ্মদেশী ও সিংহলী এই পনরটী ভাষায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ফলাফল পুরস্কারসহ ইতঃপূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

(৪) বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে পাঁচ সপ্তাহ-ব্যাপী ভারতীয় শিল্প, কলা ও সংস্কৃতির এক বিরাট প্রদর্শনী কলিকাতা নর্দার্ণ পার্কে খোলা হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি কোন কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অভূত-পূর্ব্ব ছিল। উহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রমাভিব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ ধারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সংক্ষেপতঃ মহেঞ্জোদাড়োর সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সৃজনী প্রতিভার জগতের সংস্কৃতি ভাণ্ডারে যে বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে উহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে সংস্কৃতি, কলা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও আমোদ প্রমোদ— এই পাঁচটি বিভাগ খোলা হইয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকটীর ভিতর দিয়াই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চরূপের অভিব্যক্তির একটী সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়াছে। বিবিধ শিল্পকলা সম্বলিত মহিলা বিভাগে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ভাণ্ডারে বিভিন্ন যুগে নারীর বিশিষ্ট অবদানের একটী সুস্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনাদির বিচিত্র সমাবেশে এবং বহুবিধ উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক বস্তুসম্ভারের সংগ্রহে প্রদর্শনী প্রকৃতপক্ষেই সহস্র সহস্র নরনারীর মহা আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল।

বিশ্বধর্ম্ম সম্মিলনী

শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা নগরীতে এক বিরাট বিশ্বধর্ম্ম সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। ১লা মার্চ্চ হইতে ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সম্মিলনীর পনরটী অধিবেশন হইয়াছিল। বিশ্বধর্ম্ম সম্মিলনীতে পৃথিবীর প্রাচীন ও নবীন বিভিন্ন ধর্ম্মমত, বিভিন্ন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণকারিগণকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। যোগদানকারিগণ সকলেই বিন্দুমাত্র পরমত অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম ও নৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম সম্মিলনীর বিষয়গুলি বিশ্বজনীন ছিল। উহাতে বিশ্বের সকল জাতি ও সকল সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই ধর্ম্ম মহা-সম্মিলনীর কার্য্যে যে শুধু ভারতের তথা এসিয়ার অন্যান্য দেশের ধার্ম্মিকও সুধীগণই পরম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এমন নহে, পরন্তু ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মবিদ্ শিক্ষাবিদ্ ও নীতিবিদ্গণও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ইহার সাফল্য কামনা করিয়াছেন। ইংলণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জেকোশ্লো-ভাকিয়া, মরিশস্, ইরাক্, ইরান্, চীন, জাপান, মালয় উপদ্বীপ, তিব্বত এবং পৃথিবীর আরও

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিবর্গ ধর্ম্মমহাসম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়া জগতের বিভিন্ন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন এবং লোকহিতকর অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

ভারতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম আহূত বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন। ইহার সফলতাও অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ হইয়াছে। দুই শতেরও অধিক পণ্ডিত, ধর্ম্মনেতা, সমাজের কল্যাণকামী মনীষী ধর্ম্মমহাসম্মিলনীর অধিবেশনগুলিতে যোগদান করিয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা ধর্ম্মমহাসম্মিলনীর পনরটী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, একজন চীন, একজন জেকোশ্লোভাকিয়া, একজন ইংলণ্ড, একজন ইরান্ এবং একজন যুক্তরাষ্ট্র-আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন। সভাপতিগণের মধ্যে দুইজন মহিলা, দুইজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত এবং একজন গুজরাটী পণ্ডিতও ছিলেন। কাশীধামবাসী প্রাচীনপন্থী জনৈক ধর্ম্মাচার্য্যও সভাপতি ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ও বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের সহকর্ম্মী স্বামী অভেদানন্দজীকে ধর্ম্মমহাসম্মিলনীর সভাপতিরূপে পাইয়া শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তৃগণ সবিশেষ কৃতার্থ হইয়াছেন।

পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশের শত শত সুধীজন কর্ত্তৃক শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী প্রেরিত হইয়াছিল। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড্, বাংলার গভর্ণর, হায়দরাবাদের নিজাম, মহাত্মা গান্ধী, মঁসিয়ো রোমাঁ রোলাঁ এবং অন্যান্য সুধীজন ধর্ম্মমহাসম্মিলনীর সাফল্য কামনা করিয়া শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাসম্মিলনীতে ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, তিব্বতী, স্পেনীয় ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে যে সকল প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল ঐগুলি ফরাসী, ইটালীয়, জার্ম্মেন্ ভাষায় লিখিত ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন-পন্থী, সংস্কার পন্থী, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, উন্নতিকামী মুসলমানগণ ধর্ম্মমহাসম্মিলনীর কার্য্যে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। পার্শী, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহও সম্মিলনীর সফলতার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ধর্ম্মমহাসম্মিলনীর আলোচনা দ্বারা পৃথিবীর নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মজীবন, নৈতিক উৎকর্ষ এবং সাধারণ প্রগতি বিষয়ক বিবিধ সমস্যা-সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত ও বিচারশীল জিজ্ঞাসা সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী স্মৃত্যর্থে শতবার্ষিকী বৎসরে আমরা কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপুলায়তন ও বহু তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-খানির নাম The Cultural Heritage of India, ভারতের সংস্কৃতি-সম্পদ। এই বিরাট গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে যে শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান সকলই লিপিবদ্ধ আছে এমন নহে, পরন্তু এতদ্দেশীয় মনীষিবৃন্দের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রতিভার বহুমুখী প্রচেষ্টাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতের বস্তুতান্ত্রিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং উহার সৃজনী প্রেরণা ও সম্ভাবনার উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করিয়াছে। বৈদিকযুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় ও কৃষ্টিগত জীবনের সকল ধারা সম্বন্ধে একশত আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুলেখক ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থ আমাদের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন এবং সমন্বয়মূলক আন্তর্জ্জাতিক সংস্কৃতির ক্রমাভিব্যক্তির বহুলপরিমাণে সহায়তা করিবে ভারতে আবির্ভূত মুনিঋষিগণের চিরন্তনবাণী—বিশ্বজনীন প্রেম ও শুভেচ্ছা প্রণোদিত করিবে।

আরও একখানা উল্লেখযোগ্য বহু চিত্র সমন্বিত

শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের নাম Sri Ramakrishna Centenary Souvenir "শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী চিত্রগ্রন্থ"। ইহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য গোষ্ঠী এবং তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতি জড়িত বহু স্থান ও ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক চিত্রাবলী সন্নিবিষ্ট আছে। সভ্যজগতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে প্রধান প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত আছে উহাদের চিত্রও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

শতবার্ষিকী সমিতি এই উপলক্ষে পদক ও প্রতীকাদিও প্রস্তুত করাইয়াছেন।

শতবার্ষিকীর উদ্যোগে ধর্ম্মসভা, ছাত্র সম্মিলনী, মহিলা সম্মিলনী প্রভৃতি বেলুড়মঠ ও কলিকাতায় আহূত হইয়াছিল। প্রত্যেকটীই বিশেষরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে বেলুড়মঠে দশদিনব্যাপী উৎসবের বিবিধ অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব সকলের জীবনেই অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা লক্ষ লক্ষ নরনারীর দৈহিক ও মানসিক শিক্ষা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিপুষ্টির প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

আমি পরম আনন্দের সহিত জানাইতেছি, ১৯৩৪ সনের নবেম্বর মাসে শতবার্ষিকীর যে বিরাট পরিকল্পনা আপনাদিগের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল, জনসাধারণের শিক্ষা ও সেবার নিমিত্ত একটী স্থায়ী অর্থভাণ্ডার এবং কৃষ্টিভবনের জন্য আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হইলেও, মোটের উপর শতবার্ষিকী পরিকল্পনার সমগ্র বিষয়ই একরূপ কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সকল কার্য্যের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করিবার জন্য শতবার্ষিকী সমিতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন এবং ভারতের সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আরও অধিক আর্থিক ও নৈতিক আনুকূল্যের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-শতবার্ষিকী জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। মানব ইতিহাসে পূর্ব্বে আর কখনও একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এরূপে সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বেরই একজন ছিলেন—বিশ্বপিতারই 'অদ্ভুত প্রকাশ ছিলেন। সকল ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য সত্যের জীবন্ত বিগ্রহরূপে তিনি সত্যের জন্য জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের জন্যই প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট সকল ধর্ম্মমত শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছিবার পথ ছিল এবং তিনি সকল মত, সকল আদর্শ, সকল চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও প্রত্যক্ষানুভব করিয়া উহাদের জীবন্ত পরিপোষকরূপে জগতের নিকট পূজিত হইয়াছেন। "বিরোধ নহে, সহানুভূতি, সংহার নহে, সংগঠন, বিসম্বাদ নহে, মৈত্রী"—আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হউক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিতে পারি না। অনাদি, অনন্তকে লাভ করিবার অনন্ত পথ। শতবার্ষিকী সমিতি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের শতবর্ষের শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার অনন্তভাবের অনন্ত পূজা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

পতঞ্জলি ও জন্মান্তর

স্বামী বাসুদেবানন্দ

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে যোগশাস্ত্রের বিভিন্ন সিদ্ধি বা বিভূতি সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেছি। ঐ সকল সিদ্ধিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :—(১) জন্ম হতেই, পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হেতু, কারও কারও ক্ষুদ্র সিদ্ধি সকল দেখা যায়। যেমন, অনেকে ভূত দেখতে পায়, মনের কথা জানতে পারে, দুর্ঘটনার পূর্ব্বে টের পায়, দূর দেশের ঘটনা দেখতে পায়, স্বপ্নে সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষ হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। (২) ঔষধ ও মণি প্রয়োগে নানা সিদ্ধি সকলের আবির্ভাব দেখা যায়। (৩) মন্ত্র শক্তির দ্বারাও দেবতা কৃপায় বিভূতি জন্মে। (৪) তপস্যার দ্বারাও দেব কৃপায় নানা সিদ্ধি আসতে পারে। (৫) আর সমাধি বা সংযম দ্বারা যে বিভূতি লাভ হয় তা পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে সবিস্তারে বলা হয়েছে। এক্ষণে জন্মান্তর-পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্চে।

যোগ সাধনের পূর্ব্ব ভাগে (১২ ও ১৩ সূত্রে) পতঞ্জলি বলেচেন যে বিভিন্ন কর্ম্মাশয় বা সংস্কার বিপাক (ফলোন্মুখ) হয়ে বিভিন্ন জাতি, আয়ু ও ভোগ সৃষ্টি করে। এরই নাম জাত্যন্তর-পরিণাম (Variations in species) বলে। এখন অবয়ব বা দেহ ছাড়া তো ভোগ সিদ্ধ হয় না—তা হলে এ অবয়ব আসে কোথা থেকে—ডারউইন (Darwin) কারণ এক প্রকার অজ্ঞেয়ই বলেচেন, তিনি বলেন, chance (যদৃচ্ছা); ফরাসী প্রাণতত্ত্ববিৎ লামার্ক (Lamark) বলেন, 'আবেষ্টনীর প্রভাব (influence of environment); মধ্যযুগীয় কোনও কোনও দার্শনিকের মতে 'মন' (mind). তাঁদের সার কথা এই, "If for example, I will to chisel a lump of stone into the shape of a human head, am I not freely altering my environment to please myself? Can it in any sense be maintained that I am merely adopting myself to my environment?" বর্ত্তমান কালের প্রাণতত্ত্ববিদ্ জোয়াড (Joad) প্রভৃতি চিরপরিবর্ত্তনবাদীরা বলেন, 'Sports', 'Emergence' এও ডারউইনের 'যদৃচ্ছা'রই মত অকারণ। প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদীরা (Evolutionists) বলেন, 'জগতে ক্ষুধা ও কামের বশবর্ত্তী হয়ে জীব নিরন্তর এক প্রতিযোগিতার (struggle) ভিতর দিয়ে চলচে। এই প্রতিযোগিতার অনুকূল অবস্থার আকাঙ্ক্ষা হতেই দেহ, মন ও অবস্থার প্রগতি (progress) ঘটচে, যারা এই অকারণ, অভাবনীয় অবস্থার উত্তরোত্তর অনুকূল পরিবর্ত্তন সৃষ্টি না করতে পারবে, তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে; কারণ প্রাণিজগতে দেখা যায় যোগ্যতমেরই অনুবর্ত্তন (Survival of the fittest)

কিন্তু—(১) কী থেকে এবং (২) কেন এই জাত্যন্তর ঘটচে তা তাঁরা জানেন না। ব্যাস বলচেন, "কায়-ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির যাবতীয় উপাদানই প্রকৃতির ভিতর সংস্কার রূপে আছে। সেই পূর্ব্ব পরিণাম নাশ হয়ে উত্তর পরিণামের আরম্ভ হয়, অমনি অনুকূল অবস্থা পাওয়ায় অ-পূর্ব্ব অনুকূল অবয়ব সংস্থানও ঘটে। একেই বলে প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ।" অপর আচার্য্যের ভাষায়, "যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণাম হয়, তখন সেই অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে

যেটি উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অবসর পায়, সেইটিই আপূরিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের অনুরূপ ভাবে সেই কারণকে পরিণত করায়।"—এইটি হচ্ছে 'কী থেকে ?'র উত্তর, আর 'কেন' ?র উত্তর হচ্ছে, কর্ম্মাশয় বা ইচ্ছাকৃত সঞ্চিত কর্ম্মের সংস্কার।

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদীরা আজ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ও মনের ক্রমবিকাশের তাৎপর্য্য একমাত্র 'ক্ষুধা ও কাম' তৃপ্তিতেই পরিসমাপ্তি করেছেন। কিন্তু প্রাচ্য দার্শনিকেরা বলেন, 'ঐ দুটো চরিতার্থ করবার জন্য যে জাতি আজ পর্য্যন্ত জগতে যত রকম দেহ, মন ও আবেষ্টনীর বিবৃদ্ধি করেছে, তাদেরও অচির ধ্বংস দেখতে পাওয়া যায়।' ঐ দুটোর অসংযমে ক্রম সংকোচ এবং সংযমে ক্রম বিকাশ ঘটে। যে জাতি যত সংযমী, ঐরূপ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দিক থেকে তারা তত দুর্ব্বল; কিন্তু এই দুর্ব্বলেরাই কাল বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকে; কারণ সংযম থেকে সত্ত্ব বৃদ্ধি-হেতু যে চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ তা তাঁদের জ্ঞান ভূমিতে এখনও আরূঢ়ই হয় নি। তাঁরা জানেন না যে অত্যন্ত অসুর প্রকৃতি জাতিরও শ্রীবৃদ্ধির হেতু অজ্ঞাতসারে আচরিত সংযম ও দৈবী সম্পদের অনুশীলন।

নিমিত্ত বা কার্য্যসকল কখনও প্রকৃতির প্রয়োজক বা বিধান কর্ত্তা হতে পারে না—কার্য্য কখনও কারণকে চালিত করতে পারে না। কার্য্য কেবল অরূপ (অবিশেষ) প্রকৃতিকে বর্ণ ভেদ (বিশেষিত) করতে পারে। যেমন অরূপ প্রস্তরে যে রূপ সংস্কার রূপে রয়েছে, তাকে যন্ত্র ও রূপকারের (artist) কর্ম্মশক্তি রূপায়তনে বিস্তার করতে পারে। অথবা যেমন ক্ষেত্রিক বাঁধ কেটে দেয়, আর জল আপন স্বভাবে চালিত হয়ে ধান্যাদির মূলে প্রবিষ্ট হয় এবং তাদের কর্ম্মাশয় বা বীজ-সংস্কারের অনুযায়ী বিচিত্র বর্ণ ভেদ করে। কতকগুলো প্রকৃতি শক্তির অভিব্যক্তিতে একটা বিশেষ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হয়, তখন অপর শক্তিগুলি নিরুদ্ধ থাকে। আবার অভি-ব্যক্ত শক্তিগুলিকে যদি কতকগুলি বিশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়, তখন নিরুদ্ধ শক্তিগুলি তদনুযায়ী অভিব্যক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করবে। যেমন আকৃতি হীন জলকে যদি একটা চৌবাচ্চায় নিয়ে আসা যায়, তখন সে তদাকার প্রাপ্ত হবে, আবার ৩৩° ফারান্‌হাইটের নীচের নিয়ে গেলে সেটা এক খণ্ড চৌকনা তুষারে পরিণত হবে। জলীয় পরমাণুর এই তরল বা তুষার ভাব তার স্বভাব সিদ্ধ—চৌবাচ্চা তাপাদি-নিমিত্ত কেবল তার অন্তর্নিহিত বিচিত্র স্বভাব প্রকাশের সহায়ক মাত্র। কর্ম্ম বিভিন্ন সংস্কার একত্রিত করে একটা বিশিষ্ট বর্ণ বা Kind সৃষ্টি করে, আর প্রকৃতি সেই বিভিন্ন আবেষ্টনীকে আশ্রয় করে তার সংস্কারগুলিকে একটা বিশিষ্ট জাতির অভিব্যক্তি দান করে। তখন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অপরাপর শক্তিগুলি নিরুদ্ধ বা চাপা পড়ে থাকে। এইরূপ গীতোক্ত দৈবী-সম্পদরূপ কর্ম্মের অভ্যাসে জীব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দেবভাবকে জাগ্রত করে দেবতায় পরিণত করে। তখন নরযোনি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইন্দ্রিয় ও চিত্তের অভিব্যক্তিতে তাঁরা অলৌকিক স্থান ও তত্ত্ব সকল নিরীক্ষণ করেন। আমাদের শাস্ত্রে তাকেই পাপ বলে, যে সব কর্ম্ম অন্তঃকরণের আসুরাদি নিম্ন সংস্কার সকলকে জড় করে বর্ণ ভেদ করে এবং প্রকৃতিকে সেই আবেষ্টনীর ভেতর প্রবৃদ্ধ হতে সাহায্য করে। এর ফল অসুরাদি নিম্ন বর্ণ বা জাতি প্রাপ্তি।

প্রশ্ন হচ্ছে—সমাধি দ্বারা বিবেকজ্ঞান হেতু দগ্ধ বীজের ন্যায় চিত্ত হলে যোগী জন্মান্তর দ্বারা বা ইহশরীরে লোক কল্যাণাদি কার্য্য করতে পারেন কি না। চিত্ত যদি একেবারে নিরুদ্ধ হয়, তা হলে পারেন না, যদি মাত্র কিছু কালের জন্য নিরুদ্ধ করেন, তা হলে অস্মিতা নামক সমাধিতে বুদ্ধি তত্ত্বের সাহায্যে যে শুদ্ধ-সত্ত্ব চিত্ত সকল নির্ম্মাণ

করেন, তার দ্বারা উপদেশাদি করা চলে। এই নির্ম্মাণ-চিত্তের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ ইচ্ছামাত্র নিরুদ্ধ হতে পারে। কথিত আছে, বিজ্ঞানীরা প্রারব্ধ ক্ষয়ের নিমিত্ত এইরূপ বহু নির্ম্মাণ-চিত্ত সৃষ্টি করে কর্ম্ম করেন। এতে প্রারব্ধ অতি অল্পকালের মধ্যে ক্ষয় হয়। এক একটি চিত্তের দ্বারা কর্ম্ম করলে হয়ত অনেক সময় লাগতো। এক অন্তঃকরণ যেমন বিচিত্র প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করে অতি ক্ষিপ্র পদ্ম কুট্মল-কণ্টক-বেধ বা অলাত-চক্রের ন্যায় তাদের মধ্য দিয়ে যেন যুগপৎ কর্ম্ম করে, সেইরূপ বিজ্ঞানীরাও এক বুদ্ধি-তত্ত্বকে অবলম্বন করে অতি শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ম্মাণ চিত্ত সকল সৃষ্টি এবং প্রারব্ধ সকল ক্ষয় করেন। ঈশ্বরকল্প মানবেরা যে, অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ লোক কল্যাণের নিমিত্ত আনয়ন করেন, তাঁরা আর কিছুই নয়, অবতারের 'এক চিত্ত' হতে উদ্ভূত বহু নির্ম্মাণ চিত্ত সকল। লীলা শেষে তাঁর ইচ্ছা মাত্র তাদের চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে অবতারের মূল অস্মিতা মাত্র চিত্তে লীন হয়ে যেতে পারে। এই সকল মহাপুরুষদের ধ্যান হতে জাত চিত্ত সকল অর্থাৎ মানসপুত্রগণ কর্ম্ম করলেও অনাশয়, কারণ মূল চিত্ত তত্ত্বদর্শী বোলে সংস্কার-শক্তিহীন, সেইজন্য তাঁর কার্য্যরূপ নির্ম্মাণ-চিত্ত সকলও সংস্কার-শক্তি হীন। ব্যাস বলচেন, "নাস্তি আশয়ো রাগাদি প্রবৃত্তিঃ ন অতঃ পুণ্যপাপাভিঃ সম্বন্ধঃ, ক্ষীণ ক্লেশত্বাৎ যোগিনঃ।"

আচ্ছা যোগীরা যে কর্ম্ম করেন এবং সাধারণ লোক যে কর্ম্ম করে—এদের মধ্যে পার্থক্য কি? যোগীদের চিত্ত অশুক্ল, অকৃষ্ণ কিন্তু অপরের ত্রিবিধ (১) কৃষ্ণ, (২) শুক্ল এবং (৩) কৃষ্ণ-শুক্ল। (১) কৃষ্ণ-কর্ম্ম—বাহ্য পরপীড়নাদি, (২) শুক্ল-কর্ম্ম—তপঃ স্বাধ্যায়, ধ্যানাদি (৩) শুক্ল-কৃষ্ণ কর্ম্ম আন্তর-বাহ্য ও অনুগ্রহ-নিগ্রহাদি। কর্ম্মফল ত্যাগ করায় যোগীর স্বাধ্যায়াদি কর্ম্মও অশুক্ল এবং নিষিদ্ধ-কর্ম্ম বর্জ্জন হেতু তাঁদের কর্ম্ম অকৃষ্ণও বটে। তা থেকে অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ কর্ম্ম হতে তাদের বিপাকের (ফলের) অনুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি হয় এবং সেই বাসনানুযায়ী জন্ম হয়। যেটি ফলোন্মুখ-প্রধান-কর্ম্মাশয়, তারই অনুযায়ী বাসনার বিপাকে জন্ম। সেই জন্মের ভেতর যদি হঠাৎ কোনও অপরিচিত বাসনা বিপাক দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে কোনও জন্মে তার উক্ত কর্ম্মাশয় সঞ্চিত ছিল, কোনও কারণে তার প্রতিবাধা অপসারিত হওয়ায় তা বর্ত্তমানে ফলোন্মুখ হয়েচে। একটা ভাল লোকের ভেতর যে হঠাৎ একটা অসৎ কর্ম্ম সংস্কারের অভিব্যক্তি দেখা যায়, উপরোক্ত নিয়মই তার হেতু, আমরা জানি না বলে, accidents of life প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে আমরা উড়িয়ে দিই।

স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলে প্রত্যেক জীবদেহ অপরাপর জীবদেহের সহিত জাতি ও কালের দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হলেও অব্যবহিতেরই ন্যায় অর্থাৎ নিরন্তর বা তৎক্ষণাৎ একটির পর অপরটি উদিত হয়। স্মৃতি সংস্কারের অনুরূপই হয়। সংস্কার বোধারূঢ় হলেই তাকে স্মৃতি বলে—স্মৃতি হচ্চে সংস্কারের বোধ্যতা পরিণাম, সেই জন্য সংস্কার বহু কাল এবং জাতি ধরে চাপা পড়ে থাকলেও, যে ক্ষণে স্মরণ হয়, সেই ক্ষণেই তা স্মৃতিরূপে বোধারূঢ় হয়। একটা বিষয় মনে করতে হয়ত দেরী হতে পারে, কিন্তু যেক্ষণে স্মরণ হয়, সেইক্ষণেই তা বোধারূঢ় হয়—দীর্ঘকাল বা জন্ম অতীত হয়েচে বলে যে সেটা দীর্ঘকাল ধরে অভিব্যক্ত হবে তা নয়। আশীঃ="মা অনভূবং ভূয়াসম্"—"আমার যেন অভাব না হয়, আমি যেন থাকি"—এইরূপ যে নিত্য ইচ্ছা—এ থেকেই বাসনা অনাদি বলে সিদ্ধ হয়। এটাকে সহজাত বা instinct বা untaught ability বলা যায় না, কারণ ব্যাস বলচেন, "জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য

দ্বেষদুঃখানুস্মৃতি নিমিত্তো মরণ ত্রাসং কথং ভবেৎ"— যে পূর্ব্বে কখনও মরণত্রাস অনুভব করে নি, তার দ্বেষ দুঃখ স্মৃতি হেতু মরণ ত্রাস কিরূপে অনুভূত হয়? যদি বলা যায় "দীপাৎ দীপান্তরং যথা" এবং এই ভাবে সর্ব্ব জীব-বাসনার মূল হচ্ছে এক কোষিক (unicellular) জীবাণু (amœba)। কিন্তু এদের ভেতরও আশীঃ এবং অন্যান্য এমন অনেক কর্ম্ম দেখা যায়, যা নিমিত্ত সাপেক্ষ। তবে আশীঃ যদি জীবের স্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান হয়, তা হলে তা কখনও কোনও বস্তুর নিমিত্ত হতে পারে না। এবং আশীঃ যে নৈমিত্তিক অর্থাৎ সংস্কারাভিব্যক্ত স্মৃতি তার প্রমাণ কী? না—আগন্তুক বিষয়ের সহিত সংযোগ না হলেও তা অন্তরে বোধারূঢ় হয়। যেমন সে এখানে নেই, তবুও একটা জিনিষ দেখে তার কথা মনে পড়চে। জিনিষটা হচ্ছে উপলক্ষণ মাত্র, তার প্রত্যক্ষ-হেতু বেদন (sensation) নয় ঠিক সেইরূপ অপরের মৃত্যু দেখে নিজের মৃত্যু-স্মৃতি জাগরিত হয়ে ভীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। সে নিজ মৃত্যুর প্রত্যক্ষ-বেদন অনুভব করচে না, অথচ অপরের মৃত্যুরূপ উপলক্ষণ, তার মৃত্যুরূপ স্মৃতির উত্তেজক (stimulus) হয়ে দাঁড়াচ্চে। সেই জন্য আশীঃ কে নৈমিত্তিক বলতে হবে এবং সেই জন্য ব্যক্তিগত জন্মান্তর নিশ্চিত স্বীকার্য্য। আশীঃ যদি স্বাভাবিক হোত, তা হলে তা উপলক্ষণা ব্যতীরেকেও সর্ব্ব সময়ই অনুভূত হোত কিন্তু তা আমাদের অনুভব যোগ্য নয়। এইভাবে প্রত্যেক বাসনাই অনাদি— নচেৎ অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। অনাদি বাসনা এবং বাসনার হেতু সংস্কার চিত্তে কখনও সংকুচিত, কখনও বিকশিতভাবে থাকে। বাসনাই সংস্কারের উত্তেজক কারণ।

বাসনা সকল (১) হেতু, (২) ফল, (৩) আশ্রয় (৪) আলম্বনের দ্বারা সংগৃহীত অর্থাৎ সঞ্চিত। সেই জন্য এদের অভাবে বাসনারও অভাব হয়। (১) বাসনার হেতু—যেমন ধর্ম্ম থেকে সুখ, অধর্ম্ম থেকে দুঃখ, সুখ থেকে রাগ, দুঃখ থেকে দ্বেষ, রাগ ও দ্বেষ থেকে প্রযত্ন, প্রযত্ন হতে মন, বাক্য ও কায়ের পরিস্পন্দন ও ক্রিয়া হেতু জীব অপরকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করে। এই ক্রিয়াই আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগ দ্বেষ বা সুখদুঃখের হেতু হয়। এই ছয় অরযুক্ত হেতুমৎ সংসার-চক্র অনাদিকাল হতে চলেছে। (২) বাসনা ফল—যে সকল কার্য্য কারণরূপ বাসনাময় সংস্কারে সূক্ষ্মরূপে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে পুরুষার্থই ফল, ভোজরাজের মতে শরীরাদি ও স্মৃতি প্রভৃতি এবং মণিপ্রভাকরের মতে জাতি, আয়ু ও ভোগ। (৩) বাসনার আশ্রয়। চিত্তই বাসনার আশ্রয়। (৪) বাসনার আলম্বন—শব্দাদি বিষয় যারা বাসনাকে উত্তেজিত করে, তারাই বাসনার আলম্বন। অতএব বাসনাই জন্মান্তর হেতু।

অবতারতত্ত্ব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

প্রত্যেক ধর্ম্মেই মানবরূপে ঈশ্বরের এক এক প্রতিনিধি দেখা যায়। ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এ জগতে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া বিদিত। প্রত্যেক ধর্ম্মে যখন ঈশ্বরের উপাসনায় কোন না কোন রূপের কল্পনা করা হয়, তখন বুঝিতে হইবে ইহার প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য আছে।

সাধারণ লোকেরা গুণাতীত ও মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ ধারণা করিতে পারে না, সগুণ নিরাকার ভজনেও অনেকের তৃপ্তি হয় না। এইজন্য বাধ্য হইয়া তাহারা বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানবকে স্থূল দেহধারী ঈশ্বর জ্ঞান করত তাঁহাকে আদর্শ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। এই জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এখন সাকারবাদী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, 'যাঁহারা অব্যক্ত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের ঐরূপ উপাসনা অতীব ক্লেশকর।' মনে হয়, এই কারণে রোমান ক্যাথলিক্ ও গ্রীক্ চার্চ্চ সম্প্রদায় ঈশা ও মেরীর মূর্ত্তি গির্জ্জায় রাখে।

ধর্ম্মমাত্রই লোকশিক্ষার জন্য এক মহোচ্চ আদর্শ সকলের সম্মুখে ধারণ করে। তবে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলেও তাহারা ঈশা ও মহম্মদকে মধ্যস্থ বলিয়া মান্য করে। খৃষ্টানেরা ঈশাকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষতঃ মুক্তি প্রার্থনা করে। আর মুসলমানেরা মহম্মদের উপদেশ মানিয়া সদ্‌গুরুরূপে পরোক্ষভাবে তাঁহাকে মধ্যস্থ বলিয়া মানিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবকে স্থূলরূপে পূজা করে এবং হিন্দুধর্ম্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে পরব্রহ্মের মায়ারূপ জ্ঞানে—এমন কি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণকেও সদ্‌গুরু বা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরে স্থূলরূপে অপার ভক্তি ও প্রেম দেখাইতে শিক্ষা করিলে পরে নিরাকার ভজনের উপযুক্ত হওয়া যায় বলিয়াই মানব-ধর্ম্ম সকল দেশে ঈশ্বরোপাসনা এই ভাবে সহজ ও সুগম করিয়াছে। তবে মহাপুরুষদিগকে মধ্যস্থ করিয়া আরাধনা করা অপেক্ষা ঈশ্বরকে স্বয়ং বা অবতার জ্ঞানে পূজা করিলে অতি সহজে তাঁহাকে লাভ করা যায়। কারণ, মধ্যস্থ জ্ঞানে পূজা করিলে সেবক ও সেব্যের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিয়া যায়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হন কিনা? উত্তর ইতিহাসই প্রদান করে। মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, যখন অধর্ম্মের প্রাবল্য হয়, তখন এক এক মহাত্মা দেশবিশেষে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া স্বদেশের মহোপকার সাধন করেন। বাস্তবিকই অবনতির দিকে যখন প্রকৃতির প্রবণতা অধিক, তখন মধ্যে মধ্যে মহাত্মার আবির্ভাব অত্যাবশ্যক। নচেৎ সংসারে ধর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা খুব কম।

জগতের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখুন। যখন জনসাধারণ সামাজিক ধর্ম্ম ভুলিয়া যাগ যজ্ঞে বিবিধ পশুহত্যা করিতে করিতে হিংসাপর হইয়া উঠে, সেই সময় বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া যথার্থ ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য অহিংসা পরম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। যখন পেলেষ্টাইনের জনসাধারণ পৌত্তলিকতার বীভৎস কাণ্ডগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে অধর্ম্ম-

পরায়ণ হইয়া উঠে, তখন ঈশাদেব অবতরণপূর্ব্বক একেশ্বরবাদের জয় ঘোষণা করেন। আবার আরব দেশের জনসমাজ যখন পৌত্তলিকতায় অধর্ম্মচারী হইয়া উঠে, তখন মহম্মদ নিরাকারোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদের মধ্যে উৎসাহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। যখন শঙ্করাচার্য্য ভারতে আবির্ভূত হন, তখন বহুসংখ্যক লোক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তন্নিবারণার্থে তিনি হিন্দুধর্ম্মের আমূল সংস্কার করিয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আবার যখন তন্ত্রোক্ত সাধন করিতে করিতে জনসাধারণ অধর্ম্মপরায়ণ হয়, তখন চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। যখন গুরু নানক আবির্ভূত হন, তখন পাঞ্জাবের বহুসংখ্যক লোক হিন্দুত্ব বর্জ্জিত ছিল, তথায় তিনি শিখসম্প্রদায় স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যখন বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার হলাহল পান করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে, তখন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সকলকে সদুপদেশ দিয়া স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ করেন। এইরূপে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখন ভগবদিচ্ছায় ধর্ম্মাত্মগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন।

এখানে জিজ্ঞাস্য, ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, তবে এই সামান্য কাজের জন্য মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া কেন তিনি অশেষ দুঃখের ভাগী হন? এস্থলে শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। কি প্রকারে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে হয়, কি প্রকারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়, তাহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য পরমকারুণিক ঈশ্বরের অবতরণ—ইহাই শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন। প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ ভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। রাম, কৃষ্ণ, মূষা, বুদ্ধদেব, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানব-ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইঁহারা মানব জাতির আদর্শ পুরুষ। এই অপকৃষ্ট কলিযুগে ইন্দ্রিয় ভোগ পরায়ণ মানবের যথার্থ ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য এই সকল মহামানব ও অবতারের পূজন আত্মোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়। এইজন্য বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম্ম মানবদিগকে ধর্ম্মপথে সহজে অগ্রসর করাইবার জন্য অবতার পূজন বিধিবদ্ধ করে এবং অবতারদিগের লীলা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। মহাপুরুষগণের লীলা শ্রবণ করিয়া মনের সাত্ত্বিক ভাব স্ফুরণ করত মানুষ ধর্ম্মপথে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে। শাস্ত্রোল্লিখিত অবতারগণের লীলাদি শ্রবণ ও পাঠ করিলে সাধারণ লোকের যেরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, অথবা মানব-মনের উচ্চ,স্বর্গীয় ও সাত্ত্বিক ভাব যেরূপ স্ফুরিত হয়, ঈশ্বরকে কেবল দয়াময় বলিয়া ডাকিলে অথবা সামান্য ভাবে তাঁহার মৌখিক উপাসনা ও সংকীর্ত্তন করিলে সেইরূপ হয় না বলিয়াই মনে হয়। এইহেতু আমাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরকে মানবাকারে দেখাইয়া তাঁহার আরাধনা আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে।

এক্ষণে পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ণু মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবতার রূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষাহেতু সংসারে যুগে যুগে অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি অমানুষিক অবতার ও শেষোক্ত পাঁচটি নরাবতার। হয়ত অনেকে বলিবেন, প্রথম পাঁচ অবতার শাস্ত্রকারগণের অর্ব্বাচীনতার পরিচয় ছাড়া কিছু নহে। কিন্তু পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য প্রকাশ

পাইতেছে। ইহাতে বিজ্ঞানের উচ্চ বিবর্ত্তবাদ নিহিত আছে। যে বিবর্ত্ত ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয়, তাহাই পুরাণের উপকথায় জাজ্জল্যমান রহিয়াছে।

মানবের জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাহার জাতীয় জীবনে অতি প্রাচীন-কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিহিত আছে। প্রথমোক্ত স্তরগুলি বুঝাইয়া দেয় কিপ্রকারে নিকৃষ্ট জীব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে আধুনিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবরূপ ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত স্তরগুলি জানাইয়া দেয় কি প্রকারে নিকৃষ্ট জীবোৎ-পন্ন বনবিহারী বর্ব্বর মানব সামাজিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন করিতে করিতে স্বকীয় অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন করত অশেষ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান সুসভ্য মানবে পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত দশ অবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচ অমানুষিক অবতার ভূপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় জাতীয় জীবনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখা গিয়াছিল, তাহাই জ্ঞাপন করে এবং শেষোক্ত পাঁচটি মানুষিক অবতার দেবমানব ভাব জ্ঞাপন করে।

শাস্ত্রে দশাবতারের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, মানব স্বীয় জাতীয় জীবনে প্রথমতঃ মৎস্যরূপী হইয়া জলময় ভূপৃষ্ঠে জলচর হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি কূর্ম্মরূপী হইয়া স্থলজলময় ও পর্ব্বতাকীর্ণ ভূপৃষ্ঠে উভচর হন। তৃতীয়তঃ বরাহরূপী হইয়া তিনি ভূপৃষ্ঠের উত্থিত সমতল স্থলভাগে স্থলচর ও স্তন্যপায়ী হন। চতুর্থতঃ তিনি নৃসিংহরূপী হইয়া অর্দ্ধনরা-কৃতি ও অর্দ্ধসিংহাকৃতি অসুররূপে বিচরণ করেন। পঞ্চমতঃ তিনি দীর্ঘকায় অসুর হইতে ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতে করিতে বামনরূপী মানব হন। ষষ্ঠতঃ সমাজের আদিম অবস্থায় মানব মাতৃহন্তা পরশুরামের ন্যায় পাশববলে বলীয়ান্ ও অতি বর্ব্বর ছিল। সপ্তমতঃ ক্রমশঃ ক্রম বিকাশের সঙ্গে পারিবারিক ভাবাবলী যখন মানব-হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তখন উহাদের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির জন্য অশেষ গুণশালী শ্রীরামচন্দ্রকে মানব আদর্শপুরুষ জ্ঞান করেন। অষ্টমতঃ ভক্তি প্রেম বাৎসল্যাদি হৃদয়ের সাত্ত্বিক ভাবগুলির অনুশীলন ও স্ফুরণ হইলে মানব নিষ্কামধর্ম্মোপদেষ্টা বিশ্ব-প্রেমিক ও নবরসের অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ জ্ঞান করেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা যখন মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ প্রখরতর হইতে থাকে, তাহার মন তখন নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়। সমাজের সেই অবস্থা প্রদর্শনের জন্য শাস্ত্রকারেরা নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।* এইভাবে পৌরাণিক অবতার তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে উহা অর্ব্বাচীনতা, কল্পনা বা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে হইবে না বরং ইহাতে বিংশ শতাব্দীর উচ্চ বিজ্ঞানের মহোচ্চ সত্যগুলিই প্রকাশিত হইবে। সুতরাং যাঁহার মন বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত এবং যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিবেন, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও তৎসম্পর্কিত অবতারতত্ত্বকে কখনও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

* লেখকের সহিত এ সম্বন্ধে আমাদের মতদ্বৈধ আছে। উঃ সঃ।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

স্থূল দেহ আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন করিয়া লিঙ্গদেহও আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অন্বয়ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন :—

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে ॥৩৯

অন্বয়—সুষুপ্তৌ লিঙ্গাভানে আত্মনঃ ভানম্ অন্বয়ঃ স্যাৎ। তদ্ভানে লিঙ্গস্য অভানম্ তু ব্যতিরেকঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—সুষুপ্তি-অবস্থায় লিঙ্গদেহের অপ্রতীতি হইলেও, আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। আর আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে লিঙ্গ দেহের (অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের) অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গই দেহের অর্থাৎ উক্ত কোষত্রয়ের ব্যতিরেক ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (লিঙ্গ দেহের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্য ভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে লিঙ্গ দেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সুষুপ্তি অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"সুষুপ্তৌ"—সুষুপ্তি অবস্থাতে, "লিঙ্গাভানে"—লিঙ্গদেহের অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ ভানম্"—সেই অবস্থার সাক্ষিরূপে আত্মার স্ফুরণ, "অন্বয়ঃ স্যাৎ"—তাহাই আত্মার অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। "তদ্ভানে"—সেই আত্মার স্ফুরণ থাকিতে, "লিঙ্গস্য অভানং"—লিঙ্গদেহের অস্ফুরণ, "ব্যতিরেকঃ উচ্যতে"—তাহাকেই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক বলিতে হইবে।৩৯

এইরূপে সুষুপ্তিতে আত্মার অন্বয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

(শঙ্কা)—ভাল, পঞ্চকোষের বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে লিঙ্গ দেহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাত আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, অসঙ্গত হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যে প্রাণময়াদি কোষত্রয় উক্ত লিঙ্গদেহেরই অন্তর্গত বলিয়া লিঙ্গদেহের বিচার আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে।

তদ্বিবেকাদ্বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোষাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ।
তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎপৃথক্‌কৃতাঃ ॥৪০

অন্বয়—তদ্বিবেকাৎ প্রাণমনোধিয়ঃ কোষাঃ বিবিক্তাঃ, হি (যতঃ) তে তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্ কৃতাঃ।

অনুবাদ—সেই লিঙ্গদেহের বিচার দ্বারা অর্থাৎ আত্মা হইতে লিঙ্গদেহের পার্থক্য নির্ণীত হইলে, প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোষেরই আত্মা হইতে পার্থক্য নিরূপিত হইবে, কেন না প্রাণময়াদি কোষত্রয় সেই লিঙ্গশরীরে, কেবল সত্ত্বরজোগুণজনিত অবস্থাভেদবশতঃই পৃথগ্‌ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—"তদ্বিবেকাৎ"—সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন হইতে, "প্রাণমনোধিয়ঃ"—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় নামক কোষত্রয়, "বিবিক্তাঃ স্যুঃ"—আত্মার সহিত অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ কৃত হইবে। সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন অর্থাৎ পৃথক্‌করণ দ্বারা তিনটি কোষ কি প্রকারে পৃথক্ কৃত হইবে? এই হেতু বলিতেছেন—"হি"—যেহেতু, "তে"—প্রাণময় প্রভৃতি কোষত্রয়, "তত্র—সেই লিঙ্গ শরীরে, "গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ"—সত্ত্বরজোনামক গুণদ্বয়ের কেবলমাত্র অবস্থাভেদবশতঃ অর্থাৎ গৌণ ও মুখ্যভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থিতিহেতু,

"পৃথক্কৃতা"—ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রাণময় কোষ কেবল রজোগুণের অবস্থা, মনোময় কোষ সত্ত্বরজ এই দুই গুণেরই অবস্থা, কেননা ইহার দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও ইচ্ছাদি ক্রিয়া সংসাধিত হয়, এবং বিজ্ঞানময় কোষ কেবল সত্ত্বগুণের অবস্থা, এই প্রকারে অবস্থার ভেদ বশতঃ একই লিঙ্গ দেহে তিনটি কোষ পরিকল্পিত হইয়াছে।৪০

এইরূপে পঞ্চকোষ বিচারে লিঙ্গদেহের বিচার-উত্থাপন বিষয়ে যে আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার সমাধান হইল।

এক্ষণে যাহাকে আনন্দময়কোষরূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কারণশরীরকে পৃথক্ করিবার উপায় বলিতেছেন :—

সুষুপ্ত্যভানে ভানং তু সমাধাবাত্মনোঽন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনম্ ॥৪১

অন্বয়—সমাধৌ সুষুপ্ত্যভানে আত্মনঃ তু ভানম্ অন্বয়ঃ, আত্মভানে সুষুপ্ত্যনব ভাসনং তু ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—সমাধিকালে, সুষুপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের অভান বা অপ্রতীতি হয়, তখন কিন্তু আত্মবিষয়ক ভান বা প্রতীতি থাকে। তাহাই (আনন্দময়কোষ সম্বন্ধে) আত্মার অন্বয়—অনুস্যূততা বা অনুবৃত্তি। আবার আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে সুষুপ্তির অপ্রতীতি, তাহাই সুষুপ্তির (অর্থাৎ আনন্দময় কোষের ব্যতিরেক, ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা) [সমাধি অবস্থায় সুষুপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের বা কারণশরীরের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্য ভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে সেই কারণশরীরের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সমাধি অবস্থায় ইহা অনুভব করা যায়; ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা আনন্দময় কোষ হইতে পৃথক্।]

টীকা—"সমাধৌ"—সমাধি অবস্থাতে, যাহার লক্ষণ অগ্রে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বলিবেন, "সুষুপ্ত্য-ভানে"—'সুষুপ্তি' শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত কারণ-দেহরূপ অজ্ঞানের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ তু" —'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ, অর্থাৎ আত্মারই, "ভানম্"—যে স্ফুরণ হয়, তাহাই আত্মার "অন্বয়ঃ" (অনুবৃত্তি)। আর "আত্মভানে" আত্মার স্ফূর্তি বা প্রকাশ থাকিতেও, "সুষুপ্ত্যনবভাসনম্"—'সুষুপ্তি' শব্দদ্বারা উপলক্ষিত অজ্ঞানের অপ্রতীতিই, "ব্যতিরেকঃ"—সেই অজ্ঞানের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি। এস্থলে এই অনুমান আছে—প্রত্যগাত্মা অন্নময় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, কেননা তাহারা (সেই কোষ সকল) পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, আত্মা নিজে অভিন্ন থাকেন, যাহা, সেই কোষ সকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহা সেই কোষসকল হইতে ভিন্ন, যেমন (মালাতে) পুষ্পসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও, তন্মধ্যে অনুস্যূত যে সূত্র, তাহা আপনার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এই হেতু তাহা পুষ্পসকল হইতে ভিন্ন। অথবা যেমন খোঁড়া, কানা প্রভৃতি অনেক আকারের গরু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, সেই সকল গো ব্যক্তিতে অনুস্যূত গোত্ব জাতি, যেমন আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, এই হেতু সেই গোত্বজাতি সেই সকল গো-ব্যক্তি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ।৪১

এইরূপে সমাধিতেও আত্মার অন্বয় ও কারণ দেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্-কৃত হইলে, আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়,—৩১ সংখ্যক শ্লোকে যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেই কথার প্রতিপাদক কঠশ্রুতি বচন ৬।১৭ (অথবা শ্বেতাশ্বতরের শ্রুতিবচন ৩।১৩)—**অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ তং**

বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥"*— অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥৪২

অন্বয়—যথা মুঞ্জাৎ ইষীকা এবং আত্মা যুক্ত্যা শরীরত্রিতয়াৎ ধীরৈঃ সমুদ্ধৃতঃ পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে।

অনুবাদ—যেরূপ মুঞ্জতৃণ হইতে কৌশলে গর্ভপত্রটি বা গর্ভ শলাকাটি নিষ্কাশিত করিতে হয়,সেইরূপ অন্বয়ব্যতিরেক বিচারকৌশলে আত্মা শরীরত্রয় অথবা পঞ্চকোশ হইতে, ব্রহ্মচারী বিষয়বিরক্ত মুমুক্ষু কর্ত্তৃক পৃথক্কৃত হইলে, পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

* ইহার অর্থ—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকাকে (গর্ভ দণ্ডটিকে) বাহির করেন, সেইরূপ ধৈর্য্যের সহিত, সেই অন্তর্যামী পুরুষকে নিজ শরীর হইতে বাহির করিবেন, এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। (আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণের উপাধি হৃদয় দেশ, তাহাই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ ধরিয়া শ্রুতি-উপচারক্রমে আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়াছেন।)

টীকা—"যথা"—যেমন "মুঞ্জাৎ"—মুঞ্জনামক তৃণ বিশেষ হইতে, "ইষীকা"—গর্ভস্থ কোমলতৃণরূপ শলাকাটিকে, "যুক্ত্যা"—বাহিরে আবরকরূপে অবস্থিত স্থূলপত্রগুলিকে পৃথককরণরূপ উপায় দ্বারা বাহির করিতে হয়, "এবং" এইরূপে, আত্মাও "যুক্ত্যা" অন্বয় ব্যতিরেকরূপ উপায় দ্বারা, "শরীরত্রিতয়াৎ" পূর্ব্বোক্ত তিনটি শরীর হইতে, "ধীরৈঃ" যাঁহারা ধীকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিষয়ানুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতে পারেন, সেই),—ব্রহ্মচর্য্য (বৈরাগ্য) প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন অধিকারিগণ কর্ত্তৃক, "সমুদ্ধৃতঃ"—যদি পৃথক্ কৃত হয় তাহা হইলে সেই আত্মা "পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে" পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন, যেহেতু চিদানন্দ স্বরূপতারূপ লক্ষণ ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে তুল্যরূপে দেখা যায়—ইহাই অভিপ্রায়।

এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিলে আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয় ইহাই প্রদর্শিত হইল।

ন্যায়ভাষ্যের সমালোচনার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

শ্রীশ্যামাপদ লায়েক, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ততীর্থ

গত বৈশাখ মাসের উদ্বোধনে পুনরায় স্বতঃপ্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত স্বতঃপ্রমাণ কতগুলি শব্দের একত্র সমন্বয় দেখিতে পাইলাম। ঐ সকল বাক্যগুলিকে আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের উত্তর বলিয়া গ্রহণ না করিলেও নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। যেহেতু উহা দ্বারাও অর্থবোধ হইয়া থাকে। বাগপ্রযুক্ত বাক্য-বিন্যাসের বৈচিত্র্য অস্বাভাবিক নহে ইহা আমরা জানি। আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উপহাস করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে স্বতঃপ্রামাণ্য শব্দের অর্থ প্রকাশ না পাইলে যে দোষ হয়, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছিলাম। সাহিত্যিক দিগকেও আমি অবজ্ঞার সহিত উপহাস করি নাই। বরঞ্চ আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধের দ্বারা আধুনিক সাহিত্যিকদিগের উৎকর্ষই সূচিত হইয়াছে। তাহা আমার প্রবন্ধ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে একজন সাহিত্যিক, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের দ্বারাই আমি উহা অনুমান করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "আমি সাহিত্যিক নহি।" তাঁহার এই বাক্যকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইলে অবশ্য আমাদের, সাহিত্যিকত্বের অনুমান বাধিত হইবে, কারণ অনেক স্থলেই বলবত্তর আগমের দ্বারা প্রকৃতানুমান বাধিত হইতে দেখা যায়। এখন "আমি সাহিত্যিক নহি" তাঁহার এই বাক্যের আপ্ততা বা অনাপ্ততা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমাদের মনে হয় সত্যের অপলাপ করিলেই দম্ভের সীমা অতিক্রম করা হয়, অন্যথা নহে। এখন উত্তরবাদী কি বুঝিয়াছেন বলিতে পারিনা।

(১) উত্তরবাদী অসম্যগ্ জ্ঞান প্রযুক্ত মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থ সন্দর্ভের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমি আমার

পূর্ব্বপ্রবন্ধে উহার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেরও সাধারণ ভাবে কিছু ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তথাপি প্রতিবাদী লিখিয়াছেন, আমি ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে নাকি অসমর্থ! প্রতিবাদীর মনে রাখা উচিত, সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা জানিতে হইলে গুরুর নিকটে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

(২) বহু প্রমাণ বা প্রমাণ দ্বয়ের দ্বারা কখনও কোন অর্থের প্রতিপত্তি হয় না, সুতরাং প্রমাণতঃ এই স্থলে দ্বিবচনও বহুবচনের উত্তর তসি প্রত্যয় হওয়া সমীচীন নহে। অথচ উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উহাকে সমীচীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি ঐ ব্যাখ্যাকে অসঙ্গত বলিনা। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যাবধারণ হওয়া আবশ্যক, ইহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবং "প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ঞ্চ" এই স্থলের একবচনের সমর্থন করিলেও বোধ হয়, মিশ্রজীর "জাত্যপেক্ষয়া একবচনং" এই পঙক্তির সুসঙ্গতি হইবেনা। সুতরাং আমি, প্রমাণঞ্চ এই স্থলের একবচনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া লোকের অজ্ঞতার নিরাকরণ করিতে চাহিনা।

(৩) অর্থভেদ থাকিলেও অভিন্ন শব্দের স্বারসিক প্রয়োগ কখনও হয় না। তাহা হইলে ঘটাদি পদের নীল গুণে লক্ষণা করিয়া বহুস্থানেই 'ঘটোঘটঃ' "পটঃপটঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইতে বাধা হইত না। অতএব "প্রমাণংপ্রমাণং" এইরূপ আধুনিক প্রয়োগ পণ্ডিত মাত্রেরই উপেক্ষণীয়।

(৪) যথার্থ জ্ঞানত্ব প্রকারাদি ভেদে ভিন্ন ইহাই সিদ্ধান্ত। যেই যথার্থজ্ঞানত্ব ব্যাপ্তিজ্ঞানে আছে, সেই যথার্থজ্ঞানকরণত্ব কখনও ব্যাপ্তিজ্ঞানে থাকেনা। ইহাই আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়াছিলাম। কিন্তু উত্তরবাদী বিভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা যে অতিরিক্ত প্রাচীন ন্যায়ের অধ্যয়ন বা দর্শনের ফল ইহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। যথার্থজ্ঞানত্ব ও যথার্থজ্ঞান করণত্ব কখনও একস্থানে থাকেনা, একথা বলিলে পূর্ব্বোপস্থাপিত যথার্থ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় না।

(৫) হানাদিবুদ্ধিকে আমি ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করি নাই। তবে ঐ বুদ্ধিকে প্রমা বলিলে উহার প্রমাত্ব কি ভাবে বলিতে হইবে, তাহাই আমার দ্রষ্টব্য ছিল। হানাদিবুদ্ধি প্রমা হইলেও আমার প্রকৃত বিষয়ে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অতঃ ইত্যনুসন্ধেয়ম্।

(৬) "স্বতশ্চ প্রামাণ্য গ্রহে তৎ সংশয়ানুপপত্তেঃ" এই গ্রন্থের দ্বারা গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাতে প্রামাণ্যের স্বতোগ্রাহ্যত্বের আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা ঐ স্থানের "নম্বেবং প্রত্যক্ষ প্রমায়াঃ প্রামাণ্যং সন্দিহ্যতে ইত্যনুভবঃ কথমুপপদ্যতাং" ইত্যাদি গদাধর ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতে পারে। নাস্তিক দর্শনের মত লইয়া আমাদের কোন কথাই চলিতে পারেনা। ইহা বহুপূর্ব্বে ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন।

(৭) স্বতো গ্রাহ্যত্ব শব্দের অর্থ স্বাশ্রয় বিষয়কজ্ঞানজনক-সামগ্রী জন্য গ্রহত্ব ব্যাপক বিষয়িতানিরূপকত্ব, ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারেনা। ঐ স্বতো গ্রাহ্যত্ব কিন্তু প্রমাত্বে ভিন্ন প্রমাকরণত্বে কখনও থাকেনা। সুতরাং যেই স্থানে স্বতঃএব প্রামাণ্য নিশ্চয়ঃ অথবা শব্দাদীনাং প্রমাণতা এইরূপ বাক্যের উপলব্ধি হয় সেই স্থানে স্বশব্দের উত্তর পঞ্চম্যর্থের প্রমাত্বে অন্বয় হইয়াই প্রমাকরণত্বাদিরূপ প্রামাণ্য, শব্দাদিতে অন্বিত হইবে। ইহাই মীমাংসকদিগের অভিপ্রায়। অনবস্থাদি দোষের উদ্ভাবন ও সেই অভিপ্রায়েই। এখন সকল গ্রন্থের একবাক্যতা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন।

উত্তরবাদী ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শেষকথায়" লিখিয়াছেন, আমি যদি তাঁহার প্রদর্শিত প্রাচীন পঙক্তির ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধে বাহির না করি, তাহা হইলে আমার কথা নাকি কোন পণ্ডিত সমাজই গ্রহণ করিবেন না। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, এই পণ্ডিত সমাজ কে? আমার মনে হয় ঐ স্থানে পণ্ডিত সমাজের পরিবর্ত্তে আমি লিখিলেই ভাল হইত। কারণ সম্প্রতি যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে ভয় প্রদর্শনে কোন ব্যক্তিকে নিগৃহীত করা নিতান্ত অসম্ভব। এমন কি কোন বালককেও তাহাতে নিরস্ত করা চলে না। যাহা যুক্তিসিদ্ধ ও প্রকৃত সত্যকথা, তাহা গ্রহণ করিতে বোধ হয় সকল পণ্ডিত সমাজই বাধ্য হইবেন। আমি এখন সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। জানিনা ভগবান্ কবে আমাকে শেষ কথা লিখিবার অবসর দিবেন। আশা করি, এই বিষয়ে এই পর্য্যন্তই আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিব।

সমালোচনা

শিবানন্দ-বাণী (প্রথম খণ্ড)—স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়মঠ, হওড়া হইতে স্বামী অভয়ানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। দুইশত পৃষ্ঠা, মূল্য একটাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা সহচর স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অমৃতময় উপদেশ সংকলন করিয়া গ্রন্থকার বাংলা ভাষা-ভাষী ধর্মপিপাসু পাঠকদের বিশেষ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের প্রভূত উপকার সাধন করিলেন। দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ ও কথার মধ্য দিয়াই মহাপুরুষগণের মহাপুরুষত্বের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সময়ে ভক্তগণের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ভক্তগণের দিন পঞ্জী হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকখানা সংকলিত হইয়াছে। সাধন ভজন, জন সেবা, দেশসেবা, কর্ম, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে বহু সমস্যার সমাধান এই পুস্তক হইতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলির একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। শ্রবণ মাত্রেই তাহা আবাল বৃদ্ধ-বনিতা পণ্ডিত মূর্খ সকলের অন্তর অতি সহজ ভাবে স্পর্শ করে। পাঠকগণ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের উপদেশাবলীরও ঠিক অনুরূপ অপূর্ব ক্ষমতা অনুভব করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও ভূমিকাটি অতি মূল্যবান হইয়াছে। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থে মহাপুরুষ মহারাজের যে সকল উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে সেই সকল অমূল্য উপদেশ শ্রীভগবানের পূত আশীর্বাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত ও সাধকদিগের অশেষ কল্যাণের নিদান হইবে।

পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা চিত্র এবং মহাপুরুষ মহারাজের দুইখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি চমৎকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস শতাব্দী জয়ন্তী স্মৃতি (হিন্দি)—প্রকাশক স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বেনারস সিটি। ৩২০ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে দেশের বিখ্যাত সংবাদ পত্র এবং দেশ বিদেশের মনীষিগণের সুচিন্তিত অভিমত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ সংগ্রহ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে জনসভা হয় তাহাতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাশীধামে অনুষ্ঠিত সর্বধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত প্রতিনিধি ও বক্তাগণের বক্তৃতাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অন্যান্য প্রবন্ধ ও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব। আর্যাবর্তের প্রধান প্রধান মঠাধ্যক্ষ ও দেশপ্রসিদ্ধ ধর্মনেতৃগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে কি দৃষ্টিতে দেখেন, এই পুস্তক পাঠে তাহা পরিষ্কার ভাবে ধারণা হইবে। পুস্তকের সুলভ মূল্য এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রণ প্রশংসনীয়।

ত্রয়ী—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়, নবজীবন সংঘ, ৪ ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা। ৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা।

চারণ সিরিজের ইহা প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে স্বাধীনতার বেদীমূলে, বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষ এবং থিয়োরির ভূত নামক তিনটি প্রবন্ধ আছে।

চারণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় দমদম স্পেশাল জেলে। কারা-প্রাচীরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহা আজ দেশের সাহিত্যে ও কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চারণের পাঁচটি মন্ত্র। এক, ভগবানে বিশ্বাস। দুই, সর্বহারাদের কল্যাণ। তিন, স্বাধীনতা। চার, গণসংযোগ এবং পাঁচ, স্বাস্থ্য ও সাহস।

বিজয়লাল শুধু ভাবুক কবি নহেন, তাঁহার সুসংযত লেখনী নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাক্য তেজ, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার অগ্নিময় অভীঃমন্ত্রে সমুজ্জ্বল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

চারণ কবি হুইটম্যান—হুইটম্যান স্মৃতি-সভা কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তি স্থান—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ৪ ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক আনা।

মাঝে মাঝে এমন এক একজন মানব জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহারা সমাজের দেশের জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে গৌরবান্বিত করেন। এমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান

এইরূপ একজন মহামানব। বিশ্বমানবতার অক্ষয় ভাণ্ডারে তাঁহার দান অমূল্য। তাঁহারই স্মৃতি সভার অর্ঘ্যরূপে এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়াল্‌ট্ হুইটম্যান (জীবন কথা) এবং ওয়াল্‌ট্ হুইটম্যান—বিদ্রোহী ও গণতান্ত্রিক নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কবির তিনটি বিখ্যাত কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কবিতা গুলির পদ্যে অনুবাদ অতি চমৎকার হইয়াছে।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

কৈবল্য রহস্য—কালীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন কর্তৃক সঙ্কলিত, ২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৷০।

নাম হইতেই বুঝা যায় ইহা একখানি ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে, অধ্যাত্ম বিদ্যা, বন্ধন ও মুক্তি, ব্রহ্মভাব, চিৎ হইতে উৎপন্ন জীব, মোক্ষপ্রাপ্তি, ইত্যাদি বহু অত্যাবশ্যক ধর্মবিষয়ের আলোচনা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে করা হইয়াছে। প্রত্যেকটী বিষয়ের আলোচনা উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত, যোগবাশিষ্ট, মনুস্মৃতি, তন্ত্র, ভাগবৎ, ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে এবং সকলের সুবিধার জন্য উক্ত প্রমাণগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। লেখক সুপণ্ডিত বলিয়াই যথাযোগ্য প্রমাণ দেখাইয়া এত সংক্ষেপে বিবিধ জটিল ধর্মবিষয়ের আলোচনা করিতে পারিয়াছেন। তিনি যে ৮৩ বৎসর বয়সে লোকের কল্যাণ কামনায় শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মূল্যবান বস্তু দান করিয়াছেন এই জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

তবে তিনি যে ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'এই পুস্তকের আভ্যন্তরিক বিষয় তত্ত্বকথা অভ্যস্ত হইলে বা সম্যক মন্থাবধারণ পূর্ব্বক সাধন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার দিব্যচক্ষুঃ প্রকাশিত ও আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়'—সে বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত এক মত হইতে পারিলাম না—কারণ গীতায় শ্রীভগবানই বলিয়াছেন 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'। দ্বিতীয়োল্লাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে 'হরিনামের মাহাত্ম্য' এবং 'হরি, কৃষ্ণ, ও রাম এবং গৌরনিতাই নাম যাহারা করে' ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শ্রীমদ্ভাগবৎ আদি শাস্ত্র যে সাধারণের লেখা এবং মীরাবাঈ, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, হরিদাস, শ্রীজীব গোস্বামী ইত্যাদি যে সাধারণ ভক্ত তাহা তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন না। এই সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিরপেক্ষ ও উদারভাবে মতগুলি প্রকাশ করিলে আমরা আরও আনন্দিত হইতাম। এইগুলি না থাকিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

সাধুপ্রসঙ্গ বা আধুনিক ভক্তমাল (১ম খণ্ড)—শ্রীমতী সরোজবাসিনী সেনগুপ্তা কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—৪৮ ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ৩১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷৵৫ মাত্র।

ইহাতে সরল পয়ার ছন্দে বহু সাধক জীবনী ও নানা ধর্মকথা আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীউত্তরকাশী বিশ্বনাথ-স্তোত্রম্—দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। গঙ্গোত্রী, পোঃ উত্তরকাশী, টিহরী গড়বাল, হিমালয়। ডবল ক্রাউন × ৩২ আকারে ৮ পৃষ্ঠা।

গঙ্গোত্রী মাহাত্ম্য—(হিন্দি)—দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। গঙ্গোত্রী, পোঃ উত্তরকাশী, টিহরী গড়বাল, হিমালয়। ডবল ক্রাউন × ৩২ আকারে ২৭ পৃষ্ঠা।

ইহাতে হিন্দিভাষায় গঙ্গার উৎপত্তি এবং মর্ত্যলোকে আগমন ও গঙ্গোত্রী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সূত্রম্—দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরাখালচন্দ্র সিংহ, পাটনাবাজার, মেদিনীপুর। ডবল ক্রাউন × ৩২ আকারে ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ আনা।

ইহাতে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি সূত্রাকারে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বধর্ম্ম—দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মাইতি, এম এ, বি-এল, মেদিনীপুর। ডবল ক্রাউন × ৩২ আকারে ৭৯ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা।

হিন্দুধর্মের অধিকারীবাদের ভিত্তিতে গ্রন্থকার পুস্তিকাখানা লিখিয়াছেন এবং পুরাণ, সংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন।

শশাঙ্কশেখর দাস

সংবাদ

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্ ফ্র্যান্‌সিস্‌কো—সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরী ক্লাব এবং বেদান্ত সোসাইটিতে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন :—"আত্মার প্রকৃতি, মূলকারণ, এবং ভাগ্য", "মন—অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন", "বেদান্ত মতে বাহ্যিক অভ্যাস", "বাহ্যিক দীক্ষা", "আভ্যন্তর জীবন এবং ইহার অভিব্যক্তি প্রণালী।"

এতদ্ব্যতীত শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে সমাগত ভক্তদিগকে তিনি ধ্যানধারণাদি ও বেদান্ত-তত্ত্ব-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী—স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগে ১৯২৭ সালের মে মাসে দিল্লী নগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। স্থানীয় সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই শাখাকেন্দ্র জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জীবসেবারূপ মহৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। মিশনের ১৯৩৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রচার বিভাগ—আলোচ্যবর্ষে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ভাবে গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদি ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনাদি হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্ত্তন, কালী-কীর্ত্তন ও ভজনাদিতেও স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ২৯৫টী ঐরূপ আলোচনা ও ভজনাদি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে ৩৮টী ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে এই শাখাকেন্দ্র হইতে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের জন্য মিশনের প্রধান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছেন।

পাঠাগার—মিশন সংলগ্ন গ্রন্থাগারে ইংরাজী সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলা ভাষায় সর্ব্বসমেত ৮২৪ খানি পুস্তক আছে। আলোচ্য বর্ষে ৭২২ খানি পুস্তক পাঠ্য হিসাবে পাঠকগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ২৫ খানি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছিল।

সেবাবিভাগ—মিশন সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্যবর্ষে সর্ব্বসমেত ১৭,৬৭০ জন রোগী জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে চিকিৎসিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ৮,৬৯৮ জন, পুরুষের সংখ্যা ১০,৭৭৯ ও নারীর সংখ্যা ৬,৯১১। হিন্দু ১৪,১৭৫ জন ও মুসলমান ৩,৪৫৫ জন। এতদ্ব্যতীত ৫০জন দুঃস্থকে পথ্যাদি সাহায্য করা হইয়াছিল।

দাতব্য যক্ষ্মা চিকিৎসালয়—জুম্মা মসজিদ পোষ্ট অফিসের নিকট দরিয়াগঞ্জস্থ দাতব্য যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ে সর্ব্বসমেত ৬,৬৩৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ৩৮৪ জন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী—যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানেও ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, পাঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হিন্দী উর্দ্দু ও বাংলা ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ, বক্তৃতা, ধর্ম্মসম্মেলন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। ভারতের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি শতবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত সভাসমূহে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

যাঁহাদের আন্তরিকতা সহৃদয়তা পৃষ্ঠপোষকতা ও দানশীলতায় মিশনের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, স্থানীয় সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্যে মিশনের কার্য্যাবলী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতাকারে পরিচালিত হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প-বিদ্যালয়, বেলুড় (হাওড়া)—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী

সভা হয়। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত হরিপদ ভৌমিক, কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বামী শঙ্করানন্দ, শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে একটী ভজন সঙ্গীত গীত হইলে কার্য্য পরিচালক সমিতির সভ্য স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের কার্য্য-বিবরণী সমেত সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ করেন। বর্ত্তমানে শিল্প-বিদ্যালয়ে মোট ৪১টী ছাত্র আছে, তন্মধ্যে ২৩টী ছাত্রাবাসে থাকে। ১৯৩৬ সালের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭০৯ টাকা ১৩ আনা ৬ পাই।

সভাপতি মহাশয় নির্ব্বাচিত ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের—বিশেষভাবে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরিশেষে স্বামী ঘনানন্দ কার্য্য পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা মাতাজী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি বলে ১৩০১ সালে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ অনুযায়ী স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাদিগকে আশ্রয় দান এবং নারীদিগকে আদর্শ জীবন যাত্রার পথে সহায়তা করা। ইহাতে গৃহকর্ম্ম ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

গত ১৩৪৩ সালে আশ্রমবাসিনীগণের সংখ্যা ছিল ৪৭। তন্মধ্যে ৩৪ জনের ব্যয় আশ্রম হইতে নির্ব্বাহ হইয়াছে এবং ১৩ জনের ব্যয় তাঁহাদের অভিভাবকগণ বহন করিয়াছেন। আশ্রমের যাবতীয় গৃহকর্ম্ম আশ্রমবাসিনী শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ স্বহস্তে করিয়া থাকেন। আশ্রম-সংশ্লিষ্ট অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা তিন শতেরও অধিক।

আলোচ্য বর্ষে ১ জন আশ্রমবাসিনী ব্যাকরণ-তীর্থা উপাধিলাভ করিয়াছেন, ৪ জন ছাত্রী আদ্য এবং ৪ জন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আশ্রমে তাঁত, চরকা ও সেলাইর কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত মখমল, কার্পেট, পাপোষ, চটের আসন প্রভৃতি নানারূপ শিল্পকার্য্যও শিক্ষাদান করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ৪১,৮৫৮৵১৫ এবং ব্যয় ১৮,৪৪৭৷৷০। আমরা এই আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

চৈতন্য লাইব্রেরী—আমরা চৈতন্য লাইব্রেরীর ১৯২৬-৩৬ কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবভক্ত ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত কর্ত্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই দীর্ঘ ৪৭ বৎসর ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া এই গ্রন্থ প্রতিষ্ঠান গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে।

গ্রন্থালয়ের নিজস্ব বাটীর জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর সম্প্রতি ৭ কাঠা জমি ৪২,২২০, টাকা মূল্য ক্রয় করা হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত নরনারীগণ আজকাল গ্রন্থাগারের উপকারিতা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন। আমরা আন্তরিক আশাকরি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে শীঘ্রই উক্ত জমিতে গ্রন্থালয়ের উপযোগী নিজস্ব বাড়া নির্ম্মিত হইবে।

১৯৩৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পুস্তকালয়ে মোট ২২,৩২৮ খানা পুস্তক ছিল। ইহার মধ্যে ১২,৯৬৯ খানা বাংলা এবং ৯,৩৫৯ খানা ইংরেজী। বাংলা ও ইংরেজী ভারতের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল পত্রিকাই পাঠাগারে রাখা হয়। গড়ে বৎসরে ২০,০০০ পুস্তক সভ্যগণ বাড়ীতে লইয়াছেন এবং ৪০০০ পুস্তক সর্ব্বসাধারণ পাঠক পুস্তকালয়ে বসিয়া পাঠ করিয়াছেন। পুস্তকাগার সকালে ৭টা হইতে ৯টা এবং পাঠাগার সকাল ৬টা হইতে ৯৷৷০টা ও বিকাল ৩টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

আমরা এই গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

শ্রীমৎ স্বামী কল্যাণানন্দজী মহারাজ

দেহত্যাগ

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৭

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী—

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার সংঘর্ষে এই দেশে ধর্ম্মরাজ্যে যখন ভয়ঙ্কর অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশে এমন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহার অত্যদ্ভুত জীবন ও শিক্ষা ভারতীয় ধর্ম্মের উপর—শুধু ভারতীয় ধর্ম্ম কেন, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের উপর, নূতন আলোক বিকীরণ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার বহুবিধ সাধনা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভদ্বারা এই নাস্তিকতার যুগেও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, ভগবানকে জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়, ভগবান শুধু একটা কথার কথা নয়, আর প্রত্যেক ধর্ম্মই ভগবানলাভের এক একটী পথ, তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য শিক্ষা হইতে সকল ধর্ম্মের লোকই প্রভূত উপকার লাভ করিবে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার মত হয়তো একদিন সমস্ত জগতের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে। ইতিমধ্যেই ইহার অনেক সূচনা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

যখন কোন মহামানব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতিপয় লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে ঐ মহাপুরুষের বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ হইয়া জগতে তাহা প্রচার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর যে কয়জন শক্তিমান পুরুষ তাঁহার জীবনের জলন্ত প্রতীক হইয়া তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতন জগতের উপর নিপতিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ এক বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিজকে সমস্ত কোলাহলের অন্তরালে রাখিয়া তাঁহার ধীর প্রশান্ত জীবনধারা শত সহস্র নরনারীর উপর ধর্ম্মপ্রভাব

বিস্তাব কবিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহাব বক্ষা ও গঠন কবিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আধ্যাত্মিকতায় বাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমা হইতে বড়।" বিনয়প্রণোদিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই মত প্রকাশ কবিয়াছিলেন কিনা এই সম্বন্ধে আলোচনা না করিলেও এই উক্তি হইতে, তিনি তাঁহার এই গুরুভ্রাতাকে কি শ্রদ্ধাব চক্ষে দর্শন কবিতেন, তাহা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীবামকৃষ্ণদেব একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "মা, তোমাকে বলিয়াছিলাম এক-জনকে সঙ্গী করিয়া দাও—আমাব মত। তাই বুঝি রাখালকে দিয়াছ।" শ্রীবামকৃষ্ণদেবেব গৃহী ও সন্ন্যাসী—কোন শিষ্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে গুরু-ভ্রাতার মত দেখিতেন না—তাহা হইতে অনেক উচ্চে তাঁহাকে স্থান দিতেন।

শ্রীবামকৃষ্ণদেব তাঁহাব শিষ্যদেব মধ্যে কাহাকেও বলিতেন ঈশ্ববকোটী, কাহাকেও বলিতেন জীব-কোটী। জীবকোটী যাঁহাবা, তাঁহাবা সাধনভজন কবিয়া ভগবান লাভ কবেন, আব ঈশ্ববকোটী যাঁহাবা, তাঁহাবা জন্ম হইতেই সিদ্ধপুরুষ। তাঁহারা যে সাধন ভজন কবেন, সে কেবল লোক-শিক্ষার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দপ্রমুখ ছয়জন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, এবা নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্ববকোটী, এদেব শিক্ষা কেবল বাড়ার-ভাগ। ঈশ্ববেব জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। সংসাবের মলিনতা ইহাদিগকে স্পর্শ কবিতে পাবে না।

বাল্যকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দেব নাম ছিল, শ্রীবাখালচন্দ্র ঘোষ। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণাব এক বিখ্যাত জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীবামকৃষ্ণ-দেবকে প্রথম দর্শন করেন। সন্ন্যাসী ভক্তদিগেব মধ্যে তিনিই প্রথমতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "বাখাল আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটী বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটী তোমার পুত্র।'—শুনিয়া শিহবিয়া উঠিয়া বলিলাম—'সে কি?—আমাব আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'সাধাবণ সাংসাবিকভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। এই দর্শনেব পবেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।"

শ্রীবামকৃষ্ণদেব শ্রীযুত বাখালকে নিতান্ত শিশু-সন্তানেব মত দর্শন কবিতেন। বাখালও তাঁহাকে দেখিলেই আত্মহারা হইয়া তিন চারি বৎসরের বালকেব মত ব্যবহাব কবিতেন—কখনও তাঁহাব কাঁধে চড়িতেন, কখনও কোলে বসিতেন। শ্রীবামকৃষ্ণদেব বাখালকে বিশেষ স্নেহেব চক্ষে দর্শন কবিতেন; অন্যকে দেওয়া হইত না এমন অনেক অধিকাব বাখালকে দান কবিতেন। তাঁহাব শিষ্যদিগেব মধ্যে বাখালকে তিনি অতি উচ্চ আসন প্রদান কবিযাছিলেন। উত্তবকালে তাঁহাব আধ্যাত্মিক শক্তিব বিকাশ হইলে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল, কেন শ্রীবামকৃষ্ণ-দেব রাখালকে এত প্রশংসা কবিতেন। তিনি বলিতেন, "বাখাল ব্রজেব বাখাল—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণেব সহচবভাবে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। বাখাল তাহাব স্বরূপ জানিতে পাবিলে আব দেহধারণ কবিবে না।" একবার শ্রীযুত রাখাল যখন বৃন্দাবনে যাইয়া পীড়িত হন, তখন শ্রীবাম-কৃষ্ণদেবের ভাবনা হইয়াছিল, বুঝিবা রাখাল শবীব ত্যাগ কবে এবং তজ্জন্য অস্থিব হইয়া শ্রীশ্রীজগ-দম্বাব নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, যাহাতে বাখাল বক্ষা পায়।

বাখালের আধ্যাত্মিক উন্নতিব জন্য প্রয়োজন হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাসন করিতেও ক্রটী

করিতেন না। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসাধারণ মনোযোগ প্রদান করিতেন এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহের আকর্ষণে এবং ঈশ্বরলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাবশতঃ শ্রীযুত রাখাল ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীতে গমন করা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটই বেশীর ভাগ সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর যে কয়জন ত্যাগী ভক্ত সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করেন, শ্রীযুক্ত রাখাল তাঁহাদের মধ্যে একজন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তখন সকলেরই তীব্র বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবর্ত্তমানে তাঁহার জন্য যে একটা তীব্র অভাব বোধ করিতেছিলেন, সাধনভজন দ্বারা তাহা পরিপূরণ করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। স্বামী ব্রহ্মানন্দও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত। কিছুদিন বরাহনগরে বাস করিয়া তিনি নর্ম্মদার তীরে তপস্যা করিতে গমন করেন। সেখান হইতে দ্বারকা, বৃন্দাবন, কনখল, জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও তপস্যা করিয়া ছয় বৎসরকাল পরে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেলুড়মঠ স্থাপন করিলে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই ইহার অধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনেরও প্রথম অধ্যক্ষ এবং যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও তাঁহার মন সদাসর্ব্বদা উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিত, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিমুখ হন নাই। তাঁহার চেষ্টায়ই 'মিশন' ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত কলেবর হইতে থাকে। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন, উহাকে গঠন প্রদান করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার ধৈর্য্য, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলেই রামকৃষ্ণ মিশন বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। মিশনের কাজের জন্য তাঁহাকে এক এক সময় অতি কঠোর পরিশ্রম ও বিশেষ উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত। যদিও তাঁহার মন সাধারণতঃ আত্মস্থ হইয়া থাকিতে চাহিত, মিশনের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে হরিদ্বার, কাশী, মাদ্রাজ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। তাঁহাকে দর্শন করিলে বুঝা যাইত,

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

গীতার এই উক্তির যথার্থ মর্ম্ম কি? তাঁহার উপর এত গুরুভার ন্যস্ত ছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, কোন কাজেই তাঁহার আকর্ষণ নাই, কাজ আপনা-আপনিই চলিয়া যাইতেছে—তাঁহার মন যাবতীয় জাগতিক ব্যাপারের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। সকলকেই তিনি তপস্যার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেন। মঠ মিশনের কাজ করিতে করিতেও তিনি একবার নিজকে সরাইয়া লইয়া কাশী, কনখল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যাইয়া প্রায় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করেন। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ভুবনেশ্বরে এক মঠ স্থাপন করেন যাহাতে নূতন সাধু সন্ন্যাসিগণ সাধন ভজন তপস্যাদির জন্য প্রচুর সুবিধা লাভ করিতে পারে। সকল কাজকর্ম্মের মধ্যেও ভগবান লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই কথা যেন কেহ ভুলিয়া না যায়, তজ্জন্য সকলকে তিনি খুব সাবধান করিতেন। শত সহস্র লোক তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া জীবনে নূতন আলোক লাভ করিয়াছে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, সাংসারিক দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে এমন এক বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে, যাহা চিরমঙ্গলময় শাশ্বত নিত্য। ইহাদের সকলকে অভয় প্রদান করিতে করিতে

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নরদেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যে সত্য, মৃত্যুকালে তিনি তাহার দুই একটী নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।

সাধু মহাপুরুষদিগকে তাঁহাদের জীবনের শুধু বাহ্যিক ঘটনার ইতিবৃত্তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। তাঁহাদের অন্তর্জগতের নিগূঢ় ইতিহাস জানিতে না পারার দরুণ, তাঁহাদের স্বরূপ চিরদিন লোক-সমাজের নিকট অব্যক্ত থাকিয়া যায়। এই কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দসম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি নিজের ধর্ম্মজীবনের বিবরণ কদাচিৎ অন্যের নিকট প্রকাশ করিতেন। তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত চাপা ছিলেন। তবে তাঁহাকে দেখিলে অতি পরিষ্কার বুঝা যাইত, তিনি অন্য এক জগতের লোক —সাধারণ লোক হইতে তাঁহার "শতেক যোজনের" ব্যবধান। তিনি লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিলেও, সময় সময় ফষ্টিনষ্টি করিলেও বোধ হইত—তিনি এই জগতের উর্দ্ধে অন্য এক রাজ্য হইতে সেই সময়কার জন্য নামিয়া আসিয়া কথা বলিতেছেন। ইহা বুঝিবার জন্য কোন অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন হইত না—সাধারণ লোকও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত। আর যে সময়ে তিনি মনকে সত্য সত্যই গুটাইয়া লইতেন, তখন চারিদিকের আবহাওয়া তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত—একঘর লোক থাকিলেও তখন ঐখানে যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত, কাহারও সাহস হইত না বা প্রবৃত্তি হইত না, উহা ভগ্ন করে; তখন সকলেই যেন মন বুদ্ধির অতীত এক জগতের আস্বাদ লাভ করিত। শেষের দিকে অনেক সময়ই মহারাজের নিকট অনেক লোক থাকিত এবং তাহাদিগকে এইরূপ ঘটনার জন্য প্রায়ই প্রস্তুত থাকিতে হইত।

অথচ তিনি সকলকে যে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন, তাহা প্রত্যেকেই মনে করিত, অপার্থিব। ধনী নির্ধন, উচ্চ নীচ, সকলেই তাঁহার নিকট হইতে সমানভাবে ভালবাসা লাভ করিত, যাহারা সমাজে ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত, যাহাদিগকে দেখিলে লোকে কথা বলিতে চাহে না, মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারাও মহারাজের নিকট হইতে এত স্নেহ লাভ করিত যে তাহাতে তাহারা নিজেরাই আশ্চর্য্যবোধ করিত। তাঁহার অদ্ভুত সহানুভূতি শত অন্যায়কে ক্ষমা করিত। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না—তিনি অন্যায়কে উপেক্ষা করিতেন। তিনি লোকের দোষ দর্শন করিতেন না, ভালবাসাদ্বারা প্রত্যেকের ভিতর যে সদ্‌গুণ আছে, তাহা জাগাইয়া দিতেন। কত হীনচরিত্র লোক তাঁহার পূত সংস্পর্শে আসিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত। শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ ছুটিয়া যাইত। কত লোক ছিল, শত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহাকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার দর্শন করা চাই-ই—তাহা না হইলে যেন ঐ দিনটা তাহাদের পক্ষে বৃথা যাইত—তাহাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না।

একটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়, এত ধর্ম্মপিপাসু লোক তাঁহার নিকট গমন করিলেও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তিনি সহজে করিতে চাহিতেন না। সাত পাঁচ কথা বলিয়াই যেন লোককে তিনি ভুলাইয়া রাখিতেন। কিন্তু ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছে যে তাঁহার নিকট গেলেই যেন ধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত—কোন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না। তিনি যেখানেই থাকিতেন, চারিদিকে অপার্থিব, বিমল এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত। লোক তাহাতে ডুবিয়া থাকিত—অন্য কোন সমস্যার কথা তখন তাহাদের মনে উদয় হইত না। শুধু তাঁহার নিকট থাকিলেই উচ্চাঙ্গের

যে এক আধ্যাত্মিক আনন্দের অনুভূতি হইত, একনিষ্ঠ সাধকও মনে করিত, শত সাধনা দ্বারা তাহা দুষ্প্রাপ্য।

মহাপুরুষগণ স্থূলজগত হইতে অন্তর্হিত হইলেও তাঁহাদের প্রভাব লুপ্ত হয় না। তাঁহাদের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ধ্যান ও আলোচনা করিয়া শত সহস্র লোক নিজেদের জীবন গঠনে সহায়তা প্রাপ্ত হয়। যাহারা 'মহারাজ'এর পুতসঙ্গ লাভ করিয়াছে, তাহারা জীবনের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐ স্মৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু মহারাজকে স্থূলশরীরে দর্শন করে নাই এমন শত শত কত লোক ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনকে আদর্শ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

রজোগুণের উদ্দীপনায় স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদক

হিন্দুশাস্ত্রমতে যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর-হইতে বিলক্ষণ, পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষী, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এবং সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই আত্মা। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ অবিকারী দেহী বা আত্মার স্বরূপাবৃত করিয়া তাঁহাকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আত্মা গুণাতীত হইয়াও নামরূপের মরীচিকায় পতিত হইয়া জীবভাবপ্রাপ্ত। গীতাকার আত্মা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যিনি ভূতসমূহে পৃথক্ পৃথক্ অথচ অখণ্ড চৈতন্যরূপেও বিদ্যমান এবং যিনি নিত্যমুক্ত হইয়াও জীবে জীবে বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন তিনিই আত্মা।" সত্ত্বগুণের লক্ষণ—প্রকাশশীলতা, জ্ঞান ও শান্তভাবস্থিতি। রজোগুণের কার্য্য—বিষয়তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভূত কর্ম্মপ্রবণতা, ভোগবাসনা, অবিরতি, আকাঙ্ক্ষা। আর তমোগুণের ধর্ম্ম—অজ্ঞানতা, ভয়, আলস্য ও নিদ্রা। একমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশেই জীবাত্মার ব্রহ্মস্বরূপ মানুষের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। গীতা বলেন, "যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিসমূহে অভিন্ন অব্যয় এক আত্মাকেই সন্দর্শন করেন, তাহাই বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান।" এই শুদ্ধসত্ত্বগুণে মানুষকে স্থিত করাই সকল শাস্ত্রের মূলকথা। রজঃ ও তমঃকে পরাভূত করিয়া পূর্ণ সত্ত্বগুণে স্থিত হইলে আত্মা নিজ মহিমায় স্বতঃ-প্রকাশিত হন, কিন্তু তমোবর্জ্জিত হইয়া রজো-গুণের সাহায্য ভিন্ন সত্ত্বে উপনীত হইবার উপায় নাই।

সত্ত্বগুণ হইতেও সর্ব্বগুণাতীত অবস্থা শ্রেষ্ঠ বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে চরাচর বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। বিকার বা গুণসমূহ প্রকৃতিজাত। পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিজাত রূপরসাদি ভোগ করেন। এই ভোগাসক্তিই পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ। কিন্তু 'আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও যেমন কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত নহে, পুরুষ বা আত্মা সমস্ত দেহে অবস্থান

করিয়াও তেমন কোন শরীরের সঙ্গে মিশ্রিত হন না।' পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ববস্তুর ধারণকর্ত্তা, তিনি নির্গুণ হইয়াও সকল গুণের সংরক্ষক। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ", 'প্রকৃতিদ্বারা ক্রিয়মাণ হইয়া গুণই সকল কর্ম্ম করিতেছে', আত্মা কিছুই করেন না, তিনি নির্লিপ্ত—সাক্ষিস্বরূপ। এই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া সাধক আত্মস্বরূপ জানিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় উপনীত হওয়াই মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। কিন্তু কেবল গুণের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াই এই গুণাতীত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব; এ জন্য একমাত্র উপায়—রজোগুণরূপ কাঁটা দ্বারা তমোরূপ কাঁটা তুলিতে হইবে, পরে রজোরূপ দেহবিদ্ধ কাঁটাটীকেও সত্ত্বগুণরূপ কাঁটার সাহায্যে তুলিয়া শেষে তিনটী কাঁটাকেই দূরে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে। তিনটীই শৃঙ্খল—একটী লোহার, একটী রূপার এবং একটী সোনার। "গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥" 'দেহী দেহজাত এই তিনটী গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখবর্জ্জিত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।'

মানুষ যখন তাঁহার জন্মগত স্বত্ব-স্বাধিকার—অনন্তজ্ঞান, শক্তি ও পবিত্রতার প্রস্রবণ আত্মাকে আপনার মধ্যে বিকশিত করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার পক্ষে প্রথমতঃ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মাকে প্রত্যক্ষানুভব করিবার তীব্র সংকল্পের নাম মুমুক্ষুত্ব। এই মুমুক্ষা ভিন্ন কাহারও আত্মদর্শন অসম্ভব; আর এই দর্শন কেবলমাত্র তমোবর্জ্জিত রজোগুণের সাহায্যেই সম্ভব। সুতরাং কাহারও মনে মহা-রজোগুণাত্মক কর্ম্মপ্রেরণা না আসিলে সত্ত্বগুণ তাহার পক্ষে অর্থহীন শব্দমাত্র। জগতের ধর্ম্মাচার্য্যগণ অক্লান্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়াই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদ বহুধা নিন্দিত এবং শাস্ত্রমতে জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ পুরুষের কর্ম্মে অবসর নাই সত্য, কিন্তু এ কথাও শাস্ত্রসম্মত যে, "মানুষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কর্ম্মহীন অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম ছাড়িয়া কেহ সিদ্ধিলাভও করিতে পারে না।"

বৌদ্ধযুগে সমগ্র ভারতকে নির্ব্বাণমোক্ষকামী সন্ন্যাসীদের মঠে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। দেশের সকলে যদি মোক্ষমার্গের ঠিক ঠিক অনুসরণ করিত, তাহা হইলে পরম কল্যাণ সাধিত হইত। কারণ, আত্মস্বরূপ জানিয়া সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হওয়া অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ মানুষের আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্ভব, মুক্তির পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, সুতরাং এই অবস্থালাভ অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। এই ভোগবিলাসপূর্ণ জগতে সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া নিবৃত্তি-মার্গ বা সত্ত্বগুণের পথ অতি মুষ্টিমেয় লোকেরই গ্রহণযোগ্য। আজকাল দেখা যায়, দেশশুদ্ধ সকলে—অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দু আপনাদিগকে সত্ত্বগুণী মনে করেন, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যায়, তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনের মধ্যে সত্ত্বগুণ দূরের কথা, কিছুমাত্র কর্ম্মশক্তি বা রজোগুণেরও বিকাশ নাই, প্রায় সকলেই ঘোর তমে আকণ্ঠ মজ্জমান! সেই বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের যুগের "কর্ম্মকুণ্ঠ লোকদেখানো মুক্তিকাম" সত্ত্বগুণের নামে সমগ্র হিন্দুজাতিকে প্রতারিত করিতেছে! গোটাভারত মহাতমে আচ্ছন্ন! কেবলমাত্র উদরান্নের জন্য অগণিত জনসঙ্ঘের হাহাকারে যে দেশের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত, যে দেশে দারিদ্র্য নগ্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমগ্র জাতিকে জগতের ঘৃণার পাত্র করিয়া

তুলিয়াছে, যেথানে লক্ষ লক্ষ পরিবার বাধ্য হইয়া গরু-ঘোড়ার সঙ্গে একত্র জীবনযাপন করিতেছে, অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে যে দেশের লোক জানোয়ারের মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"যেথানে মহা-জড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে,—যেথানে জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে,—যেথানে ক্রূরকর্ম্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম্ম করিয়া তুলে,—যেথায় নিজের সমর্থতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, * * সে দেশ যে তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই" (ভাববার কথা)? দেশের এই হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য দর্শন করিয়া মুমুক্ষু স্বামীজি দেশভক্তরূপে পরিণত হইয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ক-বিকার অথবা বিচার-শূন্য উৎসাহসম্পন্ন)। মহারজোগুণের উদ্দীপনা-ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল—না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমঃতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব—পরলোকে নরক। * * তাই বলছি, এখন মানুষকে রজো-গুণে উদ্দীপিত করে কর্ম্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম, এখন আর "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-হয়নায়", উহাভিন্ন উদ্ধারের আর পথ নাই" (স্বামি-শিষ্য সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড)।

প্রকৃতির বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজ জীবন রক্ষার চেষ্টা প্রাণি-জগতের সাধারণ ধর্ম্ম। জীবন-ধারণের জন্য সকলের আগে দরকার 'অন্নসংস্থান'। যে মানুষের পক্ষে মোটাভাত এবং মোটাকাপড় সংগ্রহ করাই ভীষণ সমস্যা, তাহার মন উদরের চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, ললিতকলা, দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চচিন্তা ও উচ্চকর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারে না। স্বামীজির উদ্দেশ্য ছিল এই উন্নত বিষয়গুলি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আপামর সাধা-রণের মধ্যে বিস্তার করা। কিন্তু ইহকালে যে এক-মুষ্টি উদরান্নের সংস্থানে অপারক, পরকালের পথ—স্বর্গের রাস্তা বা ঐ সকল উন্নত বিষয়ের সন্ধান করিতে তাহাকে পরামর্শ দেওয়া কি তাহার পক্ষে বিদ্রূপের কথা নয়? এইজন্য স্বামীজি তাঁহার বুভুক্ষু দেশবাসীকে সর্ব্বাগ্রে অন্নবস্ত্রসংস্থান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও যেখানে ভাতের অভাব, সেখানে গীতা অপেক্ষা ভাতের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। সমস্ত দেশ যে দুরবস্থার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। দেশে ঘরে ঘরে অশন-বসনের নিত্যদুর্ভিক্ষ, হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক ভিক্ষুকের মত দেশময় কর্ম্মসন্ধানে বিচরণ করিতেছে: কাজ নাই, কাজের ক্ষেত্র নাই, কাজ দিবার লোক নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের আধিপত্য এবং সমাজে অশিক্ষা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব, এই সকল অনর্থের মধ্যে কি আর ধর্ম্ম বা সত্ত্বগুণের প্রবেশাধিকার আছে? এ যে মহাতমের কুজ্ঝটিকায় জীবনের চারদিক ঘনায়মান অন্ধকার।

এই দুরবস্থা প্রতিকারের উপায়স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন, "যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দন ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতির তৃষ্ণা, চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি

কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, চাই আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ" (ভাব্‌বার কথা)। পুনশ্চ—"আমি এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা এ দেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। * * সকলকে ধরে ধরে বল্‌ গে, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর, - জীবন-সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তি-লাভের কথা তাদের বল" (স্বামি-শিষ্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড)। অন্যত্র—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্ব-ধারার উপর পাশ্চাত্য-জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া পাশ্চাত্যের রজোগুণ-প্রবাহ প্রতিবাহিত না করলে আমাদের ঐহিককল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত" (ভাব্‌বার কথা)।

যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের নির্দ্দেশমত প্রবল রজোগুণের উদ্দীপনায় আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই যে ভারতের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মায়ের পরশ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

মোর জীবনে প্রাণের অতীত তুমিই ওগো বাঁধছ বাসা,
দেহ মাঝেই দেহাতীতের চলছে নিতি যাওয়া আসা,
চিত্ত-দুয়ার তাইত খোলে স্পর্শে তোমার সঙ্গোপনে
নীবব মনে পড়ছে আজি তারই ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥

বাহির পানে তাকাই যবে নীল গগনে ও কী হেবি,
নৃত্যে চবণ দুলছে কাহার মহাকালের অঙ্গ ঘেরি,
তারার মালা কাঁপছে গলে চাঁদের মণি জ্বলছে শিবে,
সাগব লুঠে পায়েব তলে, স্তুতির সুর উঠছে ধীরে॥

কেমন করে মিলিয়ে গেল আমার ক্ষুদ্র শরীর-মায়া,
কোথায় তুমি কিসের আমি বিরাজ করে বিরাট কায়া;
আলো আঁধার নেইকো কিছু দুঃখের কান্না সুখের হাসি,
তলিয়ে গেছে নেই ঠিকানা কোন অতলে সর্ব্বগ্রাসি।

তর্কবিহীন স্বীকার নব ভাব-স্বপনে মোহের খেলা
নয়গো এযে মনোবিলাস খেয়াল বলে করবে হেলা,
মেঘের বুকে তড়িৎসম লুকিয়ে রয় কারণ বিনে,
কোন্‌ উপায়ে বুঝ্‌বে বল চমক তাবি দৃষ্টি হীনে॥

তাঁরি হাতের পরশ শুভ বুলিয়ে যদি করেন আলো
পবাজ্ঞানের সে কৌশলে তবেই ঘুচে সকল কালো॥

"যুগে যুগে প্রচারিত তব বাণী"

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল সান্যাল, এম্-এস্‌সি

নিত্য যাঁরা তেতালায় থাকেন, তাঁরা দেশকালের অতীত। তাঁরা সকলেই একজায়গার মানুষ, এক সুরে সুর বাঁধা, এক জ্ঞানে জ্ঞানী, ঠিক যেন একাত্মা অথবা একই জন যুগে যুগে। চার যুগে এঁদের একই কারবার। মানুষের এঁদের সঙ্গে বিশেষ কারবার—তাদের যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তার খবর এঁদের হাতে। মানুষ চায় কি? যুগে যুগে তার একই আকাঙ্ক্ষা—সুখ, আনন্দ, স্ফূর্তি। এর কোনটা শ্রেয় আর কোনটা প্রেয় তা ও সে ঠিক জানে না। তাই বৈদিক যুগেও অনেক প্রার্থনায় দেখি মানুষ চাইছে—হে দেব, দুঃখ হতে, বিপদ হতে আমাকে ত্রাণ কর, "মা মাং হিংস্যাঃ", আমাকে পীড়ন করো না। "রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন পাহি মাং নিত্যং", রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আমার উপর নিক্ষেপ কর। আমি যেন সুখে থাকি। "যদা অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণা-বিজ্জরিতারং, মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়", যদি জলের মাঝারে বাস করি, তৃষায় শুকায়ে মরি, তবে দয়া কর হে দয়া কর হে।

বেদের অন্তভাগ উপনিষৎ অধ্যাত্ম-ভাবের গৌরব। সে যুগের ঋষির মুখে সেদিন তুমিই কি বলেছিলে—"হে মানব, স্ফূর্তি ও আনন্দ তুমি অবশ্যই পাবে। স্ফূর্তি-স্ফুরণের ভাব, আপন প্রকৃতিতে বিকশিত হয়ে উঠা। তুমি স্বধর্মে বিকশিত হয়ে ওঠ। শিশু যখন সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে মায়ের কোলে থাকে তখন ঘুমের পর প্রথম জেগে উঠে হেসে চোখ খোলে। তার যে অহেতুকী আনন্দ তোমারও তা হবে। ওহে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', আনন্দ তোমার স্বরূপ, আনন্দে তোমার জন্ম বৃদ্ধি, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"। একটু নিজের দিকে চেয়ে দেখলে আনন্দ পাবেই। যাঁর কাছ থেকে এসেছ সে যে সৎ, চিৎ, আনন্দময়, "রসো বৈ সঃ", "রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"। স্থির হলেই দেখবে "ইয়ং পৃথ্বী সর্বেষাং মধু"। তখন, তোমার নয়ন দুটি মেলিলে পরে পরাণ হবে খুসী, তুমি যে পথ দিয়ে চলিয়ে যাবে সবারে যাবে তুষি। বাতাস জল আকাশ আলো, সবারে তুমি বাসিবে ভাল। ক্রমে অনুভব করবে, অনল অনিলে জলে মধু প্রবাহিণী চলে। অনুভব করবে "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।" তখন দেখবে দুঃখই নাই।

সাধারণ লোকের ধাতে এতটা সয় না। তারা ত ভুল করবেই। তারা বুঝি কেঁদে বলেছিল, তত্ত্বদর্শী ঠাকুর, তোমরা সব বড় কথা বল কিন্তু আমরা যে অত বড়র নাগাল পাই না। আমরা যে অমৃতের পুত্র সে কথা ত কই টের পাই না, নিজের দুঃখের ভাবেই ডুবে যাই। আমরা চরম লাভ মনে করি নিজেদের অভাব-মোচন। সে দিন ঋষির মুখে কি তুমিই আবার বললে—সাধারণ জীব, তোমার আত্মবুদ্ধি দেহ মনে। তুমি হঠাৎ শুধু বিদ্যার কথা নিয়ে ত পারবে না। "ততঃ ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।" তুমি দেহে মনে গড়ে উঠে লৌকিক জ্ঞানদ্বারা পার্থিব অভাব মোচন কর—অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম কর, তখন বিদ্যাদ্বারা ঐ অমৃত লাভ করবে। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

সব রকমে ফুটে ওঠ। "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়-

সিদ্ধি" সেই ধর্মপথে চল। "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ", সেই "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিত"। অতএব "পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্"।

গৃহী, গৃহধর্ম্ম পালন কর, লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্ম্ম পালন কর। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ত্যাগের দ্বারা যজ্ঞের পর ভোগ কর। যেথানে দৃষ্টি পড়ে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্"—সব কিছু ভগবানের দ্বারা আচ্ছাদিত করে নাও। বৈষ্ণব কবির ভাষায় "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।" যে নিজের কথা বলছ, যার অভাব-মোচন করতে ব্যস্ত, তাকে সঙ্কুচিত ক'রনা, বিস্তৃত কর, সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দাও। "নাল্পে সুখং ভূমৈব সুখং" ক্রমে বড় চাইতে শেখ।

কিছুদিন পরে সাংখ্যকার কপিলমুনি হয়ে তুমি বলছ—"ওরে মানুষ তুই বড় দুঃখী, তা-ও দুঃখ একটা নয়, ত্রিবিধ। তবে আশার কথা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও তোমার হাতে আছে। প্রকৃতির উপর পুরুষের কার্য্য লক্ষ্য কর। প্রকৃতিকে ঠিক করে জান, তাকে ধর। সেই জ্ঞান লাভ করে অভ্যুদয় ধর্ম্মপথে তোমার দুঃখনিবৃত্তি হবে।"

কাল নিরবধি পৃথ্বীও বিপুলা, কত পথে লোকে চলে। ধর্ম্ম কথনও সঙ্কুচিত, ক্ষীণ হয়ে লুপ্ত হয়ে আসে, আবার অবতার প্রভৃতি এসে সূর্য্যের মত তার দীপ্ত তেজ প্রকাশ করেন।

কথনও আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র এসে রাজধর্ম্ম স্থাপন করেছেন, রাক্ষস নষ্ট করেছেন। আবার ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে যেদিন ধর্ম্মক্ষীণ সেদিন তিনি এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদকারী পার্থসারথিরূপে। সেই পরম প্রেমিক রাধাকান্ত আবার বজ্রাদপি কঠোর শূরশ্রেষ্ঠ আদর্শ ক্ষত্রিয়, সেদিন সমরে ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্যাসদেবের কৃপায় আজও আমরা তাঁর শ্রীমুখের বাণী, উপনিষদ্ দোগ্ধা গোপাল নন্দনের অমৃতময় দুগ্ধ গীতার আস্বাদ পাই।

তিনি শেথালেন—সমন্বয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। মানব জীবন গড়ে তুলবে কর্ম্মপথে, মর্কট-বৈরাগ্যের নৈষ্কর্ম্যপথে নয়। সাধক, ক্লৈব্য ত্যাগ কর, শোক করো না, কর্ম্মের কৌশল জেনে সুখে দুঃখে সমভাবে নিজের কর্ত্তব্য যুদ্ধ করে চল। ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত হয়ে অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম্ম কর। যুক্তাহার, বিহার, স্বপ্ন ও চিন্তাশীল হও। ভয় নাই, তুমি মৃত্যুর অধীন নও। কল্যাণকৃৎ দুর্গত হয় না, প্রনষ্ট হয় না। জীবমায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢবৎ চালিত হলেও আমিই তার হৃদি-সন্নিবিষ্ট থেকে তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসি। যে যে-ভাবে ভজনা করুক আমি তার পূজা গ্রহণ করি। তবু তুমি নিজে আত্মাদ্বারা আত্মাকে উঠাবে। মৈত্র করুণ ও ভক্তিমান হয়ে নিত্য আমার সহিত যুক্ত থেকে ভজনা করবে। যুগে যুগে আমি ধার্ম্মিকের উদ্ধার, অধার্ম্মিকের ক্ষয় ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আসব।

কালে আবার ধর্ম্ম হল শুধু বাহ্য অনুষ্ঠান। ধনী নিজ মদগর্ব্বে বিরাট যজ্ঞ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। সে যজ্ঞে মন্ত্র শ্রদ্ধাহীন, কর্ম্ম প্রাণহীন। যজ্ঞে পশুবধ করে অনুষ্ঠাতার বা তার পিতার পাপ মোচনের চেষ্টা হয়। সাধারণ লোকে ধর্ম্মে পাটোয়ারী বুদ্ধিতে দেবতাকে মাংস খাইয়ে ইষ্টলাভ করতে চায়। সন্ন্যাসী অতি কৃচ্ছ্রসাধনে আত্মপীড়ন করে। দাম্ভিক ব্রাহ্মণের সেদিন অসীম প্রভুত্ব। অনেক ক্ষত্রিয় এই প্রভুত্বে বিশেষ অসন্তুষ্ট।

এ হেন যুগে মানুষের দুঃখে বিগলিত করুণহৃদয় সিদ্ধার্থ এলেন। কপিল শিষ্য বংশজাত কপিলা-বস্তুর এই রাজপুত্র মানুষের সহজ মুক্তিপথের জন্য কঠোর সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করে ধর্ম্মপ্রচার করলেন।

তিনি শেথালেন—কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করতেই হয়; বাহ্য ক্রিয়ায় তা হতে অব্যাহতি মিলে না। অষ্টাঙ্গ-সাধনে অবশ্যই দুঃখ-নিবৃত্তি হয়

কিন্তু তোমার নিজের তপস্যা নিজেকেই করতে হবে—"তুম্‌হেহি কিচ্চং আতপ্‌পং।" অলস নির্বীর্য্য ব্যক্তি জ্ঞানপথ পায় না—"কুসীদপঞ্‌ঞায় অলসো ন বিন্দতি।" ধর্ম্মপথে চল—"ধর্ম্মপীতী সুখং সেতি বিপ্‌পসন্নেন চেতসা"—ধর্ম্মপালনকারী প্রসন্নচিত্তে সুখে বাস করে। মিথ্যাবাদ, প্রাণী-হত্যা, সুরাপান, ব্যভিচার, লোভ, মোহ, অহংকার বর্জ্জন করিয়া শুচি হও। বাহ্য শুচিতায় ফল নেই—"কিং তে জটা হি দুমেধা কিং তে অজিন সাটিয়া

অভ্যন্তরং তে গহনং বাহিরং পরিমাজ্জসি॥"

জন্মের ফলে কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব মিলে না, ধর্ম্মপালনকারী ত্যাগীই শ্রেষ্ঠ। মোহ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত বেদপাঠ, যাগযজ্ঞ তপস্যা সবই বিড়ম্বনা। কৃচ্ছ্রসাধনায় মুক্তি নাই, ক্লিষ্ট দুর্ব্বল শরীরে ইন্দ্রিয় জয় হয় না, জ্ঞানার্জ্জনও হয় না পরন্তু অলীক চিন্তায় ও সংশয়ে সাধক আকুল হন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি দুর্ব্বলচিত্ত ও মনুষ্যত্বহীন হয়। মধ্যমার্গ অবলম্বন কর, দশশীল রক্ষা কর, সদ্ধর্ম্ম অবলম্বন কর, মৈত্রীময় চিত্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত কর, ধ্যানের পথে সুখ-নির্ব্বাণ লাভ হবে।

বৌদ্ধদের মধ্যে যে কোন জাতি শ্রমণ হলেই ব্রাহ্মণের সম্মান পেত। অন্য সকলের মধ্যে হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ রয়ে গেল। যে নূতন ব্রাহ্মণত্ব গড়ে উঠল তার আদর্শ—

"বারি পোক্‌খর পত্তের, আরগ্‌গেরিব সাসপো
যো ন লিপ্পতি কামেসু তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥"

যিনি কামনার বস্তুতে আসক্তিহীন হয়ে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় বা সূচ্যগ্রে সর্ষপের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

আবার সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তিও অতিশয় বাড়ল—

"মাতরং পিতরং হন্‌ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে
রট্‌ঠং সানুচরং হন্‌ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥"

বুদ্ধদেব নিজে তাঁর গেহকারকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তাঁর গৃহের সকল গ্রন্থি ভেঙেছে; গৃহকারকের সব কৌশল তিনি জেনেছেন আর নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ভয় নাই। কিন্তু এই গৃহ-কারকের কোনও কথা তিনি বলেন নাই। নৈতিক ভিত্তির উপর ধর্ম্মস্থাপন করা হল অথচ কোনও পুরুষ বা পুরুষোত্তম এই বিধির বিধানকর্ত্তা নহেন, এরূপ ভাবে—হৃদয়কে উপবাসী রেখে মস্তিষ্কের সাহায্যে চলা বেশীদিন যায় না। তাই সেই যুগেই "ললিতবিস্তরে" দেখি বুদ্ধকে অবতার করার চেষ্টা বা তার ইঙ্গিত—

* * * * "প্রতিকৃতী রুদ্রস্য কৃষ্ণস্য বা
শ্রীমান লক্ষণ চিত্রিতাঙ্গ অনঘো বুদ্ধোঽথবা স্যাদয়ং॥"

ইহার কাছাকাছি সময়ে বৈশালির আর একটি রাজপুত্র কর্ম্মকাণ্ডবিরোধী ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় এই জৈনধর্ম্মেরও মূলকথা অহিংসা, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য। এঁদের মত ভারত-দর্শনে বরাবর থাকবে।

এর কয়েক শত বর্ষ পরে প্যালেষ্টাইন্ প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মসংস্থাপনের দরকার হল। সেদিন গ্যালিলিতে এলেন Son of man. তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের দশশীল প্রভৃতি এবং অন্য সর্ব্ববিষয়ে অনুরূপ কথা। তৎসঙ্গে স্বর্গগত পিতার—প্রেমিক স্রষ্টার ও তাঁর প্রেমের কথা। তাই চিন্তাশীল খৃষ্টান (Mrs. Spier) লিখলেন, "It could be imagined that before God planted Christianity upon earth, he took a branch from the luxuriant tree and threw it down to India." আর একজন বিশপ লিখলেন "Most of the moral truths prescribed by the Gospel are to be met with in Buddhistic scriptures."

ভগবৎ কথার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মে আসিল ত্রিব্যূহ বা ত্রিত্ববাদ God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. ভারতের সমসাময়িক

বৈষ্ণবদর্শনে ছিল চতুর্ব্যূহ বাদ—"পরম কারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে। সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ পরব্রহ্মভাবে সতি।"

ইতিহাসে দেখি ভারতক্রমে খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যের নিত্যকলহে ক্লান্ত হল। মাৎস্যন্যায়, হিংসা আর নিষ্ঠুরতা চারদিকে। পঞ্চ বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্যদের মধ্যে উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদের সূচনা চলছে। এই বিতণ্ডার মধ্যে অপরূপ প্রেম, ভক্তির ছবি আঁকলেন ঋষি ভাগবতে। মানুষ যদি সাক্ষিগোপাল তাহ'লে তার অপূর্ণতার জন্য সে ক্লেশ ভোগ করবে কেন? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ", তা হলে অন্য সকলে তাঁকে খুঁজবে কেন? তিনি মঙ্গলময় ত দুঃখ কেন? এসব বিচার শেষ হয় এই প্রেমের সম্বন্ধে, কারণ তখন আর তিনি বিচারক ও শাস্তিদাতা থাকেন না এবং তাঁকে খোঁজবার নূতন প্রেরণা আসে, কাজেই সব বিতর্ক শেষ হয়।

আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কৃষ্ণকে যুগলরূপে ফুটিয়ে তুল্লেন। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়ে বিচার করেছেন, শৈব ও শাক্ত দিলেন অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ, এবার বৈষ্ণবও যুগলরূপ নিলেন। রাধাতত্ত্বে রাগমার্গের পথ প্রসার হল। স্রষ্টার সঙ্গে শাসক শাসিতের সম্পর্ক থেকে দয়িতের সম্পর্ক অতি মধুর ভাবে ফুটে উঠল।" রাই রূপে পেতে ফাঁদ ধরে নিব কালচাঁদ।" নারদ বল্লেন, ভক্তি—সা রাগাত্মিকা। কলিকালে এবার চতুষ্পাদ ধর্ম্ম একপাদ হলেন।

গোদাবরী তীরে দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এ তিনের অংশে অবতার হয়ে এলে দত্তাত্রেয়রূপে। দেখালে এ তিনের ছোট বড়র বিরোধ চলতে পারে না।

একদিন আবার সাধারণ লোকে স্রষ্টা যে 'শিবং সুন্দরং' তা ভুলে জড়বাদে বিপন্ন হল। অদ্ভুত অনৈসর্গিক পথে শক্তিলাভে চেষ্টিত হতে লাগল। তখন আবার তুমি দাক্ষিণাত্যে ভক্তির উচ্ছ্বাসের বিরাট প্লাবন আনলে। উত্তরে, দক্ষিণে বহু বৈষ্ণব ছিল, ভাগবতাদি গ্রন্থও অধীত হত, এবার ভক্তি-তরঙ্গ জীবন্ত হয়ে এল জামুন, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি রূপে। ভারতের ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রধানত দাক্ষিণাত্যের ধারা।

যে দিন পতিত বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদ, বামমার্গীর ব্যভিচার এবং কাপালিকের অত্যাচারে দেশ পীড়িত, সেদিন তাদের গতিরোধ করে বিশুদ্ধজ্ঞানে চেতনা সম্পাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান ও অদ্বৈতজ্ঞান প্রচার করতে তুমি এলে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যরূপে। তুমি স্মরণ করিয়ে দিলে আত্মজ্ঞান—"অহং ব্রহ্ম ন চান্যোস্মি"। এই সিংহনাদে পাপ, তাপ পালাল। "আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি" বাক্য পুস্তকে নিবদ্ধ ছিল। সাধকমাত্রের আত্মা ছড়াল বিশ্বে।

ভারতে সাধনের দুইটি ধারা। অসীমকে পেতে, তার উপলব্ধি করতে একদিকের পথ—আমিত্বের বিনাশ। নিজেকে শূন্য করে সমস্ত বস্তুর মধ্যে ভূমাকে, অসীমকে অনুভব করা, তার আস্বাদ পাওয়া—দ্বৈতবাদের পথ। আর বৈদিক ধারা অধিকাংশ স্থলেই আমিত্বের প্রসার। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"। ক্রমে ক্রমে অসীমে মিলে যাওয়া—বৈদান্তিকের পথ। এই দ্বিতীয়টি ভাল করে দেখালেন শঙ্কর। ভারতে ধর্ম্মের ধারা চিরদিন সন্ন্যাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর এই সন্ন্যাসীদের সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করলেন শঙ্করাচার্য্য।

তার পরের যুগে কিছুদিন দেখি নিয়মতান্ত্রিকতা। সন্ন্যাসীরা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন, পঞ্চোপাসনা তন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পণ্ডিতেরাও অধিকারীর রুচিভেদে উপাস্য দেবতার রূপ বিভিন্ন হওয়া উচিত একথা স্বীকার করে ধর্ম্মসমন্বয়ের ব্যবস্থা দিচ্ছেন।

আবার কোথাও দেখি আরোপ-সাধনের ভাব, ভাগবত, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নির্দ্দেশিত পথে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। রাণী মদালসার ন্যায় পুত্রে বাল-গোপালের সেবা 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ' বোধ; কুমারী কন্যায় গৌরী, তাকে সম্প্রদান করে গৌরীদান এবং জামাতারূপে শিবকে লাভ করা। বিবাহকালে শুভদৃষ্টিতে স্বামীতে শিবদৃষ্টি এবং স্ত্রীতে শক্তি-কল্পনা, সপ্তপদী গমনে সহস্রারে পৌঁছানর অভিনয়, প্রথম সন্তানের পর জায়াতে অন্য সম্বন্ধ স্থাপন প্রভৃতির উদ্দেশ্য সংসারকেই শিবের সংসার করা। পিতৃরূপে, মাতৃরূপে সেই চৈতন্যরূপে বিরাজিতের পূজা-চেষ্টা বিকশিত হয়ে উঠছে। এ সকলের ব্যবস্থা যাকে কবি-শ্রেষ্ঠের কথায়—"এ সংসারে হবে তব ধাম।"

বিবর্ত্তন কিন্তু সকল দিকেই চলে। মৎস্যেন্দ্র-নাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক সহজ যোগধর্ম্ম দেশময় ছড়াতে থাকেন—সে যোগ পতঞ্জলির কৈবল্য সাধনোপায় নহে, অনেক স্থলেই শক্তিবৃদ্ধি ও সুখবাদের সহায়। রাগমার্গ হতে সহজিয়া সম্প্রদায় এবং তাদের কীর্ত্তনে ভজন প্রভৃতি গড়ে উঠল। আবার কীর্ত্তনে সহজ মূর্চ্ছা, দেহতত্ত্ব এবং সুখবাদে এই পথ নামতে লাগল।

বীরভূম অঞ্চল ছিল তান্ত্রিক ও সহজিয়াদের একটি কেন্দ্র। এখানকার ভক্ত কবি জয়দেব ও পরে চণ্ডীদাস উভয়েই সহজিয়া এবং বিশুদ্ধ রাগমার্গের পথিক। এখানকার একটি তরঙ্গ এল নবদ্বীপে চৈতন্যলীলায় নিত্যানন্দরূপে।

ভারতের অন্য অন্য স্থানেও মুসলমানধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দাদু, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষ এসেছেন। কবির নিজেকে বলেছেন ভারত-পথিক।

বাংলায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের সময় পাঠান রাজত্বের শেষভাগে একদিকে মন্ত্রযান, সহজিয়া, তন্ত্র ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার সহিত দেবপূজা-বিরোধী এই নূতন মতের ঘাতপ্রতিঘাত ও অন্যদিকে জাতিচ্যুতের ধর্ম্মত্যাগ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতিতে সমাজ বিভ্রান্ত। সে দিন তাকে চালাতে বাংলার হৃদয় নবদ্বীপে এক নূতন রূপ প্রেমিকের আবির্ভাব হল। কাঙালের ঠাকুর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপ—সে যে ঘনীভূত কৃষ্ণপ্রেম। তাঁর প্রচারিত ভক্তির ধারায়, নূতন ভাবের বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেল। তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে কি কেহ পারে? তিনি যে বলেন, "জীবের দুঃখে আমার হিয়া ফাটিয়া যে যায়।" শেষপর্য্যন্ত বৌদ্ধমতাবলম্বী বলে সমাজে যারা পতিত ছিল, সেই সব নির্যাতিতেরা উঠে দাঁড়াল; তারা পবিত্র হয়ে নূতন সমাজে স্থান পেলে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতিরাও কৃপালাভে বঞ্চিত হল না।

অদ্বৈতবাদের বিকৃতরূপ নিয়ে যারা নিজের অহংকারকেই ব্রহ্ম করে তার রাজভোগ ব্যবস্থা করতেছিল, তারা ফিরল, উদ্ধার হল। দার্শনিক এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পেলেন নূতন চিন্তা ও প্রাণে আশা। কবি বলেন—"তাই শ্রীচরণে করি আমি বাস; বুকে যদি উঠি সখি পড়ি পড়ি ভয় হয়, চরণে নাহিক কোন ত্রাস।"

রাগমার্গের বিশুদ্ধরূপ দেখে, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা কাকে বলে জেনে, অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলার ধারণা পেয়ে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদীর দেহতত্ত্বের নামে ইন্দ্রিয়লালসা-চরিতার্থ ব্যাহত হল। সাধারণ মানুষ পেলে আত্মসমর্পণের আনন্দ। এই আনন্দ পরিণামে নয় প্রতিমুহূর্ত্তে; সেই প্রেমিক যে "চলে পায় পায়," সে যে "শয়ন দুপুর সময় জানি তপ্ত বালুতে ছিটায় পানি।" 'পতিতের ঠাকুর, দীনাতিদীন কিন্তু সুরু হল তাঁর দিগ্বিজয়। উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্র যোলআনা হিন্দু হলেন, তাঁর গুরু রায় রামানন্দ ত গলে গিয়েছেন। প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুনরায় বৌদ্ধ হলেও উড়িষ্যা

এখনও বৈষ্ণব। রায় রামানন্দের মুখ দিয়ে ঠাকুর বলালেন—"রসাভাস মহাভাব দুহুঁ একাকার।" উত্তর ভারত জয় হল, কবির বৃন্দাবন বাস্তবে স্থাপিত হল, দাক্ষিণাত্য জয় হল। এখনও গুজরাটে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বাংলার এই নবযুগে তন্ত্রের বামমার্গ সংশোধন করে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি শ্রুতিসম্মত দক্ষিণমার্গ-তন্ত্র প্রচার করেন। বাংলার উচ্চবর্ণ শাক্তের' তা সাদরে গ্রহণ করলে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আত্মার উদ্বোধন*

শ্রীসাহাজী

কংস। [দেবকীর সদ্যঃপ্রসূত শিশুকন্যাটিকে শিলাতলে নিক্ষেপপূর্বক হত্যা করিয়া]

হাঃ! হাঃ! হাঃ। হাঃ! এতদিনে
ঘুচিল সংশয়!
দেবকীর অষ্টগর্ভ করিয়া নিক্ষয়,
নিশ্চিন্ত নির্ভয় আমি নিষ্কণ্টক আজ!

দৈববাণী। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! নিষ্কণ্টক
তুমি, মহারাজ?
রে দুর্বৃত্ত নরাধম ত্রিলোক-কণ্টক!
ভাবিয়াছ, তুমি হ'বে ভবে নিষ্কণ্টক?
বিনাশি অষ্টম গর্ভ, মিথ্যা চিন্তা ত্যজ,—
বিনষ্ট সে দেবকীর অষ্টম গর্ভজ!
শিশুঘাতী, রে নির্লজ্জ ভীরু কাপুরুষ
ক্ষুদ্র-সত্ত্ব! দেখ ভাবি, কী তব পৌরুষ?
ছয়বার ছয় গর্ভ নাশিয়াছ, বীর।
ভাবিয়াছ, 'নাশিয়াছি গর্ভ দেবকীর'।
নহে, নহে দেবকীর! দিনু দিব্য আঁখি,
দেখ দেখি, কেবা তা'রা রহিয়াছে জাগি
অচঞ্চল-নেত্র-পাতে তব পানে চাহি—
ব্যথাহত ক্ষীণপ্রাণ,—কণ্ঠে ভাষা নাহি।
হাঃ! হাঃ! হাঃ। তোমারি পুত্র চিনেছ
কি তা'রা?
তুমিই তাদেরে বধি এ কী আত্ম-হারা?
মূর্খ তুমি যে দুর্বৃত্ত! চিত্ত অন্ধকার,—
জান না কি, বিশ্ব তব আত্মারি বিস্তার?
পর ভাবি পরেরে যে করে নিষ্পেষণ,
নিজেই নিজেরে জেনো, করে সে নিধন!
আঘাতের প্রতিঘাত কে রুধিবে, কহ?
তোরে যে বধিবে দুষ্ট! আসিছে সে রহ।

কংস। [অভিভূতের ন্যায়]

নহি কংস, কালনেমি, পুত্র ওরা মোর!

[পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া]

এ কী? কী হেরিনু এ? এ কী মায়া-ঘোর?
কে আমি, বুঝিতে নারি, ছায়া কিম্বা কায়া?

নারদ। মহামায়া মহারাজ, মহা-ঘোর মায়া।

* পুরাণে কথিত আছে, কংস পূর্বজন্মে কালনেমি ছিলেন এবং তৎকর্তৃক নিহত দেবকীর ছয়টি পুত্রও সেই জন্মে তাঁহারই পুত্র ছিলেন—হরিবংশ।

কংস। [ব্যস্ত সমস্ত হইয়া]
কহ দেব! শুনিনু যা', সে কি দৈববাণী,
কিম্বা, মোর অন্তরের গোপন সন্ধানী
কহিল, যা' স্বপনেও ভাবি নি ক আমি?

নারদ। বুঝিতে না পারি কিছু! হেন অনুমানি,
হোয়েছিল দেবকীর যমজ সন্তান!
কন্যাটি পেয়েছ তুমি, পাওনি সন্ধান,—
শুধু সর্ব সন্ধানের অতীত যে জন!
জন্মে নি যে, তারে খোঁজা মিথ্যা অকারণ!

কংস। এ কী, মুনি? কী কহিছ? শোন নি কি কভু,
কহিল যা দেবকীর—[ব্যস্ত সমস্ত হইয়া]
কন্যা সে কি প্রভু?

নারদ। কংস! অসুস্থ কি তুমি? বাতুল সমান
কী কহিছ, বুঝিতে না পারি মতিমান্?
ক্ষীণ-প্রাণা দেবকীর ক্ষুদ্র সে তনয়া
হের, ওই সে তোমার হোয়েছে অভয়া,—
গত-প্রাণা, চূর্ণ, ভগ্ন অঙ্গ শিলা-তলে।
চিনিতে কি পারিছ না ছিন্ন সে কমলে?

কংস। সত্য যা কহিছ, দেব! ছিন্ন শত-দল
রহিয়াছে পড়ি ওই চুম্বি শিলাতল!
নিঃশঙ্ক আজি এ কংস! কিন্তু? কিন্তু, মুনি!
প্রকৃতিস্থ ছিনু, কিম্বা হৈনু, কহ, শুনি?
জান, মুনি! দেবতারে নাহি মানি আমি,
তবু শুনি নিত্য নব হেন দৈব-বাণী?

নারদ। মনের খবর বৎস! পেয়েছ কি ঠিক?
দেবতা-বিশ্বাসী তুমি সবার অধিক,—
জানি আমি! তুমিও তা জান নিজ মনে;
মুখে শুধু নাহি মানো! তাই প্রাণপণে,
মনেরে মারিতে চাও মুখের দাপটে!
অসম্ভব! দেখ ভাবি চিত্তে অকপটে!

[কংস অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। পরম কারুণিক নারদ দুর্বৃত্তের এই ক্ষণিক চৈতন্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অপলক-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শাঙ্কর বেদান্ত

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

কবি কর্ণপূরের রচিত বলিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য নামে অপর একটী গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সমুদায় লীলা কাব্যাকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ষষ্ঠ সর্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণীরূপে ছন্দোবদ্ধ ভাবে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যেদ্যু কন্দদহিমাংশু সহস্র ভাস্বান্
ভূমৌ বসন্ করতল দ্বয়তালপূরৈঃ।
সর্ব্বা দিশঃ প্রতিরবোন্মুখরাঃ সমন্তাৎ
কুর্ব্বন্নুবাচ নিজপাদ পয়োজ ভক্তান্।

নবোদিত সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রায় দীপ্তিমান্ শ্রীগৌরাঙ্গ অন্য কোন দিন ভূমিতলে আসীন হইয়া দুই করতলে তালি দিতে দিতে দিকসমূহকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিধ্বনিতে মুখরিত করিয়া নিজ পাদপদ্মস্থিত ভক্তদিগকে বলিতে লাগিলেন।

ভোঃ পশ্য পশ্য ভুবি রোপিত মাত্রবীজং
চূতস্য পশ্য পুন রঙ্কুর এব জাতঃ।
পশ্যৈষ সম্প্রতি বভূব বিতস্তিমাত্রো
ভূয়োঽপি পশ্য বিটপোঽস্য বভূব শীঘ্রং॥

আহা দেখ দেখ—মাটীতে আমের বীজ রোপন করিলাম, আবার দেখ আমের অঙ্কুর উঠিল, আবার দেখ অঙ্কুর প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি

পাইল—দেখ, আবার চাহিয়া দেখ, সত্বরেই শাখা-প্রশাখায় বিটপীতে পরিণত হইল।

শাখা বভূবুরিহ পশ্য নিমেষ মাত্রাৎ
পশ্যাস্তু পল্লবচয়ঃ পরিতো বভূব।
পশ্যৈতদেব পরিপক্ক মভূদথাস্তু
পশ্যাভবদ্গ্রহণ মপ্যতি চিত্র মেতৎ॥

এই গাছ দেখিতে না-দেখিতে নিমেষমাত্রেই শাখা ও পল্লবে পূর্ণ হইল—আবার দেখ, ফলও পরিপক্ক হইয়া উঠিল, দেখ, গ্রহণ কর—এযে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁহার পদাশ্রিত ভক্তমণ্ডলীকে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার সম্বন্ধে বলিতেছেন যে,

বৃক্ষশ্চ সর্ব্ববিটপশ্চ ফলঞ্চ সর্ব্বং
মায়াকৃতং সকলমেব কুতোঽপি নাস্তি।
শৈলূষচেষ্টিতমিদং বিতথং যদেত
ত্তৎ প্রাপ্য বৈকৃতমনর্থকতাং প্রয়াতি॥

বৃক্ষ, শাখাসমূহ ও ফল সবই মায়াকৃত—এসব কিছুই নাই। ইহা সমস্তই মিথ্যা—ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল, কেননা অল্প সময়েই ইহা বিকৃত হইয়া বিলয় হইল।

এতত্তদপ্যমৃতমেব যদীশ্বরস্ত
কৌতুহলায় পুরতঃ কুরুতে জনৌঘঃ।
প্রাপ্নোতি সদ্বসন মৃক্থ মতি প্রকামং
মায়াকৃতেন চ ফলং লভতে বিচিত্রং॥

মনুষ্যেরা যদি শ্রীভগবানের সম্মুখে কৌতুহলের জন্য করে তাহা হইলে উত্তম বসন কাম্যমত যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে পারে কিন্তু মায়াবশীভূত হইয়া করিলে বিচিত্র ফল লাভ করিয়া থাকে।

এবং হি বিশ্বমখিলং বিতথং যদেত-
ন্নিম্পাস্ততে সততমীশ্বর সেবনায়।
তৎ সার্থকং ভবতি সম্যগসত্যমেতৎ
সত্য ভবেদশুচি যত্তদিদং শুচি স্যাৎ॥

এইরূপে যদি মিথ্যাময় লিখিত বিশ্ব সতত ঈশ্বরের সেবার্থে নিয়োজিত হয়—তাহা হইলে এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী অলীক সংসার সম্যক্‌রূপে সার্থক হইয়া থাকে। কারণ অশুচি বস্তু ঈশ্বরে অর্পিত হইলে পবিত্র হইয়া যায়।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, অলীক ও ইন্দ্রজাল, ইহাই শ্রীমহাপ্রভু প্রচার করিতেছেন। কালীপঞ্চকস্তোত্রে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে ইহা ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল—ইহা মনের কল্পনা।

"যস্ত্বেন্দ্রিয়া কল্পিত মিন্দ্রজালম্
চরাচরো ভাতি মনোবিলাসম্॥"

মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে বসিয়া বলিতেছেন যে "আধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ—এই জগতে এক আত্মাই বিদ্যমান এবং সৃষ্টি কালেও এক আত্মাই প্রকাশিত রহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে যথা—

অধ্যাত্মতত্ত্বমপি গৌরমহাপ্রভুঃ স
ব্যাখ্যাং চকার বহু দুর্গম বোধ মন্তৈঃ।
একোঽবশিষ্যত ইহা বিবতং স আত্মা
সৃষ্টৌ স এব পুনরেকক এব ভাতি॥

অনন্তর গৌর মহাপ্রভু অত্যন্ত দুর্গম অধ্যাত্মতত্ত্ব সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে এই জগতে এক আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন এবং সৃষ্টি কালেও সেই এক আত্মাই আবার দীপ্যমান রহিয়াছেন।

ইত্থং প্রসার্য্য স্বকরৌ করুণাসমুদ্রো
মুষ্টীচকার চ পুন র্দ্রুতমেব নৃত্যন্।
সচ্চিৎ স্বরূপমথ তত্ত্ব নিরূপণং তৎ-
ভূয়ো জগাদ জগদেকগতিঃ প্রকামং॥

এইরূপ জগতের একমাত্র গতি করুণা-পারাবার (শ্রীশ্রীমহাপ্রভু) নৃত্য করিতে করিতে ত্বরায় হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া আবার তাহা মুষ্টিবদ্ধ করিলেন এবং সচ্চিৎস্বরূপের তত্ত্বপথ নিরূপণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

ভাবোঽপি নিশ্চিত মনর্থক এব তস্য
সদ্রূপমেব সুধিয়া মবধারণীয়ং।
যদ্‌ব্রহ্মণো ভবতি নৈব কদাপি মুক্তি-
রেকেত্বমেতদববোধমৃতে হি সা স্যাৎ॥ ১১।৬৫

"ভাব অর্থাৎ উৎপত্তিশীল পদার্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের অনর্থস্বরূপ কিন্তু সুধীবৃন্দ ঐ সব পদার্থকেও ব্রহ্মরূপে অবধারণ করিয়া থাকেন, কারণ ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানব্যতীত কখনও মুক্তিলাভ হয় না।"—ইহার পর দৃষ্টান্ত দিয়া সকলকে মহাপ্রভু বুঝাইতেছেন যে—

পশ্যাঙ্গুলী করগতে পুনরেককস্য
সৈকোঽমৃতেন নিচিতাং পরিলোচিতাঙ্ক।
অন্যাং ব্রণেন গলতাতিতরামবদ্যাং
নো পশ্যতি ক্ষণমপি প্রকটং ঘৃণার্ত্তঃ॥ ১১।৬৬

দেখ, এক হাতের অঙ্গুলীতে একটী অমৃত নিষিক্ত, অপরটী গলিতকুষ্ঠগ্রস্ত কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ একটী অঙ্গুলীকে উচ্চ শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদরপূর্ব্বক দর্শন এবং অপরটীকে ক্ষণকালও ঘৃণার সহিত দেখে না। তিনি আরও বলিলেন—

ইত্থং স এক ইহ শেষপদং হ্যনাদি-
রাত্মা সদৈব পরিশিষ্যত এব মেধঃ।
সোপাধিরেব ভবতি প্রকটাত্নপাধে-
র্মুক্তো হ্যন্যথা ন খলু কশ্চিদপীহ জীবঃ॥ ১১।৬৭

এই সংসারে—সেই এক অনাদি আত্মাই নিশ্চিত শেষ পদবাচ্য। সোপাধিই প্রকটিত উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া নিরুপাধি অর্থাৎ নিগুর্ণ ব্রহ্ম বিরাজিত হন—নতুবা সেই সোপাধি ব্রহ্ম জীবব্যতীত আর কিছু নহে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত তত্ত্ব যাহা তিনি তাঁহার ভক্তদের নিকট বিচার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহা কবি কর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এখন উক্ত মহাকাব্যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পরে তিনি শ্রীনীলাচলধামে সার্ব্বভৌমের সহিত কি বিচার করিয়াছিলেন তাহা দেখা যাউক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে কবি কর্ণপুর দ্বাদশ সর্গে বলিতেছেন—

প্রবিশ্য সৎক্ষেত্রমদভ্রলীলঃ
শ্রীসার্ব্বভৌমালয়মাযযৌ সঃ।
আকস্মিকং বীক্ষ্য জগন্মনোজ্ঞং
সন্ন্যাসিনং সোঽথ ননন্দ বিপ্রঃ॥১

অনন্তর প্রভূত লীলাশালী তিনি (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) উত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম-আলয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ সেই জগন্মনোহর সন্ন্যাসীকে অকস্মাৎ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

তদনন্তর সার্ব্বভৌম গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তি-সহকারে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া উপবেশন করিবার জন্য উৎকৃষ্ট আসন দিলেন এবং প্রণাম করিয়া বিনীত-ভাবে ধীরে ধীরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য তাঁহার সঙ্গে সার্ব্বভৌম নিজ পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে তিনি কোন প্রকার ত্রুটী করেন নাই। পরে একদিন তিনি নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ—নবীন যৌবনের উদ্দামেই সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। এত শান্ত যে কোন কর্ম্মকেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। এই মহাত্মা অনেক প্রকার মহাপুরুষের চিহ্নাদি দ্বারা সুশোভিত এবং সকল জগজ্জনের মনোমুগ্ধ-কারী। ইনি এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মে কি করিয়া কাল কাটাইবেন? ইনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্তবংশে সমুদ্ভূত কিন্তু ইঁহার অত্যন্ত অল্প বয়স। পরিতাপের বিষয় এই যে ইহা কলিযুগ,—যতিধর্ম্মও অতি কঠিন ও কঠোর—একে কালপ্রভাবে অধর্ম্ম বলবান তাহাতে আবার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম। এক্ষেত্রে এই নবীন সন্ন্যাসী কি সহজে ইহা অতিক্রম করিতে পারিবেন? কিন্তু ইঁহাকে দেখিলে বোধ হয় ইনি

অত্যন্ত সুশান্তচিত্ত। নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যরসে এবং সমুজ্জ্বল জ্ঞানে একতান-চিত্তে মোক্ষপথের পথিক করিতে হইবে।" এদিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অন্তর্যামীরূপে সার্ব্বভৌমের হৃদ্‌গত-ভাব জ্ঞাত হইয়া প্রফুল্ল বদনে হাসিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পরিকর-ভক্তবৃন্দের সহিত সার্ব্ব-ভৌমের আলয়ে গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভক্তগণপরিবৃত নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া শিষ্যগণের সহিত স্বয়ং গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রণত হইলেন এবং সাদরে বিস্তৃত আসনে তাঁহাদের উপবেশন করাইয়া নিজে পৃথক আসন গ্রহণ করিলেন। কবি কর্ণপুর বলিতেছেন—

উবাচ বিপ্রো বিনয়েন নাথং
বেদান্ত এতৈঃ পরিপঠ্যতেঽত্র।
ভবাদৃশা যোগ্যতমাঃ শৃণুধ্বং
মনঃকষায়ো যত আশু যাতি ॥

ব্রাহ্মণ সবিনয়ে বলিলেন "প্রভু!—ইহাদের বেদান্ত অধ্যয়ন করাইতেছিলাম। আপনারা ঈদৃশ যোগ্যতম ব্যক্তি, শ্রবণ করুন—কারণ ইহা শুনিলে সত্বর মনের মলিনতা সত্বর চলিয়া যায়।

অধীতমধ্যাপিতমেতদুচ্চৈ-
রনেকশস্তৎ পুনরপ্য হমুষ্য।
প্রভোঃ সমীপে ধরণীসুরাগ্র্যো
বভূব সংপাঠয়িতুং প্রমত্তঃ ॥

"এই বেদান্ত-শাস্ত্র আমি স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াছি এবং শিষ্যগণের নিকট অনেকবার অধ্যাপনা করিয়াছি", এই বলিয়া সার্ব্বভৌম পুনরায় প্রমত্ত-ভাবে বেদান্ত অধ্যাপনায় নিরত হইলেন।

সাক্ষান্মহীগীষ্পতিরেষ চঞ্চৎ
প্রাগল্‌ভ্য সংযুক্তবচা যথাধি।
নির্বক্তি তত্ত্বৎ সনিশম্য নাথঃ
শনৈস্তদোদ্‌গ্রাহবিধিং চকার ।২২

ভূতলে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি (সার্ব্বভৌম) যথাবিহিত প্রগল্‌ভসংযুক্ত বাক্য বলিতেছেন; প্রভু নিঃশব্দে সেইগুলি শুনিয়া ধীরে ধীরে উদ্‌গ্রাহবিধিতে অর্থাৎ নিজ বক্তব্যের অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন—

কিমুচ্যতে কঃখলু পূর্ব্বপক্ষঃ
কিম্বাস্তু রাদ্ধান্তিত মাতনোষি।
বেদান্তশাস্ত্রস্য নচায়মর্থ—
স্তচ্ছ্রূয়তাং যত্তু নিরূপয়ামঃ ।২৩

অর্থাৎ—"আপনি কি বলিতেছেন? ইহার পূর্ব্ব-পক্ষই বা কি? কিম্বা সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন? যাহা বলিতেছেন তাহা বেদান্ত-শাস্ত্রের অর্থ নয়। আমি যাহা নিরূপণ করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।"

ইতস্য পক্ষপ্রতিপক্ষ রূপং
স্বপক্ষমেকং সতু সজ্জয়িত্বা।
অদ্বৈতবাদং বিনিবস্য ভক্তি-
সংস্থাপকং স্বীয়মতং জগাদ ॥২৪
ইত্থং প্রমাণৈ রখিলৈশ্চ শক্ত্যা
তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গৌণ্যা।
মুখ্যা জহৎস্বার্থ তদন্য মিশ্র-
স্বরূপয়া স্বস্মতমাবভাষে ॥২৫

অনন্তর তিনি ইহার পক্ষ-প্রতিপক্ষরূপে একটী স্বপক্ষ সাজাইয়া অদ্বৈতবাদ ভক্তি-সংস্থাপক স্বীয় মত বলিতে লাগিলেন। নিখিল শাস্ত্রের প্রমাণ-সমূহের দ্বারা তাৎপর্য্য, লক্ষণ, গৌণী, মুখ্যা, জহৎস্বার্থ এবং তাহা ছাড়া অন্য মিশ্রভাবে অর্থাৎ জহদজহৎস্বার্থ প্রভৃতি স্বরূপ বিচারে স্বীয়মত প্রকাশ করিলেন—

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈ-
র্নিরস্ত ধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষং।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা সচাশু-
স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ ।২৬

অনন্তর এইরূপ বিতণ্ডা ছল ও নিগ্রহাদিদ্বারা পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করিয়া স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্তবিদ্ প্রভুদ্বারা বিপ্র নিরস্ত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি

শ্যামপুকুরের বাড়ীর কথা

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ঠাকুর গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহিত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বাদানুবাদ ঘটাইয়া মধ্যে মধ্যে রহস্য দেখিতেন। বুদ্ধিমান ডাক্তার সরকার মহাশয় সহসা কোন সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ করিতে চাহিতেন না; কতকটা যেন আপনা হইতেই চাপিয়া যাইতেন। ফলে বাদানুবাদের দ্বারা কোন বিষয় মীমাংসা হওয়া সুকঠিন ছিল। অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের সর্ব্বমনোহারী প্রেম ও অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির বিচিত্র প্রকাশ দর্শনে ডাক্তার সরকার মহাশয়ের মনোভাবের অনেকটা যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তায় তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় না পাইলেও নানা ভাবে কতকটা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ঐ বৎসর ঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার সিমলার বসতবাটীতে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করেন। শুনিয়াছি, পূজার সঙ্কল্প কালে সহসা কোন বিঘ্ন ঘটায় অনেক দিন হইতে তাঁহাদের বাটীতে এই পূজা বন্ধ ছিল। সেই জন্য পরিবারবর্গের কেহ আর এই পূজা করিতে সাহসী হন নাই। হঠাৎ একবার মহামায়াকে বাটীতে আনিতে বড় ইচ্ছা হওয়ায় সুরেন বাবু সকলের অনভিমতে ঐ পূজায় ব্রতী হন এবং ঠাকুরকে জানাইয়া পূজার ব্যয়-ভারাদি সকলই নিজেই বহন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে মহামায়াকে তাঁহাদের সিমলাস্থ ভবনে আনয়ন করেন। মহামায়ার এই পূজার কথা পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন।

পূজার দুএকদিন পূর্ব্বেই পরিবারবর্গের কেহ কেহ সহসা পীড়িত হইয়া পড়ায় সুরেন্দ্র বাবুই যেন সেজন্য সকলের নিকট দোষী সাব্যস্ত হন। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া মহামায়ার পূজার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরের সকল ভক্ত এবং গুরুভ্রাতৃগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এ বিষয় সকল দিকে উৎসাহ থাকিলেও একটী কারণে তাঁহার মনে বড় ব্যথা ছিল। ইদানীং ঠাকুরের শরীর নিতান্ত অসুস্থ থাকায় এ পূজায় তাঁহার আসা ঘটিয়া উঠিবে না জানিয়া এত করিয়াও প্রাণে তেমন আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই।

সপ্তমী পূজার পর আজ মহাষ্টমী, শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুরের ভক্তগণ ভগবৎ আলাপনে ও নামগুণকীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দে কাটাইতেছিলেন। ডাক্তার সরকার মহাশয় নিত্য যেমন আসিয়া থাকেন, সেদিনও তেমনি বেলা প্রায় চারিটার সময় আসিয়া উপস্থিত হন। ডাক্তার সরকার মহাশয় স্বামীজি মহারাজের (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। স্বামীজি ভজন গাহিতে লাগিলেন, সম্মুখেই ঠাকুর উপবিষ্ট থাকিয়া সেই সকল ভজনাদির ভাবার্থ মধ্যে মধ্যে সরকার মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, কখনও বা নিজেও

সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই সময় ভক্তগণের ভিতর কয়েকজনকে ভাবাবেশে বাহ্য-চৈতন্ত হারাইতে দেখা গিয়াছিল। ডাক্তার সরকার মহাশয়ের অনৈক বন্ধুও সেদিন তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের ঐ সমাধি অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন কিরূপ হইতেছে ডাক্তার সরকার মহাশয় যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এবং সরকার মহাশয়ের সঙ্গীয় বন্ধুটীও ঠাকুরের অর্দ্ধউন্মীলিত চক্ষুদেশে অঙ্গুলি ঠেকাইয়া চক্ষু অমনি বুজিয়া যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ছাড়েন নাই। সম্পূর্ণ জীবিত অবস্থাতেও কেমন করিয়া যে এরূপ মৃতের ন্যায় অবস্থা মানুষে সম্ভব হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক বিচারে তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম না হওয়ায় উভয়েই সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া যান। বেলা চারিটার সময় ডাক্তার সরকার মহাশয় সেদিন আসেন, অথচ দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া যে সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল তাহা কেহ এতক্ষণ জানিতেও পারেন নাই। কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে সকলেই বিভোর হইয়াছিলেন। সমস্ত ঘরখানি যেন অনির্ব্বচনীয় দৈব প্রভায় জল্ জল্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া স্বামীজির মধুর ভজন-সঙ্গীতে মুগ্ধ থাকিবার পর সহসা ডাক্তার সরকার মহাশয়ের স্মরণে আসিল যে রাত্রি ক্রমশঃ বেশী হইয়া যাইতেছে। তখন স্বামীজিকে বিশেষ প্রীতিভরে আলিঙ্গনাদি করিয়া ও ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণান্তর যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিবামাত্র ঠাকুরও অমনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন ঠিক সন্ধিপূজার সময় বলিয়া সকলই বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য, ঠিক সন্ধিপূজার সময় না জানিয়াও ঠাকুর হঠাৎ আপনা হইতে সমাধিমগ্ন হইলেন!" প্রায় আধঘণ্টার পর সমাধি ভঙ্গ হইল। ডাক্তার সরকার ও তাঁহার সেই বন্ধুটী উভয়ই তখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে সেদিন ডাক্তার সরকার ঠাকুরের দিব্য প্রকৃতি ও দৈব-শক্তির পরিচয় লাভে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর সমাধি অবস্থায় যাহা দর্শন করিয়াছিলেন তাহা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করায় ও সেই বর্ণিত ঘটনাটী যে কতদূর বর্ণে বর্ণে সত্য—পরে আমরাও তাহা জানিতে পারিয়া যথেষ্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ঠাকুর বলিলেন, "এখান থেকে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলে গেল। দেখলাম, তার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হয়েছে, তৃতীয় নয়ন দিয়ে জ্যোতির রশ্মি নির্গত হচ্ছে, দালানের ভেতরে দেবীর সামনে প্রদীপমালা জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, আর উঠানে বসে সুরেন্দর ব্যাকুল হয়ে মা মা বলে কাঁদছে। তোমরা সকলে তার বাড়ীতে এখুনি যাও, তোমাদের দেখলেও তার প্রাণটা শীতল হবে।" এই কথার পর ভক্তগণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যান এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, ঠাকুর যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক্ ঐ সময় সত্যই তিনি প্রায় এক ঘণ্টা কাল মা মা বলিয়া ছেলেমানুষের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন—এবং ঠাকুর যেমন বলিয়াছিলেন প্রদীপাদিও ঠিক সেইভাবে জ্বালা হইয়াছিল, ঠাকুরের সমাধিকালের বর্ণিত ঘটনার সহিত সুরেন্দ্রবাবুর কথার সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। তখন সেই অল্প বয়সে এরূপ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। কেননা ইহার পূর্ব্বে কোন অলৌকিক শক্তির প্রতি আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না।

সেদিন ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে "child of nature" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, সাধারণ অন্য কোন বালকের পক্ষে হয়ত এই কথাটী

তেমন আনন্দ উপলব্ধিকর বলিয়া ঠেকিত না, কিন্তু আমার নিকট সেই কথাটী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এতদ্বারা আমি আমার অসাধারণত্বের পরিচয় দিতে চাই না, এ কথা বলার উদ্দেশ্য যে, মানুষমাত্রেই বিভিন্ন প্রকৃতির এবং যাহার যাহা প্রকৃতি তাহা তাহার জীবনের মূলগত বীজ। বয়সের তারতম্যে তাহার প্রকাশের বিভিন্নতা ঘটে কিন্তু তাহার মূলগত স্বরূপের বিলক্ষণতা কোথাও ঘটে না। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে এ সমস্ত ঘটনার সবিস্তর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমি যে ইহার পুনরুল্লেখ করিতেছি, ইহার কারণ এই বৈজ্ঞানিক যুগে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণিত সত্যের বাহিরের কোন শক্তিকে মানুষ আজ মানিতে চাহে না। যুগধর্ম্মেরও এমন আশ্চর্য্য মহিমা যে, যুগের মানুষের যেরূপ মানসিক অবস্থা, তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যেও ঠিক তাহারই প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের একটী সামান্য কথাদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। এই সকল অলৌকিক শক্তি বা বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার অবজ্ঞার ভাব তিনি ছোট একটী গল্পচ্ছলে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একজনের বড় ভাই অনেক দিন পূর্ব্বে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ী ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। পরে হঠাৎ একদিন সে তার ভাইয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তার ভাই বহুকাল পর তাকে পেয়ে খুব খুসী হয় এবং জিজ্ঞাসা করে, "হাঁা দাদা, বাড়ীঘর ত্যাগ করে এতদিন ধরে নানা কষ্ট সহ্য করে ঘুরে কি এমন লাভ করে এলে বল দিকিন্?" শুনে তার ভাই তখন বুক্ ফুলিয়ে বললে, "কি পেয়ে এলুম জানিস্, আমি ইচ্ছে করলে এখুনি নৌকো টৌকো বা কোন কিছুরই সাহায্য ছাড়া অনায়াসে এমনি পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে যেতে পারি।" তার ভাই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিল, সে তখন মুখখানা বেঁকিয়ে ঠাট্টার ছলে বল্লে, "বল কি দাদা, আরে ছ্যা, তবে ত ভারি কাজই করে এসেছ, ওত এক পয়সার মামলা।" এই উক্তির মধ্যে অলৌকিকতার বিরুদ্ধে ঠাকুরের অভিমত স্পষ্ট।

বিশ্বময়

শ্রীঅভীশ্বর সেন, বি-এ

তোমার রূপ দেখিতে পাই, যেদিকে আঁখি মেলি
নীল গগনে স্বর্ণ-প্রদীপ তুমিই রাখ জ্বালি'!
　তোমার রূপ সবুজ বনে,
　ছড়িয়ে আছে সকল খানে
আলোকময় বিশ্বভুবন, তোমারি রূপ ডালি!
তোমার গান গাহিয়া চলে বাদল মেঘদল!
সে গানে হয় মুগ্ধ জগৎ—পাগল নদীজল!
　পাখীরা ফেরে সে গান গাহি'
　ভ্রমর সারা সে সুর চাহি'
বিশ্ব হ'ল পাগল পারা—প্রাণ হ'ল নির্ম্মল!

জাগ্রত জাপান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

জাপানের ফুজিওয়ারা বংশ ৪০০ শত বৎসরের অধিককাল রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিল (৬৪৫—১০৫০)। নামেমাত্র রাজা 'ফুজিওয়ারার' ইঙ্গিতে পরিচালিত এবং বিলাস-ব্যসনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফুজিয়ারা বংশীয় কুরাম্বাকু এবং কর্ম্মচারিবৃন্দের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির উদ্ধত অপব্যবহার হইতে রেহাই পাইবার নিমিত্ত এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে বৌদ্ধ পুরোহিতকুলের হস্তক্ষেপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ম সম্রাট'কুয়াম্মু' (খৃঃ ৭৪২-৮০২) নারা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া কামো নদীর তীরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই নবনগরের নাম হইল 'হেইয়াঙ্কো' বা শান্তি নগর। শান্তিনগর স্থাপিত হইল বটে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না। ফুজিওয়ারা-প্রভুত্ব সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া সিংহাসনের অধিনায়কত্ব করিতে লাগিল এবং বৌদ্ধ পুরোহিতগণ এক বিরাট সঙ্ঘ নির্ম্মাণ করত শান্তিনগরকে ভগবান বুদ্ধের চরণতলে টানিয়া আনিলেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অতুল প্রভাবে শান্তিনগর শ্রী, ধী ও ঐশ্বর্য্যে নারাকেও অতিক্রম করিল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক গগনের ঘনঘটা অপসৃত হইল না। বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সহায়তায় ফুজিওয়ারা-পরিবার রাজা ও প্রজার প্রভু হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। পরিবর্ত্তিকালে এই নগরের নাম হইয়াছিল 'কিয়োটো' এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস রক্তলেখায় অভিরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

'কুয়াম্মু'র আমল হইতে প্রায় ৪০০ শত বৎসর কালকে 'হেইয়ান' যুগ বলা হয়। রাজধানী হেইয়াঙ্কোর নাম হইতে হেইয়ান যুগের নামকরণ হইয়াছিল। এই যুগে ফুজিওয়ারা-প্রভুত্ব চরমে উঠিয়াছিল এবং ফুজিওয়ারার অত্যাচার, অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতায় সম্রাটের ক্ষমতা এমন সঙ্কীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, হেইয়ান যুগের পঞ্চবিংশতিজন সম্রাটের মধ্যে দ্বাদশজন রাজতক্ত ত্যাগ করিয়া 'ইন্‌সেই' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অপর ত্রয়োদশজন নামেমাত্র রাজা হইয়া ফুজিওয়ারা-কুলের কৃপার পাত্ররূপে সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে "নিম্মিও" (৮৩৪—৮৫১) ছিলেন বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় অগ্রগণ্য। নানা মানবীয় সদগুণে ভূষিত এই উদারহৃদয় সম্রাটের অন্তঃকরণ দরিদ্র প্রজার অপার দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত থাকিত। প্রজার সর্ব্ববিধ সুখ সুবিধা এবং উন্নতির জন্ম তিনি যথাশক্তি রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি দীন-দুঃখীর সহায়ক ছিলেন, প্রজা সাধারণের দারিদ্র্য নিবারণার্থ কৃষিকার্য্যের উন্নতি প্রচেষ্টায় জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র ও দুঃখী প্রজার দুঃখ নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের উপর কর স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশেষগুণসম্পন্ন এই মহাপ্রাণ নৃপতির ক্রমপ্রতিষ্ঠা ফুজিওয়ারা-কুয়াম্বাকুর নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল; ফলে শিশু সম্রাট 'মন্টকু'-হস্তে সিংহাসন অর্পণ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হইলেন।

নারা যুগের ন্যায় হেইয়ান যুগেও বিভিন্নমুখী উন্নতির ধারা ক্রমবিকাশমান জাপজাতিকে নানা বিভূতিতে ভূষিত করিয়াছে। সাহিত্য এবং কলায় এই যুগে নারা-যুগের খর প্রবাহকে শুধু অব্যাহত রাখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অধিকতর বেগ সঞ্চার করিয়া জাপানের উষর ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। জাপান দেশটাই যেন একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কবিতা,—বিশ্বস্রষ্টার কণ্ঠনিঃসৃত হইয়া অপূর্ব্ব

শোভায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আর সেই অপার্থিব কাব্য-সম্পদ হেইয়ান-যুগের কবিকণ্ঠে সুরে ছন্দে বিকশিত হইয়া জাপানী নরনারীর ঘরে ঘরে পরিবেশিত হইয়াছে। জাপজাতি স্বভাবতঃই পুষ্পপ্রিয়, তাই যখন চেরিপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জাপানের বন উপবনকে সৌন্দর্য্য-সুষমায় পরিপূর্ণ করিত, সারা জাপানে একটা সহজ এবং স্বাভাবিক আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইত, ঠিক সেই সময়ে কাব্যপ্রিয় নৃপতি জাপানের কবিবৃন্দকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া কবিতার পুষ্পবৃষ্টি সুরু করিতেন। সেই কাব্য কুসুমাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্মটী যাহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিত তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্পণ করিয়া সম্মানিত করিতেন।

জাপানীদের মত সৌন্দর্য্যবিলাসী জাতি জগতে আর নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে এমন সংযত চিত্তে পূর্ণ করিয়া উপভোগ করিতে অন্য কোন জাতিই সমর্থ নহে। ভারতবাসী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে গিয়া সহজেই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, বিশ্বের রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে গিয়া 'রসো বৈ সঃ'র সন্ধানে আত্মহারা হইয়া পড়ে ; কিন্তু জাপান এমন সহজে এমন নিবিষ্ট চিত্তে প্রকৃতির রসরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে যে, তাহাতে ভোগের উন্মাদনা নাই, অস্বাভাবিক উত্তেজনা নাই, দ্রব্যসম্ভারের বাহুল্য নাই, আছে অনুদ্বেল চিত্তের অনাবিল আত্মপ্রসাদন। জাপান রসিক কিন্তু পেটুক নহে ; সেখানে আবেগ আছে কিন্তু আলোড়ন নাই। পাশ্চাত্য জাতির সৌন্দর্য্য-সাধনায় যে প্রগল্‌ভতা ও গৃধ্নুতা দৃষ্ট হয়, জাপানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। দুই চারিটী পত্রপুষ্পে গঠিত একটী অতি ক্ষুদ্র তোড়া জাপানের গৃহকে সৌন্দর্য্যদান করিতে এবং জাপানী মনকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ। এক গাদা ফুলকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া একটী সুবৃহৎ গুচ্ছ নির্ম্মাণ করিলেই যে কলার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, তাহা তাহারা অবগত নহে। বাছা বাছা সুগন্ধি ফুলকে সংগ্রহ করিয়া উগ্র গন্ধে গৃহাঙ্গন পূর্ণ করিতে পারিলেই যে পুষ্পগন্ধের সদ্ব্যবহার করা হইল, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। জাপানীরা বিলাসকে কলায় পরিণত করিয়া পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়াছে, উপভোগকে সাধনার সংযমে ভরিয়া তুলিয়াছে। হেইয়ান-যুগ হইতে জাপ-সভ্যতার এই স্তর বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিকশিত কুসুমস্তবকে নয়ন নিবিষ্ট করিয়া পুষ্পসৌন্দর্য্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে জাপানীরা এই সময়েই শিক্ষা করিয়াছে ; চন্দ্রমার অফুরন্ত কৌমুদী প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবাক্‌নেত্রে তাকাইয়া থাকিতে তাহারা এই সময়েই অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারা পুষ্পকে উপকরণ করিয়া ভোগের চরণে অর্ঘ্য দেয় না, বরং দেবত্ব দান করিয়া পুষ্প-ধ্যানে নিমগ্ন হয় ;—জ্যোৎস্নার কমনীয় প্রভায় পুলকিত হইয়া বিলাস ব্যসনে নিযুক্ত হয় না, বরং জ্যোৎস্নাকে অন্তরে আহ্বান করিয়া মহামহিমায় ভরিয়া তুলে। আজও জাপ-নরনারী পুষ্পশোভায় আত্মহারা, জ্যোৎস্নালোকে বিমোহিত। যখন চেরিপুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন সমগ্র জাপান আনন্দে মাতিয়া উঠে ; দলে দলে আপিস আদালত পরিত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া ছুটিয়া যায় পথের বাঁকে, নদীর ধারে, মন্দির প্রাঙ্গণে, চেরিপুষ্পের অপার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার নিমিত্ত। এই পুষ্পোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আপিস আদালত বন্ধ থাকে, স্কুল কলেজের ছুটি হয়। গাছে ফুল ফুটিলে আপিস আদালত, স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে, এমন অদ্ভুত কাহিনী আরব্য উপন্যাসের গল্পকথিকা যদি একবারও কল্পনা করিতে পারিতেন তবে হয়ত তাহাকে স্বীয় জীবন রক্ষার নিমিত্ত সহস্র নিশি জাগিয়া গল্পের জাল বুনিতে হইত না। যাহা

স্বপ্নের চেয়েও অসম্ভব, তাহাই জাপানে সত্য হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুষ্পকে এমন করিয়া সম্মান করিবার প্রথা পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই নাই, কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। জাপানের জনসাধারণ ধনী নহে, উপার্জ্জনও তাহাদের অধিক নহে—অবান্তর জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, তবু তাহারা খাদ্যের পয়সা বাঁচাইয়া পুষ্পক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন পুষ্পপ্রিয় জাতি দুনিয়ায় যার দ্বিতীয় নাই।

নৃত্যগীত, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি এইযুগে অপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সাহিত্য। এই যুগে জাপানের নিজস্ব ভাষা চীন-সাহিত্যের নিগড় ছিন্ন করিয়া সহজসৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাপানী নারী "মুরাসাকি শিকিবু"র অমর লেখনী-নিঃসৃত "জেঞ্জিমনোগেটারী" গ্রন্থের এবং "সেই-শোনাগন্"-লিখিত "মাকুরা-নো সোশি"নামক গ্রন্থের ভাষা ও ভাব জাপানী সাহিত্যের মুকুটমণিরূপে আজ পর্য্যন্ত জাপানের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তদানীন্তন কবিশ্রেষ্ঠ "জ্জুবাওকি"-সঙ্কলিত "কোকিনসু" গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০০ কবিতা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটী কবিতাই জাপানী ভাষায় লিখিত এবং মহান ভাবমাধুর্য্যে পূর্ণ 'জ্জুবাওকি'র স্বকীয় লেখনীপ্রসূত "টোসানিক্কি"-নামক গ্রন্থও জাপানী ভাষায় এক মহামূল্য বস্তু। সংক্ষেপে বলিতে গেলে "হেইয়ান-যুগ" জাপ-সভ্যতার অভিব্যক্তিপথে দ্বিতীয় স্তর। এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম এমন অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ পুরোহিতগণের শক্তি এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রাজ্যশাসন ব্যাপারেও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ধর্ম্মের-প্রভাব এবং ধর্ম্মযাজকের প্রভাব দুইটী বিভিন্ন বস্তু। ধর্ম্মের প্রভাবে রাজ্য সুশৃঙ্খলিত হইয়া দিব্য শ্রীতে মণ্ডিত হয়, আর ধর্ম্মযাজকের প্রভাবে ধর্ম্ম ও রাজনীতি উভয়ই অধঃপতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। য়ুরোপে পোপ-অনুশাসন যেমন সুখকর হয় নাই, জাপানেও তেমনি বৌদ্ধ পুরোহিতগণের হস্তক্ষেপ কোনরূপ দৃঢ়সংবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ নিজেদের সুখ সুবিধা এবং প্রতাপ-প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল রাখিতে সদা যত্নপর থাকিতেন। তাঁহারা যে ভূসম্পত্তি উপভোগ করিতেন তজ্জন্য কোন কর দিতে হইত না, বরং তাঁহারা ধর্ম্মের নামে প্রভূত কর আদায় করিতেন এবং যে সকল ব্যক্তি মন্দিরের নামে সম্পত্তি রেজেষ্টারী করিত তাহাদিগকেও কর হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইত। রাজকীয় ব্যাপারে ধর্ম্মযাজকের অপ্রতিহত প্রভাব রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল কিনা বলিতে চাহি না, তবে ইহাতে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক ও পুরোহিতগণের মধ্যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্যাগী ভগবান বুদ্ধের আদর্শ হইতে বিচলিত হইয়া তাঁহারা ক্রমশঃ ক্ষমতালুব্ধ, সুখপ্রিয় এবং ঐশ্বর্য্যবিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে যে জাপানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন তাহার বীজ এই হেইয়ান-যুগেই উপ্ত হইয়াছিল। কারণ সন্ন্যাসীর অর্থের প্রতি মমতা হইলে কলত্র জুটিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে সে পতনের শেষ কোথায় তাহা বলা কঠিন। সন্ন্যাসীর কঠোর আদর্শ হইতে যে এক চুল পড়িয়াছে, ভোগের বিপুল আকর্ষণ তাহাকে কোথায় টানিয়া আনিবে কে বলিতে পারে? অগ্রগমনের যেমন একটা প্রবল প্রেরণা আছে, পিছু হটিবারও তেমনি একটা বিপুল আকর্ষণ আছে। ত্যাগের শক্তি অপেক্ষা ভোগের প্রলোভন বড় কম নহে।

সাত্ত্বিক আহার

শশাংকশেখর দাস

এমন এক দিন ছিল, যখন ভারতের আকাশ যজ্ঞের স্বাহামন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠত, আর্য ঋষিদের হোমশিখায় ভারতগগন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত। যজ্ঞহবির ভাগ নিয়ে তখন দেবতাদের মধ্যে কলহবিবাদের অন্ত ছিল না। গরু ছিল রাজাদের একটি প্রধান সম্পত্তি। এই গোধন নিয়েও রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ বড় কম হয় নি।

সে সব দিন চলে গেলেও আজ পর্যন্ত ভারতের অস্থিমজ্জায় গব্যহীনং কুভোজনম্ কথাটি বর্তমান রয়েছে। ভারতের পূজাপার্বণ, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণভোজন কিছুই গব্য ভিন্ন হতে পারে না। এদেশের সর্বপ্রকার উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যই গব্য হতে অথবা গব্যমিশ্রিত হয়ে প্রস্তুত হয়।

তেল ঘি ছাড়া আমাদের রান্না হতে পারে না। প্রদেশ ভেদে সর্ষপ তেল, নারকেল তেল, তিল তেল, বাদাম তেল প্রভৃতি চলে। কোথাও কোথাও রেড়ির তেল ব্যবহার করতেও দেখা যায়। পার্বত্যজাতিদের মধ্যে কোথাও কোথাও রান্নায় জান্তব চর্বি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঘিয়ের প্রচলন সর্বত্র। ভারতবাসীমাত্রেই ঘিয়ের ভক্ত। গরিবেরা পর্যন্তও মাঝে মাঝে ঘি খাবার চেষ্টা করে থাকে।

কালের পরিবর্তনে আমাদের বৈদিক হবি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার সংবাদ আমরা অনেকেই রাখি না। এদেশ ধর্মের দেশ, এদেশে সাত্ত্বিক আহারের বড় মান, নিরামিষ আহারের ও হবিষ্যান্নের বড় প্রশংসা। বিলাতের নিরামিষাশীরা ডিম খান, এদেশের নিরামিষাশীরা দই দুধ ঘি মাখন খান।

আমাদের দেশের নিরামিষভোজীরা নিরামিষ আহার করিয়া শুধু যে গর্ব অনুভব করেন তা নয়, আমিষাশীদের মছলিখোর গোস্তখোর প্রভৃতি সম্মানিত সুমধুর আখ্যাদ্বারা আপ্যায়িতও করে থাকেন। কিন্তু ঘি মাখনের নামে তাঁরা কী বস্তু বাজার থেকে কিনে আনেন এবং পরমানন্দে আহার করেন, তা জানলে তাঁদের সে আনন্দ আর থাকবে না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন, নিকেল ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তেলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করলে তার ফলে তরল তেল ঘন হয়ে যায়। নিকেল তাতে শুধু ঘটকের কাজ করে, তেলের অঙ্গীভূত হয় না। এ আবিষ্কারের পর বহু বৈজ্ঞানিকের বহু গবেষণায় ঘন তেলের অনেক উন্নতি হয়েছে। পৃথিবীর ব্যবসা-ক্ষেত্রে এই ঘন তেল একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছে।

ইউরোপ এমেরিকার নানাস্থানে এখন এই ঘন-তেল তৈরী হচ্ছে। ব্যবসাক্ষেত্রে হল্যাণ্ড সকলের উপর স্থান অধিকার করেছে, ইংল্যাণ্ডও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। চর্বির দ্বারা এতদিন যেসব কাজ হত, আজকাল তার অধিকাংশই ঐ ঘন-তেল দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। উদ্ভিজ্জই হোক বা জান্তবই হোক, যে সব তেল এতদিন অতি নিকৃষ্ট বা অব্যবহার্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তাই এখন রূপান্তরিত হয়ে নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে যে-কোন তেলকে মাখনের মত কোমল, চর্বির মত ঘন, মোমের

মত বা তার চেয়েও শক্ত বস্তুতে পরিণত করা যায়। তেলের বর্ণ ও গন্ধ এই প্রক্রিয়ার পর বিশেষ আর থাকে না। দুর্গন্ধ মাছের তেল পর্যন্ত বর্ণহীন গন্ধহীন বস্তুতে পরিণত হয়ে আজকাল আমাদের জাতধর্ম রক্ষা করছে।

এই বস্তুটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় একবার প্রবাসীতে লিখেছিলেন, এই নূতন বস্তুর ব্যবহার অনেক বৎসর পূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকাতেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্বদা হা করিয়া আছে, বিলাতী বণিক্ যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—ভেজিটেবল প্রডাক্ট বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ব্যবসায়িগণ প্রচার করিলেন, ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্মহানি হয় না এবং পবিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—মহীরুহ, পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতের জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেলওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্বত্র এই বস্তু প্রচলিত হইতেছে এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরোসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজকাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধাআধি ইহা চলিতেছে। ধর্মভীরু ঘিওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে। এখন আর চর্বি ভেজাল দেবার দরকার নাই, মহীরুহ মার্কা মিশাইলেই চলে।

ইউরোপে মাখনের কাটতি খুব বেশি। গরিব লোকেরা খাঁটি মাখন কিনে খেতে পারে না। তাদের জন্য অল্পদামের মার্গারিন নামক এক প্রকার কৃত্রিম মাখন সেদেশে পাওয়া যায়। মার্গারিনের উপাদান ছিল, চর্বি, উদ্ভিজ্জ তেল, দুধ এবং অল্প মাত্রায় পিষ্ট গোস্তনের নির্যাস। গোস্তনের নির্যাস মেশানোতে মার্গারিনে মাখনের গন্ধ ও স্বাদ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। ভাল মার্গারিনে অল্প খাঁটি মাখনও মিশ্রিত থাকে। আজকাল যে মার্গারিন তৈরী হচ্ছে তাতে চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেল প্রায় থাকে না। তার পরিবর্তে মাখনের মত ঘন-তেল (ভেজিটেবল প্রডাক্ট) দেওয়া হচ্ছে। বাকি সব উপাদান ঠিক আছে। চকোলেট টফি প্রভৃতিতে আগে মাখন দেওয়া হত, আজকাল ঘনতেল চলছে।

যাঁরা পশুমাংস আহার করেন না, তাঁরা কখনো জ্ঞাতসারে চর্বিও আহার করেন না। আবার গোমাংসে যেমন হিন্দুর জাতি যায়, গরুর চর্বি আহার করলেও তেমনি জাতি যায়। মুসলমানদের কাছে শূকরমাংস যেমন হারাম, শূকর চর্বিও ঠিক তেমনি। ঘিয়ে ভেজাল হিসাবে চর্বির প্রচলন এক সময় খুব বেশি ছিল। কুকুর বিড়াল সাপ বাঘ গরু শূকর কোন প্রাণীর চর্বিই তাতে বাদ যায় না। কয়েক রকমের চর্বি আছে, ঘিয়ের দানার তারতম্য অনুসারে চর্বি মেশানো হয়। তারপর রং ও গাওয়া ঘিয়ের মত গন্ধ দ্রব্য মেশালেই একবারে খাঁটি গাওয়া ঘি হয়ে গেল। চর্বির চেয়ে ঘন-তেল সস্তা বলে আজকাল মার্কামারা খাঁটি গাওয়া ঘিতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘন-তেল (পচা মাছের নিরামিষ তেল!) মেশানো হয়।

সাবান প্রস্তুতের একটি প্রধান উপাদান চর্বি। চর্বি মেশালে সাবান শক্ত হয়, নারকেল তেলে প্রচুর ফেনা হয়। রেড়ি চিনাবাদাম প্রভৃতির সাবান নরম হয়। সাবানের প্রকার ভেদে তেলের সহিত পরিমাণমত চর্বি ও নারিকেল তেল মেশানো হয়। কাপড় বুনবার আগে সুতোয় যে মাড় দেওয়া হয়, চর্বি তার একটা প্রধান উপকরণ। তাঁতীরা

চর্বির পরিবর্তে নারকেল তেল ব্যবহার করে, কাপড়ের মিলগুলোতে চর্বিই ব্যবহৃত হয়।

লুচি কচুরি খাজা গজা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ঘিয়ের ময়ান দিতে হয়। তেলের ময়ানে তত ভাল হয় না। চর্বি দিলে ঘিয়ের চেয়েও ভাল হয়। বিলাতী বিস্কুটে এপর্যন্ত চর্বির ময়ানই দেওয়া হচ্ছে। এসব ছাড়া আরও অনেক কাজে চর্বি লাগে। তাই চর্বির ব্যবসা একটি মস্ত বড় ব্যবসা।

খাঁটি খাদ্য এদেশে আজকাল সত্যই দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুধে জল, আটা ময়দা প্রভৃতিতে পাথরের গুঁড়ো, মাখনে মার্গারিন, ঘিয়ে চর্বি ও ভেজিটেবল প্রডাক্‌ট। পাড়াগাঁয়ের গয়লাও আজ শিখে ফেলেছে দুধে জল মিশিয়ে তাতে একটু চিনি বা ময়দা মিশিয়ে দিলে দুধ পরীক্ষার কলে আর তা ধরে পড়ে না।

এদেশ ধর্মের দেশ। কথায় কথায় আমরা ধর্মের উচ্চ উচ্চ তত্ত্বের কথা বলি কিন্তু এভাবে খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে মানুষের সর্বনাশ করা ভারতের মত আর কোথাও নেই। আমাদের শেঠজির দৃঢ় বিশ্বাস ঘিয়ে যত চর্বিই মেশান না কেন, একটি ধর্মশালা বা পিঞ্জরাপোলে কিছু অর্থদান করলেই সব পাপ কেটে যাবে। পাপ ভি জোতো হোয় পুন্‌ভি তোত কামিয়ে লেন।

পূর্বপুরুষগণের সমুদয় গৌরব হারিয়ে পরম সতর্কতার সহিত আহার ও স্পর্শবিচার বাঁচিয়ে হিন্দুভারত এখনও কোন রকম বেঁচে আছে। অন্তত দেশের অধিকাংশ লোক এরকম মনে করেন। কোন বস্তুবিশেষ আহার করলে বা ব্যক্তিবিশেষকে স্পর্শ করলে অনেক হিন্দুরই জাত ধর্ম থাকে না। বর্তমান ভেজালের যুগে তাদের জাতধর্ম এতটুকুও অবশিষ্ট নেই, সেকথা না বললেও চলে। কতটুকু গোবর খেলে যে তাঁদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে, তা বোধহয় হিন্দুর কোন শাস্ত্রকারই বলতে পারবেন না।

যাঁরা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তত গোঁড়া নন, স্বাস্থ্যের উপকারিতাই যাঁরা খাদ্যাখাদ্য বিচারের চূড়ান্ত মনে করেন, তাঁরাও চর্বি অপেক্ষা বিশুদ্ধ ঘিকে বেশি পছন্দ করবেন। গরিব লোকেরা চর্বি মিশ্রিত ঘি খেতে পারেন, কিন্তু পচা মাছের তেল প্রভৃতি অব্যবহার্য বস্তু থেকে তৈরী নিরামিষ প্রডাক্‌টকে কখনও খাওয়া উচিত নয়।

এ প্রবন্ধের অধিকাংশ উপাদানই শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের লেখা ঘনীভূত তৈল নামক প্রবন্ধ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

সাঙ্গীতিকী

(পূর্বানুবৃত্তি)

দিলীপকুমার

সঙ্গীতে ভক্তিরসাত্মক গানের কথা বলতে মনে পড়ল কুমার শচীন্দ্র দেববর্মনের কথা। যেমন সুললিত কণ্ঠ, তেমনি সুকুমার ভাবভঙ্গি। আকৃতি চালচলন, ধরণধারণ সব কিছু থেকেই তাঁর অন্তরের সৌকুমার্য সৌগন্ধ্য বিকীর্ণ হ'তে থাকে। এঁর মুখে দুটি গান শুনে আমি সব চেয়ে আনন্দ পেয়েছি: "প্রিতম পিয়ারে বন্‌সিবারে আ জা কন্‌হৈয়া আ জা" ব'লে বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয়ের একটি হিন্দি গান এবং এই ছন্দেই "নবলকিশোর"-কে নিয়ে সুকবি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যের একটি বাংলা গান। এখানে এঁদের কথা বলবার আগে ভক্তিরসাত্মক গান সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

অনেকের ধারণা: ভক্তিরসাত্মক গানে মাতামাতি অশ্রূচ্ছ্বাস, দশা, শীৎকার, মাটিতে গড়াগড়ি, মূর্ছা, হরি হরি বোল্, এসবের প্রাবল্য না থাকলে সে গানকে ভক্তিপাংক্তেয় করা চলে না। কিন্তু এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নেই।

একথা সত্য যে, অনেক ভক্তিরসাত্মক গানেই এই ধরণের মাতামাতি হাহুতাশ খুব বেশি প্রকট হ'য়ে ওঠে। একথাও সত্য—(অস্বীকার করবার উপায় নেই, এ একটা ফ্যাক্ট ব'লে)—যে, যেসব গানে দশা, মূর্ছা, ধূল্যবলুণ্ঠন সেসব গানে ভক্তি যে একেবারেই থাকে না তাও নয়—যদিও খাঁটি জিনিষটি মেলে খুব কম ক্ষেত্রেই, প্রায়শই লোক-দেখানো ভক্তির জাহিরিপনা চড়াও হ'য়ে ওঠে। যাঁরা সত্যি ভক্ত এ-মন্তব্য তাঁদের স্পর্শও করবে না—তাঁরা চিরদিনই চিন্ময়মস্ত থাকবেন, কারণ নির্ভেজাল শরণব্রতী ভক্তের কাছে কে না মাথা নোয়াবে? আমার নিশানা হচ্ছে সেইসব নকল ভক্তি যারা আসলের মুখোষ প'রে শুধু আত্ম-বিজ্ঞপ্তির জোরে অকৃত্রিমের প্রাপ্য মর্যাদা পায়—তারা চায়ও যে এই মর্যাদাটুকুই—ভক্তির আত্মদান তো নয়। কিন্তু যেখানে ভক্তি সত্য সেখানেও অনেক সময়েই এই আতিশয্য ভক্তির অনাবিল আত্মপ্রকাশের সহায় না হ'য়ে বাধাই হ'য়ে দাঁড়ায়। অনেকেই ভুলে যান এই সাদা কথাটি যে, ভক্তির নির্যাস হ'ল নিঃশেষে আত্মদান—অভিমানবিলুপ্তি। ভক্তির এই আত্মবিলোপসাধনা বড় সহজ সাধনা নয়। আবেগের উচ্ছল ফেনিলতাই ভক্তির মর্মবাণী নয়—ভক্তির মর্মবাণী সম্বন্ধে ভগবান কৃষ্ণের গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্লোক কয়টি স্মরণীয়। ভক্ত কে বলতে তিনিও সংজ্ঞা দিচ্ছেন:

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

আর উদ্ধৃত করলাম না বাহুল্যভয়ে। এর পরে ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ শ্লোক কয়েকটিও এই সম্পর্কে প্রতি ভক্তিকামীর অবশ্য পঠনীয়। এ-থেকে পাওয়া যাবে সত্য ভক্তের অভিজ্ঞান কী কী। এখন ফিরে আসি।

বলেছি, ভক্তির সবচেয়ে বড় কথা হ'ল আত্ম-

সমর্পণ—self-surrender ও আত্মবিলোপ—self-effacement "মষ্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ—যে ভক্ত আমাকে তার মন ও বুদ্ধি সঁপে দিয়েছেন তিনিই আমার প্রিয়"—এই কথা বলেছেন অবতাররূপী স্বয়ং ভগবান্। এর উপর আর কথা কি?

কিন্তু যা বলছিলাম। যে-সব গানে ভক্তির ফেনিলতা অত্যধিক সেখানে প্রায়ই (যদিও নমস্য ব্যতিক্রম আছেই—মহাপুরুষ মহাত্মাদেরকে কোনো বিধানই স্পর্শ করতে পারে না) ভক্তির নামে emotionalism ওরফে আবেগবিলাস ভাববিলাস প্রশ্রয় পায়, ভক্তির এই যে আত্মসমাহিতির দিক্‌টা এইটেই থাকে পিছনে প'ড়ে, সাম্‌নে আসে শুধু ভক্তের আত্মবিজ্ঞপ্তিটুকু। গানের সময়ও মনে রাখতে হবে আদর্শটা কী?—"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" যে লোকের কাছে উদ্বেগের হেতু হয় না, লোকও যাকে উদ্বিগ্ন করে না—সেই হ'ল যথার্থ ভক্ত গায়ক। কিন্তু কত সময়েই কীর্তনাদিতে ঠিক উলটোটাই দেখা যায়—"প'ড়ে গেল প'ড়ে গেল—জল আন্ জল আন্—আহা, মুখে গ্যাঁজলা উঠছে গো! বাছা বাঁচবে তো?"—বলেন ভক্তিমতীরা। উদ্বেগের চরম। একে ভক্তি বলেন নি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্তিরও আদর্শ যে হবেই সৌন্দর্য, সুষমা—beauty, harmony. তিনি যে চিরসুন্দর, তাঁকে দেওয়া চাই শুধু আমাদের যা কিছু সুন্দর আছে—তবেই না তাঁর তর্পণ হবে। আমরা আর কী দিতে পারি—কণার কণা বেণুর বেণু আমরা? সঙ্গীতে বিশ্বরাজের পূজার জন্যে আতুর বিধুর আর কী করতে পারে তার প্রেমকে সুন্দর গানে সুন্দর তানে সুন্দর রঙে সুন্দর ভূষায় নিবেদন ক'রে দেওয়া ছাড়া? আর শুধু গানের বেলারই তো নয় জীবনের সব আরাধনার বেলায়ই সৌন্দর্যের এই যে আদর্শ, এই যে নিখুঁৎ হবার স্বপ্ন এভেই তো চিরসুন্দরের তর্পণ। সুন্দরের একজন বিশ্ব-বন্দিত পূজারী কবি কীটসের কথা স্মরণীয়:

> হিয়ার প্রেমের শুভ্র পুণ্যবাণী জানি আমি সার,
> তারি সত্য অঙ্গীকারি। সুন্দর অন্তর-কল্পনার
> অক্লান্ত পূজারী আমি: তার স্বপ্ন অর্ঘ্য দেয় যারে
> সৌন্দর্যের গন্ধদীপে—চিরন্তন সত্য গণি তারে।*

আমাদের জীবন আরাধনায় এ-সত্য আদর্শ হিসেবে চিরদিনই স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে কে না জানে? হিঁদু আর কিছু সম্বন্ধে সজাগ হোক না হোক মন্দিরটিকে ঝকমকে ক'রে রাখবেই। দেবতাকে যে-ভোগ দেবার সময়ে যথাসাধ্য সুন্দর ক'রেই নিবেদন করবে। স্নান না ক'রে পূজায় বসবে না। শুচিতা তার বিলাস নয়—অন্তরের গাঢ়তম তীব্রতম আকুতি।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সঙ্গীতে এ নীতির প্রায়ই অন্যথা দেখি। কীর্তনে অনেক খোলীদেরই লম্ফঝম্ফ অঙ্গভঙ্গি, কীর্তনী অনেকের মুখবিকৃতি, জুড়িদের ভগ্নস্বরে চীৎকার, অশ্রুর প্লাবন, মাতামাতি দাপাদাপি, করতালের কান-ঝালাপালা অট্টনাদ, এসবের কিছুকেই সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু দুঃখ এই যে, এ-ধরণের অসুন্দর নিবেদন সেই চিরসুন্দরকে করা অনুচিত এ ইশারা করলেও কীর্তনানুরাগীরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। বলেন, এ যে ভক্তি—বাইরের অনধিকারী একে কী বুঝবে? শিষ্টসমাজে ভক্তি যে অনাদৃত হয়েছে তার জন্যে এ ধরণের কুশ্রীতা কম দায়িক নয়।

কিন্তু কুশ্রী ব'লেই সত্য ভক্তি এ নয়। ভক্তি সত্যস্বরূপের একটি অপরূপ প্রকাশ। তাই

* "I am certain of nothing but of the holiness of the heart's affections, and the truth of imagination. What the imagination seizes as Beauty must be Truth"···· Keats

তাকে অনবদ্য হ'তেই হবে। শ্রীহীনতার ছায়াও তাকে যেন স্পর্শ না করে সত্য ভক্তেব হবে এই-ই অভীপ্সা। আবেগের উচ্ছ্বাসের দাপাদাপি মাতামাতি কোলাহল কলরব এ সবই হ'ল সত্যের অপলাপ—চিত্তবিকার থেকেই এব উদ্ভব। কে না জানেন স্বামী বিবেকানন্দ গানে এধরণের মাতামাতিকে অনুমোদন করতেন না। এ যে অসুন্দর।

কিন্তু শুধু অসুন্দরতা ছাড়া আবও একটা কারণ আছে যে-জন্যে তিনি ভক্তিপ্রমত্ততাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। সে কারণটি গভীবতব—আমার বর্তমান নিবন্ধের পক্ষে একটু অপ্রাসঙ্গিকও বটে। কাজেই তার শুধু উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হব।

বলেছি ভক্তির কেন্দ্রীয় আকুতি আত্মসমর্পণ। ভাব-আবিলতার মধ্যে দিয়ে এ-সমর্পণ অগ্রসব হ'তে বাধা পায়। স্বচ্ছ সংযত নির্মল আবেগ স্নিগ্ধ আবেশ এ-সমর্পণের সহায় কিন্তু সবরকম অতিচার ফেনিলতাই হয় অন্তরায় যেহেতু ওবা আনে কুজ্ঝটিকা, অন্ধতা। সাধক কৃষ্ণপ্রেম—ওরফে রোনাল্ড্ নিক্সন্—তাই আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে আবেগেব বেলায় বিশেষ ক'রে দেখতে হবে যেন সেটা আবেগ-বিহ্বলতা হ'য়ে না দাঁড়ায়—পূজ্যেব পূজা ছেড়ে আপনার আবেগের পূজাই শেষটায় না সর্বেসর্বা হ'য়ে ওঠে। One mustn't be led to worship of one's own emotions"

এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম আরো এইজন্যে যে ভক্তির গান শোনবার সময় আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গির ফোকাস প্রায়ই সরল থাকে না—বেঁকে-চুবে যায়। তাই ভক্তির গানে বাড়াবাড়িকেই আমরা ভক্তির গাঢ়তার পবিমাপক ব'লে মনে করি। কিন্তু গাঢ় ভক্তি হবে সংযতাবেগ কেন না সৌন্দর্যের একটা চির-আনুষঙ্গিক হ'ল সংযম —যদিও সংযমেরও বাড়াবাড়ি আছে—যার ফলে সেও অসরল হ'য়ে দাঁড়ায়—তাকে কাটখোট্টা লাগে—মনে হয় stiff, standoffish.

এবার ফিরে আসি কুমার শচীন্দ্র দেববর্মনের গানের প্রসঙ্গে। তাঁর মুখে ঐ ভক্তির গান দুটি আমাকে স্পর্শ করেছিল—কারণ তাঁর ঐ গান দুটিতে ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযম ও সুষমাবোধের সৌরভ। বিশেষ ক'রে সুকবি অজয় ভট্টাচার্যের কৃষ্ণ-কীর্তনটিতে। আশা করি এ শ্রেণীর গান তিনি আবো বেশি গাইবেন তথাকথিত সেন্টিমেণ্টাল প্রেমের গান না গেয়ে।

অজয় ভট্টাচার্যের আবো কয়েকটি ভক্তিরসাত্মক ও মিসটিক গান আমার খুবই ভাল লাগল। রেডিয়োতে আমি বলেছিলাম মাস দুই আগে যে তাঁর ভক্তির গান যে আমাদের অনেককে স্পর্শ কবে তাব একটা কারণ, তাঁর এসব গানে ফুটে ওঠে বড় একটা সুন্দর আবেগসংহতি ও উচ্ছ্বাসসংযম। কবিত্বেব সুষমাবোধ থেকে এসেছে এ-সংযম ও গাঢতা। এতে আরও আনন্দ হয় এই মনে করে যে কবি কীটসের কথা কত সত্য—যা সুন্দর তাই তো সত্য, যা সত্য তাই তো সুন্দর। যা হওয়া উচিত তা বাস্তব জীবনে হতে দেখলে মনটা ভ'রে ওঠেই। বাক্‌পরিমিতি আবেগগাঢতা অজয়চন্দ্রের মিসটিক ধবণেব গানকে পরম মনোহারিত্ব দিয়েছে। তাঁর একটি গানের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে দেখাই আমি কী বলতে চাইছি :

> "যে আমারে ডাক দিয়ে যায়
> পরাণ তারে নাহি জানে।
> আপন গড়া কতই নামে
> তারেই ডাকি আমার গানে।"

* * *

কী সুন্দর! আর ভক্তির দিয়ে কত সত্য—how true! যে চির-অজানাকে আমরা চিনি না সেই তো নিরন্তর প্রেমিক হৃদয়কে ডাক দেয় নিজে প্রেমের অন্তরলোকে আড়াল রচনা ক'রে। তাই

না তাকে কত নামেই ডাকি গানে, প্রার্থনায়, কাব্যে, ছন্দে, রেখায়, বর্ণে···ডেকে সাধ মেটে না ·· তবু ডাকি। শুধাই আপনাকে বারবারই :

(সে যে) হিয়া থেকে বাহির হ'য়ে

কেন ডাকে বাহির পানে ?"

ঐখানেই তো তার লুকোচুরি খেলার মজা! অন্তরতম বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তাই না বাইরের প্রতি জড়বস্তুও হ'য়ে ওঠে চিন্ময়—তারাও ডাকে, অন্তর্মুখী হয় বহির্মুখী কেন না অন্তরে যে নিহিত বাইরেও পড়ল তো তারই ছায়া, তারই গৌরাঙ্গের আভায় না সব কালোই হ'ল আলো।

অথচ তবু সে ধরা তো দেয় না দিল দিল · ঐ যায় মিলিয়ে, আর বিরহী হিয়া গায় :

"(সে যে) ফুলের মাঝে কাঁটার জ্বালা

ফুলের আশা কাঁটার মনে।"

অপূর্ব। ফুল হ'য়েও সে কাঁটার দুঃখ দেয়, অথচ কাঁটা হ'য়ে যে দুঃখ দিল তারও অন্তরে ফুলের আশা রইল ছেয়ে। তাই তো তার জন্যে হাজার ব্যথা পেলেও তাকেই চাই, না চেয়ে পারি কই, নিস্তার পাই কই ?—

"(তবে) জানতে গিয়ে হার মেনে যাই,

না জানিলে মন না মানে ?"

অজয়চন্দ্রের এ-হৃদয়স্পর্শী গানটির এত ক'রে উল্লেখ করলাম কেন বলি। এবার কলকাতায় গিয়ে একটা জিনিষ একেবারেই ভালো লাগে নি : গানের অতিলালিত্য, সেন্টিমেন্টাল ঝঙ্কার যাকে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গত আশ্বিনের বিচিত্রায় কটাক্ষ করেছেন "সখী ধরো ধরো" গোছের ভাষা ব'লে। তিনি ঠিকই বলেছেন : ওর জন্যে দায়ী বলি আমাদের চটুল প্রগল্ভ তরল গজলসুরের ও তাদের অপভ্রংশদের মেকি চটক সস্তা আড়ির মিষ্টতা। অত্যন্ত দুঃসহ এই সব ছেপ্‌লা গান গাওয়া। অথচ কত সুকুমারীকেই যে এ ধরণের গান গাইতে শুনলাম : এই অসার গজল ও ঠুনকো ভাটিয়ালি। গজল ভাটিয়ালির এ-ভঙ্গির মধ্যে মিষ্টতার উপাদান যে কিছুই নেই তা নয়। আছে, কিন্তু বড় সস্তা, তরল, রক্তহীন, অপল্কা। হৃদয়াবেগকে পণ্য করলে তবেই এ শ্রেণীর গান গ'ড়ে ওঠে। তাই এ-যুগে অজয়চন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক গানে আমি এত মুগ্ধ হয়েছিলাম। বিশেষ টকির গান শুনতে শুনতে যখন বিস্বাদে মন ভ'রে যেত তখন এ-শ্রেণীর গানে মিলত যে কী গভীর আনন্দ!

(আগামীবারে সমাপ্য)
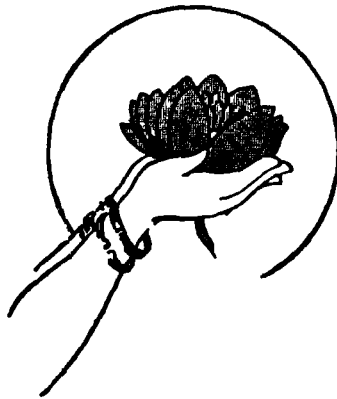
নেংটা কুকির দেশে

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

এক সময়ে মাসিক পত্রে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনীর সহিত নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন মানুষের ছবি দেখে ও সেই সব প্রবন্ধ পড়ে তাদের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জানাবার খুবই আগ্রহ হত। বহুদিন পরে সে সুযোগ আমার উপস্থিত হয়েছিল। আরাকানের একটি পার্ব্বত্য জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফের কাজে আমাকে প্রায় সাত আট মাস বাস করতে হয়েছিল। সে সময়ে ওখানকার লোকদের কাছে শুনতাম, উপরের পাহাড়ে নেংটাদের বাস। তারা নাকি খুব হিংস্র ও অসভ্য।

এখানে একটি কথা বলে রাখি, আমি যেখানে বাস করতাম, সে স্থানটি পাহাড়ী দেশ হলেও নবীন সভ্যতার আলোকরশ্মিতে সেখানকার সবাই আলোকিত ও পুলকিত। অফিস, স্কুল, মন্দির সবই রয়েছে। আকিয়াব সহর থেকে প্রত্যহই ষ্টিমার যাতায়াত করে। কাজেই এখানকার আরাকানীদের দেখে সেই নেংটাদের কথা ভাবা সম্ভব নয়। তবে কখন কখন্ দুচার জন সুস্থ সবল বিশালাকৃতি মানুষ যখন নেংটি পরে একেবারে খালি গায়ে একটা লম্বা দা হাতে নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক ভাবে এই ভদ্রলোকালয়ে এসে উপস্থিত হত, তাদের দেখে তখন সত্যিই মনে হয়েছে, উপরের পাহাড়ে নিশ্চয়ই নেংটা লোকের বাস রয়েছে।

সন্ধান করে জানলাম, প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে এখান হতে একটি ছোট ষ্টিমার অতি প্রত্যূষে যাত্রী ও সরকারী ডাক নিয়ে পার্ব্বত্য নদী বেয়ে উপরের দিকে পেলেটোয়া পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করে। ঐ পেলেটোয়াই হল পার্ব্বত্য জেলা। লুসাই পাহাড়ের সাথে পেলেটোয়ার পর্ব্বত শ্রেণীর অতি নিকট সম্বন্ধ।

সত্যিই আমি একদিন ভোর ছটায় সেই পেলেটোয়া-গামী ক্ষুদ্র ষ্টিমারে উঠে বসলাম। কয়েক মিনিট পরে ষ্টিমার তার শেষ সাড়া দিয়ে নঙ্গর তুলে দাঁড়াল। ষ্টিমারের প্রধান চালক সারেঙের ইঙ্গিত-ধ্বনি হওয়ামাত্র টুং টাং করে ঘণ্টা বেজে উঠবার সাথে ষ্টিমার গন্তব্য পথে ছুটে চলল। প্রভাতের সোনালি আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। পাখির কাকলি ও জনগণের কর্ম্মকোলাহল নিত্যকার মতই চলছে।

সারেঙ ও কেরাণীর সাথে আমার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। আদর যত্ন করতে তাঁরা কোনই ত্রুটি করলেন না। ষ্টিমারখানা অতি ছোট, সেই অনুপাতে যাত্রী বেশী, তাই পাশাপাশি বসে সবাইকে মিলেমিশে যেতে হয়। একটি ফাষ্ট ক্লাস এতে আছে, সেটি প্রায়ই সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য থাকে। আমি কোন মতে নিজের একটু জায়গা করে বসে পড়লাম। ষ্টিমারের নাম "কালাডোন্" আর এই পার্ব্বত্য নদীটিরও নাম "কালাডোনা।"

ষ্টিমার ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে নদীর উভয় তীর হতে যাত্রীদের আহ্বানে মাঝে মাঝে থামতে লাগল। ষ্টিমারের সাথে সর্ব্বদা একখানা ছোট নৌকা বাঁধা থাকে। সেই নৌকায় যাত্রীদের পার হতে নিয়ে আসা এবং নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ষ্টিমার দু-একটী বড় ঘাট ব্যতীত বড় থামে না। রাস্তায় যেখানে সেখানে লোক

ডাকলেই ষ্টীমার নদীর ভিতর দাঁড়িয়ে থেকে নৌকার সাহায্যে লোক উঠিয়ে নেয়, এ বড়ই সুন্দর ব্যবস্থা; এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। নদীর দুধারেই পাহাড়ের নীচু সমতলে ছোট ছোট গ্রাম, শস্যপূর্ণ ক্ষেত, মন্দিরের চূড়া এসব দেখতে পেলাম। আবার সমতলের গা ঘেঁসে কাল মেঘের মত সারি সারি বিশাল ঢেউখেলান পাহাড়গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও পাহাড়ের চূড়া হতে ধূম উদ্গীরণ হচ্ছে, কোনটা কুয়াসাচ্ছন্ন, কোথাও বা সূর্য্য-কিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে জল জল করছে। এ ভাবে ঘণ্টা দেড়েক এগিয়ে যাওয়ার পরই ধীরে ধীরে নদীর উভয় পার্শ্বের সমতল ভূমি আর দেখতে পাচ্ছি না। দুধারে শুধু প্রাচীরসদৃশ দৈত্যের মত উঁচু পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে, মাঝ দিয়ে প্রবল বেগে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। নদীর জলের খরস্রোত আমাদের বিপরীতদিকে ছুটেছে, তাই ষ্টীমারখানি তার প্রাণপণ শক্তিতে অতি কষ্টে উপরের দিকে উঠছে। নদীটীও তেমন প্রশস্ত নয়। যারা গৌহাটি হতে মটরে চৌষট্টি মাইল শিলঙ পাহাড়ে উঠেছেন, তাঁরাই আমার কথার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। আমাদের ষ্টীমারখানা জলপথে সেরূপ এঁকে বেঁকে উপরের দিকে উঠতে লাগল, কারণ উভয় পার্শ্বে উঁচু পাহাড়ের সারি। জলের নীচেও ডুবু-পাহাড়, কাজেই অতি সন্তর্পণে যেতে হচ্ছে। একটী আঘাতেই জাহাজ নষ্ট হবার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রমেই নদীটী আরো এঁকে বেঁকে চলেছে ষ্টীমারকেও সেভাবে যেতে হচ্ছে। এখন আর গ্রাম দেখতে পাচ্ছি না, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তাতে আবার নির্ব্বাক বনানীর শ্যামল শোভা, কত যে ছোট বড় গাছ, লতা শাল, সেগুন অর্জ্জুন, বেতস্, বাঁশ, আরো কতরকম না-জানা গাছ ও লতা সুসজ্জিত এক বনানীকুঞ্জ তৈরি হয়ে আছে, কোথাওবা লতাবীথিকার আভরণহীন শুষ্কগাত্র পাহাড় আমাদের ষ্টীমারের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও জলমধ্যে হস্তী-পৃষ্ঠবৎ শিলাখণ্ড ভেসে আছে। শুনলাম, এসব নিবিড় অরণ্যময় পাহাড়ে বন্যহাতী, হরিণ, বাঘ; ভালুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বদাই স্বাধীন ভাবে চরে বেড়ায়। এ দিক্‌কার পাহাড়গুলোতে ভয়াবহ নিস্তব্ধতার সাথে একটা কমনীয়তাও ফুটে রয়েছে। ষ্টীমারের সারেঙ অতি দূরে নির্দ্দেশ করে আমায় দেখাতে লাগল, আরো উপরের পাহাড়ের মাঝে মাঝে এক এক স্থানে চারপাঁচখানা মাচা বাঁধা ছোট ছোট উঁচু ঘর। উহাতেই নাকি নেংটাদের বাস, ঐসব তাদের পল্লী। ঐ ঘরগুলো দেখে আমার খুব আনন্দ ও আগ্রহই হল। ভাবতে লাগলাম, অতদূর পর্ব্বত হতে তারা কিভাবে নীচে আসে, কি সাহসেই বা হিংস্র জন্তুর মধ্যে নির্ভয়ে বাস করে, কেমন করে একাকী তাদের এই কঠোর বিচিত্র জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইত্যাদি। ষ্টীমারের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম বেলা একটা বেজে গেছে। চলতি পথে প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখতে দেখতে মন প্রাণ এতই তন্ময় হয়েছিল যে, এ পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় নাই। প্রায় দেড়টায় আমাদের ষ্টীমার এসে এ পার্ব্বত্য পথে একটী ষ্টেসনে উপস্থিত হল। ষ্টেসনের নাম "মেওয়া"। এখানে সরকারী বনবিভাগের অফিস, ডাকবাঙ্গলা, সাময়িক পোষ্টাফিস্ আছে। এখান হতে এখনও চিঠি বিলি করা হয় না অর্থাৎ এদের সুসভ্য করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আরও শুনলাম, একটী প্রাইমারী স্কুলও নাকি খোলা হয়েছে, এটি একটী বড় রকমের গ্রাম, আর এই গ্রামটীই হল আকিয়াব জেলার শেষসীমা। এর পর হতে পার্ব্বত্য জেলা আরম্ভ হয়েছে, তাই এখানে ষ্টীমার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঐ কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার দুচার জন লোক নীচের দিকে

অফিস্ আদালতে কখন কখন যায়, তাই ওখানকার লোকদের দেখে এরা পোষাক পরিচ্ছদে অনেটা ভদ্র সভ্য হয়েছে। ষ্টিমার থামামাত্র অনেক পাহাড়ী ছুটে আসে সহরবাসীদের দেখবার জন্য এবং দূরে দাঁড়িয়ে আপন ভাষায় কি যেন বলে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে।

আমাদের ষ্টিমার তার বিদায়সূচক মর্ম্মভেদী বাঁশী বাজিয়ে একটু পরেই ছেড়ে চলল। এই ষ্টেসন হতে দুচারজন যাত্রিও উপরের দিকে যাবার জন্য উঠল। এখান থেকে আমরা আরও নিবিড় ঘন বনময় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নদীপথে চলেছি। যেদিকেই চাইছি শুধু আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের সারি চারদিক ঘিরে আছে, আর কিছুই নাই। নয়ন-মনের সামনে প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর রূপটী ভেসে ওঠে।

দেখতে দেখতে আবার কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর, উচ্চ পর্ব্বত শিখরে দুচারখানা ঘর দেখতে পেলাম। এবার ষ্টিমারের কেরাণীর সঙ্গে আলাপ হতে লাগল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা শেষষ্টেসন "পেলেটোয়া"য় পৌছাব। আমি তাকে 'পেলেটোয়া' সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। সে বলতে লাগল, সেখানে গভর্ণমেণ্টের একটি পার্ব্বত্য জেলা, একজন ডেপুটি কমিশনার ও কতক রক্ষী পুলিশ রয়েছে। বিচারালয় ও জেলখানাও আছে। পূর্ব্বে এদেশ শাসনও সংরক্ষণ করবার জন্য অনেক সৈন্যও এসেছিল। কিন্তু শাসন করবে কাদের? এই পাহাড়ী নেংটা-দের সাথে দেখাশুনাত হয়ই না, তারা দূরে—অতি দূরে উঁচু পাহাড় শিয়রে স্বাধীন ভাবে বাস করে, তারা কারও শাসনে বাধ্য নয়, কোথাও কিছু অসুবিধা বোধ করলে অপর পাহাড়ে চলে যায়। কাজেই এদের দেখা পাওয়া বড়ই মুস্কিল। এসব কারণে সরকারী রাজস্বও তেমন আদায় হয় না। তাই সৈন্যদলকে বিদায় দিয়ে শুধু রক্ষী পুলিসবাহিনী রাখা হয়েছে। বনবিভাগের কর বেশ আদায় হয় এবং নানা উপায়ে নেংটাদের শাসন-শৃঙ্খলায় আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এদের যেসব খুব সখের জিনিষ, সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করে প্রতিবৎসর নানারূপ উৎসব আমোদের ভিতর দিয়ে এদের বশে আনবার অনেক চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাতেও কোন আশাপ্রদ ফললাভ হয়নি। কখন কখন দেখা যায়, কোন দরকারী জিনিষের জন্য উপর হতে পাহাড়ী নেংটারদল নীচে বাজারে নেমে আসে। এখানে একটি বাজার আছে, দোকানীরা বাঙলা বিহার ও নানা স্থানের অধিবাসী। সরকার হতে বিশেষ সুবিধা করে দেবার চুক্তিতে এরা এখানে দোকান করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য এখানে একটি ছোটখাট সহর গড়ে পাহাড়ীদের নিকট রাজসম্মানের দাবী করে রাজস্ব আদায় ও তাদের সুসভ্য করা। ডাকবাংলা পোষ্ট অফিস, প্রাইমারী স্কুল সবই আছে। ষ্টেসনটি দেখতে বেশ, পাহাড়ের একেবারে নীচে নদীর ধারে, আর এই সহরটি হল পাহাড়ের উপর। ষ্টিমার হতে কিছু দেখা যায় না। উপর হতে অতি ক্ষুদ্রকায় এই ষ্টিমারটী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেরাণী আরও বললে যে, কোন বিদেশীলোক এখানে এলে ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী একজন পুলিস তার নাম ধাম ঠিকানা, কি উদ্দেশ্যে আসা, কবে যাওয়া হবে, কত টাকা সঙ্গে আছে, এসব লিখে পরে সহরে প্রবেশ করতে দেয়। আর সৌভাগ্যক্রমে কোন সন্দেহ জাগলে তৎক্ষণাৎ বের করে দেয়। কোন ওজর আপত্তি কারও শোনে না।

আমি এসব রহস্যজনক কথা শুনতে শুনতে চলেছি। মনে ভাবলাম, পেলেটোয়া ষ্টেসনের পূর্ব্বে কোথাও নামলে এ হাঙ্গাম হয়ত হত না। অবশ্য দুচারটি ঠিকানা আমি জোগাড় করে সঙ্গে এনেছি। বাঙলা দেশের দুচারজন লোক সরকারের অনুমতি নিয়ে বহুদিন হতে এসব পাহাড় অঞ্চলের নানা স্থানে ব্যবসা করে বেশ দুপয়সা উপায়

করছেন। এদের কোন দোকানে যেতে পারলেই আমার আর কোন গোলে পড়তে হবে না, অথচ সব আশা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এই ভেবে কেরাণীকে একটা ঠিকানা দেখালাম—অমনি সে অদূরে একটি পাহাড়ের উপরে একখানি টিনের ঘর দেখিয়ে বললে, ঐ সেই দোকান। আমি ওখানে নামবার প্রস্তাব করতেই, কিছুক্ষণ পরে আমাকে এই অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে নামিয়ে দিয়ে ষ্টিমার চলে গেল। এক চিন্তা দূর হল বটে, কিন্তু এই স্থানটী অপরিচিত বলে, আর এক সমস্যার উদয় হল। আমি ষ্টিমার হতে নেমে অতি কষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে কোন রকমে উপরের দোকানে এসে উপস্থিত হলাম। অল্প সময়েই দোকানীর ভদ্র ব্যবহার ও আদর আপ্যায়নে খুশি হলাম। আমিও তাঁদের নিকট আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। একটু আলাপেই দোকানী আমার খুব আপনার-জন হয়ে গেলেন। আধঘণ্টার ভিতর তিনি আমার খাবার যোগাড় করে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনার এদেশে যা দেখবার তা এখান হতেই দেখতে পারবেন, কারণ আমাদেরই দোকানে এখানকার বহু দূর দূর প্রায় আট দশটি পাহাড়ের লোক জিনিষপত্র কিনতে আসে। আশে পাশেও অনেক পাড়া রয়েছে।' আমি আহার শেষ করতে করতে তার কথা শুনলাম, পরে দোকানের যেখানে বেচা কেনা হয় সেখানে এসে বসলাম। একটু বাদেই দেখি একদল লোক মেয়ে পুরুষ শিশু নির্ভীক নিঃসঙ্কোচভাবে এসে দোকানে প্রবেশ করলে। আমি প্রথমেই আমার অতি কাছে এদের দেখে মুখ ফিরিয়ে বসলাম, কারণ মানুষ যে এভাবে লজ্জা না করে লোক সমক্ষে চলা ফেরা করতে পারে, এ আমার ধারণাও ছিল না। পুরুষ যারা তারা ছয় সাত অঙ্গুলি প্রস্থ কাল কাপড়ের একখানি টুকরা কোমরে কৌপীনের মত ঝুলিয়ে লজ্জা নিবারণ করছে, আর মেয়েরা কোমরের নীচে ঐ প্রকার আধহাত আন্দাজ কাপড় জড়িয়ে রেখেছে, সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত। ছেলেরা সব নেংটা অথচ এদের এতে লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুই নেই, বেশ স্বাভাবিক সরল ভাবে হাসি তামাসা করতে করতে তাদের জিনিষপত্র কিনে বাড়ী ফিরে গেল। আমি দোকানীকে এদের কথা জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাষায় এরা কথা বলে? তিনি বললেন, এরা মগ নয়, কুকি, এদের ভাষাও ভিন্ন, তবে এদের ভেতর দুচারজন মগভাষা জানে। দোকানী আবার বললেন, 'আরও দুচারদিন এখানে বাস করলেই সব বুঝতে ও দেখতে পাবেন। এখানেই আরো একটি পাহাড়ী জাতি আছে, তারা হল মুরুং, কুকিদের সাথে তাদের তফাৎ দেখলেই বুঝবেন।'

এইভাবে দোকানীর সাথে অনেক কথা হতে লাগল, সেই অবসরে যেন সূর্য্যদেব পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার মৌন আঁধার নিবিড় হয়ে নেমে এল পৃথিবীর বুকে। পাহাড়ী পল্লীগুলি একেবারে নীরব নিঝুম আঁধারে ছেয়ে গেল। আমরা শুধু দোকানে একটি জোনাকির মত বাতি জেলে গল্প জুড়ে দিলাম, মাঝে মাঝে এই স্তব্ধতা ভেদ করে দূর হতে ঝিল্লীরব ভেসে আসছে। আমিও ক্লান্ত শরীরে শয্যা গ্রহণ করলাম। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ভয়ানক শীত বোধ হতে লাগল, কাপড় জামা কম্বল ভাল করে শরীরে জড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তাতে কিছুই হল না। সব যেন জলে ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দোকানী আমার অবস্থা বুঝতে পেরে অমনি উঠে খানিকটা আগুন জেলে তার সামনে বসে আমায় আরাম করতে বললে। সত্যিই এতে শীতের জড়তা অনেকটা কমে গেল।

পরদিন আটটার পূর্ব্বে আর সূর্য্যদেবকে দেখতে পাওয়া গেল না, সূর্য্য উঠার সাথেই তার সোনালি আলো ছড়িয়ে গেল পাহাড়ের মাথায় মাথায়। চিরগম্ভীর পাহাড়ে নীরবতা ভঙ্গ করে

দু চারটি পাহাড়ী পাখির কলকাকলিও ভেসে আসছিল। একটু পরেই দলে দলে পাহাড়ী কুকির দল দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। সবাই বহুদূর হতে জিনিষপত্র কিনতে এসেছে। স্ত্রী-পুরুষ-বালক এদের কারো কারো পোষাক গতকল্য যাদের দেখেছিলাম তাদের মতই, আবার কয়েক দলকে দেখলাম, গাছের পাতা গেঁথে কোমরে খানিকটা ঝুলিয়ে রেখেছে, সর্ব্বাঙ্গ একেবারে শূন্য। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐরূপ কিন্তু শরীর সুস্থ সবল হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান, খুব উঁচুও নয় বেটেও নয়, মাঝামাঝি চেহারা। প্রথমত আমি এদের ঐ উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখে সঙ্কোচে নিজেই লজ্জিত হতাম, কিন্তু এভাবে এদের নিঃসঙ্কোচ নির্ভীক স্বাভাবিক সরল বাক্যালাপ ও কার্য্যকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দোকানী আমাকে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা আমায় সশ্রদ্ধ ভূলুণ্ঠিত প্রণতি জানিয়ে তাদের পাড়ায় যাবার জন্য অনুরোধ করলে। আমি এদের সরল প্রাণের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না, আনন্দে সম্মতি জানালাম। এরা নেংটা অবস্থাতেই সর্ব্বদা থাকে। সবার সঙ্গে একখানি দা আছেই, এটি হল এদের নিত্যকার প্রিয় সাথি, এদের জীবন খুব কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু। সাধারণত এরা পাহাড়ে বাঁশ গাছ ও বেত কাটে এবং তাহা নীচের লোকদের নিকট বিক্রয় করে অথবা পাহাড়ের গায় ধান, তুলো, তিল, কুমড়া, শশা, কলা, নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করে জীবিকানির্ব্বাহ করে। এইসব জিনিষ ঐ পাহাড়ী দোকানে বদল করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যায়। এদের মাথার সাথে দড়ি দিয়ে জড়ান লম্বা একটা টুকরি বা ঝুড়ি বাঁধা থাকে, তাতেকরে সবাই প্রায় একমণ দেড়মণ জিনিষ নিয়ে এ দুর্গম পার্ব্বত্য পথে সহজেই উঠা নামা করে। এরা বেশ আমোদপ্রিয়, সর্ব্বদা আনন্দে থাকে, কোন বিষাদের ভাব নেই। মেয়েরা ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে পিঠে ঝুলিয়ে কাজ করতে যায়। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এরা মাংসাশী জাতি, গরু মহিষ শূয়র হরিণ মুর্গি হাঁস যা পায় তাই খায়। তামাকের পাতা ও পান ইহাদের বড় প্রিয়। ঘরে এক প্রকার মদ তৈরি করে খুব খায়, তখন সবাই মিলে খুব আনন্দে নাচ গানে মেতে যায়। বাদ্য-যন্ত্রের ভিতর কাঠের চাকায় চামড়ার ছাউনী দিয়ে ঢোলের মত বাজায় এবং দুখানা বাঁশের টুকরা দ্বারা ঠক ঠক করে গানের সাথে তাল দেয়। আবার পাকা লাউয়ের খোলে বাঁশের নলের সাহায্যে একপ্রকার বাঁশী তৈরি করে নেয়—সেটি হল পোঁ ধরা বাঁশী। এদের উলঙ্গ অঙ্গে নানারূপ চিত্র পরিশোভিত। উৎসবের সময় পাখির পালক ও বিচিত্র রং মেখে সেজেগুজে মেয়ে পুরুষ সবাই আনন্দে যোগ দেয়।

আমি একদিনই দুচারটি পাহাড়ী পাড়ায় বেড়িয়ে এদের সরল প্রাণের আদর আপ্যায়নে খুবই প্রীত হয়েছিলাম। যেন আমি তাদের কতই আপনার জন। আমারও কিন্তু ওদের প্রতি ঐরূপ আপনার ভাব এসেছিল। অবশ্য দোকানী আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বলেই ওদের সাথে এতটা মেশবার সুযোগ হয়েছিল। নয়তো এরা অপরিচিত লোকের সাথে আলাপও করে না—তাদের বিশ্বাসও করে না।

এরা লোকের সামনে যেরূপ উলঙ্গ অবস্থায় আসে, ঘরেও তেমি ভাবেই থাকে। আমরা যেমন প্রথমত ঐরূপ একজন লোক দেখলে অবাক্ হয়ে সঙ্কোচের সহিত তার দিকে তাকাই, এরাও ঠিক বিপরীত। হঠাৎ কোন কাপড় জামাপরা ভদ্রলোক দেখলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের দারুণ শীতে আদুড় গায় এরা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে কাজ করে যায়—শীত সহ্য করা যেন এদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি দু তিন দিন বৈকালের দিকে পাহাড়ী পাড়াগুলো দেখতে

গিয়ে ফেরবার পথে সাঁঝের শীতে আড়ষ্ট হয়ে পড়োছলাম। এ পাহাড়ী মুলুকে কি ভীষণ শীত! কিন্তু এখানকার শীতের একটা গুরুত্ব আছে। সমতলে যেমন বাহিরে খুব শীত অনুভূত হয় এবং গরম জামা কাপড় পরলেই অনেকটা কমে যায়। পাহাড়ী দেশে তা নয়। এখানকার জলবায়ু বার মাসই ঠাণ্ডা থাকে। তাই শীতের সময় শীত আরও বেশী। এখানকার শীতের বিশেষত্ব হচ্ছে হাত পা সমস্ত শরীর যেন ধীরে ধীরে একেবারে ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসে আর শরীরের সমস্ত আবরণগুলো শীতল হয়ে যায়। এর একমাত্র প্রতিষেধক আগুনের তাপ, আর কোন গরম পোষাকে আরাম হয় না।

পাহাড়ীদের ঘরগুলো সব একই রকমের; এক বস্তিতে দশ বার খানা কোথাও বা চার পাঁচ-খানা ঘর আছে। সবই উঁচু মাচা বাঁধা বাঁশের তৈরি। একটি লম্বা গাছ সেই উঁচু ঘরের সামনে ফেলে রাখা আছে—তাই দিয়ে উঠা নামা করতে হয়—ঐটিই হ'ল সিঁড়ি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এরা যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তখন সম্মুখে পাহাড়ের ঝরণায় দিব্যি মেয়ে পুরুষ উলঙ্গ হয়ে স্নান সমাপন করে পূর্ব্বের মত সেই পাতা দিয়ে অথবা কাপড়ের টুক্‌রা কোমরে জড়িয়ে বাড়ী এসে বড় একখানা কাঠের গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে তার ধারে বসে আরাম করে। মাঝে মাঝে একটি বাঁশের নলে কিছু তামাকপাতা কুচিয়ে অগ্নি-সংযোগে টানতে থাকে, মেয়েরাও ইতিমধ্যে বাঁশের তৈরি একখানা চিরুণী দিয়ে চুলগুলি সব মনের মত করে গুছিয়ে, পাহাড়ী নানাজাতি ফুল তুলে মাথায় ও কানে ঝুলিয়ে আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হয়। ফুল এদের অতি প্রিয়—পুরুষদের মাথার চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, ঐদিকে তাঁরা বেশী নজর দেয় না। ইতিমধ্যে তাদের সান্ধ্য-ভোজনের যোগাড় হয়ে যায়; আহার সমাপন করে ঘর হতে নামা উঠার সিঁড়িখানা ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে সম্মুখের দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। আলোর দরকার হলে শুকনো বাঁশের ফালি অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত করে তা দ্বারা আলোর কাজ করে নেয়। প্রায় বাড়ীতেই সমস্ত রাত আগুন জ্বালান থাকে। রাত্রিতে যদি এক পাড়া হতে অন্য পাড়ায় যেতে হয় তা হলে এক গোছা বাঁশ জ্বালিয়ে দু তিনটি মশাল তৈরি করে তাই নিয়ে নির্ভীক ভাবে চলে যায়। শুনেছি হিংস্র জন্তুও নাকি আগুনে ভয় পায়।

বিপদে অথবা শিকারের সময় কুকিরা সুতীক্ষ্ণ তীর ও গুলাল বাঁশ ব্যবহার করে, লম্বা দা খানা তো সর্ব্বদা সহচর রূপে আছেই। যদি দূর হ'তে কাউকে ডাকতে হয় তবে মুখে দুহাত চাপা দিয়ে এমন একটা উচ্চ শব্দ করে ডাকে যে, নিকটবর্ত্তী সকল পাহাড়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। যদি কাহারও উত্তর দেবার আবশ্যক হয়, সেও ঐ ভাবে সাড়া দেয়। নিয়মটি বড় চমৎকার! পাহাড়ীরা রাত্রি দিন কোন সময়েই ভয়ের লেশমাত্র বোধ করে না; একেবারে নির্ভীক। মাছ যেমন জলে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে—এ নেংটা কুকিরাও নিবিড় পর্ব্বতে নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক অন্তরে বাস করে। এদের ভিতর যারা আবার আরও দূরে লোকালয়ের একেবারে বাইরে অতি উঁচু পাহাড়ে বাস করে; তাদের কেউ বা গাছের ছাল অথবা কাঠের ফালি দু খণ্ড কোমরে ঝুলিয়ে থাকে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ দেহ, উলঙ্গ মূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গে নানা চিত্রাঙ্কিত ভীষণ চেহারাটি দেখলে সবারই মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হয়। বিশেষ দরকার হলে কখনও নীচের পাহাড়ে তারা আসে—এদের আহার আরও বীভৎস, কাঁচা মাংসাদিও নাকি খায়।

শুনলাম, এদের ভেতর হিংসার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা এত বেশী যে, প্রতি বৎসরই যে কোন সুযোগে এক পাহাড় হতে অপর দল এসে প্রতিশোধ নেবার ছলে দুচার জনকে হত্যা করে দু'একজনকে

ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। এই প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির ভাবটি আবার বংশপরম্পরায় চলে আসছে। হয়ত একজন অপর পল্লীর কারো প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছে, সে যদি জীবিত অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়, তাহলে মৃত্যুশয্যায়ও সেকথা তার ছেলে বা অন্য যে কেউ উপস্থিত থাকবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবে, যাতে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয়। কেউ যদি কারো নিকট ঋণী থাকে তাহলে যে কোন উপায়ে তাকে ধরে আটকে রেখে তার দ্বারা কাজ করিয়ে ঋণ প্রতিশোধ করিয়ে নেবে। এমনও হয়, যাদের সাথে শত্রুতা ছিল উভয় পক্ষের দুজনেই মারা গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুতিন পুরুষ পরেও উহারা প্রতিশোধ নেবেই, এই হল তাদের বংশের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। প্রতি বৎসরই এরূপ প্রতিহিংসার পরিশোধে অনেক প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। এরা শাসন শৃঙ্খলার বাইরে, আইন আদালত জানেও না, মানেও না। তবে প্রত্যেক পল্লীতেই কিন্তু একজন প্রাচীন প্রধান বা সর্দার আছেন তার আদেশ কেউ কখনো উপেক্ষা বা অবহেলা করতে পারে না, তার প্রতি সবারই এত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে, তার কথার প্রতিবাদ করতে কারো সাহস হয় না, যে কোন বিপদে-সম্পদে সেই একমাত্র উপদেষ্টা ও ভরসা।

এরা যে ধর্ম্ম মানে না তা নয়, এই নেংটা জাতেরও ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে। বৎসরে দুই তিনবার এদের দেবতার পূজা হয়। কোন মন্দির মস্‌জিদ বা চার্চ্চ নেই। তবে এরা গ্রামের নিকটে একটি বৃক্ষকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে, তার চারদিক পরিষ্কার করে পূজার দিন স্ত্রীপুরুষ ছেলে মেয়ে সবাই মিলে একটি ছাগ বা মুর্গি স্নান করিয়ে সেই বৃক্ষের সম্মুখে বেঁধে রাখে, গরু মুর্গি শুয়োর ছাগ অথবা হাঁস যে কোন একটা চাই। প্রথমত তারা সেখানে দেবতার উদ্দেশ্যে সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষটীর নীচে বেদী তৈরি করে, তাতে নানাজাতি পাহাড়ী ফুল দিয়ে সাজিয়ে সবাই মিলে নাচগান আরম্ভ করে। নিকটেই একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়, এই তাদের ভগবানের পূজা বা যজ্ঞের রীতি। তারপর ঐ বৃক্ষের নিকটে রক্ষিত পশুটিকে হত্যা করা হয়। এই আনন্দ উৎসবের সাথে তাদের ঘরের তৈরি এক প্রকার মদ খাওয়া চলতে থাকে। এভাবেই সে দিনটি আনন্দ উৎসবের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়।

এদের সরল প্রাণের স্মৃতিটুকু আমার জীবন-পথের চিরস্মরণীয় সম্বল হয়ে আছে। এই নিরক্ষর মূর্খ জাতির ভিতর এমন কতকগুলো জিনিষ দেখেছি, যা আমাদের শিক্ষাভিমানীদের কাছেও শিক্ষনীয়। এদের সর্ব্বাঙ্গে যেমন কোন আবরণ নেই, ভেতরটাও ঠিক সেরূপ সরল, কোন কপটতা সেখানে নেই। আমাদের মত ভদ্র পোষাকধারী শিক্ষিত কুটিলতাপূর্ণ স্বার্থপর অসত্যপরায়ণ তারা নয়। এদের ভবিষ্যৎ বিধাতার শুভাশিসে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, ইহাই আমার অন্তরের কামনা।

মহাভারতীয় সভ্যতা

মহাভারতের আচার-ব্যবহারের রূপ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

প্রাচীন ভারত বলিলে কি জানি আমাদের কি প্রকার একটা ধারণা জন্মে। আমরা ভাবি সে কি অদ্ভুত, সে কি উদ্ভট, সে কি প্রাচীনতায় জীর্ণ। প্রাচীন ভারতে শুধুই যেন জটা-বল্কল, বিক্রপদ, অনাবৃত উলঙ্গ দেহ। প্রাচীন ভারতে হাসি নাই, রহস্য নাই, সর্ব্বদাই গম্ভীর মুখকান্তি, জটিল আলাপ আলাপন। আধুনিকই যেন সম্পূর্ণ, আর প্রাচীন ভারতবর্ষ শুধু অসম্পূর্ণ নহে, নিতান্ত কদর্য্য বীভৎস।

প্রাচীন ভারতের জীবনের রূপ-রসের পরিচয় পাইবার উপাদানের অসদ্ভাব নাই। শাস্ত্রে, সংহিতায়, স্মৃতিতে, পুরাণে উহার সম্পূর্ণ পরিচয়ই বিবৃত রহিয়াছে। মহাভারতেও সে পরিচয় দেদীপ্যমান। শান্তিপর্ব্ব ভীষ্ম-কথনের পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাতরুত্থান ব্যাপার বর্ণন-প্রসঙ্গে ভারতের অভিনব সুন্দর প্রাত্যহিক জীবনের যে পরিচয় পাই, তাহাতে ভারত সভ্যতার আচার-আচরণের সৌষ্ঠবের সঙ্গে তাহার মহিমময় মূর্ত্তিও উদ্ভাসিয়া উঠে।

বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ ব্যাপার এইরূপে বিবৃত হইতেছে :—

"মধুসূদন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক সুখে নিদ্রিত হইলেন এবং যামিনীর অর্দ্ধযামমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে জাগরিত হইয়া ধ্যানপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকল ও বুদ্ধি স্থির করিয়া পরে সনাতন পরব্রহ্মকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মনোহর কণ্ঠস্বর সমন্বিত সুশিক্ষিত স্তুতি এবং পুরাণাভিজ্ঞ বন্দিগণ সেই প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় সহস্র সহস্র মৃদঙ্গ শঙ্খ ও করতলধ্বনি এবং মনোরম পণব, বীণা ও বংশী রব হইতে লাগিল; গায়কগণ সুস্বরে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই গীতবাদ্যজনিত গম্ভীর কলনাদ হইতে থাকিলে ভগবানের শয়নগৃহটি যেন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল।"

বিবরণের এইটি প্রথমাংশ। এই প্রথমাংশেরও আবার দুইটি বিভাগ। এক জীবন আপনার গম্ভীর সুন্দর ভঙ্গিমা, দ্বিতীয় তাহার ঈশ্বর-নিবেদন! নিশীথের বিশ্রামের পর যে নিদ্রাভঙ্গ, তাহার শারীর অবস্থার একটা প্রকার ভেদ মাত্র নহে। নিদ্রার পর জাগরিত হইয়া জীব-স্বভাবের স্বাভাবিক তাড়নার বশে চঞ্চল হইয়া উঠাই জাগরণ নহে। জীব-চঞ্চলতাকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও বুদ্ধির প্রেরণায় অধিকাংশই জীব-ভাবের আধিক্য। ভারত-সাধনার সেইজন্যই রীতি সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয় সকলকে স্থির করিয়া পরব্রহ্মকে চিন্তা করিতে হয়। প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্যই সংসার যাত্রার অনুবর্ত্তন। তাই এই ধ্যান ও মনন।

দ্বিতীয়াংশে সৌষ্ঠবপূর্ণ জীবন-যাপনার পরিচয়। জীবন-সংগ্রাম নহে, তাহা সুন্দরের অভিমুখে অভিযান। তাই কেবল আয়োজন ও প্রয়োজনের কথা নহে, কড়া প্রশস্তির গণনা নহে, হাহাকার করিতে করিতে নিদ্রোত্থিত হওয়া নহে, পণব, বীণা

ও বংশীরবের মধ্যে জাগরণ। জটা-বল্কল ভিক্ষুজীবন দেখিয়া যাঁহারা ভারতের জীবন-ব্যাপার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণার পোষণ করেন, মহাভারতের এই অংশ পাঠ করিলে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইতে পারে।

এই সম্বন্ধে আর একটু কথা আছে। সেইটুকু জানিলে ভারতের জীবন ব্যাপাবের সমুচ্চ ভঙ্গিমার পরিচয় প্রকটিত হইবে। আর্য্যজীবন তাহার ভিতর ও বাহির উভয় লইয়া, ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুইটিকে বিধৃত করিয়া! তাই, শ্রীকৃষ্ণের গাত্রোত্থান ব্যাপাব-প্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন আরও বিবরণ দিতেছেন, তাহা এবম্প্রকার :—

"তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ স্নান, কৃতাঞ্জলিপুটে গুহ্যমন্ত্র জপ ও হোম-কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া অবস্থিত হইলে চতুর্ব্বেদ-বিশারদ এক সহস্র বিপ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি গো প্রদান করিলে তাঁহাবা সকলেই আনন্দ সহকাবে সেই দান প্রতিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার স্বস্তিবাচন করিলেন। তখন কৃষ্ণ মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল স্পর্শ ও বিমল আদর্শ মধ্যে আত্মদর্শন করিয়া" ইত্যাদি।

আর্য্যের দিনচর্য্যার এ হেন রীতি-নীতি! সকলের মধ্যেই পবিত্রতা ও সমুচ্চতা। সৌন্দর্য্যেব মধ্যে শিব এবং শিবত্বের মধ্যেই সৌন্দর্য্য। তাই দ্বারকাব রাজা রাজসভায় আগমন করিলে তাঁহার পুরোভাগে রণবিশারদ সেনাপতি ও মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিবর্গ আগমন করিলেন না, আসিলেন, চতুর্ব্বেদ-বিশাবদ সহস্র ব্রাহ্মণ।

এইখানে ভারতীয় মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আর একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। হয় ত তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক, তবুও উহার উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, ভারতীয় জীবন-পদ্ধতি কি পরমসুন্দব মনোধর্ম্মেরই না বিকাশ ঘটাইয়াছিল!

পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেব সন্দর্শনে যাত্রা করিবেন। যুধিষ্ঠিরও তৎসমভি-ব্যাহারে যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত হইয়াছেন জানিয়া ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—হে অপ্রতিমদ্যুতে, ফাল্গুন! তুমি আমার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রথ, সজ্জা করিতে আদেশ কর। অন্য কেবল আমবাই কয়েকজন যাইব। সমভিব্যাহারে সৈন্য যাইবার আবশ্যক নাই।

মহারাজের আচরণের মধ্য দিয়াও তৎকালীন আচার-আচরণের শিষ্টতাব কতকটা আভাস পাইলাম। বিজয়ী রাজা পরপক্ষীয় পরাভূত সেনাপতির নিকট গমন করিতেছেন, বিজয়ীর দর্পিত মনোবৃত্তি লইয়া নহে, একান্তই বিনীতভাবে। সৈন্যসামন্ত লইয়া রণজয়ের অহঙ্কার প্রদর্শনের আদৌ আবশ্যকতা নাই। সেইজন্যই যুধিষ্ঠিরের ঐ প্রকাব আদেশ, সৈন্যসামন্ত লইবাব কোন আবশ্যকতা নাই।

ইহাব পর শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে পঞ্চভ্রাতা ভীষ্মদেব সমীপে উপনীত হইলেন, হইয়া আদৌ কুশল প্রশ্ন। ইহা সর্ব্বসাময়িক সভ্যতার শিষ্টা-চারানুমোদিত। কুশলবাদেব ভঙ্গিমা দেখিয়াও সভ্যতার কতকটা মর্ম্মোপলব্ধি কবিতে পাবা যায়। তুমি কেমন আছ, জিজ্ঞাসাবাদের ইহাই সাধারণ রীতি। অচ্যুত ভগবান কেশব ভীষ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিতেছেন :—

হে রাজসত্তম! গত রজনী তোমার সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত? তোমাব বুদ্ধি বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ত? হে অনঘ! তোমাব জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রতিভাত হইতেছে ত? তোমার মন বেদনায় কাতর হইয়া ব্যাকুল হয় নাই ত?

এই উক্তিটুকুর মধ্য দিয়া ভারতের শিষ্টতা এবং সৌজন্যের পরিচয় সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দিবসের ক্লান্তির পর রাত্রির সুনিদ্রা একান্তই

প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া রণক্লান্ত রথী, অস্ত্রাহত সেনাপতির। তাই প্রথমেই শারীর কুশলবাদ। তদনন্তর ভারতের চিরন্তনী জিজ্ঞাসা—তোমার জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রতিভাত হইতেছে ত?

এই সকল আচার, আচরণ, জিজ্ঞাসা, প্রতি-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া আমরা ভারতবর্ষের এক সুমহান এবং শোভনীয় সভ্যতার সম্মুখবর্ত্তী হই। অতীতের যে সভ্যতাকে একান্ত আধুনিকতা বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে করি, আদৌ তাহা নহে। উহার মধ্যে আছে আধুনিকের রূপ এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ সমুচ্চতা। সেদিনের বিলাস বৈভবের মধ্যেও মার্জ্জিত রুচির যথেষ্ট পরিচয় পাই। তবে তাহা শুধুই শারীর সংস্থাকে কেন্দ্র করিয়া নহে, উহার মধ্যে মধ্যে অধ্যাত্ম-অভিমুখীনতা রহিয়াছে। তাই দেখি শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিবার পর শুধুই মনোহর বর্ণের বীণা, বংশীরব হইল না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুহ্যমন্ত্রজপ ও হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে আধুনিকের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আধুনিক বলিলেই মনে হয়—অভিনব নূতন। পূর্ব্বে ছিল না, এখন আসিয়াছে। পূর্ব্বের জীবনযাত্রার মধ্যে কতকটা অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান ছিল। রুচি ছিল কতকটা অমার্জ্জিত। ইহা কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অভাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাতরুত্থান ব্যাপারে তদানীন্তন জীবনছন্দের মনোহারিত্বের যে পরিচয় পাই, অন্য তাহা পাই না। আজিকার নিদ্রাভঙ্গ ব্যাপার একান্তই অশুচি ও অশোভন। তাহা পশুর মত ক্ষুধিত হইয়া শয্যা ত্যাগ করে।

যে দিনের কথা কহিতেছি, সে দিনের আচার আচরণ বহু বিসর্পিত। তাহাতে যজ্ঞ কর্ম্ম আছে, তাহার নানাবিধি বিধান আছে; তদানীন্তন দিনের অন্যান্য লৌকিক ও দেশাচারও রহিয়াছে। সেই সকলের সমুদয় ইতিবৃত্ত এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নহে, তবে তদানীন্তন দিনের জীবন-প্রণালীর শোভনীয়তা সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের অবতারণা।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের শয্যাত্যাগও তাঁহার কুশলবার্ত্তা লইয়াই বর্ত্তমান বক্তব্য শেষ করিলাম। ভারত সভ্যতার উপাঙ্গও সুন্দর, তাহার ব্যবহারও সুন্দর। তবে সেই সৌন্দর্য্য লৌকিক সৌন্দর্য্য নহে, তাহার কেন্দ্রবস্তু পরম সুন্দর।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ

এতগুলি শ্লোকরচনাদ্বারা আত্মার ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিরূপ ফলের সহিত তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়া যাওয়াতে, পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির রচনারম্ভ হওয়াই উচিত ছিল না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগের আরম্ভ সিদ্ধ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনঃকীর্ত্তন-পূর্ব্বক পরবর্ত্তী গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে॥৪৩

অন্বয়—এবম্ পরাপরাত্মনোঃ একতা যুক্ত্যা সম্ভাবিতা; সা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এইরূপে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয়ের অভেদ, যুক্তিদ্বারা জিজ্ঞাসুকে অথবা

প্রতিবাদীকে অঙ্গীকার করাইলেন। এক্ষণে সেই অভেদ, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিমহাবাক্যদ্বারা, ভাগত্যাগলক্ষণার সাহায্যে প্রতিপাদন করিতেছেন।

টীকা—"এবম্"—এ পর্য্যন্ত যে যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা "পরাপরাত্মনোঃ"—পরমাত্মা ও জীবাত্মা যাহা যথাক্রমে, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'পদ ও "ত্বম্"পদের অর্থ, তদুভয়ের "একতা"—অভিন্নতা, "যুক্ত্যা"—সচ্চিদানন্দ-রূপতারূপ লক্ষণ তদুভয়ে তুল্যরূপে বর্ত্তমান, ইহা দেখাইয়া এবং অন্যান্য যুক্তিদ্বারা (অর্থাৎ অধ্যারোপ অপবাদ এবং অন্বয় ব্যতিরেক ইত্যাদি উপায়দ্বারা) "সম্ভাবিতা"—জিজ্ঞাসুর বা প্রতিবাদীর বুদ্ধিকে স্বীকার করাইলেন বা বুদ্ধিতে ধরাইলেন। "সা"—সেই অভেদ, "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ"—তত্ত্বমসি, প্রভৃতি (অর্থাৎ "অহং"ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," ও "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই সকল) মহাবাক্যদ্বারা—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের অভেদবোধক শ্রুতিবাক্য-দ্বারা, "ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে"—বিরুদ্ধাংশ—ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও জীবের অল্পজ্ঞতারূপ একতাবিরোধী অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা বুঝান হইতেছে—(এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন)। * ৪৩

এইরূপে এ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত বিষয়ের সার-সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য-প্রদান করিতেছেন।

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের, জীবব্রহ্মের একতারূপ অর্থ, উক্ত বাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'পদ ও 'ত্বং'পদের অর্থ বুঝিলেই, বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু প্রথমে 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন—

জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতেব্রহ্ম তদ্গিরা ॥৪৪

অন্বয়—যৎ তামসীম্ মায়াম্ আদায়, জগতঃ উপাদানম্ (ভবতি), শুদ্ধসত্ত্বাম্ তাম্ (আদায়) নিমিত্তম্ (ভবতি, তৎ) ব্রহ্ম, "তৎ" গিরা উচ্যতে।

অনুবাদ—যিনি তামসী মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের উপাদান কারণ, এবং শুদ্ধসত্ত্বা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের—নিমিত্তকারণ, সেই ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মই 'তৎ' শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন।

টীকা—'যৎ'—যে সচ্চিদানন্দরূপব্রহ্ম, "তামসীম্" —তমোগুণপ্রধানা, "মায়াম্ আদায়"—মায়াকে উপাধিরূপে অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করিয়া, "জগতঃ"—স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্য্যসমূহের,"উপাদানম্ "ভবতি"—জগতের অধ্যাসের অধিষ্ঠান অর্থাৎ কল্পিত সর্পের উপাদানস্বরূপ বিবর্ত্তোপাদান হন, "শুদ্ধসত্ত্বাম্ তাম্ আদায়"—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান সেই মায়াকে অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেইরূপ মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া "নিমিত্তম্ ভবতি"—নিমিত্তকারণ হন, অর্থাৎ তমঃ-প্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদান প্রভৃতির বিশেষ—জ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তা হন। (অভিপ্রায় এই—কুম্ভকার যেমন ঘটোপাদান মৃত্তিকা এবং তাহার সহিত দণ্ডচক্রাদি অন্যান্য নিমিত্তের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানদ্বারা ঘটের কর্ত্তা হন, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান মায়োপহিত ব্রহ্ম তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদানের এবং জীবের অদৃষ্ট, আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন, কাল, দিক্, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকা-ভাব এই কয়েকটি নিমিত্তকারণের, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লইয়া জগতের কর্ত্তা হন।) "তৎব্রহ্ম"—সেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামী, "তৎ"-গিরা উচ্যতে"—এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যস্থিত 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ। ৪৪

এইরূপে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

* মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর ২য় গ্রন্থ দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকের (খ) পরিশিষ্ট এবং এই পঞ্চদশীর পঞ্চম পরিচ্ছেদ "মহাবাক্য বিবেক" দ্রষ্টব্য।

(এক্ষণে) "ত্বম্"পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন :—

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে॥৪৫

অন্বয়—তৎ পরম্ ব্রহ্ম যদা মলিনসত্ত্বাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাং তাম্ আদত্তে তদা "ত্বং"—পদেন উচ্যতে।

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম যখন মলিনসত্ত্বগুণযুক্ত, কামকর্ম্মাদি দূষিত সেই মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই পরব্রহ্মই (জীবরূপ ধরিয়া) "ত্বম্"—পদের বাচ্যার্থ হন।

টীকা—"তৎপরং ব্রহ্ম"—সেই পরব্রহ্মই অর্থাৎ যিনি অন্য উপাধিযোগে জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদন কারণ, "যদা"—যে সংসারাবস্থায়, "মলিনসত্ত্বাম্"—কিঞ্চিৎ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রণবশতঃ মলিন অর্থাৎ রজস্তমোভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান এবং "কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্"—বিষয় ভোগেচ্ছা, অদৃষ্ট প্রভৃতি দ্বারা দূষিত, 'তাম্ আদত্তে' —সেই অবিদ্যাশব্দবাচ্য মায়া বা প্রকৃতিকে উপাধি বা প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করেন, "তদা 'ত্বম' পদেন উচ্যতে"—তখন সেই 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ হন।৪৫

এইরূপে "ত্বম্" পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

এই প্রকারে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অর্থ বলিয়া উক্ত পদসমুদায়ের অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ বলিতেছেন—

ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥৪৬

অন্বয়—ত্রিতয়ীম্ অপি পরস্পর বিরোধিনীং তাম্ মুক্ত্বা অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—তমঃপ্রধান, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মলিন সত্ত্বপ্রধান—এই তিনপ্রকারের মায়া পরস্পর বিরোধিনী। সেই তিনপ্রকার মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাবাক্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই লক্ষ্য করিতেছে অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ।

টীকা—"ত্রিতয়ীম্ অপি"—তিন প্রকারের মায়াকেই অর্থাৎ তমঃপ্রধানতা, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানতা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানতা—এই তিন প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিতা (মায়াকে), অতএব "পরস্পরবিরোধিনীম্ তাম্"—পরস্পর বিরোধিনী সেই মায়াকে "মুক্ত্বা"—ছাড়িয়া অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা অসৎ বলিয়া জানিয়া, "অখণ্ডং সচ্চিদানন্দম্" —সজাতীয়াদি তিনপ্রকার—ভেদরহিত ব্রহ্ম, (অর্থাৎ অগ্রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২০শ হইতে ২৫শ শ্লোকোক্ত, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদবর্জ্জিত অথবা—(১) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, (৪) জড় ও জীবের ভেদ ও (৫) জড় ও জড়ের পরস্পর ভেদ, এই পাঁচ প্রকার ভেদবর্জ্জিত ব্রহ্ম), "মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে" —মহাবাক্যের দ্বারা, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞাপিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্য অর্থ।৪৬

এইরূপে লক্ষণার দ্বারা কিপ্রকারে মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহা দেখান হইল।

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বাক্যের অর্থ বুঝান কোথায় দেখিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

সোঽয়মিত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা॥৪৭
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥৪৮

অন্বয়—'সঃ অয়ম্' ইত্যাদি বাক্যেষু তদিদন্তয়োঃ বিরোধাৎ ভাগয়োঃ ত্যাগেন একঃ আশ্রয়ঃ যথা

লক্ষ্যতে, এবম্ পরজীবয়োঃ উপাধী মায়াবিদ্যে বিহায় অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ পরম্ ব্রহ্ম এব লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—'সেই ব্যক্তি এই' এইপ্রকার বাক্যে 'সেই' ও 'এই' এই দুই অর্থ (যথাক্রমে অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশ এবং বর্ত্তমান কাল ও অপরোক্ষ সমীপদেশ বুঝায় বলিয়া) 'সেই' অর্থাৎ অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেছে—'এই' অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল ও প্রত্যক্ষ সমীপদেশবিশিষ্ট ব্যক্তি, এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থ পাওয়া যায় এবং ঐরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া ঐ বিরুদ্ধ অংশ দুইটিকে ত্যাগ করিয়া যেমন তদুভয়ের এক আশ্রয় উক্ত ব্যক্তির শরীররূপ স্বরূপই লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়, সেইরূপ "তৎ+ত্বম্+অসি" এই বাক্যেও 'তৎ'পদবাচ্য ঈশ্বরেরও 'ত্বং'পদবাচ্য জীবের উপাধি যথাক্রমে মায়াকৃত সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতাদিধর্ম্ম ও অবিদ্যাকৃত অল্পশক্তি অল্পজ্ঞতাদিধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এবং তদুভয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া তদুভয়কে পরিত্যাগ করিয়া তদুভয়ের এক আশ্রয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়।

টীকা—"সোঽয়ম্ ইত্যাদি বাক্যেষু"—'সেই (দেবদত্ত) এই' এইপ্রকার বাক্যসমূহে "*তদিদন্তয়োঃ*"—'*তত্তা*' ও '*ইদন্তা*' *এই* উভয়ের অর্থাৎ 'সেই' বলিতে যে পরোক্ষ দূরদেশ ও অতীতকালবিশিষ্টতারূপ ধর্ম্মাক্রান্ত এবং 'এই' বলিতে যে অপরোক্ষ সমীপদেশ ও বর্ত্তমান কাল-বিশিষ্টতারূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বুঝায় সেই উভয় ধর্ম্মের "বিরোধাৎ" একতার—অসম্ভব বলিয়া "ভাগয়োঃ ত্যাগেন" বিরুদ্ধ অংশসমূহেরই ত্যাগ করিয়া "একঃ আশ্রয়ঃ" সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তির শরীররূপ একটিমাত্র স্বরূপ, "যথা লক্ষ্যতে" যেমন লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বুঝিতে হয়, এইরূপে দৃষ্টান্ত বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে সিদ্ধান্ত কহিতেছেন—"এবং"—'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে যেপ্রকার, এইরূপ "পরজীবয়োঃ"—পরমাত্মা ও জীব উভয়ের "উপাধী"—উপাধিভূত মায়া ও অবিদ্যা, যাহা ১৬ সংখ্যক এবং ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, তদুভয়কে "বিহায়" পরিত্যাগ করিয়া "অখণ্ডম্"—ভেদরহিত "সচ্চিদানন্দং" পরব্রহ্মকেই মহাবাক্য হইতে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়।৪৮

এইরূপে ভাগত্যাগ লক্ষণার দৃষ্টান্ত দিলেন।

(শঙ্কা)—ভাল মহাবাক্য হইতে লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্ম, তাহা সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প? অর্থাৎ তাহা—নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট? অথবা নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মরহিত?

সমালোচনা

পরলোক-রহস্য—স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক ষ্টোর্স, ৯৯।১এফ কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ১৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য বার আনা।

এই পুস্তকখানা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা, প্রায় সমগ্র ভারতের ধার্ম্মিক সমাজে সুপরিচিত যশস্বী বাগ্মিবর তিরোহিত স্বামী দয়ানন্দ মহারাজ লিখিত জন্মান্তর তত্ত্ব নামক পুস্তকের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ইহা প্রকাশকের নিবেদনে জানা যাইতেছে। এই পুস্তকের ভাবমধুর শ্রবণ-প্রিয় দর্শনোক্ত কঠোর শব্দসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ চিন্তাপ্রসূত গভীরার্থদ্যোতক সুবিন্যস্ত বাক্যপরম্পরা শাস্ত্রকুশল সুধীসমাজের প্রীতি সম্পাদন করিবে। পরন্তু শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক ইহার লেখনৈপুণ্যে আকৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেও সংক্ষেপোক্ত প্রতি-পাদ্যাংশের সম্যক্ গ্রহণে অশক্ত হইয়া শাস্ত্রের দুর্ব্বোধতা স্মরণ করতঃ নিরস্ত হইবে।

যে কোন পদার্থ-প্রতিপাদনের জন্য প্রমাণ-বিচার আবশ্যক—'প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি'। লেখক প্রমাণ-নিরূপণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অলৌকিকার্থে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার সুপ্রশস্ত উপায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। লেখক আরম্ভ বিবর্ত্ত ও পরিণাম এই ত্রিবিধ বাদের যে কোন বাদাবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলে পুস্তক-খানা সাধারণের উপযোগী হইত।

ধর্ম্ম জ্ঞান মুক্তি প্রভৃতি অবশ্য বক্তব্য বিষয়ে লেখকের কার্পণ্যবশতঃ মুখ্য বক্তব্য অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। একাদশাধ্যায়ে সমাপ্ত এই পুস্তকের প্রত্যধ্যায়ে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। ঈশ্বর-তত্ত্ব নামক চতুর্থাধ্যায়ে এবং জীবের জন্ম নামক পঞ্চমাধ্যায়ে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি লেখকের অধিক আগ্রহ ব্যক্ত হইলেও বিভিন্ন স্থলে তদ্বিপরীত মতসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন মতের অবিরোধে স্বমত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই। পরন্তু তৎকালে সাধারণ পাঠকের বিভ্রমের সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্যভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন শাস্ত্রবাক্যে নির্ভর না করিয়া স্বকল্পিত অতিব্যাপ্তিদোষাদিগ্রস্ত লক্ষণ সাহসের সহিত উল্লেখ করেন, এই লেখকও বহুস্থলে সেইরূপ করিয়াছেন। যথা—"যে শক্তি মনুষ্যের এই অধোগমনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া মনুষ্যকে ক্রমোন্নতির অবসর প্রদানপূর্ব্বক পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর করে সেই শক্তির নামই ধর্ম্ম।" "সঞ্চিত কর্ম্মসকল চিত্তের গভীর দেশে অর্থাৎ চিদাকাশে সঞ্চিত থাকে।" "নবীন বাসনার বশে …নবীন কর্ম্ম করে তাহার সংস্কারকে ক্রিয়মান সংস্কার বলে।"

চিত্তের গভীর দেশে, চিদাকাশে, নবীন বাসনার বশে, নবীন কর্ম্ম প্রভৃতি পদগুলি কেবল সাধারণ পাঠকের বিভ্রমসৃষ্টির উপায়। ক্ষুদ্র বিরোধসমূহ অবশ্যই অনুল্লেখ্য।

লেখক সম্পূর্ণভাবে সমগ্র প্রাণীর জন্মান্তর আলোচনা না করিলেও (যেমন শৈশবে যাহাদের পুনঃপুনঃ মৃত্যু হয় তাহাদের পুনর্জ্জন্মক্রম জায়স্ব ম্রিয়স্ব নামক তৃতীয় গতি প্রভৃতি) সিদ্ধান্তাংশে শাস্ত্রবাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এবম্বিধ পুস্তক লিখিবার যোগ্যতা ও ধর্ম্মোপদেশ সামর্থ্য সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। ইহাও সত্য যে, ১৪৬ পৃষ্ঠার পুস্তকে ইহার অধিক বিষয় সন্নিবেশিত হইতে পারে না। লেখক পুরাণ শাস্ত্র হইতে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত

করিয়াছেন ঐ উক্তিতে যে মতবৈলক্ষণ্য আছে তাহার সমাধানে যত্ন করিলে উহা অত্যন্ত আদৃত হইত। এই ক্ষীণপুণ্য কালে এবম্বিধ পুস্তকের প্রভূত প্রচার অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্র-বিমুখ জন-সাধারণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া পরম কল্যাণ প্রাপ্তির প্রকৃত উপায় অবশ্যই জানিতে সমর্থ হইবে, লোকান্তরাস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইবে, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে—ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য্য, ষট্‌তীর্থ

শুদ্ধ জীবন—শ্রীগিরিজাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত। যুগমঙ্গল সঙ্ঘ, রাজাপুর, পোঃ বেগমপুর, জিলা শ্রীহট্ট। ১২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

সদাচার ও নীতি সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তক। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হইবেন। এই উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে এই প্রকার গ্রন্থের প্রচার মঙ্গলকর।

স্বামী প্রেমেশানন্দ

বলাই-স্মৃতি বা জীবের পরিণতি—ডাঃ পরেশচন্দ্র দত্ত, ডি-এস্‌সি, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রশান্তকুমার গুহ, বি-এ, ১৬, ইণ্টালী মার্কেট, কলিকাতা। ২২১ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

কনিষ্ট ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হইয়া গ্রন্থকার মৃত্যুর পর জীবের পরিণতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন এবং উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্ররাশি আলোচনা করিয়া পুনর্জন্ম ও পরলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন।

গ্রন্থকার যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সমর্থনে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানা বাস্তবিকই উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীসুবোধচন্দ্র দে কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারি, ঢাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৩০ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার বিশেষ কোন মন্তব্য না করিয়া অতি সহজ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখিয়াছেন। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে যাইবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দুই শত জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন তারিখসহ লেখক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের মূল্য অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ও বলিবার ধরণ অতি সহজ হওয়ায় এই পুস্তক সর্বসাধারণের উপযোগী হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

মনোরম মলাট, সুন্দর বাঁধাই, পরিষ্কার ছাপা, মলাটসহ পুস্তকের ছয়খানা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থকার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকে বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন; ইহাতে মূল দেওয়া হয় নাই।

গীতা চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ পদ্যে অনুবাদ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। লেখক ইহাতে যথেষ্ট সফলকাম হইয়াছেন। স্থানে স্থানে অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। অনুবাদ সহজ সরল হওয়ায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণও ইহাতে বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

অমিতাভ দত্ত

গৌতম বুদ্ধ—ত্রিভঙ্গ রায় প্রণীত। প্রকাশক—সেন ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কো, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৪৭ পৃষ্ঠা, দাম এক টাকা।

দেবমানব বুদ্ধ সারা জগতের মুকুটমণি। তাঁর অমূল্য জীবনের অমল আভায় দু হাজার বৎসর পর আজও ভারত দীপ্তিমান। লেখক অতি নিপুণ

ভাবে ভগবান গৌতমের অমৃত-জীবন বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন।

তরুণ লেখক একজন উদীয়মান শিল্পী। তিনি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ছাত্র। শিল্পী লেখক পুস্তকখানার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তহস্তে চিত্রের পুষ্পবৃষ্টি করেছেন। চিত্রগুলো এত নিখুঁত ও সুন্দর হয়েছে যে শুধু চিত্রের জন্যই পুস্তকখানা রাখতে ইচ্ছা হয়। পুস্তক না পড়েও যদি চিত্রগুলো শুধু পর পর দেখে যাওয়া যায়, তা হলেই বুদ্ধের জীবনী মোটামুটি জানা হয়ে যাবে। লেখকের ভাষাও অতি সহজ ও কবিত্বময়। লেখক তাঁর লেখনী ও তুলিকা-স্পর্শে বাংলার শিশুচিত্ত অতি সহজে জয় করবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাংলার ছেলেমেয়েরা এ পুস্তকখানা পাঠ করে ভগবান তথাগতকে অতি সহজেই আপনার করে নেবে। শুধু শিশু নয়, বড়রাও এ পুস্তক অতি আনন্দের সহিত পড়বেন। এ সুদৃশ্য মনোহর বইখানিকে এ বৎসরের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য পুস্তক বলা যেতে পারে।

গৌতম-বুদ্ধ বাংলার সর্বত্র আদর লাভ করবে।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

স্বামী কল্যাণানন্দজীর মহাপ্রয়াণ

গত ২০শে অক্টোবর রাত্রি ১১টা ১০ মিঃ সময় আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য, কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ মহারাজ মুসৌরীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। তাই স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি গত জুন মাসে সেখানে গমন করিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি অনেকটা ভাল বোধ করিতেছিলেন। তাহাতে আশা করা যাইতেছিল, শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন এবং কনখলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হরিদ্বারের আগামী পূর্ণকুম্ভ মেলার সেবা-কার্য্যের কর্ম্মভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহা কেহই কল্পনা করেন নাই।

গত ২০শে অক্টোবর সকালবেলা হইতেই তিনি সামান্য অসুস্থ বোধ করেন। দ্বিপ্রহরে এইজন্য কোন পথ্যই গ্রহণ করেন নাই এবং সমস্ত দিন শয়ন করিয়াই কাটান। অপরাহ্ণ ৩টার সময় সামান্য দুগ্ধ পান করিতে যাইয়া বিছানা ত্যাগ করেন ও ইজিচেয়ারে বসেন। কিছুক্ষণ পর উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে শরীর কাঁপিতে থাকে ও অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পাঁচ সাত মিনিট পর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতে সমর্থ হন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা হয়। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার 'ডায়বেটিক্ কমা' বলিয়া স্থির করেন এবং কিছুক্ষণ পর পর দুটি ক্যাম্ফার ইনজেকশন করেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল দেখা গেল না। তিনি ডাক্তারকে বলিলেন,

আর কি হবে? আই য়্যাম্ ডাই-ইং, (আমি মারা যাচ্ছি)।

ইহার পর তিনি শরীরে খুব জ্বালা অনুভব করিতে থাকেন ও মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' বলিতে থাকেন। রাত্রি প্রায় ১০॥টার সময় আবার ইজিচেয়ারে উঠিয়া বসেন ও দুইবার সামান্য জল পান করেন। ১১টা ১০ মিনিটের সময় তিনবার মা নাম উচ্চারণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু চিরতরে আকাশে বিলীন হইয়া যায়।

তাঁহার পূতদেহ পরদিন কনখলে লইয়া আসা হয় এবং যথাবিহিত রূপে পবিত্র জাহ্নবীগর্ভে সমাহিত করা হয়।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম দক্ষিণারঞ্জন গুহ। তিনি বরিশাল জেলাবাসী এক দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন এবং জ্যেষ্ঠতাতের অভিভাবকত্বে থাকিয়া বানরী-পাড়া স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রে ধর্ম্মানুরাগ ও গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হইত। যখন তিনি স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন তখনই তাঁহাকে অতি নিবিষ্টভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ প্রভৃতি পাঠ করিতে দেখা যাইত। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান তিনি। মাতা ও আত্মীয় পরিজনের বন্ধন তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। প্রায় ২৪ বৎসর বয়সে সংসার ও আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণের ইচ্ছায় তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিলেন।

পাশ্চাত্য দেশে অসামান্য সফলতা লাভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ সালের শেষভাগে দক্ষিণারঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ব্রহ্মচারী রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—বাল্যাবধি তিনি আর্ত্তের সেবায় বড় আনন্দ পাইতেন। রামকৃষ্ণ-মঠে যোগদানের প্রথম হইতেই তিনি বেলুড়ের পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া অতিশয় নিষ্ঠাভরে আর্ত্ত ও রুগ্নদের সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী যোগানন্দ যখন কলিকাতায় তাঁহার অন্তিম রোগশয্যায় শয়ন করেন, সেই সময় প্রায় এক মাসকাল তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য দক্ষিণারঞ্জন লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে স্বামীজি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামীজি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি স্বামীজির কখনও অর্থের প্রয়োজন হয় এবং তজ্জন্য তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে ভৃত্যরূপে বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে দক্ষিণারঞ্জন সম্মত হইবেন কিনা। দক্ষিণারঞ্জন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তদীয় গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে স্বামী কল্যাণানন্দ তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া কাশীধাম গমন করেন এবং স্বামী অচলানন্দজীর পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামী কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুবর্গের অন্তরে সেবা-ধর্ম্মের প্রেরণা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। তাঁহারা ১৯০০ সালের জুন মাসে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী কল্যাণানন্দ তখন এলাহাবাদ গমন করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি এলাহাবাদ

সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

স্বামী কল্যাণানন্দের চরিত্রে পূর্ব্ব হইতেই সেবাপ্রবণতা ছিল, স্বামীজি তজ্জন্য তাঁহার সেবা-ভাবের উপরই বিশেষ জোর ও উৎসাহ দিয়া-ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি স্বয়ং ছিলেন জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সমন্বয়-মূর্ত্তি। স্বামীজি একবার তাঁহাকে এইরূপ কথাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি এমন আশ্রম গড়িয়া তুলিতে চান যাহাতে যেমন ধর্ম্মসাধনার ব্যবস্থা থাকিবে, তেমনি পাশাপাশি থাকিবে উপাসনার কার্য্যকরী দিক্—সেবাবিভাগ।

স্বামী কল্যাণানন্দের জীবনে শেষের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্ম ও ভক্তি তুল্যরূপে তাঁহার জীবনে বিকাশলাভ করিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, যদিও কনখল সেবাশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশনেরই শাখাকেন্দ্র বলা হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে মঠ ও মিশন উভয় বিভাগের কর্ম্মই করা হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া কনখলে লইয়া যাইতেন এবং পরম ভক্তিভরে তাঁহাদের সেবা করিতেন। ১৯১২ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেখানে গমন করিয়া প্রায় সাত মাস কাল অতিবাহিত করেন। তিনি কলিকাতা হইতে দুর্গাপ্রতিমা আনয়ন করিয়া সেখানে দুর্গাপূজা করাইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সাধন ভজনে রত থাকি-তেন। একবার যখন তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহাকে কনখল লইয়া গিয়া অতিশয় ভক্তিভরে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের শাস্ত্রব্যাখ্যায় সেবাশ্রম তখন যেন একটি বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মঠের বা অন্য যে-কোন মঠের সাধু সন্ন্যাসিগণ যখনই অসুস্থ হইয়া কনখল সেবাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, স্বামী কল্যাণানন্দ তখন তাঁহারই সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং ইচ্ছানুরূপ স্বল্পকাল বা দীর্ঘকাল আশ্রমে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে চাহিলে তাঁহারও সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

১৯০২ সালে স্বামীজির দেহত্যাগের পূর্ব্বে আশ্রমসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার উপদেশ লইবার জন্য তিনি বেলুড়মঠে আসিয়া কয়েক মাস ছিলেন। তারপর যে চলিয়া যান আর জীবনে বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি একাদিক্রমে প্রায় ৩৬ বৎসর কনখল সেবাশ্রমে অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কনখল সেবাশ্রম স্থাপনের প্রথমদিকে তিনি কুম্ভমেলায় সেবাকার্য্য-ব্যপদেশে দুইবার এলাহাবাদ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষদিকে প্রায় পনর বৎসর যাবৎ তিনি বহুমূত্ররোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন। কলিকাতা বা কাশীতে আসিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য তাঁহাকে বহুবার অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু কোথাও গমন করিতে তিনি সম্মত হন নাই। শেষদিকে যখন তাঁহার অসুখের বিশেষ বাড়াবাড়ি হইল, তখন মুসৌরী, আলমোড়া, কাশ্মীর প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে জোর করা হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি অল্পদিনের জন্য মুসৌরী যাইতে সম্মত হন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য মায়াবতী আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহার সাহচর্য্যে আশ্রমবাসী সকলে বড়ই আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছিলেন।

স্বামী কল্যাণানন্দের জীবনে গুরুভক্তি ও সেবা যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ কর্ম্মযোগী এবং আচার্য্য বিবেকানন্দের একজন উপযুক্ত শিষ্য। তাঁহার মত মহাপ্রাণ সাধকের তিরোধানে শুধু যে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, দেশেরও প্রভূত ক্ষতি হইল, সন্দেহ নাই।

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণ

স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্য, কনখল সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক স্বামী কল্যাণানন্দের দেহত্যাগের সংবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উপর যে বিষাদের ছায়া নিপতিত হইয়াছে, উহা তিরোহিত হইতে না হইতেই আজ ১৬ই নবেম্বর তারযোগে সংবাদ পাওয়া গেল যে, চিকাগো বেদান্ত-সমিতির স্থাপয়িতা ও অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দজী ৪৫ বৎসর বয়সে গত ১৪ই নবেম্বর, রবিবার উক্ত সমিতি-ভবনে হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমরা যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়াছি। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম্মমহাসম্মিলনীতে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে বেদান্তের যে বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছিল, স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের সমিতি-ভবন হইতে গত দশ বৎসর যাবৎ উহারই প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছিল, আজ অনন্ত আকাশের অঙ্গে যেন উহা অন্তর্হিত হইল!

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তথা হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ঢাকা নগরীতে গমন করিলে তাঁহার পুণ্য সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞানেশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ধর্ম্মভাবের প্রাবল্যে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন এবং কয়েক বৎসর কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমে থাকিয়া সাধন ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্রতী হন। অতঃপর তিনি পাটনা নগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ সন্তোষজনকভাবে কয়েক বৎসর উহার কার্য্যপরিচালন করেন। কার্য্যদক্ষতার গুণে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ বেদান্ত প্রচার-কার্য্যে আমেরিকায় প্রেরিত হন। তথায় প্রথমতঃ তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির অন্যতম প্রচারকরূপে কার্য্য করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত চিকাগো নগরীতে বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করিয়া প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। প্রতি রবিবার তিনি চিকাগো মহানগরীর সমবেত সুধীবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা ও ভজন-সঙ্গীতাদি করিতেন। তাঁহার বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ এবং বিশেষ পারদর্শী ছিলেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে। আমেরিকার জনসাধারণ তাঁহার বাংলা ভজন সঙ্গীতে এবং বাদ্য যন্ত্রের আলাপে মুগ্ধ হইতেন। অনেকে তাঁহার নিকট ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, যথা সেতার এস্‌রাজ প্রভৃতি বাজাইতে শিখিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র এবং ছাত্রীমণ্ডলীর অনেকে তাঁহার নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। আমেরিকায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এবং আলোচনা হয়, ইহা তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার তিনি সমবেত ভক্তগণের নিকট ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিতেন।

এতদ্ব্যতীত রেডিওতে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান তাঁহার প্রচারকার্য্যের অন্তর্গত ছিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধুত্ব আমেরিকা ও ভারতের অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত জয় করিয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একবার তিনি কয়েক মাসের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া বম্বে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বহু জনসভায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা এলবার্ট হলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সদাপ্রফুল্লভাব, অভিমানরাহিত্য, প্রাণখোলা সবল ব্যবহার ও বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছেন। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের অকাল দেহত্যাগে কেবল মঠ মিশন নয় সমগ্র বঙ্গদেশ যে একটী অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইল সে অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

স্বামী সোমানন্দজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীমৎ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজীর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সোমানন্দজী গত ৪ঠা অক্টোবর মাদ্রাজ সহরে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সোমানন্দজী অন্ধ্র দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর সোমানন্দজী ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে কাশ্মীরে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্য সুদূর দক্ষিণ-দেশ হইতে সোমানন্দজী অনেক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হন। তিনি বেলুড়মঠে স্বামীজির পুণ্যসংসর্গে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশেই তিনি বেশীরভাগ কাটাইয়াছেন। মহীশূর সরকারের অনুরোধে, তিনি ব্যাংগালোর কারাগারের কয়েদীদিগকে নিয়মিতভাবে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন এবং ভজনাদিদ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

পরলোকে অধ্যাপক কালীকুমার কুমার

গত ২৩শে অক্টোবর, শনিবার কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ রসায়নের (Physical Chemistry) অধ্যাপক কালীকুমার কুমার ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কালীকুমার গত তিন বৎসর যাবৎ 'রক্তের চাপ'-রোগে ভুগিতেছিলেন; কিছুকাল যাবৎ হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়াও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছিল—ইহাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

কালীকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলুড়মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ প্রভৃতি প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দেরও তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রোগশয্যায় তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পরলোকে চন্দ্রমোহন দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত চন্দ্রমোহন দত্ত গত ৯ই অক্টোবর, শনিবার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত তিন বৎসর যাবৎ হাঁপানিরোগে ভুগিতেছিলেন, উহা হইতে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতা উপস্থিত হয় এবং যক্ষ্মারোগেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চন্দ্রমোহন ত্রিশবৎসর যাবৎ উদ্বোধন কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী ছিলেন; মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিবৃন্দের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

চন্দ্রমোহন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য এবং তাঁহার সেবায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এতদ্ব্যতীত রেডিওতে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান তাঁহার প্রচারকার্য্যের অন্তর্গত ছিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধুত্ব আমেরিকা ও ভারতের অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত জয় করিয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একবার তিনি কয়েক মাসের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া বম্বে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বহু জনসভায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা এলবার্ট হলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সদাপ্রফুল্লভাব, অভিমানরাহিত্য, প্রাণখোলা সরল ব্যবহার ও বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছেন। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের অকাল দেহত্যাগে কেবল মঠ মিশন নয় সমগ্র বঙ্গদেশ যে একটী অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইল সে অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

স্বামী সোমানন্দজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীমৎ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজীর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সোমানন্দজী গত ৪ঠা অক্টোবর মাদ্রাজ সহরে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সোমানন্দজী অন্ধ্র দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর সোমানন্দজী ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে কাশ্মীরে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্য সুদূর দক্ষিণ-দেশ হইতে সোমানন্দজী অনেক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হন। তিনি বেলুড়মঠে স্বামীজির পুণ্যসংসর্গে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশেই তিনি বেশীরভাগ কাটাইয়াছেন। মহীশূর সরকারের অনুরোধে, তিনি ব্যাংগালোর কারাগারের কয়েদীদিগকে নিয়মিতভাবে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন এবং ভজনাদিদ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

পরলোকে অধ্যাপক কালীকুমার কুমার

গত ২৩শে অক্টোবর, শনিবার কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ রসায়নের (Physical Chemistry) অধ্যাপক কালীকুমার কুমার ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কালীকুমার গত তিন বৎসর যাবৎ 'রক্তের চাপ'-রোগে ভুগিতেছিলেন; কিছুকাল যাবৎ হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়াও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছিল—ইহাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

কালীকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলুড়মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ প্রভৃতি প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দেরও তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রোগশয্যায় তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পরলোকে চন্দ্রমোহন দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত চন্দ্রমোহন দত্ত গত ৯ই অক্টোবর, শনিবার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত তিন বৎসর যাবৎ হাঁপানিরোগে ভুগিতেছিলেন, উহা হইতে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতা উপস্থিত হয় এবং যক্ষ্মারোগেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চন্দ্রমোহন ত্রিশবৎসর যাবৎ উদ্বোধন কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী ছিলেন; মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিবৃন্দের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

চন্দ্রমোহন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য এবং তাঁহার সেবায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদ

বেলুড় মঠে রেভারেণ্ড উইলমটের সম্বর্দ্ধনা—১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার অপরাহ্নে বেলুড় মঠে এক ভোজসভায় মার্কিন সাংবাদিক রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক উইলমটকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আমেরিকান ভক্ত মিসেস্ অ্যানি উষ্টার, মিস্ ফ্রান্সিস উষ্টার এবং মিস্ হেলেন রুবেলও উক্ত সভায় সম্বর্দ্ধিত হন। স্বামী মাধবানন্দ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠের পক্ষ হইতে এই শ্রদ্ধেয় অতিথিগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনাজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলীতে রেভারেণ্ড উইলমট যে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমেরিকায় রামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীকে যে সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করেন।

মিসেস্ উষ্টার এবং মিস্ হেলেন রুবেলের উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন যে, তাঁহাদের গভীর চিন্তাশীলতা ও গভীর ধর্ম্মপরায়ণতার—বিশেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি যে কত গভীর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাদের সহৃদয়তা, মহত্ত্ব, ধর্ম্মপরায়ণতা ও সাহায্যেই বেলুড় মঠে বিরাট মন্দিরটী নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইতেছে। মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরটী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গ করা হইবে। তাঁহাদের বিশ্ববিশ্রুত-শিক্ষাদাতা স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার বাসনা ছিল, কিন্তু তাঁহার সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, উহা কল্পনাতেই থাকিয়া যায়। এই শ্রদ্ধেয় অতিথিদ্বয়ের সহৃদয়তার ফলেই আজ সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল।

স্বামী অখিলানন্দ

আমেরিকার অন্তর্গত প্রভিডেন্সে রামকৃষ্ণ মিশনের যে কর্ম্মকেন্দ্র আছে, তাহার ভারপ্রাপ্ত স্বামী অখিলানন্দ বিদেশে মিশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমেরিকাবাসীর ভারতের চিন্তা-ধারার প্রয়োজন আছে।

রেভাঃ উইলমটের উত্তর

সম্বর্দ্ধনার উত্তরপ্রদান প্রসঙ্গে রেভাঃ উইলমট বলেন যে, বেলুড়ের এই মঠ নানাভাবে আধুনিক জগতের ধর্ম্মমন্দিরে পরিগণিত হইয়াছে। এই নব মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলেই কেবলমাত্র ভারতের নহে, যাঁহারাই বিশ্বধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি এই স্থানের উপর পড়িবে।

এক ব্যক্তির পক্ষে নানাধর্ম্মমতের সমন্বয়দ্বারা ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করা সত্যই এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। আরম্ভমাত্র হইলেও এই ভাব দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। পুরাতন ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বধর্ম্মের ভাবে ভরপুর হইয়া এক নূতন ধারায় জীবন-যাপনের যুগ শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

গত শতাব্দীতে জগতে বিজ্ঞানালোচনা প্রাধান্য লাভ করে এবং বিজ্ঞানের বলে অনেক কিছু নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে ইঁহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম-চিন্তা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার

সমাধানও হইতে পারে। অবিনশ্বর ভগবানের নিকট সকল মানুষই যে এক, সে বিষয়ে এক্ষণে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। ভগবানের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কিনা কিম্বা মানুষ পশুরই মতই কিনা, অথবা পশু অপেক্ষা কিছু চতুরমাত্র, আজ এই দুইটী প্রশ্নই বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

হিন্দু মুসলমানে বা ইহুদী খৃষ্টানে বিরোধের দিন চলিয়া গিয়াছে।

জগতের প্রধান ধর্ম্মমত সকল ভগবান যে এক তাহাই শিক্ষা দিয়াছে। এই সব ধর্ম্মমতাবলম্বীদের প্রধান কার্য্য হইতেছে ক্রমবর্দ্ধমান নাস্তিকতা হইতে জগৎকে রক্ষা করা। বস্তুতান্ত্রিক যুগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যাহাতে সক্ষম হয়, সেইভাবে নূতন ছাঁচে বিশ্বধর্ম্মের ভিত্তি পত্তনের প্রয়োজন আজ উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের দানগুলিকে গ্রহণ করিয়া উহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যামূলে উহাকে এক নূতন আধ্যাত্মিক স্তরে স্থাপনকরাও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র নানারূপ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ও সাধনাদ্বারাই ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করা সম্ভব, ইহা স্বীকার করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক সত্যের একটী সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করাও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, বিশুব বা শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ধর্ম্মমত অনুসরণ—অন্ততঃপক্ষে নিজে উহা অনুষ্ঠান করাতেই তিনি আজ জগৎবরেণ্য হইয়াছেন।

ভারতের এই সন্ধিক্ষণে অহিংসা ভারতের পক্ষে ঠিক আধ্যাত্মিক নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না সে বিষয়ে আমি তত সুনিশ্চিত নহি। মার খাইয়া দয়া করা শক্তিশালীর আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা নহে।

আধুনিক ভারতের দরকার অনমনীয় কর্ম্মশক্তি। পরিকল্পনার মাত্রা হ্রাস করিয়া এক্ষণে তাহার কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়া প্রয়োজন, বিপুল কর্ম্মশক্তিকে পরিচালিত করিতে পরিকল্পনাদ্বারা আমরা আমেরিকাবাসীরা উপকৃত হইতে পারি। ভারতের কল্পনাশক্তি বিপুল, এই বিরাট কল্পনাশক্তিকে কার্য্যকরী করা প্রয়োজন।

উপসংহারে বক্তা বলেন যে,আমেরিকায় ভারতবাসীর প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা, ভারতবাসীরাও সমভাবেই আমেরিকাবাসীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—সস্ত্রীক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বি, সেনগুপ্ত, মহম্মদ ইউসুফ আহম্মদ বাগদাদী (ইরাক), সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণ।

রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণগঞ্জ—নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনকর্ত্তৃক আগামী জানুয়ারী মাস হইতে একটী ছাত্রাবাস পরিচালনার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে আপাততঃ দশটী ছাত্র থাকিবার স্থান হইবে। নারায়ণগঞ্জ অতি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তথায় পাঁচটী হাইস্কুল চলিতেছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া স্থানীয় হাইস্কুলগুলিতে পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে পারিবে। ছাত্রদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধানের যথোচিত ব্যবস্থা থাকিবে।

দশ হইতে পনর বৎসর বয়স্ক ছাত্রগণকে গ্রহণ করা হইবে। ভর্ত্তিফিস দুই টাকা বাদে পড়ান, থাওয়া ও অন্যান্য চার্জ্জ মোট মাসিক ১২৲ টাকা। স্কুলের বেতন, কাপড়, বিছানা ও পুস্তকাদির ব্যয়ভার পৃথকভাবে অভিভাবককে বহন করিতে হইবে।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

দেশবাসিগণের নিকট আবেদন

যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বেলুড় মঠে তাঁহার মহামহিম গুরুদেবের পূত অস্থি স্থায়িভাবে রক্ষা করিবার একটী স্থান করিতে পারিলেন, তখন এক বিরাট দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধ হইতে যেন নামিয়া গেল, এই বোধ করিয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুগ যুগান্তর ধরিয়া ঐ পুণ্যস্থানে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" অবস্থান করিবেন, কারণ তিনি নিজ মুখে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমাকে মাথায় করে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই থাকব।" জগতের বিভিন্ন প্রান্তের নানামতাবলম্বী নরনারী যে বেলুড় মঠের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা যে-কেহ প্রতিদিন তথায় সমবেত ক্রমবর্দ্ধমান জনতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। উৎসবাদির দিনের ত কথাই নাই। ইঁহাদের অনেকে যথার্থ ভক্তিভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়া থাকেন এবং ঐ স্থানে প্রাণের ভিতর একটা শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। তথায় পবিত্রতা, প্রেম ও আধ্যাত্মিক শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য প্রকাশই যে তাঁহাদের ঐ প্রকার অনুভূতির কারণ, ইহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

স্বামীজির বিশেষ ইচ্ছা ছিল বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করা। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে উহার একটী নক্সাও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরটী যাহাতে গম্ভীর-ভাবদ্যোতক হয় এবং উহার নাটমন্দিরে যাহাতে এক সহস্র ভক্ত একত্র বসিতে পারে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কালের কুটিলগতিতে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হওয়ায় তিনি ঐ কল্পনা কার্য্যেপরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবিত মন্দিরের নক্সাটী এতদিন তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রক্ষিত ছিল। তাঁহারা এত বড় একটা অনুষ্ঠানের উপযোগী অর্থ কোথা হইতে পাইবেন? কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এক অপ্রত্যাশিত স্থল হইতে সাহায্যের প্রস্তাব আসিল। কতিপয় স্বার্থত্যাগী পাশ্চাত্য ভক্ত উক্ত মন্দির নির্ম্মাণোদ্দেশ্যেই সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা মন্দিরটী যত শীঘ্র সম্ভব নির্ম্মিত হউক। তদনুসারে স্বামীজির অনুমোদিত নক্সাটী অবলম্বনে একটী আংশিক পাথরের মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করান হয়। উহাতে বাহিরের দিকে চুণার পাথরের গাঁথুনিবিশিষ্ট একটী গর্ভমন্দির ও শুধু নিম্নাংশে ঐরূপ পাথরবসান একটী নাটমন্দিরের ব্যবস্থা হইল। কলিকাতা মার্টিন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে উহার নির্ম্মাণকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সম্পূর্ণ হইলে মন্দিরটী মহান ভাবদ্যোতক এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থাপত্য-শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু হইবে, এবং এমন সুদৃঢ় হইবে যে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। বলা বাহুল্য ইহা বঙ্গদেশের মন্দিরনির্ম্মাণের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে, কারণ এই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য প্রস্তরমন্দির একটীও নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রতিশ্রুত অর্থ মন্দিরের সমগ্র ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। উহা সম্পূর্ণ করিতে এবং রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ও পোস্তা প্রভৃতি উহার অত্যাবশ্যকীয় আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির ব্যবস্থা করিতে আরও অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইবে। সুতরাং ঐ অর্থ অবিলম্বে সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় যে, এ দেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এমন সহস্র সহস্র ভক্ত আছেন যাঁহারা আন্তরিক কামনা করেন যে বেলুড় মঠে তাঁহার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত মন্দিরটী যতদূর সম্ভব দৃঢ় ও ভাবব্যঞ্জক হয়। ইঁহারা স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের অভীষ্ট মন্দিরটীর নির্ম্মাণকার্য্যে কোন সাহায্য করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবেন। এইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সহায়তা করিতে সাদরে আহ্বান করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। আমরা এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নীরব থাকায় অনেকের ধারণা হইয়াছে যে মন্দিরের জন্য আবশ্যক সমুদয় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আর অর্থের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দেশবাসিগণের পক্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইহাই সময়। পাশ্চাত্য ভক্তদের সহিত এই শুভকার্য্যে যোগদান করিবার সুযোগ তাঁহাদের সম্মুখে। এইরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলিতভাবে, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য যাঁহার আবির্ভাব সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের মূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে।

এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

নিবেদক

১।১১।৩৭

স্বামী মাধবানন্দ

অস্থায়ী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

আধুনিক মনস্তত্ত্ব

সম্পাদক

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনের উপর প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান (Psychology) অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সভ্য জগতের সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, ললিতকলা, সমাজ, নীতি প্রভৃতি এই মতবাদদ্বারা অধুনা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত এবং রূপায়িত হইতেছে। একদিকে যেমন বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ক্রমেই "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা"র দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং জীবন-বিজ্ঞান (Biology) "সৃজন ক্ষমতা ও সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে"র উপর জোর দিতেছে, অপর দিকে তেমন মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) ও ব্যবহারবাদ (Behaviourism) নামক আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দুইটী মতেই ইচ্ছাশক্তি ও মনের প্রাধান্য—এমন কি মনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া জীবদেহ যন্ত্রের ন্যায় স্বয়ংসচল (automata) বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। একটী স্বল্পায়তন প্রবন্ধে এই জটিল বিষয়ের সকল দিক সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নহে। আমরা এই প্রবন্ধে মনস্তত্ত্ববাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ফ্রয়েড্ (Freud) বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মতে একটী বাটীর দুইটী তলায় যেমন দুইটী পরিবার বাস করে, ঠিক তেমন প্রত্যেক মানুষের দুইটী তলায় দুই প্রকার পরিবার বাস করিতেছে। মানুষের নীচের তলা তাহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয় কিন্তু এখানেই প্রত্যেকের বৃহৎ পরিবার বাস করে। এই পোষ্য আত্মীয়বর্গ পশুতুল্য, অসভ্য, কামুক, আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী ও ভয়ানক স্বার্থপর। আপন আপন বাসনা চরিতার্থ করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই বাসনা প্রধানতঃ কাম-মূলক। মানুষের সর্ব্বপ্রকার ভালবাসা ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মধ্যে ফ্রয়েড্ কেবল কামের অভিব্যক্তিই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে

নিম্নতলার অধিবাসিগণকে দ্বিতলে যাইয়া কামনা পূরণ করিতে হয়। মানুষের দ্বিতলে যে পরিবারবর্গ বাস করে, তাহারা আত্মবোধের বিষয়ীভূত, বিবেচক, সংযত, সম্মানার্জ্জনপ্রয়াসী এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে সদা সচেষ্ট। ইহাদের দরজায় একজন সতর্ক দ্বারবান্ সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত আছে। একতলার উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসীদিগকে দোতলায় প্রবেশ করিতে না-দেওয়াই ইহার কাজ। কিন্তু বাসনার অঙ্কুশ-তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হইয়া একতলার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে বলপূর্ব্বক, অনেকে দ্বারবান্‌কে উৎকোচ দিয়া, অনেকে ছদ্মবেশধারণ করিয়া এবং অনেকে দ্বারবানের উপদেশে অতিকষ্টে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দোতালায় যাইয়া উপস্থিত হয়। শেষোক্ত পবিত্রীকরণ-প্রণালীকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় উন্নয়ন বা সংস্কার (sublimation) বলে। ইহা দ্বারা মানুষের সামাজিক নিয়ম-বিরোধী অনৈতিক বা আইনবিরুদ্ধ আভ্যন্তর কাম প্রবৃত্তিকে প্রচলিত সমাজ, সভ্যতা ও নীতির অনুরোধে বাহ্যতঃ সংযত করিয়া রাখা হয়। মানুষের নিম্নতলা বা নির্জ্ঞান (unconscious) ভূমি হইতে বাসনাসমূহ দ্বিতল বা জ্ঞান (conscious) ভূমিতে যাইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার পথে দ্বাররক্ষক কর্ত্তৃক অবিরত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আপন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিষ্ফল আক্রোশে অধীর হয় এবং ইহার পরিণতি নানাবিধ স্নায়বিক রোগাকারে দেখা দেয়। মানুষের জ্ঞানস্তরের বাসনাসমূহ তাহার নির্জ্ঞানস্তরের বাসনাসমূহের প্রেরণাসঞ্জাত বিকৃত-রূপ। মানুষ তাহার নির্জ্ঞানবাসনার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। নির্জ্ঞানস্তরে কি কার্য্য চলিতেছে তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই। অতএব চিন্তা, অনুভব ও কার্য্যে মানুষের স্বাধীনতা নাই এবং এই সকল বিষয়ের জন্য মানুষ দায়ী নহে।

ফ্রয়েডের আধুনিক গ্রন্থে বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষের নিঃস্বার্থ কার্য্যাবলী তাহার সহজাত প্রবৃত্তি বা বাসনার (instinctive desire) সংস্কৃত রূপান্তর (sublimated version) অথবা সহজাত প্রবৃত্তির পক্ষে ত্যাগের জন্য ক্ষতিপূরণ (compensation for instinctive renunciations) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে এই সহজাত প্রবৃত্তি ও সভ্যতা বা সামাজিকতার মধ্যে চিরবিরোধ বর্ত্তমান। প্রচলিত সভ্যতা বা সামাজিকতা চায় মানুষের নির্জ্ঞান স্তরের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে (instinct) সংযত করিয়া নীতিপরায়ণ করিতে, এবং সহজ প্রবৃত্তি চেষ্টা করে সভ্যতা বা সামাজিকতাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে আপনাকে বিকাশ করিতে। সমাজে বাস করিবার জন্য সহজ প্রবৃত্তিকে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহারই ক্ষতিপূরণ বলিয়া মনস্তত্ত্ববাদিগণের অভিমত।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের বিচার-শক্তি (reason তাহার সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যে সিদ্ধান্তে উপনীত, তাহার বিচার বুদ্ধিও তদনুকূল যুক্তি প্রদান করে। ন্যায়ান্যায় বোধশক্তি (conscience) মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির পক্ষ হইতে ত্যাগস্বীকারের (instinctual renunciation) ফলমাত্র। অতএব মানুষের বিচার, বিবেক ও প্রজ্ঞা কোন বিষয়ের সত্যনির্ণয় করিতে অসমর্থ। এই দিক দিয়া বাস্তবের দৃষ্টিতে এগুলি অর্থহীন শব্দমাত্র। এইরূপে ফ্রয়েড্ তাঁহার মনস্তত্ত্ববাদে নাস্তিকতা, সংশয় ও অবিশ্বাসের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া মানুষের মধ্যে কেবল পশুত্বেরই প্রকাশ দেখিয়াছেন!

মনোবিদ্ অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল (Mc Dougall) তাঁহার বিখ্যাত (Outline of Psychology) গ্রন্থে মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) উপর বিশেষ জোর

দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত সহজাত প্রবৃত্তি ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানের (unconscious) অনুরূপ, ম্যাকডুগালের মতে মানুষের প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তা তাহার সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণাসঞ্জাত, এই প্রেরণা ভিন্ন মানুষের পক্ষে কোন কাজ বা চিন্তা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, যদি আমরা তর্কের অনুরোধে ধরিয়াও লই যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু আছে, তাহা হইলেও উহা সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণা ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে অক্ষম —সহজ প্রবৃত্তির আদেশ ভিন্ন সে ইচ্ছা অচল।

মনোবিজ্ঞান রাজ্যে ফ্রয়েডের পর য়্যাড্‌লার (Adler)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্রয়েড্ সে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, য়্যাড্‌লারও ভিন্ন পথ দিয়া সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। য়্যাড্‌লারের মতে মানুষ ক্ষমতাবিস্তারের প্রেরণা (urge to power) এবং আত্মস্বত্বাধিকার (self-assertion) স্থাপনের অপ্রতিহত বাসনার প্রতীক। তিনি বলেন যে, সহযোগিতা অপেক্ষা সকলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়া জগতের সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি মানুষের ভিতর অদম্য এবং ইহাই প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য। য়্যাড্‌লার শিশুর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার অভিমতের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াই জীবনধারণের জন্য অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া আপনাকে সকল বিষয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল, অকিঞ্চিৎকর ও পর-মুখাপেক্ষী বলিয়া বোধ করে। জীবনের বিরুদ্ধ-শক্তিসমূহের সঙ্গে একাকী স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায় সে দেখিতে পায় না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য অপরের উপর তাহার বাধ্যতামূলক নির্ভরতার ফলে সে আপনাকে অন্যের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করে। পক্ষান্তরে সে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম ও গমনাগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের উচ্চতর (superior) শক্তির তুলনায় আপনাকে অত্যন্ত নিম্নতর (inferior) শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করে। এই নিম্নতরবোধ (inferiority complex)-জনিত ক্ষতিপূরণের জন্য শিশু তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করিবার পথ অনুসন্ধান করে। এই চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইলে সে আক্রোশ বা অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে ইহাতে কোন লাভ না দেখিয়া ক্রমেই সে কল্পনারাজ্যকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে এবং যে জগৎ তাহাকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াছে তাহার উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করে। য়্যাড্‌লার বলেন যে, আপনাকে নিম্নতর বলিয়া বোধ হইতেই শিশুর জীবনের সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং এই বোধ মানুষের সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করে। মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাকে ইনি "পিতৃস্থলাভিষিক্তকরণ" (Father-transference) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। মানুষের শৈশবের মাতা পিতার উপর নির্ভরশীলতা নাকি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বকপোল-কল্পিত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে আরোপিত হয়! যে উপায়ে শিশু তাহার নিম্নতর বোধের ক্ষতি-পূরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদ্বারাই তাহার জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়া কর্ম্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। সকল মানুষের এই নিম্নতর বোধ এক রকম নহে। ইহা নানা প্রকার এবং ইহাদের পর্য্যায় অনুসারে ক্ষতিপূরণের চেষ্টাও বহুবিধ। তবে ক্ষমতাবিস্তারের অদম্য ইচ্ছা এবং সমাজে আপনাকে প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপ্রতিহত কামনা ইহার সার্ব্বজনীন সাধারণ লক্ষণ। এইরূপে য়্যাড্‌লার মানুষের মধ্যে কেবল প্রভুত্বলাভের অতৃপ্ত ইচ্ছারূপী 'সয়তান'ই দেখিয়াছেন!

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম বিভাগ

ব্যবহারবাদ (Behaviourism) নামে সুপরিচিত, ডাক্তার ওয়াটসন (Watson) এই মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা। ব্যবহারবাদিগণ বলেন যে, মন দেখা যায় না, সুতরাং ইহার অস্তিত্ব স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই অযৌক্তিক; পক্ষান্তরে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ইহা যে মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা প্রমাণিত হয় না। মানুষের চিন্তার বিষয় আমরা না জানিলেও তাহার কার্য্য আমরা দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষেও মানুষের শারীরিক ক্রিয়া বা ব্যবহার দেখিয়াই আমাদিগকে তাহার মনের গতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যবহার-বাদিগণ মানুষের যে মন আছে অথবা মানুষ যে চিন্তা করে তাহা স্বীকার না করিয়া তাহার শারীরিক কার্য্যাবলী বা ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিখ্যাত ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিক প্যাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জন্তুর ন্যায় মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী অর্থাৎ শরীর ভিতরে ও বাহিরে যে কাজ করে উহা (anything that the body does) বাহ্যিক উত্তেজনার উত্তর (response to external stimuli)-মাত্র। বিশেষ বিশেষ উত্তেজনা বিশেষ বিশেষ ব্যবহার বা ক্রিয়ারূপে শরীরে প্রকাশ পায়। প্যাভ্‌লভের মতে শরীরের সকল অংশ হইতে নিয়তউপনীত আবেগসমূহকে (impulses) ধরিয়া রাখিবার কেন্দ্রবিশেষের (receiving station) নাম মস্তিষ্ক। মানুষের চিন্তাবিশেষ তাহার মস্তিষ্কের এই আবেগবিশেষের প্রতিক্রিয়াপ্রসূত। মানুষের চিন্তা তাহার মস্তিষ্কের গতি বা ক্রিয়া (movement)-মাত্র। এই চিন্তা বা নীরবে বাক্যালাপ কোন উত্তেজনার ফল (response to a stimuli)। চিন্তা লোক-চক্ষুর অগোচরে সম্পন্ন হইলেও ইহা কোন উত্তেজনাসঞ্জাত শারীরিক ক্রিয়া (a bodily response)-মাত্র। এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বনে ব্যবহারবাদিগণ জন্তুর ন্যায় মানুষকে সর্ব্বাংশে দেহ-সর্ব্বস্ব বা স্বয়ংসচল জটিল যন্ত্রবিশেষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন!

প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান মতে সৃষ্টিকার্য্যে কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় আরোপ করা কল্পনা বলিয়া বর্ণিত। ফ্রয়েডের মতে ধর্ম্ম মানুষের নিরুদ্ধ উত্তেজনা-উপজাত (by-product) অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়জ উত্তেজনা স্বাভাবিক পথে উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ হইয়াই নাকি ধর্ম্ম, আর্ট, সংস্কৃতি প্রভৃতি উন্নত বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। বাধাপ্রাপ্ত বাসনা (thwarted desire) নাকি ক্ষতিপূরণের জন্য ধর্ম্মাদি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আপন অভিপ্রায় চরিতার্থের চেষ্টা করে। তাঁহার মতে নীতির অর্থ সভ্যতা ও সমাজের দায়ে মানুষের সহজাত অনৈতিক প্রবৃত্তি বা কার্য্যাবলীকে যুক্তি-যুক্তকরণ (rationalisation)। মনোবিজ্ঞানে অতীতের ন্যায় অজানার গর্ভে অবস্থিত ভবিষ্যৎ মানুষের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্দেশে বলিয়া প্রচারিত। কাজেই মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ সকলকে ধর্ম্ম ও নীতির মোহমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগের বর্ত্তমান সকল সুবিধাকে কাজে লাগাইতে পরামর্শ দেন! তাঁহারা বলেন যে, কল্পিত ভবিষ্যতের কুহকে সহজাত ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণাকে জল না দিয়া বলপূর্ব্বক সংযত রাখা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ত্তির অন্তরায়! যুবকগণের অসন্তোষ ও মানসিক ব্যাধির মূলেও নাকি ইন্দ্রিয়সংযমরূপ আত্মপীড়ন বর্ত্তমান! আধুনিক মনস্তত্ত্বের এই "কালাপাহাড়ী" মতবাদ প্রগতিপন্থী যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। ফলে এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণ এই ধর্মনীতি ও সমাজবিধ্বংসী মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া ক্রমেই মাত্রা ছাড়াইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইতেছেন। এ জন্য দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি,

সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রমেই কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণকে এই অকল্যাণকর মতবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

পাশ্চাত্যের এই মনস্তত্ত্ববাদ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহা দেখা ও স্পর্শ করা যায় তাহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের নিকট পদার্থ (matter) নামে পরিচিত ছিল, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থকে শক্তি (energy) হইতে অভেদ (indistinguishable) বলিয়া সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ্ প্ল্যাঙ্ক (Plank) বলিয়াছেন, 'আমি চৈতন্যকে (consciousness) মূলীভূত বা মুখ্যবস্তু (fundamental) বলিয়া মনে করি। পদার্থ (matter) চৈতন্য হইতে গৃহীত।'[১] স্যর্ জেমস্ জিনস্ (Sir James Jeans) প্রকাশ করিয়াছেন যে, পদার্থের শেষ অণু (ultimate atom or proton or electron) অবস্থাধীনে বিকিরণে (radiation) পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিণামে বিকিরণে পরিণত হইবে।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন, 'পৃথিবী একটী মহান্ যন্ত্র অপেক্ষা একটী মহান্ চিন্তা রূপেই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।'[৩] সুতরাং মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষকে যে দেহসর্ব্বস্ব বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনামাত্র। ব্যবহার-বাদিগণ মানুষের মনের প্রাধান্য—এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক এডিংটন (Eddington) মনসম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতায় মন প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক বস্তু (direct thing), অন্যান্য সকল দূরবর্ত্তী অনুমান (remote inference) -মাত্র'।[৪] বিজ্ঞানবিদ্ স্যর্ জেমস্ জিনসের মতে পদার্থ-রাজ্যে মন অনাহূত প্রবেশকারী নয়, পরন্তু পদার্থের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা।'[৫] ডাঃ ফ্যাং (Jung) তাঁহার বিখ্যাত (Modern Man in Search of a Soul) গ্রন্থে হিন্দুর যোগশাস্ত্রে আলোচিত মনস্তত্ত্বের তুলনায় পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বকে বর্ণপরিচয়মাত্র বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেমস্ (William James)-এর প্রসিদ্ধ (Varieties of Religious Experience) পুস্তকে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতি স্বীকৃত হইয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্য। ইহাতে স্পষ্ট যে, মন সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষিত সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব এইভাবে প্রত্যক্ষপ্রমাণিত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যাইয়া মানুষের বর্ব্বর (savage) ও আদিম (primitive) প্রবৃত্তির জয় ঘোষণা করিয়াছে! পক্ষান্তরে ধর্ম্মও মানুষের পশু প্রকৃতি অস্বীকার করে নাই, কিন্তু মানুষের এই পশুত্বকে দেবত্বে পরিণত করিবার উপায় দেখাইয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমত এবং প্রাতঃস্মরণীয় দেব-মানব বা অতিমানবগণ দেবত্বকে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্ট বলিয়াছেন, "Be perfect as your father in Heaven is perfect" 'তোমার স্বর্গস্থ পিতার

(১) Observer, 25th Jan, 1931.
(২) Sir James Jeans. The Mysterious Universe.
(৩) Speech at Bristol on 7th Sep. 1930 by Sir Oliver Lodge.
(৪) Eddington. Science and the Unseen World.
(৫) Speech at Bristol on 7th Sep. 1930 by Sir Oliver Lodge.

মত পূর্ণ হও।' ইহা দ্বারা মানুষ চেষ্টা করিলে যে দেবত্বলাভ করিতে পারে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। দর্শনশিরোমণি বেদান্ত মতে এই দেবত্ব মানুষের আগন্তুক ধর্ম্ম নয়, ইহা তাহার যথার্থ স্বরূপ, মানুষ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—"জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।" বেদান্ত সাক্ষাৎভাবে মানুষকে তাহার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ দেখাইয়াছে। সৎ অর্থ নিত্যস্থায়িত্ব বা অমরত্ব, চিৎ অর্থ জ্ঞান এবং আনন্দ অর্থ দুঃখশূন্য সুখ। শিশু, বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে এই সচ্চিদানন্দ লাভের প্রেরণা ভিন্ন অন্য কিছু দেখা যায় না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানুষ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে প্রতি চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের প্রতিপদবিক্ষেপের মূলে এই তিনটীর মধ্যে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগ্রহ বর্ত্তমান। উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, মানুষ পতি, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া আত্মাকেই ভাল বাসিতেছে। প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ভালবাসা হইতে মানুষের সচ্চিদানন্দ লাভের চেষ্টাই সূচিত হইতেছে। মৃগ যেমন তাহার নাভিস্থিত সুগন্ধের কারণ সন্ধানে অরণ্যে বিচরণ করে, অজ্ঞান ব্যক্তি তেমন বাহিরে সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধান করে এবং বারংবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াও বাহ্য বস্তুর মধ্যেই তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করে। জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার অভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দের প্রত্যক্ষ অনুভব করেন—আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করেন। এই পৃথিবীতে এমন জ্ঞানীরও অভাব নাই, যাঁহারা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়া সাধনসহায়ে আপনার নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে শত শত সন্দিগ্ধমনা শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবন দিয়া এই অনুভবের সত্যতা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের সাধনালোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মানুষ আধুনিক মনোবিজ্ঞানবর্ণিত স্বয়ংসচল যন্ত্রবিশেষ এবং মানুষের চিন্তা ও কার্য্য তাহার বাহ্যিক উত্তেজনার ফলমাত্র নহে। ঈশ্বর বা দেবতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ যে তাহার তথাকথিত নির্জ্ঞান উত্তেজনার দাসমাত্র এবং সকলের উপর প্রাধান্য স্থাপন যে মানুষের সর্ব্ববিধ চিন্তা ও কার্য্যের একমাত্র নিয়ামক শক্তি নহে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তাহা প্রমাণ করিয়াছে। মানুষ চেষ্টা করিলে 'প্রেয়'কে পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়'-পথ অবলম্বনে তাহার পশুত্বকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া যে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট মনস্তত্ত্ববাদের সিদ্ধান্ত কল্পনামাত্র। আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদের সমর্থকগণ যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-জীবনে প্রদর্শিত বেদান্ত দর্শনের যুক্তির আলোকে তাঁহাদের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাহা হইলে ইহার অযৌক্তিকতা ও অসত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

আচার্য্য সায়ণের বেদভাষ্য

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, পি-এইচ্.-বি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

(১)

আচার্য্য সায়ণরচিত বহুগ্রন্থের পুষ্পিকাতেই গ্রন্থের নামের পূর্ব্বে "মাধবীয়" বিশেষণটি দৃষ্ট হয়। সায়ণের রচিত "ধাতুবৃত্তি" নামক গ্রন্থ "মাধবীয় ধাতুবৃত্তি" নামে কথিত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতা ভাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তে যে পুষ্পিকা রহিয়াছে তাহাতেও "মাধবীয় বেদার্থ প্রকাশ নামক ঋক্‌সংহিতাভাষ্য" ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[১] সায়ণবিরচিত গ্রন্থের এইভাবে "মাধবীয়" আখ্যা হইবার কারণ কি হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন, এই সব গ্রন্থ মাধবেরই রচিত। কেহ কেহ বলেন, মাধব ও সায়ণ উভয়ে মিলিয়া এই সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বস্তুত পক্ষে আচার্য্য সায়ণই যে এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা আচার্য্য মাধবের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া সায়ণাচার্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে স্বরচিত গ্রন্থের পূর্ব্বে "মাধবীয়" আখ্যা যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। বুক্ক মহীপতি স্বয়ং মাধবাচার্য্যকেই বেদভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। মাধবাচার্য্য স্বয়ং উক্তকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া তদীয় অনুজ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সায়ণকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজকে বিজ্ঞাপিত করেন। বুক্ক মহীপতি তদনুসারে আচার্য্য সায়ণকে বেদভাষ্যাদি প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে মাধবের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যের ভূমিকাতে এই কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; "...... মহীপতি বুক্ক বেদার্থ প্রকাশের জন্য মাধবাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। তিনি মহারাজকে বলিলেন, রাজন্, আমার অনুজ সায়ণ সর্ব্ববেদাবৎ, বেদ-ব্যাখ্যায় তাহাকেই নিযুক্ত করুন। মহারাজ বীর বুক্ক বেদার্থ প্রকাশের নিমিত্ত সায়ণাচার্য্যকেই আদেশ করিলেন। আচার্য্য সায়ণ পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা অতি সঙ্ক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া এখন বেদার্থ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।[১]

(২)

আচার্য্য সায়ণ পাঁচখানি বৈদিক সংহিতার উপর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সময়ের পারম্পর্য্যক্রমে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে;

(১) কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা।
(২) ঋগ্বেদ সংহিতা।
(৩) সামবেদ সংহিতা।
(৪) শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্ব সংহিতা।
(৫) অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

সায়ণাচার্য্য ছিলেন, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাঁহার পক্ষে

১। ইতি শ্রীমদ্ রাজাধিরাজ পরমেশ্বর বৈদিক-মার্গ-প্রবর্ত্তক শ্রীবীরবুক্কসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয় বেদার্থ প্রকাশে ,

১। "তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধৎ বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশন্ মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে।
স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ।
সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্।

সর্ব্বপ্রথম স্বকীয় শাখার ভাষ্য প্রণয়নই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এরূপ মনে করিবার অন্তবিধ কারণও রহিয়াছে। যজ্ঞীয়কার্য্যের জন্ম যজুর্ব্বেদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। যজ্ঞ নিষ্পাদন কার্য্যে অধ্বর্য্যুই সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত; তিনি যজুঃ মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যাই প্রথমত আবশ্যক। আচার্য্য সায়ণ ঋগ্বেদের ভাষ্য-ভূমিকাতে ইহাই বলিয়াছেন,—"যজুর্ব্বেদই অধ্বর্য্যু সম্পর্কিত সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন করে এবং তন্নিষ্পাদিত যজ্ঞদেহ আশ্রয় করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্তোত্রশস্ত্ররূপে অবয়বদ্বয় ঋক্ ও সাম দ্বারা পূর্ণ করে। সুতরাং ঋক্ ও সামের আশ্রয়ীভূত যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা প্রথমেই করা উচিত। অতঃপর সামবেদ ঋগ্বেদের আশ্রিত বলিয়া এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে ঋগ্বেদেরই ব্যাখ্যা করা উচিত।"[১]

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, সায়ণ সর্ব্বপ্রথম যজুর্ব্বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তৎপর ঋগ্বেদ এবং তৎপশ্চাৎ সামবেদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে, "যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর প্রাধান্য হেতু পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন হোতার নিমিত্ত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা হইবে।"[২]

ঋগ্বেদ ব্যাখ্যার পরে সায়ণ সামবেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সামবেদের ভাষ্যের অবতরণিকাতেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে,—

"অধ্বর্য্যু যজুঃ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন; এই জন্য প্রথম যজুর্ব্বেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপর ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সামবেদ ঋগ্বেদেরই আশ্রিত, সুতরাং ইদানীং সামবেদের ব্যাখ্যা হইবে। যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে যিনি ইচ্ছুক তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পূর্ব্বোক্তক্রমে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।"[১]

সামবেদের ভাষ্য রচনার পরে সায়ণাচার্য্য শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রসংহিতায় ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের দুইখানি সংহিতা প্রচলিত,—মাধ্যন্দিনী ও কাণ্ব। মাধ্যন্দিনী সংহিতার ভাষ্য সায়ণের প্রাদুর্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য উব্বট কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি ছিলেন আনন্দপুরের অধিবাসী ইঁহার পিতার নাম বজ্রট, ভোজ-রাজের শাসনকালে উব্বট মাধ্যন্দিনী সংহিতায় ভাষ্য প্রণয়ন করেন।[২]

সংহিতাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশেষে অথর্ব্ববেদের ভাষ্য প্রণীত হয়,—

"পরকালে ফলপ্রদ বেদত্রয় (যজুঃ ঋক্ ও সাম) ব্যাখ্যা করিয়া এখন ইহ ও পর উভয়লোকে ফলপ্রসূ চতুর্থবেদ অথর্ব্ব ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।"[৩]

(৩)

আচার্য্য সায়ণ এক একখানি সংহিতাভাষ্য রচনা করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থেরও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমত তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করিয়া তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক ব্যাখ্যা

১। এবং সতি অধ্বর্য্যু সম্বন্ধিনি যজুর্ব্বেদে নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীরমুপজীব্য তদপেক্ষিতৌ স্তোত্রশস্ত্ররূপাবয়বাবিতরেণ বেদদ্বয়েন পূর্য্যেত ইত্যুপজীব্যস্য যজুর্ব্বেদস্য প্রথমতো ব্যাখ্যানং যুক্তম্। ততঃ ঊর্দ্ধং সাম্নাম্ ঋগাশ্রিতত্বাদ্ উভয়োঃ মধ্যে প্রথমতঃ ঋগ্ ব্যাখ্যানং যুক্তম্।

২। আধ্বর্য্যবস্য যজ্ঞেষু প্রাধান্যাৎ ব্যাকৃতঃ পুরা।
যজুর্ব্বেদো হথ হৌত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে।

১। যজ্ঞং যজুর্ভিরধ্বর্য্যু নির্মিমীতে ততো যজুঃ।
ব্যাখ্যাতং প্রথমং পশ্চাদ্ ঋচাং ব্যাখ্যানমীরিতম্।
সাম্নাম্ ঋগাশ্রিতত্বেন সামব্যাখ্যাহথ বর্ণ্যতে।
অনুতিষ্ঠাসু জিজ্ঞাসা বশাদ্ ব্যাখ্যাক্রমো হ্যয়ম্।

২। আনন্দপুর-বাস্তব্য-বজ্রটাখ্যস্য সূনুনা।
মন্ত্রভাষ্যমিদং ক্লৃপ্তং ভোজে পৃথ্বীং প্রশাসতি।

৩। ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়ম্ আমুষ্মিক ফলপ্রদম্।
ঐহিকামুষ্মিক ফলং চতুর্থং ব্যাচিকীর্ষতি।

করিয়াছিলেন—ইহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

ঋগ্বেদ সংহিতা-ভাষ্য-প্রণয়নের পরে ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচিত হইয়াছিল। তৎপর সামবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের ভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল। সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণ। সায়ণ সব কয়খানিরই ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। সময়ের পারম্পর্য্য অনুসারে তাহাদের তালিকা,—

(১) তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, (২) ষড় বিংশ, (৩) সামবিধান, (৪) আর্ষেয়, (৫) দেবতাধ্যায়, (৬) উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ, (৭) সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ, (৮) বংশ ব্রাহ্মণ।[২]

এই সমস্ত গ্রন্থই বুক্ক মহীপতির শাসনকালে প্রণীত হইয়াছিল।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের ভাষ্য রচনার পরে আচার্য্য সায়ণ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচনা করেন। মহারাজ বুক্কের পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের অনুজ্ঞাক্রমে শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল, ইহা উক্ত ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত হইতে জানা যাইতেছে। এই শতপথ ব্রাহ্মণের *ভাষ্যই আচার্য্য সায়ণের বৈদিকগ্রন্থের সর্ব্বশেষ* ভাষ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ হইতে আচার্য্য সায়ণ যে ক্রমানুসারে বৈদিক গ্রন্থসমূহের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা দেখান যাইতেছে,—

(১) তৈত্তিরীয় সংহিতা (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া)—
  (ক) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
  (খ) তৈত্তিরীয় আরণ্যক
(২) ঋগ্বেদ সংহিতা—
  (ক) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
  (খ) ঐতরেয় আরণ্যক
(৩) সামবেদ সংহিতা—
  (ক) তাণ্ড্য (প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশ) ব্রাহ্মণ
  (খ) ষড় বিংশ ব্রাহ্মণ
  (গ) সামবিধান ব্রাহ্মণ
  (ঘ) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ
  (ঙ) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ
  (চ) উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
  (ছ) সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
  (জ) বংশ ব্রাহ্মণ
(৪) কাণ্ব সংহিতা (শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া)
(৫) অথর্ব্ববেদ সংহিতা
(৬) শতপথ ব্রাহ্মণ (শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া)

১। ব্যাখ্যাতা সুখবোধায় তৈত্তিরীয়ক সংহিতা।
তদ্ ব্রাহ্মণং ব্যাকারিষ্যে সুখেনার্থ বিবুদ্ধয়ে॥

ব্যাখ্যাতা সুখ বোধার্থং তৈত্তিরীয়ক সংহিতা।
তদ্ ব্রাহ্মণং চ ব্যাখ্যাতং শিষ্টম্ আরণ্যক ততঃ॥

২। ব্যাখ্যাতাবৃগ্ যজুর্বেদৌ সামবেদোঽপি সংহিতা।
ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণস্যাথ ব্যাখ্যানং সংপ্রবর্ত্ততে॥
প্রৌঢানি ব্রাহ্মণান্যাদৌ সপ্ত ব্যাখ্যায় চান্তিমম্।
বংশাখ্যং ব্রাহ্মণং বিদ্বান্ সায়ণো ব্যাচিকীর্ষতি॥

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

স্বামী—

প্রশ্ন—মহারাজ, শুনেছি, ঠাকুর নিজে নানারূপ সাধন করেছিলেন এবং তিনি নানারূপ সাধন-পথের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের নিকট ধ্যানজপের উপদেশ ছাড়া অন্য কোন সাধন-পন্থার কথা আমরা শুনতে পাই না। ধ্যানের অবস্থা লাভ করবার উপায়স্বরূপ আপনাকে শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন, তা বলুন।

হরি মহারাজ—ঠাকুর কাউকে কাউকে বিভিন্ন সাধন-পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু আমাকে তিনি কেবল ধ্যান-জপেরই উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে গভীর রাত্রে (মধ্যরাত্রে) উলঙ্গ হয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন। ঠাকুরের একটী বিশেষত্ব ছিল, তিনি উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন, শিষ্য উপদেশ অনুযায়ী চলছে কি না। ঐরূপ উপদেশ দিবার পরই একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, ন্যাংটা হ'য়ে ধ্যান করিস ত?' 'আজ্ঞা হাঁ'। 'কেমন বোধ হয়?'—'মহাশয় যেন সমস্ত বন্ধন চলে গেছে'। 'হাঁ, ঐরূপ করবি। খুব উপকার পাবি'। আর একদিন তিনি (ঠাকুর) আমায় বলেছিলেন, 'মন মুখ এক করাই হচ্চে সাধন'। আমি তখন খুব শঙ্করের বেদান্তচর্চ্চা করছি। আমায় তিনি (ঠাকুর) বললেন, 'ওরে, জগৎ মিথ্যা, মুখে বললে কি হবে? ঐ নরেন ও কথা বলতে পারে। ও যদি জগৎ মিথ্যা বলে, জগৎটা অমনি মিথ্যা হয়ে যায়। ও যদি বলে, কাঁটা গাছ নাই, কাঁটা গাছ নাই হয়ে যায়, কিন্তু তোরা কাঁটায় হাত দে ত? কাঁটা অমনি প্যাট্ করে ফুটবে'।

প্রশ্ন—মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেছিলেন, ''ক্রিয়াশীল হ'তে হয়"। কি করতে হবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, 'এখন যা বলছি (অর্থাৎ ধ্যান-জপ) তাই করে যা, পরে তোকে বলে দেবো'। মহারাজ ত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, আপনি কিছু বলে দিন্।

হরি মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন, পরে বলিলেন, 'এক একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এক একটা ভাবের সাধন করতে হয়। মহারাজ ঐ ভাবসাধনকেই ক্রিয়াশীল হওয়া mean (অর্থ) করেছিলেন বোধ হয়'।

প্রশ্ন—আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

হরি মহারাজ—আমি তখন তখন এক একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতুম। 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী', এই ভাবটী কিছুদিন খুব সাধন করেছিলুম। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে সদা জাগ্রত থাকতুম, আর লক্ষ্য রাখতুম, ঠিক ঠিক ঐ ভাবটী সর্ব্বদা আছে কিনা। এইরূপে কিছুদিন গেল. আবার হয়ত 'আমিই ব্রহ্ম' এই ভাবটী কিছুদিন সাধন করলুম।

প্রসঙ্গক্রমে মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠিল। হরি মহারাজ বলিলেন, 'মহাত্মার মন মুখ এক'। একটী সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারীর কথা বলিলেন, 'ব্রহ্মচারী গম ভাঙ্গাইবার জন্য কাশীতে একটী দরিদ্র স্ত্রীলোকের নিকট গিয়েছিল। স্ত্রীলোকটী তখন কর্ম্মে ব্যাপৃত। ব্রহ্মচারী একটু দূরে বসেছিল এবং তার নিকটেই একবোঝা পাতা পড়েছিল। স্ত্রীলোকটী ঐ পাতার

বোঝাটী এগিয়ে দিবার অনুরোধ করায় ব্রহ্মচারী একটু ইতস্ততঃ করছিল। কারণ, তার অভিমানে একটু ঘা লেগেছিল। স্ত্রীলোকটী তা বুঝতে পেরে একটু হেসে বললে, 'মহারাজ, তোমরা কেবল মহাত্মা গান্ধীর জয় চীৎকার কর, কিন্তু তিনি যা বলেন, তা কর না। এরকম হ'লে স্বরাজ হবে কি করে? আমি তোমার কাজ করব, তুমিও আমায় সাহায্য করবে। কোন কাজ বড ছোট নয়। এই না মহাত্মার উপদেশ?'

হরি মহারাজ—স্বামীজি তখন আমেরিকায় আত্মার অজরত্ব ও অমরত্ব উপদেশ দিতেন, 'আমি আত্মা, আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমার আবার ভয় কাকে?' কতকগুলি cow-boys (রাখাল বালক) স্বামীজিকে পরীক্ষা করবার জন্য তাদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে। স্বামীজি যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই সময় তারা dead shots তাঁর কানের, মাথার নিকট দিয়ে চালাতে আরম্ভ করল; স্বামীজি কিন্তু নির্ভীক, অবিচলিত, তাঁর বক্তৃতারও বিরাম নাই। তখন সেই ছেলেরা আশ্চর্য্য হয়ে তার কাছে দৌড়ে গেল, আর বলতে লাগল, 'Here is our hero' একেই বলে মন মুখ এক।

প্রশ্ন—মহারাজ, ভগবানের আদেশ কিরূপে পাওয়া যায়?

হরি মহারাজ—একরূপ আদেশ হচ্ছে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে। তিনি যা করতে হবে নিজেই বলে দেন। তবে এ হচ্ছে অনেক পরের কথা।

আমি বলিলাম, হাঁ, মহাপুরুষ মহারাজের নিকট শুনেছি, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যখন যা করতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী করতেন।

হরি মহারাজ—হাঁ, আর এক রকম আদেশ আছে, তা অনেকেই পেয়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে হয়ত চলে যাচ্ছে, একটী ছোট ছেলে হঠাৎ একটা কথা বল্লে, আর তোমার কানে পৌঁছে তোমার সকল সন্দেহ চলে গেল। ঐ রকম ছেলের মুখ দিয়ে, পাগলের মুখ দিয়ে, আরও নানাপ্রকারে তুমি কোন কথা শুনতে পেলে, আর সেই কথাটী তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্তরে পৌঁছে তোমার জীবনের সংশয় কেটে যায়, আর তুমি মনপ্রাণে বুঝতে পার—এই ভগবানের অভিপ্রেত। আবার আদেশ পাবার জন্য সাধনও আছে। গীতায় ঐ যে মন্ত্রটী "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"॥ বারে বারে জপ করতে হয়। আর তখন শ্রীভগবান যে প্রকারেই হউক জানিয়ে দেন, কি করতে হবে। আমি তখন রাজপুতানায় ঘুরছি। একটী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। সাধুটী দেখলুম, এক জায়গায় চুপ করে বসে "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" এই মন্ত্রটী বারে বারে আবৃত্তি করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেটে হাত বুলুচ্ছে। শুনলুম, তার হজমের গোলমাল হয়েছে, আর গীতার ঐ মন্ত্রটী হচ্ছে তার ঔষধ।

পূজনীয় হরি মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় লইব, তিনি এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, "Give light and more light will come to you"—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"।

"যুগে যুগে প্রচারিত তব বাণী"

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল সান্যাল, এম্-এস্‌সি

ইতিহাসের পট-পরিবর্ত্তনে মোগল রাজত্ব শেষ হল, ইংরাজ শাসন আসল। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক জড়বাদ, বাংলার তথ্য সমগ্র ভারতের হিন্দুদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন করলে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ফলে সেদিন নব্য বঙ্গ বুঝি একদিনে খৃষ্টান হয়। কৃর্ম্মধর্ম্মে সেদিন আত্মরক্ষা দুষ্কর। দেশের অধ্যাত্ম জাগরণ সুরু হল, এবং খৃষ্টধর্ম্ম হতে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বাঁচালেন রাজা রামমোহন রায়। উত্তর ভারতে আসলেন দয়ানন্দ প্রভৃতি। হরিহরানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর প্রেরণায়, বেদান্ত ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইত্যাদি মিলিয়ে রাজা রামমোহন নূতন সমাজ স্থাপন করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ হতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। সে যুগে অনেক সাধক, মনীষী, চিন্তাশীল প্রভৃতি আসলেন—ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্বরানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি। আর নব্যতন্ত্রের ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র, অদ্বৈত বংশজ বিজয়কৃষ্ণ, ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি।

বিজ্ঞান দেশকালের দূরত্ব সাতিশয় কমিয়ে দিয়েছে। আজ জগতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসূত্রে গাঁথা। তাই জগতের অন্য সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকা ভারতের আর চলল না। ভারতের সমস্যা জগতের সমস্যা বোধে কেশবচন্দ্র চললেন বিলেতে। জগতের সমস্যা ভারতকে সমাধান করতে হবে এ প্রেরণা আসল দক্ষিণেশ্বরে।

এই প্রেরণা এক অপরূপ ব্যাপার, কিন্তু অভিনব নয়, ভারতের শাশ্বত ভাব। এই ভাব বুঝতে প্রথমে পার্থিব লীলা আমরা স্মরণ করব। সে লীলা এইরূপ—

কামারপুকুর গ্রামের ধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়া ধামে স্বপ্নে গদাধরকে দেখলেন পুত্ররূপে। ১২৪৩ সালে তাঁর ছোট ছেলে জন্মাল, নাম হল গদাধর। পাঠশালে পড়ায় গদাইএর তত মন নেই, মাঠে ঠাকুরদের গান গেয়ে বেড়ান ও লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেশার ঝোঁক। শিব বা কৃষ্ণ সেজে গান করতে অথবা পূজা—খেলতে সময় সময় অচেতন হয়ে যান। ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর বড় ছেলে রামকুমার কলকাতায় টোল খুলে গদাইকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং ভালরূপ সংস্কৃত লেখা-পড়া শেখাতে আগ্রহ করলেন। গদাধরের শুধু পূজা-বাতিক, তাঁর চিন্তা—ভাল লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগার করে কি হবে? তাতে ত ভগবানকে পাওয়া যাবে না? এ যেন ব্রহ্ম-বাদিনী মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। কাযেই সংস্কৃত পড়া এগুল না।

এদিকে পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি স্বপ্নাদেশে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে ভবতারিণী কালীমূর্ত্তি, রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ ও দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন; রামকুমারকে পুরোহিত-বরণ করা হল এবং তাঁর সঙ্গে গদাধরও দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। গদাধর প্রথমে ঠাকুরের বেশকার ও কিছুদিন পরে রাধাগোবিন্দের পূজক হলেন। গঙ্গাতীরে এই কাননে মন্দিরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে গদাই বা রামকৃষ্ণ

কি পেলেন কে জানে! তাঁর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ সন্তান উপনয়নের পর সামান্য পূজা অর্চ্চনা শিক্ষা করেছেন, মন্দিরেও তখন পর্য্যন্ত শুধু পূজার সাহায্য করার কাজ, সাধনপ্রণালী কিছুই প্রায় জানা নেই। কিন্তু তখন মন্দিরে ও গঙ্গাতীরে ধ্যানে কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেল, কতদিন তিনি অনন্ত চিন্তায় রইলেন। শাস্ত্রজ্ঞান নাই, পূজায়ও বিধি বিধান নাই। ক্রমে তিনি ভগবৎ দর্শনের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, মার দেখা না পেলে প্রাণ আর রাখবেন না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" হঠাৎ একদিন কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সব ভরে গেল, তীব্র অনুভূতিতে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহারা অবস্থায় তাঁর দিন দুই কাটল! স্বল্পক্ষণের জন্য জ্যোতিঃঘন রূপদর্শন—রূপদর্শন তৃষ্ণাকে আরও বাড়িয়ে দিলে। বালক ধ্রুবেরও এইরূপ প্রথম হরিদর্শনের পর তৃষ্ণা বেড়েছিল, লীলাশুকেরও এইরূপ বৃন্দাবনপথে দর্শনের পর তৃষ্ণা বেড়েছিল। "যমেবৈষ বৃণুতে" যাকে তিনি নিজের বলে চিহ্নিত করে বরণ করেন তারই এরকম হয়।

কতকটা উন্মাদ অবস্থায় প্রায় ছয়মাস কাটল। এদিকে দক্ষিণেশ্বর বাগানে পঞ্চবটী স্থাপন করে রাত্রে সেখানে সাধন করতে লাগলেন। কোথা হতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী—পরে বৈদান্তিক সাধু তোতাপুরী এসে সন্ন্যাস দিলেন, নাম দিলেন রামকৃষ্ণ। শিষ্যের নির্ব্বিকল্প সমাধি হল। সাধারণ লোকে বায়ুরোগ মনে করে গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে এনে চিকিৎসা করালে। গঙ্গাসাগরের পথে কত সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। এঁদের মধ্যে কেহ কেহ রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলতে লাগলেন।

বাল্যকালে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এই গুপ্ত সন্ন্যাসীর কোন দৈহিক সম্বন্ধ একেবারেই ছিল না। তিনি 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করেন, আপন মনে মা কালীর সঙ্গে কথা বলেন, মন্দিরে পূজা করেন এবং বিচার বিতর্কদ্বারা মনে বৈরাগ্য সাধন করেন।

মদোমাতালেরা অন্যলোকের সঙ্গ না করলে, বহুলোক একসঙ্গে নেশা না করলে মজা পায় না। সহস্রার সুধাপানকারী মনমাতালেরাও হয়ত সেইরূপ মাঝে মাঝে পরস্পরের সঙ্গ চায় অথবা পরস্পরকে সাধনপথে সাহায্য করবার জন্য দৈব-প্রেরিত হন। কোথা হতে যোগেশ্বরী নামে এক ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসলেন। সংস্কৃত ভাষা, বেদ, বেদান্ত, বৈষ্ণব গ্রন্থাদি ও তন্ত্রশাস্ত্রে অধিকারিণী এই ব্রাহ্মণী শাস্ত্রবচনের দ্বারা প্রমাণ করলেন, পরমহংসদেবের যে সমাধি হয় তার নাম মহাভাব এবং চৈতন্যদেবের পর আর কারো এরূপ হয়েছে বলে শুনা যায় না। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও ব্রাহ্মণীর কথার সমর্থন করলেন এবং শাস্ত্র মিলিয়ে দেখলেন, সাধন-কালে পরমহংসদেবের বিভিন্ন অবস্থাগুলির একটীও অশাস্ত্রীয় নয়।

ব্রাহ্মণীর সহায়তায় বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডী আসন করে তন্ত্রোক্ত যাবতীয় সাধন চলল। এগুলি যেন সাধকের চিত্তের দৃঢ়তা পরীক্ষা। এই সময়ে রামকৃষ্ণের নিকট কত তান্ত্রিকের সমাগম হত, তাঁদের জন্য কারণ ও ছোলাভাজা প্রভৃতি থাকত। কিন্তু রামকৃষ্ণ কখনও কারণ জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করেন নাই। আপন স্ত্রীর সহিত তিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করতেন। বার বৎসর দক্ষিণেশ্বরে থেকে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণের সাধনের সহায় হন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বাৎসল্য ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করে ব্রাহ্মণী যেরূপ ব্যবহার করতেন, তাতে ভক্ত রামপ্রসাদের কথা স্মরণ করে এই ভৈরবী প্রকৃতপক্ষে কে, সে বিষয়ে সন্দেহ আসে।

এরপর কর্ত্তাভজা, নবরসিক, বাউল প্রভৃতি

সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গের রস আস্বাদন করা হল। পরে এক রামাৎ সন্ন্যাসীর আগমনে হনুমানের মত অহৈতুকী ভক্তির সাধন আরম্ভ হল। রামাৎ সাধুর রামলালা মূর্ত্তি পেয়ে তাঁর সহিত শিশুর ন্যায় ব্যবহার—বাৎসল্য ভাব। পরে কিছুদিন বৈষ্ণব সাধনার সখীভাবে এরূপ বিভোর হয়ে যান যে, মথুর বাবুর অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকের ন্যায় কিছুদিন বাস করেন। সর্ব্ব অবস্থায় এই তন্ময়তা সর্ব্বরস আস্বাদের বিশেষ সুবিধা করে দিলে।

মুসলমান ধর্ম্মের সাধন-প্রণালী হিন্দুর জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার জন্য কয়েকদিন এই মতে চলে দেখলেন, মহম্মদীয় সাধনপ্রণালীর অভিপ্রায়ও একই রূপ। মেরীর ক্রোড়ে যীশুর ছবি দেখে এত বিভোর হলেন যে, তিন দিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় বড় গীর্জায় প্রার্থনা পাদ্রিদের কথা প্রভৃতি শুনতে থাকলেন। এরপর ধীরে ধীরে বাহ্য পূজা কমে আসতে লাগল।

রামপ্রসাদ যাকে বলেছেন "আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মাকে"। তখন অহরহঃ অনুভূতি

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥'

তখন বৈদিক যজ্ঞশেষ আর কর্ম্ম নাই, বাহ্য অবস্থায় শুধু অজপা সাধন, আর মা ও ছেলের লীলামাধুর্য্য। এ মেরি ক্রোড়ে চিরশিশু।

এরপর ভক্ত সঙ্গে লীলা সুরু হল। তার রস-গ্রহণ করতে ভক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেমন গহন বনে ফুল ফুটলেও তার সৌরভ চারদিকে ব্যাপ্ত হয়, তখন অসংখ্য মৌমাছি নিজেদের গরজে সেখানে ছুটে যায়। তেমন কত রকমের লোক দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে আসতে লাগল। যে সকল গৃহী সংসারে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত বা অশান্ত চিত্ত নিয়ে শান্তির আশায় ভক্তিভরে তাঁর কাছে গিয়েছেন, তাঁদের সকলের চিত্ত রামকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্রামলাভ করেছে। তাঁদের অশ্রু মুছিয়েছেন, হৃদয়ে পাপের সংগ্রাম থেমে গিয়েছে, প্রকৃতই দুঃখ ঘুচেছে। কত জ্ঞানী ভিন্নপথাবলম্বী ভাবুক অজানিত ঝঙ্কারে শুধু সঙ্গ করবার জন্য তাঁর নিকট আসত। এদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র ও পণ্ডিত শিবনাথ প্রভৃতিও ছিলেন। শিশুর ন্যায় তাঁর মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা, সাধনার একাগ্রতা, সর্ব্বধর্ম্মে সমদৃষ্টি, গভীর সত্যানুভূতি, প্রগাঢ় শাস্ত্র-জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধির চিহ্নাদি দেখে সবাই মুগ্ধ হত।

কিসে কি হয় বলা যায় না। পূর্ব্বে কেশব চন্দ্রের বক্তৃতায় ঈশার ভাব, খৃষ্টধর্ম্মের Holy Ghost এর কথার প্রাচুর্য্য থাকত। হঠাৎ তিনি মায়ের নামে মাতলেন, হিন্দু ত্যাগীর ন্যায় সাধনে চেষ্টিত হলেন, নববিধান সমাজে গৌরাঙ্গদেবের কথা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিভাবের লক্ষণ ফুটল।

তাঁর অন্তরঙ্গ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, লাটু শরৎ, শশী প্রভৃতি ভক্ত সন্ন্যাসীদের আগমনে লীলার বিকাশ হল, আমরা তাঁর "কথামৃত" পেয়ে ধন্য হলাম। সকলকে অতি সরলভাবে ঈশ্বরলাভের পথ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর গুরুগিরির ভাব ছিল না, কেউ প্রণাম করবার পূর্ব্বেই তিনি তাকে নমস্কার করতেন।

অতি সরল ভাষায় পুরাণের মত রূপকে তিনি বেদ উপনিষদাদির তথ্যের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর জীবনে এগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। মায়ের কৃপায় অসীম জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল। তিনি কর্ম্মত্যাগী, সন্ন্যাসী, অনাসক্ত, অনুরাগী। যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব মদনকে ভস্ম করে উমাকে গৃহে এনেছিলেন, তাঁর মাতৃনামের শক্তিতে মদন মূর্চ্ছিত, নিজ গেহিনীতে তিনি দেখেছিলেন শিব-গেহিনীকে।

শিষ্যদের মধ্যে তিনি নরকে নারায়ণ-বোধে সেবার প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি নিজে দীনাতিদীন

মেথরের কাজ করে সমদৃষ্টি ও বিশ্বপ্রেম শিখিয়েছেন। বৈষ্ণবের নিষ্ঠা, নারদ ও শুকাদির ভক্তি উচ্ছ্বাস ছিল তাঁর পূজার উপচার।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে নিত্যবিরোধ, সঙ্কীর্ণতা ও দ্বন্দ্বের প্রাবল্যে ভারত মুহ্যমান। আজ তাই তাঁর কথার প্রথমেই মনে আসে, "যত মত তত পথ," সকল ধর্ম্মমতই সত্য। সৃষ্টির আরম্ভ হতে অদ্যাবধি প্রচারিত সকল মতের ভিতরের রূপকে তিনি নিজ সাধনায় প্রাণ দিয়েছেন। বেদপন্থীর চক্ষে বিরাট পুরুষের বিশ্বসৃষ্টিই এক মহাযজ্ঞ।

সেই মুক্তপুরুষ স্বেচ্ছায় আপন দেহকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করছেন। তিনি কেবলই আপনাকে ত্যাগ করছেন, মহাকাল ব্যাপিয়া এই যজ্ঞ চলছে।

যজ্ঞভূমি এই ভারতে বহুসহস্রব্যাপী যে যজ্ঞ চলছে, তাঁর সাধনা, সেই যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ। বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধির, তুরীয় সোঽহং অবস্থার পর যজ্ঞ শেষ। তিনি আপনাকে ত্যাগ করেছেন, আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজ শিষ্যদের মধ্যদিয়ে সারাবিশ্বে। পুরাণে যজ্ঞরূপী বিষ্ণু দৈত্যের নিকট হতে ত্রিপাদ ভূমি অধিকার করেছিলেন। অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা ছিল তখনকার বিশ্বের সীমা। এবার আমেরিকা ইউরোপ।

ভোগোন্মত্ত প্রতীচী আজ নৃত্যপরা ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। যন্ত্রকলা তার ভোগের অনন্ত উপকরণ যোগাচ্ছে। জড়সাধনায় পাশ্চাত্য অসীম শক্তি লাভ করেছে। সে চাচ্ছে শক্তির স্বামিত্ব, শক্তির প্রতিজ্ঞা 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।' বিজ্ঞান-সাধনায় সকল বিষয়ে দক্ষতা লাভ করে সে প্রজাপতি হয়েছে, দম্ভে নিজেকে লয়ে উন্মত্ত হয়েছে। তার রাষ্ট্রে হিট্‌লার মুসোলিনির বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! পশ্চিমের শিল্প-বিজ্ঞান লৌহময় দন্ত বিকাশ করে বিরাট কারখানার আকারে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব গ্রাস করছে। তার ভূত-সাধনায় ত্রিভুবন তাপিত! পশ্চিম পেয়েছে শিবহীন শক্তি, ভোলানাথ না থাকায় পাগলী ক্ষিপ্ত হয়েছে! দক্ষের যজ্ঞ—শিবহীন যজ্ঞ চলছে।

এ হেন যজ্ঞেও সৃষ্টি-শক্তিরূপী ব্রহ্মার নিমন্ত্রণে দেবতারা এসেছেন, এমন কি বিনা নিমন্ত্রণে শিবও নিকটে। প্রতীচ্যের সদ্‌বুদ্ধিরূপিণী কন্যা সতী যজ্ঞে দেহত্যাগ করেছেন, ফলে প্রমথের নৃত্য চলছে! দক্ষের মৃত্যু নাই, সে বিকৃতরূপ ছাগমুণ্ডে পরিণত।

বাংলার গঙ্গাতীরের শিবযুক্ত শক্তিসাধক তিনি। যে মন্ত্রে নৃত্যপরা মুণ্ডমালিনী পদতলে পতিত শিবের দিকে চেয়ে শান্ত হয়, তার ভীমমূর্ত্তি ছেড়ে মাতৃমূর্ত্তিতে হাস্য করে, সেই মন্ত্র জগতে প্রচার করলেন তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ, তাই জগৎ অবনত মস্তকে তাঁর বাণী গ্রহণ করলে। আজ আমরাও বলি,

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র দাও গো জীবন নব॥"

এই মন্ত্রে আমরা বেঁচে উঠব। কবির সঙ্গে আমরাও বলি—

"আরও আলো, আরও আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো।"

পরমাণু

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

সৃজনের উপাদান তুমি পরমাণু
মাটির কাঠিন্য তুমি, জলের জলীয়
মহাব্যোমে স্পন্দমান সূক্ষ্ম বায়বীয়
তব ঘনীভূত রূপ জ্বলন্ত কৃশাণু ॥
তুমিই করেছ সৃষ্টি জ্যোতির্ময় ভানু
বিদ্যুতের বিদ্যুতিন ওগো বরণীয়
দার্শনিক কণাদের চিরবন্দনীয়
আদিম স্পন্দনে জাত বিশ্বের বীজাণু ॥

প্রকৃতির প্রেক্ষাগারে তুমিই সম্বল,
তোমার রহস্য চির অসীম অতল
অলক্ষ্যের যাদুমন্ত্রে নর্ত্তন তোমার
চলিয়াছে অবিরাম সৃজনেরে ঘেরি'
সসীমের দাম্ভিকতা করি ছারখার
প্রলয় নিশীথে বাজে তব জয়ভেরী ॥

চৈতন্য সাগরে তুমি চলেছ ভাসিয়া
সমষ্টির জন্মদাতা ওগো অণীয়ান
দিক দেশ কাল ছেয়ে তব অভিযান
বৃত্তাকারে ঘূর্ণ্যমান বিশ্ব আন্দোলিয়া ॥
ঈথর তরঙ্গ রাশি কম্পিত করিয়া
জড়ের কঙ্কাল তুমি করেছ নির্ম্মাণ
পঞ্চভূতে নামরূপ করিয়া প্রদান
আণবিক বিবর্ত্তনে নিখিল ভরিয়া ॥

নিশ্চিহ্নে হ'তেছ পুনঃ রহস্যে বিলীন,
মহাশূন্যে আত্মহারা অস্তিত্ববিহীন,
দৃশ্যমান পদার্থের ভাঙ্গি' অহংকার,
নামরূপ কর্ম্ম তাই মিথ্যা মরীচিকা
দুর্জ্ঞেয় কারণে চলে সৃজন তোমার
সুদুর্জ্ঞেয় চলে পুনঃ ধ্বংস বিভীষিকা ॥

শ্রীশ্রীমা

শ্রীলীলাময়ী দে

উদ্যানে কত সহস্র সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু উহাদের সকলেরই ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। ঐ সহস্র সহস্র পুষ্পের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি তাঁহার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়া পুষ্পজীবনের সার্থকতা লাভ করে। সেইরূপ এই পৃথিবীতে কত সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই দেবত্বের বিকাশ করতঃ স্ব স্ব জীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা ঐরূপে চরিত্রবলে জীবনের চরম সাফল্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত গুপ্তভাবে জীবন কাটাইয়া গেলেও, তাঁহাদের জীবনকথা অনন্তকাল পর্যন্ত শত সহস্র নরনারীর ধ্যানের সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়া থাকে; তাঁহাদের দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পুণ্যজীবনের সামান্য একটা ঘটনারও অনুধ্যান করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধ আনন্দ উপভোগ করে। মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীমার দেবজীবন উহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানবচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আত্মসুখস্বচ্ছন্দ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষ এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া, বাহ্যদৃষ্টিতে অতি সাধারণ নারীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকিয়া এই মহীয়সী নারী পবিত্র জীবন যাপন করতঃ জগতে যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে শত শত নরনারী যে পরম শান্তি অনুভব করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১২৬০ সালে ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা ৭মী তিথি রাত্রি দুই দণ্ডের সময় বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে জননী সারদামণি জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। "মা" তাঁহারই কন্যারূপে ধরিত্রীকে কৃতার্থ করিতে অবতীর্ণা হন।

বর্ত্তমানযুগে ভোগৈকলক্ষ্য আধুনিক নরনারীর সম্মুখে দাম্পত্য জীবনের অত্যুচ্চ পবিত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা অতি শৈশবেই ঠাকুরের সহিত মিলিতা হন। ১২৬৬ সালে মাত্র ৬ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমার সহিত ঠাকুরের শুভপরিণয় হয়।

পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রাম মধ্যে স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া শৈশবকাল হইতেই মা অনেক গুণসম্পন্না হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, বিনয়, উপচিকীর্ষা এবং চিত্তের পবিশুদ্ধিতা প্রভৃতি কোন গুণেরই অভাব তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রায় সাত বৎসর পরে ১২৭৩ সালে মা প্রথম শ্বশুরালয় কামারপুকুরে আগমন করেন। বহুদিন পর মার এই প্রথম আগমনে শ্রীরামকৃষ্ণের দরিদ্র সংসারে আনন্দের হাট বসিল। বস্তুতঃ বিবাহের পর শ্রীশ্রীমার এই প্রথম স্বামিদর্শন। স্বামিসেবা করিতে পারিলে তিনি পরিতৃপ্তা থাকিতেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ। কয়েকমাস পরে ঠাকুর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীমা-ও পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

তারপর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মা এখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী। বিবাহের পূর্ব্বে ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ হইবার কথা যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এখন সেই সব কাহিনী ততোধিক ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। সরলপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব মনঃকষ্ট অনুভব করিলেন এবং স্বামী সমীপে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রামচন্দ্রও ইহা শুনিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আসিবার জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তখন রেলপথ অথবা কোন বাষ্পীয় যান ছিল না, সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য কোন উপায় ছিল না। শিবিকারও অভাব হওয়ায় কন্যা ও কতিপয় সঙ্গিসহ রামচন্দ্র পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তখন বসন্তকাল। প্রকৃতি তখন অভিনব কান্তি ধারণ করিয়াছে এবং বন উপবনের বৃক্ষরাজি মনোমুগ্ধকর ফুলফলাদিতে সুশোভিত হইয়াছে। প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্যাবলী এবং অশ্বত্থ বট বৃক্ষাদির শীতল ছায়া তাঁহাদের পথকষ্ট কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছিল। দুই তিন দিন এইভাবে চলার পর অকস্মাৎ পথিমধ্যে মা প্রবল জ্বরে আক্রান্তা হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র নিকটস্থ চটীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। এই সময় তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন। এই দর্শনের কথা তিনি স্ত্রীভক্তদের নিকট নিম্নলিখিতরূপে বলিয়াছিলেন :—

"জ্বরে যখন আমি অচেতন তখন একটী মেয়ে আমার পার্শ্বে বসিল। রং তার কালো কিন্তু দেখিতে অপরূপ সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

সে বলিল, "দক্ষিণেশ্বর হইতে।"

অবাক হইয়া বলিলাম, "আমিও ত যাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু তাহা বুঝি আর হইল না।"

মেয়েটি বলিল, "তুমি আরোগ্য হইয়া নিশ্চয় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিবে। তোমার জন্যই ঠাকুরকে আটকাইয়া রাখিয়াছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমাদের কে ?"

মেয়েটি বলিল, "আমি তোমাদের বোন।"

এই কথোপকথনের পর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন রামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্নদর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই একখানা শিবিকা মিলিল। ইহাতে আরোহণ করিয়া রাত্রি নয়টার সময় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ঐ স্বপ্নদৃষ্ট মেয়েটি বোধ হয় স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরের "কালী মা," শ্রীশ্রীমার হৃদয়ে সাহস, শক্তি ও আশা জন্মাইতে আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর স্বহস্তে শ্রীশ্রীমার সেবায় নিরত হইলেন। অত্যল্পকালেই মা আরোগ্যলাভ করিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে মায়ের জীবনের সর্ব্ববিধ শিক্ষার সূত্রপাত হইল। একদিকে সাংসারিক জীবনের সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দিয়া ঠাকুর মাকে যেমন আদর্শ গৃহিণী স্থানীয়া করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি সাধনার সূক্ষ্মতম রহস্যসমূহের সহিত পরিচিত করিয়া— দয়া-দাক্ষিণ্য, করুণা, অসীম ধৈর্য্য-ধারণ প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারিণী করিয়া মাতৃত্বের অত্যুচ্চ আসনে বসাইয়াছিলেন।

মা স্বভাবতই মিষ্টভাষী কর্ম্মঠ এবং সেবা-পরায়ণা ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার আচরণে সকলে প্রীত হইলেন। তখন প্রায়ই তাঁহাদের ভবনে বহুলোকের সমাগম হইত। মা নিজহস্তে কোন কোন দিন ৩০।৪০ জনের অন্ন রন্ধন করিতেন।

তিনি কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। সর্ব্বদা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় রত থাকিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মা নহবতে থাকিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে কাহারো শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। মন্দিরে কত লোক থাকিত, কিন্তু কেহই তাঁহার কেশাগ্র দেখিতে পাইত না।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রঘুবংশরবি অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে জনক-রাজ-দুহিতা সীতাদেবীর প্রভাব যেরূপ ক্রিয়া করিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেবরক্ষিত চরিত্রেও মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীমার প্রভাব ঠিক সেইরূপ গভীরভাবে ক্রিয়া করিয়াছে। ধর্ম্মে ছিল মার প্রগাঢ় অনুরাগ। আমরা দেখিতে পাই যে গোপা ও বিষ্ণুপ্রিয়া যুগাবতার বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণে বাধা দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ ভাবটি মোটেই ছিল না। তিনি বরং ঠাকুরের সাধন ভজনে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মা ছিলেন সরলা, কিন্তু ঐ সরলতার ভিতর তাঁহার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে পান সাজিতে এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা সমস্ত কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর একেবারে পুরাদস্তুর মাতালের মত টলিতে টলিতে 'মা'য়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি মদ পান করিয়া মাতাল হইয়াছি?" মা ঠাকুরের এই ভাবাবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এবং তখনই বলিলেন, "না, মদ খাইবে কেন? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খাইয়াছ।" ইহাতেই আমরা মায়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাই।

ঠাকুরের প্রতি মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যদি কেহ তাঁহার নিকট অনুনয় করিয়া বলিত, "আপনি একবার বলুন 'অসুখ সারিয়া যাক', তাহা হইলেই অসুখ সারিয়া যাইবে।" কিন্তু মা-ও দৃঢ়ভাবে ঐ একই কথা কহিতেন, "আমি কি তাহা বলিতে পারি? ঠাকুর যাহা করেন, তাহাই ত হইবে। আমি কি করিতে পারি?"

শ্রীশ্রীমার সারল্যপূর্ণ সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রচলিত আছে:—একবার পদব্রজে জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে "তেলোভেলো এবং কৈকলার" বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে পথ হারাইয়া বিপন্না হইয়া বলিষ্ঠ ও ভীষণ আকৃতির এক অপরিচিত ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীর দেখা পাইলেন। তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীতা না হইয়া তাহাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি পথ হারাইয়াছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে, আমি সেখানে যাইতেছি"। এই "তোমার জামাই" কথাটিতে মায়ের সরল প্রীতিপূর্ণ মনের ভাবটি কি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পথ ভুলিয়া জনশূন্য প্রান্তরে ভীষণাকৃতি লোক দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাকে ঐ এক কথাতেই পরমাত্মীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। একজন অতি সাহসী পুরুষও ঐরূপ বাক্যালাপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার স্নেহালাপে মুগ্ধ হইয়া ঐ দস্যু এবং তাহার স্ত্রী যথাসাধ্য সেবা করিয়া মাকে গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছিল।

আবার এই দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালেই এক সময়ে এক মাড়োয়ারী দশ সহস্র মুদ্রা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু মা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "ঐ টাকা লওয়া হইবে না। কারণ আমি উহা গ্রহণ করিলে প্রকারান্তরে উহা তোমার গ্রহণ করা হইবে, আর

ঐ টাকা তোমার জন্য ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না। লোকে তোমাকে ভক্তি করে ত্যাগের জন্য, কিন্তু ঐ অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ ত্যাগের আদর্শ ম্লান হইবে।" নিতান্ত অশিক্ষিতা এক গ্রাম্য-বালিকার এক কথায় দশ সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করা যে কত বড় ত্যাগনিষ্ঠার পরিচায়ক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মায়ের চরিত্রের অতুলনীয় আত্মত্যাগ এবং অসাধারণত্ব ইহা হইতেই বুঝা যায়।

মা ছিলেন পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে সুখী। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। এক ভদ্রমহিলার একটি মাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। তিনি মায়ের কাছে আসিয়া নিজের বেদনা জানাইতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। উহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমার চক্ষে জল আসিল। আবার আর একদিন একজন যখন তাহার দুইটী পুত্রই সন্ন্যাসী হইয়াছে, ইহা মায়ের নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "মা, পুত্র যদি পরম কল্যাণের পথে যায়, তার চেয়ে কি আর মায়ের আনন্দ আছে!" শ্রীশ্রীমা-ও তখন পুলকিতা হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ মা, পুত্র সৎপথে গেলে তার চেয়ে আর কি আনন্দ মার হ'তে পারে।" এই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবের যে উক্তি, ইহাও তাঁহার আন্তরিক। একস্থলে তিনি সন্তানহারা মায়ের দুঃখের সমান অংশিনী, অপর স্থলে আবার পুত্রের প্রকৃত কল্যাণের কথা ভাবিয়া পরমানন্দিতা। মা ছিলেন দয়ার প্রতি-মূর্ত্তি। পরের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার সমস্ত ভক্তগণকে জননীর ন্যায় সমান স্নেহ দান করিতেন। তিনি ছিলেন সদা প্রসন্নময়ী।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়িয়া মা খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি প্রসন্নবদনে বহুদূরাগত পথশ্রান্ত ভক্তগণের পরি-চর্য্যায় ব্যস্ত থাকিতেন। একবার মায়ের জন্মতিথির দিন, মা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে পালঙ্কে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইলেন। কতশত ভক্ত আসিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেছিলেন, মা কিন্তু বিরক্ত না হইয়া মহানন্দে সমানভাবে সকলের অর্চ্চনা গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন হইতেই ঠাকুর নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়াও মা ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংসদেব সকলকে কাঁদাইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমার বয়স তখন ৩৩ বৎসর। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের আদেশে অবশিষ্ট জীবন মা'র পরিধানে লাল সরু পাড়ের কাপড় ও হাতে বালা ছিল। এই সময় যখনই তিনি বিশেষ শোকার্ত্তা হইয়া পড়িতেন, তখনই ঠাকুর স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। জীবনের শেষভাগে পূর্ব্বকথিত দুরন্ত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মা বড়ই কষ্ট পাইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসর বয়সে জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সকল দেশ-বাসীকে কাঁদাইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। * * * * আজ তিনি দুর্লভ, তিনি ধ্যানগম্য কিন্তু তথাপি তাঁহার ব্রত, ত্যাগনিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি ভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিজ শরীরের সুখ দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাঁহার সরলতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ সকল ভারতীয় নরনারীর আদর্শরূপে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মা পৃথিবীতে নাই কিন্তু জগৎ তাঁহার পাদস্পর্শে ধন্য হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম্-এ, বি-এল্

(১)

ধৃ+ম=ধর্ম্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যে উপায়ের দ্বারা মানুষ আপনাকে ধরে রাখে তাই ধর্ম্ম। ধরে রাখে কিসের বেগ থেকে? ভোগ-লালসার—আত্ম-তৃপ্তির।

সারা সৃষ্টিটাই ছুটেছে "আমি—আমি—আমি" ও "আমার—আমার—আমার" রবে একটানা স্রোতের মুখে আত্ম-তৃপ্তির দিকে, ছোট পিপীলিকাটি থেকে মানুষ পর্য্যন্ত। সে আত্ম-তৃপ্তির টান শেষ হয়েও শেষ হয় না, যত ছুটে তত বাড়ে। শেষে জীব তলিয়ে যায় সেই স্রোতেরই বুকে কোন দিক—নিশানের সন্ধান না পেয়ে। এই ত হল সৃষ্টিরহস্য—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকা!

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জ্ঞানের প্রথম প্রভাতে এ রহস্য সে বুঝতে পার্লো, আর বুঝলো এই একটানা স্রোতের মুখ থেকে সামলাতে না পার্লে তার আনন্দ নাই—শান্তি নাই—উদ্ধার নাই। কিন্তু এমন কি উপায় আছে যার অবলম্বনে সে তাকে এই স্রোতের টান থেকে ধরে রাখতে পারে? অর্থাৎ তার ধর্ম্ম কি? এ প্রশ্ন জেগে উঠে তার হৃদয়কে মথিত করে তুল্লো—সে অনেক দিনের কথা।

মানুষের জ্ঞানোন্মেষের ঐ প্রথম অনুসন্ধিৎসা যে যুগে বিচিত্ররঙ্গে ও বিচিত্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল সেইটাই বৈদিক যুগের আদি। বৈদিক ঋষি অন্তর্দ্দৃষ্টির সাহায্যে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন যে এই ভোগ-লালসার স্রোত মানুষের নিজের মনেরই সৃষ্টি। তিনি মানব-মন বিশ্লেষণ করে দেখ্‌তে পেলেন যে তাকে ভোগ-লালসার দিকে টেনে নিয়ে যায় প্রধানতঃ তিন বৃত্তি—জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ এ তিনের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে Knowing, Feeling ও Willing। প্রথমে ভোগ-বস্তুর জ্ঞান, তারপর তার অভাবে দুঃখ অনুভব এবং তাকে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা ও ইচ্ছানুরূপ বাহ্য কর্ম্ম। এই তিন বৃত্তির মুখ যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায় বিষয়-ভোগের দিক থেকে অন্যদিকে তা হলে মনেরও গতি ফিরে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হয়ে যাবে ঐ একটানা ভোগ-লালসার স্রোত।

বৈদিক ঋষি তাই উপদেশ দিলেন—হে মানব, তোমার মনের ঐ ত্রিবৃত্তিকে ভোগ-বস্তুর পরিবর্ত্তে সৃষ্টির যিনি আদি কারণ সেই পরব্রহ্মের দিকে নিয়োজিত কর—সেই তোমার ধর্ম্ম।"

মানবধর্ম্মের প্রকৃতরূপ প্রকাশ পেল এইখানে। তার গতি ভোগের বিপরীত দিকে—ত্যাগ-সংযমের পথে।

বৈদিক ঋষির নিরূপিত ধর্ম্ম ঐ ত্রিধা মানবীয় মনোবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—জ্ঞান-উপাসনা-কর্ম্ম। জ্ঞান অর্থে পরব্রহ্মের জ্ঞান, উপাসনা অর্থে তাঁকে না পাওয়ার জন্য অন্তরে দুঃখ অনুভব করে ভক্তি সহকারে তাঁর উপাসনা, এবং কর্ম্ম অর্থে তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর যজন-পূজনরূপ বাহ্য কর্ম্ম।

পরবর্ত্তী প্রায় সকল ধর্ম্মমতই ঐ বেদোক্ত ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—"বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং।" তবে কোন ধর্ম্মমতে হয় ত জ্ঞানবৃত্তির উপর,

কোন মতে হয় ত ভাববৃত্তির উপর, কোন মতে হয় ত ইচ্ছাবৃত্তি (বা কর্ম্ম-বৃত্তির) উপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। প্রভেদ দেখা যায় কয়েকটী বিষয়ের যুক্তি-তর্ক নিয়ে। যেমন, জগতের আদি কারণ এক—দুই—না বহু, তিনি নির্গুণ না সগুণ, নিরাকার না সাকার ইত্যাদি। এই যুক্তি-তর্কের দিকটা হল দর্শনশাস্ত্র—জ্ঞানবৃত্তির গণ্ডির মধ্যে। এক একটী ধর্ম্মমতে এক একটী বিশিষ্ট প্রকারের যুক্তি-তর্ক খাটিয়ে ঐ সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে। তার আবার শাখা-প্রশাখা কালক্রমে অনেক বেরিয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। সকল ধর্ম্মমতেরই লক্ষ্যস্থল এক—ভোগের বিপরীত দিকে। সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, যে ত্যাগ-সংযমের পথে না নিয়ে যায়।

প্রমাণস্বরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ কর্ত্তে পারি চারটী প্রধান ধর্ম্মমত—পারসিক, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয়। প্রথম, জরথুস্ত্রের পারসিক ধর্ম্ম। জরথুস্ত্র অথর্ব্ববেদের একজন ঋষি। সাকার বৈদিক দেবতা স্বীকার না করায় তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের শাখা হলেও কালক্রমে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। জগতের আদিকারণের তিনি নাম দিয়েছিলেন মজ্‌দা। মজ্‌দা নিরাকার। তা হলেও মজ্‌দার যজ্ঞ ও উপাসনা বৈদিক যজ্ঞ ও উপাসনার মত। এ ধর্ম্মও জ্ঞান-উপাসনা-কর্ম্মমূলক এবং ত্যাগ-সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে ঝোঁকটা বেশী ভাব-বৃত্তির উপর।

দ্বিতীয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব নিজে কোনস্থলে জগতের আদি কারণ কোন চিন্ময় পুরুষের কথা বলেছেন কিনা জানি না, তবে তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মে ত্রিশরণের মধ্যে প্রথমই তাঁর অর্থাৎ বুদ্ধদেবের শরণাগতির ব্যবস্থা। তাঁর উপাসকগণ তাঁকেই শ্রীভগবান বোধে আরাধনা করে থাকেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত ধ্যান ধারণা সাধনা উপনিষদের পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা সাধনার রূপান্তর। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ লাভ আর উপনিষদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার একই জিনিষের দুইটা পিঠ। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী নিয়ে গীতা, তেমন ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী নিয়েই ধর্ম্মপদ। এই ধর্ম্মপদে বুদ্ধদেব সাধককে ভোগলালসা ছেড়ে ত্যাগ-সংযমের পথে চলবার জন্য বারংবার বহুপ্রকারে উপদেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মও জ্ঞান-উপাসনা-কর্ম্ম এবং ত্যাগ-সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে ঝোঁকটা কিছু বেশী ইচ্ছাবৃত্তির (বা কর্ম্মের) উপর।

তৃতীয়, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে জগতের আদিকারণ সেই চিন্ময় পুরুষকে তিন অবস্থায় কল্পনা করা হয়—God the Son, God the Father and God the Absolute। এটা অনেকটা বেদোক্ত পরব্রহ্মের বিভিন্ন ভাব (aspect) অনুযায়ী সগুণ নির্গুণ ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার কল্পনা। মূলতঃ সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ এক। খৃষ্টীয়গণ জিশুকে শ্রীকৃষ্ণের মত ভগবানের অবতার ও ত্রাণকর্ত্তারূপে বিশ্বাস করেন। এঁদের মতে সেই সচ্চিদানন্দপুরুষ নিরাকার হলেও তাঁর প্রিয় সন্তান ও অবতার জিশুর প্রার্থনা ও উপাসনার প্রয়োজন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্মের স্থান বর্ত্তমান। ঝোঁকটা কিছু বেশী ভাব-বৃত্তির উপর। এদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে দুইটী শব্দ আছে —Spirit এবং Flesh। Spirit অর্থাৎ বেদান্তের পরমাত্মা, আর Flesh অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ভৌতিক দেহ। এই ভৌতিক দেহের লালসা পরিতৃপ্তি করা পাপের পথ, এ কথা অনেকবার বাইবেল বলেছেন এবং পরমাত্মার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এখানেও সেই ভোগলালসা বর্জ্জনের কথা—সংযমের কথা। বুদ্ধদেবের মত জিশুখৃষ্টও ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। ত্যাগ-সাধনার হোমানলে একজন আহুতি দিয়েছিলেন স্ত্রী-পুত্র রাজ-সম্পদ, আর-একজন তাঁর বহুমূল্য জীবন।

চতুর্থ, মহম্মদীয় ধর্ম্ম। হজরত মহম্মদের মতে জগতের আদিকারণ এক এবং নিরাকার। তাঁর ধর্ম্মও জ্ঞান-উপাসনা-কর্ম্মমূলক। তিনিও এমন কথা কোথাও বলেন নি যে ভোগ-লালসায় গা ভাসিয়ে দিয়ে চলাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তাঁরও জীবন ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত এবং তাঁর ভক্ত-গণকে সেই পথেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

কাজেই দেখা যায় এ সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বাহ্যতঃ বিভিন্ন দেখালেও স্বরূপতঃ এক এবং এদের কোনটীও ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত সংজ্ঞা হারায় নি। আচার অনুষ্ঠানগুলি ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের বেড়া। এক একটী ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য কতকগুলো বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা বেষ্টনের প্রয়োজন, যেমন এক একটী লোকের এক একটী জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে। বেড়াটিকে জমি বলে ধর্লে যে ভুল করা হয়, একটী ধর্ম্মমতের বাহ্য আচার—অনুষ্ঠানগুলিকে সেই ধর্ম্ম বিবেচনা কর্লে সেই ভুল করা হয়।

(২)

ধর্ম্মের পর ধর্ম্মনীতি (Morality)। নী ধাতু + ক্তি (কর্ম্মে)=নীতি। নী ধাতু অর্থে নিয়ে যাওয়া। যা মানুষকে নিয়ে যায় তাই নীতি। কোন পথে নিয়ে যায়? ধর্ম্মের পথে—ত্যাগ-সংযমের পথে।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-নীতিকে আমরা অনেক সময় দুইটী বিভিন্ন কোঠায় পুরে রাখি। সেটা ভুল। বস্তুতঃ এ দুইটী এক কোঠার। নীতি ধর্ম্মের সেই ব্যবহারিক দিক যা সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির কর্ত্তব্য নির্ণয় করে দেয়। উদ্দেশ্য—সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যষ্টির স্বার্থ-সঙ্কোচন অর্থাৎ সংযম-সাধন।

নীতি বিধি-নিষেধ দিলেন—সত্য কথা বল, চুরি কোরো না, ক্ষমা কর, হত্যা কোরো না, দয়াশীল হও, পরদার গ্রহণ কোরো না ইত্যাদি। জগতে যদি একটী মাত্র মানুষ থাকতো তা হলে এ বিধি নিষেধগুলোর প্রয়োজন হতো না, কিন্তু যেহেতু আমি ছাড়া আরও মানুষ আছে এবং মানুষ ছাড়া আরও জীব আছে—এক কথায় সমষ্টি আছে, সমাজ আছে, জীব জগৎ আছে—তাই এ বিধি-নিষেধগুলোর প্রয়োজন। কেবল আমি ও আমার নিয়ে থাকা চলে না।

প্রতিবেশী আছে—সমাজ আছে—দেশ আছে—আমি ছাড়া অন্য আছে, এই জ্ঞান থেকেই জীবের—প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক মানুষের স্বাধিকার (right) একের প্রতি অন্যের কর্ত্তব্য (duty) এই দুই ভাবের উদ্ভব। এ দুইটী স্বতন্ত্র নয়—সাপেক্ষিক। স্বাধিকার আছে তাই কর্ত্তব্য আছে, আর কর্ত্তব্য আছে তাই স্বাধিকার আছে। এই স্বাধিকার ও কর্ত্তব্য নির্ণয় নীতিশাস্ত্রের গণ্ডির মধ্যে।

আইনশাস্ত্র এই ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো আইন। আই-নের কথা—সমাজের প্রত্যেকের স্বাধিকার আছে, অতএব কেবল তোমার ষোল আনা স্বার্থ নিয়ে থাকা চলবে না—অপরের স্বাধিকার মানতে হবে। কাজেই আইনের ব্যবস্থাও ত্যাগ—সংযম নির্দ্দেশক।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম দেখা দেয় ধর্ম্ম—তারপর ধর্ম্মনীতি—তারপর আইন। সমাজের বিস্তার ও প্রয়োজন মত পর পর এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে এ তথ্যটী একটু পরিষ্কার করে বলি।

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। পূর্ব্বেই বলেছি ঐ সময়ে মানবের মনে ধর্ম্মভাব প্রথম মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনও সমাজের ধারণা গাঢ় হয়ে না উঠায় ধর্ম্মনীতির অনুশাসন তত বেশী ছিল না। বৈদিক দেবতাগণের স্তবস্তুতিতেই ঋগ্বেদের অনেকখানি পূর্ণ। তবে অহিংসা সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দুই একটী নীতি-তত্ত্বের বীজ দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রায় হাজার বৎসর পর

নীতিশাস্ত্র রচনার যুগ। তখন মানব-সমাজ সুবিস্তৃত—আর্য্যসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে—কাজেই মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্দেশক নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজন বেশী হয়ে দাঁড়ালো। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি সমাজ-ব্যবস্থাপক ঋষিগণ এই কাজে লেগে গেলেন। বহু নীতিশাস্ত্র রচিত হলো। এই সকল নীতিশাস্ত্রে একটী জিনিষ বেশ সুন্দর ভাবে চোখে পড়ে। ঋষিগণ প্রথমেই ধর্ম্ম কি তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তারপর বিধি-নিষেধমূলক ধর্ম্মনীতির অবতারণা করেছেন। এর দ্বারা এই বেশ বুঝা যায় যে নীতির মূল ধর্ম্মে।

ভারতীয় সভ্যতা ক্রমশঃ দেশ দেশান্তরে প্রসার লাভ করে। ভারতের বাহিরে তখন গ্রীস্ ও রোম রাজ্য। ভারতের ধর্ম্ম ও নীতি এই দুই রাজ্যে প্রবেশ কর্লো। নবভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রীস্ মন দিলেন দার্শনিক তত্ত্ববিচারে আর রোম মন দিলেন আইন-প্রণয়নে। রোমকে যে বলা হয় জগতের প্রথম আইন-দাতা (law giver), তার অর্থ আইনশাস্ত্রের বর্ত্তমান স্বতন্ত্র রূপ রোমই দিয়েছিলেন। কিন্তু রোমক আইনের মূলতত্ত্বগুলির ভিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাপক ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর স্থাপিত। ভারতের ঋষি আইন-ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম ও নীতির অঙ্গরূপে গণ্য করেছিলেন—পৃথক্ ভাবে নহে। প্রভেদটা এইখানে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি ও আইন পৌর্ব্বাপর্য্যহিসাবে পৃথক হলেও এক সুরে ও এক তাবে বাঁধা। আইন নীতির উপর আর নীতি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধর্ম্মমত মূলতঃ এক—নীতিও এক—আইনও এক। সকলেরই চরম লক্ষ্য ত্যাগ-সংযম।

(৩)

আজকাল একটা ঢেউ উঠেছে—ধর্ম্ম টর্ম্ম নীতি টীতি ও সব ত্যাগ কর, তা না হলে দেশের কাজ হবে না। আবার কেউ কেউ উপহাস করে বলেন—ত্যাগ-সংযম সাধন করতে করতে কাপড় ত হাঁটুর উপর উঠেছে, শেষে উলঙ্গ হয়ে বনে যাওয়াটাই বাকি! এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো।

যাঁরা ঐ সব উক্তি করেন তাঁরা বোধ হয় ধর্ম্ম ও নীতির প্রকৃত রূপ কি তা তাকিয়ে দেখবার বড় একটা অবসর পান না। ত্যাগ-সংযম ধর্ম্ম ও নীতির মূলমন্ত্র বটে, কিন্তু তার অর্থ কেবল এ নয় যে দেশের ও সমাজের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে কপনি পরে বন-জঙ্গলের ভিতর কুটির বেঁধে সারা-জীবন কাটিয়ে দেওয়া। শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় কি বলছেন শুনুন—"অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। ··· · ·· ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—নবম ও দশম অনুবাক)। অর্থাৎ—"অন্ন যাহাতে অধিক পরিমাণে লাভ হয় তাহার চেষ্টা করিবে, ব্রহ্মবিদ্‌গণের উহাই ব্রত।" কেন উহাই ব্রত ?—তার উত্তরে শ্রুতি বলছেন—"বাসের জন্য কোন ব্যক্তি আসিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করা ব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রত, আর কোনও ব্যক্তিকে বাসের স্থান দিলে আহার্য্যও দিতে হইবে, সুতরাং যে কোন উপায়ে বহুতর অন্নের সংস্থান করিবে।" কি সুন্দর সেই প্রাচীন যুগের সামাজিক আদর্শ! এখানে আছে সমাজ-ত্যাগের কথা নয়—সমাজ-সেবার।

যাঁরা কেবল মাত্র নিজের মুক্তি কামনা করেন তাঁরা বহির্জ্জগতের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে নির্জ্জনে পরমাত্ম-চিন্তায় রত একথা সত্য, কিন্তু সেটা হলো সাধনার একটা দিক। এ ছাড়া আর একদিক আছে, যার নির্দ্দেশ সুদূর অতীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং করেছিলেন এবং বর্ত্তমান যুগে সন্ন্যাসিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দ নিজের জীবনে যার পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—সে হলো "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—" "নিজের মোক্ষ ও জগতের"

কল্যাণ।" ঐ যেন ঐ শ্রুতিবচনেরই বিশদ্ ব্যাখ্যা। স্বামীজি ছিলেন ত্যাগ-সংযমের প্রতিমূর্ত্তি অথচ বর্ত্তমান বাঙ্গলার তথা বর্ত্তমান ভারতের নব-জাগরণের অগ্রদূত।

ত্যাগ সংযম সাধন করতে না শিখলে "আমি" ও "আমার" লোহার বেড়া ভাঙ্গতে কি কেউ পাবে? আর যতক্ষণ ঐ বেড়া ভাঙ্গতে না পাচ্ছি—যতক্ষণ নিছক আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে গিয়ে পরের মঙ্গলের কথা ভাবতে না শিখছি—ততক্ষণ আমার দ্বারা সমাজ-সেবা দেশ-সেবা এ সব হবে কি করে? এটা মোটা কথা। কাজেই যদি কেহ সত্যসত্যই দেশের সেবা করতে চায় তবে তার প্রথম কর্ত্তব্য ত্যাগ-সংযম শিক্ষা করা।

কেউ কেউ বলে থাকেন ত্যাগ-সংযম শিক্ষার জন্য ধর্ম্ম-নীতির প্রয়োজন নেই। এটা ভুল কথা। ধর্ম্ম ও নীতিকে বাদ দিয়ে ত্যাগ-সংযম সাধন সুদৃঢ় হতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনায় দিন কতক ত্যাগী ও সংযমী হতে পারি, কিন্তু মর্কট বৈরাগ্যের মত মনের সে ভাব বেশী দিন থাকে না, সত্যকার ত্যাগ-নিষ্ঠা আসে না। আজ স্বামী বিবেকানন্দের মত যদি প্রকৃত ত্যাগনিষ্ঠ কয়েকজন মহাপুরুষ থাকতেন তা হলে এ হতভাগ্য দেশ আরও অনেকদূর এগিয়ে যেত।

অনেকের ধারণা ধর্ম্ম-নীতির পথ অবলম্বন করেই ভারত শৌর্য্য বীর্য্যহীন ও চির-পরাধীন। একথাও সত্য নয়। প্রাগৈতিহাসিকযুগে যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হয়েও রামায়ণীয় ও ভারতীয় যুদ্ধে নায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কি সে তেজ—কি সে বীর্য্য—কি সে বুদ্ধি চাতুর্য্য! মহর্ষি জনক ত্যাগ-সংযমের আধার হয়েও দক্ষতার সহিত রাজ্য-পরিচালনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক যুগেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অশোক, চাণক্য, প্রতাপ, শিবাজী আজও ভারতের বুকের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ধর্ম্ম-নীতিসম্মত ত্যাগ-সংযম সাধনে কতখানি বীর্য্য-শৌর্য্য লাভ করা যায়।

ভারতের পরাধীনতার কারণ ইতিহাস অন্যরূপ বলে। হিন্দুরাজগণ যখন ধর্ম্ম ও নীতিমূলক ত্যাগ-সংযমের পথ ছেড়ে দিয়ে আমিত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন—যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে পরস্পর কলহ-বিবাদে মেতে গেলেন—এক কথায় যখন তাঁদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তির লোপ পেল, তখনই বহিঃশত্রু ভারতে প্রবেশ করে এ দেশ অধিকার কর্লো। মুসলমান রাজ্যের পতনের কারণও ঠিক তাই। শুধু ভারত কেন? অতি বিশাল গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছিল সেইদিন, যেদিন তারা ত্যাগ-সংযমের পথ হারিয়ে ফেলে ভোগ বিলাসিতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। জগতের ইতিহাসে এমন একটী দৃষ্টান্ত নাই যেখানে স্বদেশ গিয়েছে বিদেশীর হাতে শুধু যথার্থ ধর্ম্ম ও নীতির অনুশীলনফলে।

বর্ত্তমান খৃষ্টীয় জগৎ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মহান ত্যাগ-সংযমের বাণী বিস্মৃত হয়ে কি শোচনীয় ধ্বংস-লীলার সূত্রপাত করেছে তা ত চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাল, বৃদ্ধ, নারী, রুগ্ন কারও পরিত্রাণ নেই—বিনা দোষে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। এ সব কিসের জন্য? কেবল আত্মতৃপ্তির। কে বল্বে এটা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগ। রাক্ষসী ভোগলালসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে লেলিহান জিহ্বা নিয়ে ঐ মহাদেশের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেছে। এর শেষ কোথায় কে জানে!

তাই বলি, নব্যভারত, ঐ দৃশ্য দেখে এখনও সাবধান হও—উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি ছাড়—নিজের ধর্ম্ম-নীতিসম্মত ত্যাগ-সংযম সাধনা কর—প্রকৃত দেশহিতব্রতী হও—জড়বাদী পাশ্চাত্যের ঐ অমঙ্গল আর এই হতভাগ্য দেশে ডেকে এনে না।

শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকা পঞ্চকম্

স্বামী তপানন্দ

সমাধিলীনশম্ভুশুভ্রহৃৎসরোজসংস্থিতে
পদারবিন্দ-সঙ্গমে হ্যনন্তনন্দ-সঞ্চিতে।
বিরিঞ্চি-বিষ্ণুবন্দিতে মুনীন্দ্রভৃঙ্গ-গুঞ্জিতে
ঋতে রতের্ন-সংস্থতে বি নিষ্কৃতিঃ কদাপিতে ॥

(২)

মহাঘন- প্রভাঙ্গিনীং মহান্ধকার-হারিণীম্
নিবদ্ধদৈত্যহস্তমেখলাং কপালমালিনীম্।
চতুষ্কবেষভীববাসি-ছিন্নমুণ্ড-ধাবিণীম্
শ্রয়ে শ্মশানচারিণীং কৃতান্তভীতিবারিণীম্ ॥

(৩)

গলৎ-স্রবাবিকঙ্করাস্রধারয়াজিবঞ্জিনীম্
ক্ষরৎ-পয়স্থলস্তনীং ললাম-বামভামিনীম্।
নিতম্বলম্বিকুন্তলাং নিশুম্ভ-শুম্ভ-খণ্ডিনীম্
জ্বলল্ললাট-লোচনাং ভজেভবাব্ধিস(ভ)ঙ্গিনীম্ ॥

(৪)

অহঙ্কৃতিং বিমর্দ্দয় দ্বি-সপ্তলোকপালিকে
নিরাকুরু প্রহেলিকাং ধরা-ধরেন্দ্র-বালিকে।
ধ্রুবস্মৃতিপ্রদাসি মে শিবে শশাঙ্ক-ভালিকে
গতিস্ত্বমেব দুস্তরে প্রসীদ মাং করালিকে ॥

(৫)

ন কাময়ে ধনং ন বাণিমাদি-সিদ্ধি-ঋদ্ধিকম্
ন চাম্বরঃসুসেবিতস্বরাজ্যসার্বভৌমিকম্।
শমাদি-সাধনানি মে নিধেহি চাম্বরম্বিকে
পরন্তু নির্ব্বিকল্পকং পদং বিধেহি কালিকে ॥

বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই হিসাবে ভারতের মধ্যে বাংলার স্থান প্রথম। কেউ কেউ মনে করেন হিন্দি প্রথম। কিন্তু তা ঠিক নয়। আদম সুমারির হিসাবে হিন্দিকে পুব পশ্চিম দুটি স্বতন্ত্র ভাষা বলে ধরা হয়েছে। তাই হিন্দির স্থান বাংলার নীচে। সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান সপ্তম। চীন, ইংলিশ, রুশ, জার্মান, স্পেন ও জাপ ভাষার পরই বাংলার আসন।[১]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্যন্ত বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়েছে এবং কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বি-এ, এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। সাহিত্যসেবিগণের ঐকান্তিক সাধনায় বাংলা সাহিত্য উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং আপন মহিমায় বিশ্বসভায় সম্মানের আসন লাভ করেছে। বাঙালীর কাছে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়।

আজকাল বাংলা ভাষা ও বানান সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা ও সংস্কার-প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। দেশের সর্ববিধ সংস্কারের গোড়াতে সকলের আগে দৃষ্টি যায় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর। এ দেশের ছোট বড় কোন সমস্যাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে ও দিব্যচক্ষে তিনি সে সবের সমাধান প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি করে গেছেন। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজির কি অভিমত ছিল তাই আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

বাংলায় দুটি ভাষা, সাধু ও কথ্য। বাঙালীরা যে ভাষায় কথা বলেন তার নাম কথ্য ভাষা আর যে ভাষায় বাঙালীর সাহিত্য তার নাম সাধু ভাষা। স্থান ভেদে বাংলায় কথ্য ভাষা নানাপ্রকার কিন্তু সাধু ভাষা সর্বত্রই এক। যে ভাষায় মানুষ কথা বলে না, সে ভাষা মৃত ভাষা। সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় আজ কাল কোন জাতি কথা বলে না, তাই এগুলোকে মৃতভাষা বলে। এই হিসাবে সাধু বাংলাকে মৃতভাষা বলা যেতে পারে।

কেউ কেউ মনে করেন, কথ্য ভাষাতেই যথার্থ এবং স্বাভাবিক প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়,[২] সুতরাং তাতেই সাহিত্য গড়ে ওঠা উচিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কথ্য ভাষায় কখনও উচ্চ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বা উচ্চভাবমূলক রচনা কথ্যভাষায় অসম্ভব। কথ্যভাষা নানাস্থানে নানাপ্রকার, সুতরাং কোন্‌টিকে সাহিত্যে গ্রহণ করা যায়, এ সমস্যার সমাধান কখনও হবে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাষা চালাতে চাইবে। আবার অসম্পূর্ণ হলেও সাধুভাষার তবু ব্যাকরণ গড়ে উঠেছে, কথ্যভাষার তত হয় নি। এই সব কারণে কথ্যভাষাকে কিছুতেই সাহিত্যে গ্রহণ করা যায় না।

ব্রাহ্মণত্বের ছাপ যেখানে আভিজাত্যের মাপ-কাঠি[৩] সেখানকার ভাষা বা সাহিত্যের জন্য

১ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম এ—শব্দ ও উচ্চারণ।

২ ম্যাক্সমুলার।

৩ কিছুদিন যাবত দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশের সর্বত্র হিন্দুসমাজের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই পৈতে নেবার

সংস্কৃতের তিলক অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? সংস্কৃত ভাষা থেকে ভাব-সম্পদ বা শব্দসম্পদ গ্রহণ করা এক কথা আর বাংলা ভাষাটাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালাই করা আর এক কথা। মৃতভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে বাইরের দিক থেকে সর্বতোভাবে অনুকরণ করতে গেলে তার মৃতত্ব গুণটিও পেতে হয়, তার হাত থেকে বাঁচবার উপায় নেই।

মৌখিক ভাষাতে একটা ছন্দ আছে, তরঙ্গ আছে, দ্রুত চলার শক্তি আছে। মৌখিক ভাষায় অনেক শব্দ আছে খুব জোরালো, অবিকল ভাবটিকে প্রকাশ করতে পারে। অনেক চলিত কথার মর্মার্থ এত অধিক যে তা প্রকাশ করতে দু গণ্ডা সংস্কৃত শব্দ লাগে। সংস্কৃতানুরূপ ভাষায় লিখলে সেগুলো অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে, তাতে লোকসান আছে। বাংলা দেশের সভ্যতার সর্ব-বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে, ভাষাই বা ভূষার মত সম্পূর্ণ নিজস্ব হবে না কেন? একটা মৃত ভাষার উপর এত নির্ভর করা তার পক্ষে দৈন্য ও অমর্যাদার চরম।[৪]

সাধু ও চলতি ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে এরূপ নানা মতবাদ বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায়। এবার দেখা যাক স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে কী বলেন।

স্বামীজির প্রেরণায় ১৩০৫ সালের পয়লা মাঘ পাক্ষিকপত্ররূপে উদ্বোধন প্রকাশিত হয়। স্বামীজির অন্তরে উদ্বোধন প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—ভাষা সাহিত্য দর্শন কবিতা শিল্প সকল বিষয়ে একটা গঠনমূলক আদর্শ প্রচার করা।[৫] স্বামীজি তাঁর গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে উদ্বোধনের কার্যভার অর্পণ করেন এবং নিজে প্রায় নিয়মিতভাবে উদ্বোধনের জন্য প্রবন্ধাদি লিখতে আরম্ভ করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বামীজি পরবৎসর আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে বেলুড় মঠ থেকে যাত্রা করেন এবং ইংলাণ্ড হয়ে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি এমেরিকা পৌছেন। সেখান থেকে ফাল্গুনের প্রথম দিকে স্বামীজি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উদ্বোধন সম্পাদককে একখানা পত্র লেখেন। ১৫ই চৈত্রের (১৩০৬) উদ্বোধনে তা প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ভাববার কথা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজির লেখাটি অবিকল নীচে দেওয়া হল।

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিম্ভূত কিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচ জনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। সেই

আন্দোলন হচ্ছে। পৈতে ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন। ব্রাহ্মণত্বের বা দ্বিজত্বের গৌরব লাভের বাসনা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ঐ-সব আন্দোলনের মূলে কাজ করছে, সন্দেহ নেই।

৪ কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—বঙ্গ সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ।

৫ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃ ১৯০, সং ৬।

ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ, তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ কর্‌বো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়্‌ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম যেদিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কলকেতার ভাষাই রাখ্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতের দিকে দেখ দিখি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝ্‌তে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়; মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধূম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ করে—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এইসব চিহ্ন উদয় হল। ওটি সুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল, বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষুসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নার লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধূম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে,—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরতঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধূম! সে কি আঁকা বাঁকা ডোমা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব!

এগুলো সোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আস্‌বে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে মাত্রই

দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্‌ করবে।

প্রায় ষাট বৎসরের অধিক কাল রবীন্দ্রনাথ অবিশ্রান্ত ভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনাই তাঁকে দেশে বিদেশে অমরত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি। স্বামীজি তাঁর মতামত অতি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কী বলেন দেখা যাক।—

* * * * সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত এক মাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে একে দুই মাত্রা ব'লে ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধু ছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না ব'লে পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়ে তাকে ধাক্কা দেয় ও বাজিয়ে তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। ওতে কোন সুর বাজে না; কিন্তু "কর্চ্ছি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলে; সেইজন্য এর অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" হসন্ত-"র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খেয়ে একটা জোর জাগিয়ে তোলে; তখন ওর নাকি সুর ঘুচে গিয়ে ওর থেকে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বেরয়। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্ব্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা প'ড়ে গেছে, এবং তার চিক্কণতা যতই থাক, তার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তার চেহারা বলে একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নি; কিন্তু তাই বলে অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়ে ম'রে আছে তা নয়। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে রয়েছে। কেবল ছাপার কালীর তিলক প'রে সে ভদ্র-সাহিত্য-সভায় মোড়লি ক'রে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তার কণ্ঠে গান থামে নি, তার বাঁশের বাঁশি বাজছেই। সেই সব মেঠো-গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর প'ড়ে ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ করছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নেই;—সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করেছি। কেননা দেখেছি চল্‌তি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে—তার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। "গীতাঞ্জলি" হতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলে দিয়েছেন তা আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্ সকল্ কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুটবে গো ফুল্ ফুটবে।
আমার্ সকল্ ব্যথা রঙীন্ হয়ে
গোলাপ্ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করে হসন্তের ভঙ্গী আছে। "ধন্য" শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা

"ধন্ন" এই বানানে লেখা যেতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি একমাত্রা ব'লে ধরা যায়। তবে এমন হোতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি ক'রে সাধু ভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা ক'রে দিয়েছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি শিষা দিয়ে ভর্ত্তি করেছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে বাহির হ'তে সুর যোজনা করতে হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দু হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা-বধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়ে গেছে, তার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তা আমরা ভুলে গেছি। আমি তার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখে তার দর যাচাই করুক: আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তার চেয়ে অনেক বেশি, সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভটচাজপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।[৬]

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজি অন্যত্র কী বলেছেন দেখা যাক।

স্বামীজি। এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম্ম কি'[৭] বলে একটা বাঙ্গালায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙ্গালা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের ন্যায় ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। * * * [৮] দেশ, সভ্যতা ও সময়োপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু চেঞ্জ (পরিবর্ত্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে কর্‌চি। সাহিত্য-সেবিগণ হয় ত তা দেখে গাল মন্দ করবে। করুক্—তবু বাঙ্গালা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা কর্‌ব। এখনকার বাঙ্গালা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী ভার্বস্ (ক্রিয়াপদ) ইউজ (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ভার্ব-এর ভাব প্রকাশ কর্ত্তে পাল্লে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখ্‌তে চেষ্টা কর্ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বি। ভাষার ভিতর ভার্বগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস্? ঐরূপে ভাবের পোজ বা বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার মত দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয় যেন ভাষার দম নাই। সেজন্যই বাঙ্গালা ভাষায় ভাল লেক্‌চার (বক্তৃতা) করা যায় না। ভাষার উপর যার কন্ট্রোল (দখল) আছে, সে অত শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডাল ভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে। ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আহার, চালচলন, ভাব ভাষাতে তেজস্বিতা আন্‌তে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার কর্ত্তে হবে, সব ধমনীতে রক্ত-প্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক সার্‌ভাইভ কর্ত্তে (বাঁচতে) পার্‌বে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।[৯]

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ, সং ১, পৃ ২০৯-২১০।

৭ এ লেখাটি ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে তা 'হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে ভাববার কথা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৮ অন্য প্রসঙ্গের কথাগুলো বাহুল্য ভয়ে বাদ দিয়েছি।

৯ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, সং ৬, পৃ ১৬৩-১৬৮ (কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ ১৩০৬)।

উদ্বোধন প্রথম সংখ্যা বের হবার কিছুদিন পর স্বামীজি তাঁর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করছেন,—

স্বামীজি। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস্ ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজি। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ ?

স্বামীজি। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন ভার্ব ইউজ (ক্রিয়াপদ ব্যবহার) কল্লে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে ভার্বের ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর্। আমার আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।[১০]

স্বামীজির উক্তি তিনটির মধ্যে প্রথমটি পরের এবং শেষের দুটি আগের। প্রথমটি তাঁর নিজের লেখা, শেষের দুটি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা। স্বামীজির সঙ্গে তাঁর যে সব আলাপ আলোচনাদি হত, সে সব তিনি লিখে রাখতেন। সেগুলো একত্র করে তিনি স্বামি-শিষ্য-সংবাদ পুস্তক দু খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। স্বামীজির দেহত্যাগের পর তাঁর গুরুভ্রাতৃগণ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছিলেন।

প্রথম উক্তিতে স্বামীজি সাধুভাষা ও চলতি ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাংলা ভাষায় কী ভাবে জোর আনতে পারা যায়, তাই তিনি দ্বিতীয় তৃতীয় উক্তিতে বলেছেন। এ উক্তি দুটি উভয় ভাষা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

১০ স্বামি শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, সং৩, পৃ ১৮৩, (মাঘ ১৩০৫)।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি

শ্যামপুকুরের বাড়ীর কথা

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রেষ্ঠ মানবগণের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে দেখা দিয়াছে। ত্রেতাযুগে সমাজ ও ঋষিগণের রক্ষার্থে, রাক্ষসাদির দুর্দ্দমনীয় আসুরিক শক্তির বিপক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের অনেক অলৌকিক শক্তির খেলা আমরা দেখিতে পাই। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সময়েও অমিত-প্রতাপ ক্ষাত্রশক্তির উৎপীড়নের হস্ত হইতে ধরিত্রীর মুক্তির জন্য তাঁহাতেও অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের মুখ হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই শোনা যায় না বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক শক্তির কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যাহা যথার্থই সত্য নয় তাহার কারণ নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত বলিয়াই তাহারা ইহাকে অলৌকিক বোধ করিয়া

থাকে। এ সম্বন্ধে আরও একটী কথা, যাঁহারা ঐরূপ শক্তির অধিকারী তাঁহারা কেহই কিন্তু এই শক্তির শ্রেষ্ঠতা কিছুমাত্র স্বীকার করেন নাই বরং অবজ্ঞার ভাবই দেখাইয়া গিয়াছেন।

যিশুখৃষ্ট এই অলৌকিক শক্তিরই নজির দিয়া লোককে বলিতেছেন, "যাও, তাহাদের বল, মৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করিতেছে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতেছে, পঙ্গু পুনরায় হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, বধির শ্রবণশক্তি লাভ করিতেছে," ইত্যাদি। তাঁহার মুখ হইতেই আবার এ কথাও শুনা গিয়াছে, "হায় অবিশ্বাসিগণ তোমাদের কিছুতেই কি চৈতন্য হইবে না!" এ যুগেও যাঁহার কথা আজ আমরা লিখিতে বসিয়াছি—সেই শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে একদিন পঞ্চবটীতে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ্‌ তপস্যা-প্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হল উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু আমার—যার পরবার কাপড়ের পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তার ওসব যথাযথ ব্যবহার করবার অবসর কোথায়? তাই ভাবছি, মাকে বলে তোকে ঐ সব দি, কারণ, মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে, ঐ সব শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চার হলে দরকার মত তখন ব্যবহারে লাগাতে পারবি, কি বলিস্?" নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন-লাভ করার প্রথম দিন হইতেই তাঁহার দৈব শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং ঠাকুরের এ কথায় অবিশ্বাসের কোন কারণই তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, কিন্তু ছোটকাল হইতেই ঈশ্বরানুরাগী নরেন্দ্রনাথের মন বিনাবিচারে তাহা গ্রহণ করিতে সায় দিল না। তিনি একটু চিন্তিতভাবে উত্তর করিলেন, "কিন্তু মহাশয় ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বর লাভের সহায়তা হবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "সহায়তা না হলেও ঈশ্বর লাভ করে তাঁর কাজ করতে যখন প্রবৃত্ত হবি, তখন ঐসব বিশেষ সাহায্য করবে।" নরেন্দ্রনাথ এ কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়, তবে ওসবে আমার এখন দরকার নেই, আগে ঈশ্বর লাভ হোক্, তখন গ্রহণ করা না-করা সম্বন্ধে স্থির করা যাবে। এখন ঐসব বিচিত্র বিভূতি লাভ করে যদি আসল উদ্দেশ্যই ভুলে যাই ও স্বার্থপরতাবশে ঐসবের অযথা ব্যবহার করে বসি, তাহলে সর্ব্বনাশ হবে।" পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ এই প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" বলিয়াছেন, "ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভূতি সকল সত্য সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন অথবা তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্তভাবে বলিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, একথা আমাদের জানা আছে।" ঠাকুর যে এই কথায় প্রসন্নই হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "আধপয়সার মামলা" গল্পটী হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাহা ছাড়া অন্য সময়েও অবতারাদির এই সকল অলৌকিক শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার মুখে অনেক কথা শুনা গিয়াছে। ঠাকুর বলিয়াছেন, "দেখ, এই যে সব অলৌকিক শক্তির ব্যবহারাদি দেখতে পাস, এ সবই জানবি সেই যুগের প্রয়োজন সাধনার্থই করা, যেমন দশানন বধের জন্যে শ্রীরামচন্দ্রকে করতে হয়েছিল।" এইরকম শ্রীকৃষ্ণাদি সম্বন্ধেও, ইহার অন্য কোন বিশেষ মূল্য নাই। এই "প্রয়োজন" কথাটী হইতে ঠাকুর যে কেন নরেন্দ্রনাথের নিকট "আমার কোন ব্যবহারে এলো না" এভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বেশ সহজেই অনুমান করা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারাদির কথা ছাড়িয়া ইঁহাদের মধ্যে কথঞ্চিৎ আধুনিক যিশুখৃষ্টের কথা আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সামান্য শক্তির পরিচয় পাইয়া তখনকার লোকে অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিত। এখনকার দিনে তাহা অপেক্ষা অনেক

আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাইলেও কেহ তেমন বিস্ময় বোধ করিবে না। সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার কথা যিশুখৃষ্টের কাহিনীতেও শুনা যায়। আজকাল অনায়াসে যে-সে ব্যক্তি আকাশপথে বিচরণ করিতেছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, এখনকার যা কিছু কোন না কোন একটা বাহ্য যন্ত্রাদির সাহায্যে সাধিত হইতেছে, আর সে যুগে শুধু ব্যক্তিগত নিজস্ব আভ্যন্তর শক্তির দ্বারা সাধিত হইত, কিন্তু উভয়েরই কার্য্যক্ষেত্র এই জড়জগতের গণ্ডির মধ্যে, ইহার বাইরে নহে। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিকগণের যেমন জড়জগতের উপর প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সে যুগের অণিমাদি অলৌকিক শক্তিদ্বারা ঐরূপ জড়জগতের উপর কর্তৃত্বই বুঝায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন, তিনি এই পঞ্চভূতাত্মক জড়-জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কার্য্যতঃ এই উভয় শক্তিই এক উদ্দেশ্যমূলক। এই প্রকার অলৌকিক শক্তি ছাড়াও অবতার-পুরুষদের মধ্যে অন্যপ্রকারের এমন দৈব-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা কেবল জড়ের উপর প্রভুত্ব নয়, মানুষের মনপ্রাণ ও আত্মার উপর পর্য্যন্ত উহার প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। যে শক্তির কৃপায় শুধুই অন্ধের জড় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির পুনরুদয় হওয়া নয়, জ্ঞান চক্ষুরও উন্মীলনে যুগযুগান্তরের মোহপাশ ছিন্ন হয় এবং মূর্খ, পাপী, তাপী, দুর্নীতিশীল ব্যক্তিরও জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারদিগের ভিতরেও অণিমাদি সিদ্ধাই শক্তি ও অলৌকিক দৈবশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও প্রথমটীর প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যেরূপ সহজে উন্মুখ দেখিতে পাই, পরমহংসদেবকে কখন সেরূপ হইতে দেখি নাই। নিতান্ত কোন বিপদগ্রস্ত আশ্রিতের মর্ম্মান্তিক ব্যাকুল প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া কোথাও কিছু করিলেও—যেমন তাঁহার চির-আশ্রিত মথুর বাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই শক্তি তিনি প্রয়োগ করেন নাই। এই সকল শক্তি যে সর্ব্বদা তাঁহাতেও বর্ত্তমান ছিল ইহারও সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি নিজ মুখে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'আমি মাকে বলি, দেখিস্ মা, এখানে যেন কতকগুলি রোগীর হাসপাতাল না হয়ে বসে।' গীতায় অর্জ্জুনকেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'সখা, যতক্ষণ তোমার মধ্যে এতটুকুও কামনার ভাব থাকিতে দেখিবে, জেনো, ততক্ষণ কিছুতেই আমাকে পাইবে না।' একদিন এক যায়গায় একজন ঐরূপ শক্তির খেলা দেখাইতেছিল, পরমহংসদেবকে তাহা দেখিবার কথা বলায় তিনি বলিলেন, "ওত সিদ্ধাই, ও আর দেখব কি? যোগ ভাল করা, ওসব নীচু ঘরের কথা।" অবশ্য তাই বলিয়া ইহাতে কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, এ প্রকার তাচ্ছিল্য ভাবের কথাটী অবতারগণের প্রতি প্রযোজ্য। তাঁহারা ইহা কেবল যুগের প্রয়োজনার্থে করিয়াছেন।

জাগ্রত জাপান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণ ভগবান তথাগতের মহান্ আদর্শ হইতে কিঞ্চিৎ অবনমিত হইলেও, তাঁহারাই ছিলেন জাতীয় উন্নতির কর্ণধার। তাঁহারা লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সরস্বতীর আরাধনা পরিত্যাগ করেন নাই। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে", তাই রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র সকলেই তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া চলিত এবং তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে পারিলে নিজদিগকে ধন্য মনে করিত। এই পুরোহিত এবং শ্রমণগণই ছিলেন তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান। ইঁহাদের সাহায্যেই চীন ও ভারত হইতে অজস্র জ্ঞানরাশি প্রবাহিত হইয়া জাপানের জ্ঞানভাণ্ডারকে নানারত্নে পূর্ণ করিয়াছিল। "দেঙ্গীয় দাইশী" এবং "কুকাই" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ চীন হইতে "টেন্দাই" ও "শিন্‌গন্" মতের আমদানী করিয়া জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মকে অধিকতর দার্শনিক ভিত্তি দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের পারিবারিক জীবনে এমন সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রজাসাধারণকে শাসনানুগত রাখা সহজ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুফল প্রদান করিতে না পারিলেও, জাপানের পারিবারিক জীবনের স্তরে স্তরে ইহার মধুময় ফল আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে।

হেইয়ান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান জাপানী ভাষার উৎকর্ষ সাধন। এই কার্য্য নারাযুগ হইতে আরম্ভ হইলেও হেইয়ান যুগেই উহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীতে ভূষিত হইয়াছে। এই যুগের জাপানী সাহিত্য চীনের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আপন শক্তিতে শক্তিমান এবং আপনার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইয়া জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতির তোরণ দ্বার উন্মোচন করিয়াছে এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মহামূল্য মণিমাণিক্য চয়ন করিয়া জাপানের ঘরে ঘরে বিতরণ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়াছে। সাহিত্যই সভ্যতার বাহন। সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় ভাব দেশের সর্ব্ব স্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং জাতিকে ক্রমোন্নতির পথে টানিয়া লয়। যতদিন জাপান চীনের ভাষা ও সাহিত্যকে শিক্ষার বাহন করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন শিক্ষা পণ্ডিতগণের শিরোভূষণরূপে শোভা পাইলেও সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হয় নাই। চীন ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের ছিদ্রপথে জ্ঞানসূর্য্যের আলোকরশ্মি যেটুকু প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের অভিমানটাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের কাছে জাপানের জনসাধারণকে পদে পদে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ভারত যে আজ আত্মসংবিৎ হারাইয়া পরানুকরণকারী এবং পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে, তাহার একটী কারণ ভারতীয় শিক্ষায় বিদেশী ভাষার প্রচলন। বৈদেশিক সম্রাটের অনুশাসনে এবং রাজকার্য্যে সুবিধার জন্য যখন হইতে ভারতকে বিদেশী ভাষায় মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে, তখন হইতেই ভারতের সত্যিকার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র বৎসরের মুসলমান শাসন পারসিক

ভাষাকেই মুখ্যস্থান দান করিয়াছিল, এবং গত পৌনে দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসনে ইংরেজী ভাষা সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফলে আমরা শুধু শক্তির দৈন্যে বিফল হই নাই, ভাবের দৈন্যে পঙ্গু হইতে বসিয়াছি। বাংলা সাহিত্য পুনবার আপন স্থান গড়িয়া লইয়াছে, বাঙ্গালী জাতি বিদ্যুৎবেগে উন্নতিব পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাংলার সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে বঙ্গীয় বিশিষ্ট সংস্কৃতি ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাগ্রত বাংলার বিপুল প্রবাহকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি আর কাহারও নাই। ৪০ বৎসরে জাপান জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, আগামী বিংশতি বৎসরেব মধ্যেই হয়ত নবীন বাংলা নূতন বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিবে।

রাজা ও রাজ্যের অধিনায়ক হইয়া অর্থ ও সম্মানের প্রাচুর্য্য বশতঃ ফুজিওয়াবা বংশে আলস্য ও বিলাস প্রবেশ লাভ কবিল। কষ্টসাধ্য সামরিক কার্য্য অপর হস্তে অর্পণ করিয়া ফুজিওয়ারা বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত রহিলেন। ধীরে ধীরে ফুজিওয়ারা কুলের সামরিক প্রতিভা ম্লান হইতে আরম্ভ করিল এবং প্রকৃতির নিয়মে এক তরঙ্গের অবলম্বনে অপর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ফুজিওয়ারা প্রভুত্বের অবসান সূচনা করিল। বিদ্রোহী দমনে এবং আইনু প্রমুখ আক্রমণশীল প্রান্তীয় জাতিবর্গের বিতাড়নে অক্ষম হইয়া ফুজিওয়ারা পরিচালিত দুর্ব্বল রাজপরিষৎ ঐ সমস্ত কার্য্যে অন্যান্য সমরকুশল ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইল। শক্তি কখনও দুর্ব্বল প্রভুর চরণ চুম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিতে জানেন না। ভাগ্যবশে কখনও কখনও শক্তি লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সাধনা দ্বারা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে তিনি অবিলম্বে অন্য ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন করিয়া নব প্রভুর উন্নত মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দেন। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—যে বীর সেই বসুন্ধরাকে ভোগ করিবে। সুতবাং ভূপতিকে শক্তিপতি হইতে হইবে। শুধু মানসিক কিংবা আত্মিক বল থাকিলেই চলিবে না, তাঁহাকে বাহুবলে বলীয়ান হইতে হইবে। রাজকীয় প্রভুত্ব রক্ষায় সামরিক শক্তিব প্রয়োজন অপবিহার্য্য। যখনই কোন রাজবংশ সামরিক শক্তিতে হীন হইয়াছে, তখনই তাহার পতন হইয়া অপর শক্তিমান ব্যক্তি কর্ত্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হইয়াছে। আমীব আমানুল্লা বিদ্যাবুদ্ধিতে ও মহাপ্রাণতায় অদ্বিতীয় হইয়াও শুধু সামরিক শক্তির অভাবে বিতাড়িত হইলেন। আবেসিনিয়ার বিচক্ষণ নৃপতি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘেব নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াও কোন সুবিচাব পাইলেন না। ইহাই রাজকীয় ইতিহাসেব ধারা। জাপানেব রাজবংশ সামরিক কুশলতা হারাইয়া ফুজিওয়ারা কুলের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল; আবার ফুজিওয়ারা বংশে সামরিক কুশলতাব অভাব হওয়ায় অন্যান্য কতকগুলি পরিবার শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ফলতঃ রাজ্যশাসনভার ফুজিওয়াবার হস্তচ্যুত হইয়া অন্য বংশে স্থানান্তরিত হইল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে টাচিবানা পরিবার বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া কার্য্যতঃ রাজা ও ফুজিওয়াবাব পরিচালকরূপে গণ্য হইল। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ হইতে এই বংশ জাপানে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং মহাপ্রাণতায় এই বংশ চিরপ্রসিদ্ধ। এই বংশের পতিপ্রাণা দুহিতা "ওটো-টাচিবানা" জাপানের দ্বাদশ নৃপতি "কেইকো"র বীর সন্তান ইয়ামাতো ডেকের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি পতির জীবন রক্ষার্থ জেডো উপসাগরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। এই পতিপ্রাণা 'ওটো'র অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী জাপানের

নারীসমাজে পাতিব্রত্যের যে দৃঢ়মূল সংস্কার প্রোথিত করিয়াছে, তাহা কখনই বিলীন হইবে না। এই বংশের সুকৃত সন্তান "মারোঙ্গি" সম্রাট "শমুর" (৭২৪-৭৫৬) আমলে "মাণিওস্ত্র" নামক কাব্যগ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়া জাপানের বিদ্বজ্জনসমাজে চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই টাচিবনো বংশ যখন বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং ক্ষমতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিল, তখন নারাযুগের উন্নতি স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বিভিন্নমুখী উন্নতি-প্রবাহে টাচিবানা পবিবারেব দান নিতান্ত কম নহে।

ইহার পর প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'সুগাওয়াবা' পরিবার। এই বংশেব সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি "সুগাওয়ারা নিচিজেন" সম্রাট 'উদা'র (৮৮৮—৮৯৮) গৃহশিক্ষক ছিলেন। মিচিজেনের সুপবামর্শে সম্রাট 'উদা' স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করায় ফুয়াস্বাকুব কৌশলে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিচিজেন তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং সম্রাটেব ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার সুপবামর্শে এবং অপূর্ব্ব বিচক্ষণতায় ফুজিওয়ারা-প্রভুত্বেব হ্রাস হইবার সম্ভাবনায় ফুয়াস্বাকু 'টোকিহরা' তাঁহাকে কিয়ুসুদ্বীপের শাসনকর্ত্তাপদে বরণ করিয়া কৌশলে নির্ব্বাসিত করিলেন। সম্ভবতঃ ৯০৩ খৃষ্টাব্দে কিয়ুসুতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি রাজভক্ত, বিদ্যোৎসাহী এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "টেঞ্জিন্" (স্বর্গীয় দেবতা) নামে ভূষিত করিয়া বিদ্যোৎসাহী মহামানব এবং রাজভক্তির অবতাররূপে দেবতা বোধে পূজা করা হয়। প্রতিমাসের ২৫শে তারিখকে টেঞ্জিন দিবস বলা হয় এবং ঐদিন সমগ্র জাপানের স্কুল কলেজে ছুটি থাকে। প্রতি বৎসরের ২৫শে জুন মহাসমারোহে টেঞ্জিন-উৎসব প্রতিপালিত হয়। আজ পর্য্যন্ত মহামতি মিচিজেনের বংশধরগণের প্রত্যেকেই বিদ্যানুরাগী হইয়া জ্ঞানকেই বংশের বৈশিষ্ট্যরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং বিদ্যাচর্চ্চাকেই কুলব্যবসায়রূপে বরণ করিয়া বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সুগাওয়ারা পরিবারের ন্যায় 'ও-ই' পরিবারও বিদ্যাচর্চ্চায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। সহস্র বৎসরের অধিককাল পুরুষানুক্রমে বিদ্যাচর্চ্চায় বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান আছে, এরূপ পবিবাব জগতে খুব কমই দেখা যায়। 'সুগাওয়াবা' ও 'ও-ই'-পরিবার নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্য দিয়া অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতের অসীম অত্যাচার সহ্য করিয়া এবং বংশের বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া জ্ঞানের প্রদীপটীকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই সুদীর্ঘকাল সমস্ত জগতের সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও জাপানের জাতীয় প্রতিভা ম্লান হইয়া যায় নাই।

এই দুই পরিবার যাহাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় জীবনযাপন করতঃ বংশের ধারা রক্ষা কবিতে পারে তজ্জন্য জাপ-সরকার হইতে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। জ্ঞান চর্চ্চার জন্য রাজকীয় বৃত্তিদান একটি ভারতীয় প্রথা। সেদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি দান করিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেন। এই প্রথা ভারতের প্রতিস্তরে এত বিস্তৃত ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তিই পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখন পর্য্যন্ত এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও অনেক রাজা, জমিদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তি পণ্ডিতদিগকে নিয়মিত বৃত্তিদান করিয়া থাকেন এবং বিবাহ, অন্নারম্ভ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় পণ্ডিত বিদায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। কালের পরিবর্ত্তনে

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং অর্থের অনটনে এই প্রথা দ্রুত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা যে সমাজের পক্ষে মহাকল্যাণকর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই সহস্রাধিক বৎসরের অধীনতা আমাদের শরীরকে আড়ষ্ট করিয়াও মনকে আবিষ্ট করিতে পারে নাই—ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বিজাতীয় আবর্জ্জনাস্তূপে আবৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ যে ভারতের পূর্ব্বগগনে অরুণছটা দৃষ্ট হইতেছে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এই ব্রাহ্মণরক্ষিত ভারতীয় সংস্কৃতির পুঞ্জীভূত আলোকমালা। নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া শত অত্যাচার সহ্য করিয়া যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে তাঁহারা যক্ষের ধনের মত আগলাইয়া বসিয়াছিলেন বলিয়াই আজ ভারতে নব জাগরণের সাড়া দিয়াছে—সাগ্নিকের অগ্নিস্পর্শে যুগান্তরের অন্ধকার বিদূরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত আত্মসংবিৎ লাভ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিয়াছে।

খৃষ্টভক্ত সাধু সুন্দর সিং

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

ব্যাকুলতাই ঈশ্বরদর্শন এবং শান্তি ও আনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। প্রভু যীশু বলিয়াছেন, "ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তবেই যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে; তাঁহাকে খোঁজ, তবেই তাঁহাকে পাইবে; দরজায় ধাক্কা দাও, তবেই দরজা খুলিয়া যাইবে। প্রথমতঃ স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান কর এবং দেখিবে বাকী অন্যান্য সব আপনা আপনিই আসিবে। ধর্ম্মের জন্য যাহাদের ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা হইয়াছে তাহারাই ধন্য; কারণ তাহারাই শান্তি ও আনন্দ পাইবে।" ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন, খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাক্‌তে হয়। ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন। যো সো ক'রে একবার ঈশ্বরকে লাভ কর, তা হ'লে তাঁর কৃপায় অন্যান্য সবই পাবে।

কত সাধু মহাত্মা ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন, জগতের ধর্ম্মেতিহাস উহার প্রমাণ দিবে। সুন্দর সিং এরূপ একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্ত সুন্দরের ব্যাকুলতায় কাতর হইয়া যীশুখৃষ্ট-রূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু সাধু সুন্দরের জীবন-কথা।

উত্তর ভারতের অন্তর্গত রামপুরের এক সম্ভ্রান্ত, ধনী ও শিক্ষিত বংশে সুন্দর সিং জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতাপিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মাতাপিতা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, হিন্দু ও শিখ উভয় ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহাদের সমান অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। উভয় ধর্ম্মের মন্দিরসমূহেই তাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং উভয় ধর্ম্মের শাস্ত্রসকল সমান শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন। মুসলমানদের

কুর্‌আন্‌কেও শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইস্‌লাম সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ভক্তিমতী ও কোমল হৃদয়া মাতা ধর্ম্মমন্দিরে গমন বা ধর্ম্মাচরণকালে সর্ব্বদাই প্রিয়, কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে রাখিতেন। বালকের কোমল ও ভাবপ্রবণ হৃদয়ে মাতার ধর্ম্মপ্রাণতা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তরুণ বয়সেই মাতা বালকের সম্মুখে সাধুজীবনের পবিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়া হৃদয়ে এই আশা পোষণ করিতেন, তাঁহার পুত্র যেন কালে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া একজন সাধু হয়।

মাতার মৃত্যুর পর সুন্দর সিংএর জীবনে প্রকৃত শান্তিলাভ করিবার বলবতী ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। সাত বৎসর বয়সে বালক সমগ্র ভগবদ্গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল এবং মাতার সহায়তায় অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র ও শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করিল। বালক কুর্‌আন্‌ এবং উপনিষদ্‌ সমূহও আয়ত্ত করিল। চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারা অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে কতিপয় যোগসাধন অভ্যাস করিল। জীবনের এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া সুন্দর সিং পরে লিখিয়াছেন "আমি নিজের পরিত্রাণ চাহিয়াছিলাম। আমাদের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। আত্মার শান্তির জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছি। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, শান্তিবিধায়ক নানাবিধ কর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলাম না।"

এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও মানসিক অশান্তির ভিতর দিয়া সুন্দর সিংএর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এই সময়ে সে ইংরাজী ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষালাভ করিবার জন্য এক খৃষ্টান পরিচালিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ক্রমে বিশেষরূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। খৃষ্টধর্ম্ম তাহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছিল বলিয়াই যে এই ধর্ম্মের প্রতি তাহার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল তাহা নহে; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এতদ্দেশীয় ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানসকল ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়া চলিলেই প্রকৃত শান্তির অধিকারী হওয়া যায়, বিদেশী ধর্ম্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিলে সেই শান্তি পাইবার আশা নাই। বালক সর্ব্বপ্রকারে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল—প্রকাশ্যভাবে বাইবেল ছিন্নভিন্ন করিয়া আগুনে পোড়াইল এবং যাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাসী তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও অপমানিত করিতে লাগিল।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি সুন্দরের বিদ্বেষ দিন দিন যতই প্রবল আকার ধারণ করিতে লাগিল, তাহার অশান্তিও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে শান্তি লাভের জন্য সে চেষ্টা করিতেছিল সে শান্তি যেন তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। শীঘ্রই ব্যাপারটি চরম পরিণতি লাভ করিল। বাইবেলের দুইটি বাক্য অবিরত তাহার অন্তরে ঘণ্টার শব্দের মত ধ্বনিত হইতে লাগিল—"যারা সংসার জ্বালায় ক্লিষ্ট এবং পাপভারাক্রান্ত আছ তারা আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব। আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব। আমি তোমাদিগকে নূতন জীবন দিব।" কিন্তু সুন্দর সিং নিজে নিজে তর্ক করিতে লাগিল—"যীশু নিজেই নিজকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তিনি তবে কিরূপে অন্যকে রক্ষা করিবেন?"

১৯০৪ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে সুন্দর সিং হৃদয়ের অশান্তির তীব্র জ্বালায় অস্থির হইয়া ধৈর্য্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইলেন। সারারাত্রি তিনি প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটাইলেন। রাত্রি ৩ ঘটিকায় তিনি শীতলজলে অবগাহন সমাপন করিয়া, রাত্রিশেষে রামপুরের ভিতর দিয়া যে ডাক গাড়ী উত্তরাভিমুখে চলিয়া যাইবে সেই গাড়ীর নীচে পড়িয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। অবগাহনের পর অবিরত

প্রার্থনাই করিতে লাগিলেন এবং স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, হয় ভগবানের দর্শন পাইয়া পরাশান্তি লাভ করিবেন নতুবা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। তিনি যখন গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় বিভোর ছিলেন, সেই সময় সহসা এক জ্যোতির্ম্ময় মানবমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ মূর্ত্তিটিকে বুদ্ধ বা কৃষ্ণ বলিয়া মনে ভাবিলেন। শ্রদ্ধাবিমিশ্রিতভীতির সহিত দৃষ্টিপাত করিতেই সুন্দর শুনিতে পাইলেন, "আমাকে কেন তুমি নির্যাতন করিতেছ? মনে রাখিও, তোমাদের জন্যই আমি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়াই বালক সুন্দর যীশুর পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তিবিনম্রচিত্তে আরাধনা করিতে লাগিলেন। সুন্দর সিং এই সময়ের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "আমার মাতৃভাষা হিন্দি অথবা ইংরাজী কোন ভাষাতেই আমি সেই সময়কার দিব্যানন্দ প্রকাশ কবিতে পারিব না।"

খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকা সত্ত্বেও সুন্দর সিং যীশুর দর্শন পাইয়া ধন্য হইলেন কেন? কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ যে ভাবেই হউক ঈশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিলে ভক্ত অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হন। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ যে ভাবেই হউক ঈশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া চিত্তমলপাপাদি দূরকরত বহু সাধক পরম গতি লাভ করিয়াছেন। গোপীগণ, কামে, কংস ভয়ে, শিশুপালাদি নৃপতিগণ দ্বেষে, বৃষ্ণিবংশোদ্ভবগণ সম্বন্ধে, আপনারা (পাণ্ডবেরা) স্নেহে এবং আমরা (নারদ প্রভৃতি) ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি।"

সুন্দর সিংএর উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল কিন্তু তিনি অবিচলিতচিত্তে খৃষ্টধর্ম্মের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ততই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি প্রভু যীশুর উপদেশ স্মরণ করিয়া নীরবে নির্যাতন, অপমান ও আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা সহ্য করিতে লাগিলেন। যীশুর বাণী তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল: "আমার নামের জন্য তোমাদিগকে সকল লোক ঘৃণা করিবে, কিন্তু যে শেষপর্য্যন্ত সহ্য করিবে, সেই রক্ষা পাইবে।" যখন সুন্দর শিখের গৌরবময় চিহ্ন দীর্ঘকেশ কর্ত্তন করিলেন তখন পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সুন্দর কিছুকাল পাঞ্জাবের লুধিয়ানাস্থিত প্রেস্‌বিটীরিয়্যান্ মিশনে অবস্থান করিয়া পরে সিমলার নিকটবর্ত্তী সুবাথু নামক স্থানে গমন করিলেন। ১৯০৫ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁহার ষোড়শ জন্মদিবসে সুন্দর সিং সিমলার এংগ্লিকান গির্জ্জায় খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুন্দর সিং ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-ভোগ, নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়া তাঁহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কিন্তু সুন্দরের উহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই—তিনি যীশুকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়া মনের আনন্দে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচার ও পবিত্র জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহুলোক খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তিনি লাহোরের এংগ্লিকান গির্জ্জায় ধর্ম্মপ্রচারের অধিকার ও অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

লাহোরে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিয়া সুন্দর সিং ভারতের বাহিরে তিব্বত দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি কয়েকবারই তুষারাবৃত হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থানকালে তিনি

"কৈলাসের মহর্ষি" নামে জনৈক বৃদ্ধ তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই মহর্ষি পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন, পরে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তপস্বীর জীবন-যাপন করিতেছিলেন। তপস্বী সুন্দর সিংএর সহিত তিনি খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষির উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন সুন্দরের ধর্ম্মজীবনের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল।

এক সময়ে সুন্দর তাঁহার প্রচারকার্য্যের প্রথম ভাগে চল্লিশ দিন নীরব অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। একদল কাঠুরিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন ও অতিশয় ক্লান্ত অবস্থায় দেখিতে না পাইলে সুন্দর নিঃসন্দেহে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ একরূপ প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃত্যর্থে পাব-লৌকিক কার্য্যাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সুন্দব সিং কৃচ্ছ্রসাধনেব পবও সশরীরে জীবিত আছেন।

দাক্ষিণাত্যবাসিগণেব আগ্রহাতিশয্যে সুন্দব ১৯১৮ খৃঃ দক্ষিণভাবতে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে তিনি সিঙ্গাপুব হইয়া চীন ও জাপানে গমন করেন। দলে দলে লোক তাঁহাব ধর্ম্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইত। তাঁহার প্রচারের এমনি একটা মোহিনী শক্তি ছিল।

১৯১৯খৃঃ তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহাব পিতা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম যে মহাদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল সেই ইউরোপ মহাদেশ দেখিবার সুন্দর সিংএর বহুদিনের একটা প্রবল বাসনা ছিল। পিতা সানন্দে প্রাথমিক ব্যয় বহন করিলেন। ১৯২০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে সুন্দর সিং ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অনেক বড় বড় সভায় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ সনের মে মাসে তিনি আমেরিকায় গমন করেন। কয়েক মাস আমেরিকার প্রসিদ্ধ নগরগুলিতে ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়া মার্কিনবাসীদের উপর তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আগষ্ট মাসে তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন এবং সেপ্টেম্বরে দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯২২ খৃঃ সুন্দর প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ করেন এবং প্রভু যীশুর জন্ম ও লীলাস্থানগুলি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পিতার অর্থানুকূল্যে সুন্দর পুনঃ ইউরোপে গমন করিয়া সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন্ এবং ব্রিটিশদ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন।

সুন্দর সিংএর চরিত্রবল, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ত্যাগপূত জীবন কঠোব অগ্নি-পবীক্ষার সম্মুখীন হইয়াও পরিণামে জয়যুক্ত হইয়াছিল। ইউরোপ ও আমে-রিকা পরিভ্রমণ কালে তত্রত্য খৃষ্টান নরনারীগণের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাব, শত্রুগণের নির্দ্দয় সমালোচনা ও আক্রমণ সর্ব্বত্র বিপুল প্রশংসা ও যশোলাভ সুন্দরের দৃঢ় মনকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পাবিল না। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পবাজয় সমজ্ঞান করিয়া সুন্দর সিং অভীষ্ট পথে অগ্রসব হইতে লাগিলেন।

১৯২৩ খৃঃ পিতার মৃত্যুর পর সুন্দর ভারত ও তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার লিখিত পুস্তক ও উপদেশাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৯ খৃঃ প্রথমভাগে সুন্দর সিং পুনঃ তিব্বতে গমন কবেন এবং তথা হইতে আর কখনও ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কোনও সংবাদ আর ভারতে পৌছে নাই। কিন্তু তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মৃত্যুর কারণ কেহই অবগত নহে। শারীরিক নির্য্যাতন, হিমালয়ের শীতাধিক্য ও তুষারপাত, অনশন বা রোগ—ইহাদের যে কোন একটিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। অসাধারণ ত্যাগ ও

একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ প্রেম, ব্যাকুলতা ও সেবা-পরায়ণতা, অপ্রমেয় সহিষ্ণুতা, বিনয় ও চরিত্র-মাধুর্য্য, সর্ব্বোপরি অনিন্দ্য সাধুতার বলে সুন্দর সিং খৃষ্টধর্ম্মজগতে সাধু পল, সাধু ফ্রান্সিস্, সাধু একহার্ট প্রভৃতি খৃষ্টভক্তগণের পাশাপাশি স্থান পাইবার অধিকারী। সাধু সুন্দর সিংএর ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক হইয়াও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। সাধু সুন্দরের নাম জয়যুক্ত হউক!

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়গোপাল বিশ্বাস

তুমি সন্ন্যাসী! তুমি বীর!
উজ্জ্বল তব গৈরিক বাস,
উন্নত তব শির,
তুমি বীর।

তুমি বজ্র-নিনাদে ডাকিলে উচ্চে—
দূরে ওই প'ড়ে কা'রা!
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া;
শক্তি-মায়ের সন্তান যদি—
খাঁড়া রও, রহ খাঁড়া।
মৃত্যুরে মারো,
সংহারো—
ওই সংহারো
যত জীর্ণ-জড়তা ভয়—
এই বাণী দুর্জ্জয়
দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিলে সহসা
বিরাট ধরিত্রীর।
তুমি সন্ন্যাসী! তুমি বীর!
বিপুল-জীবন-সঙ্গীত তব
জলন্তপয়োধির!
তুমি বীর।

তুমি কাল বৈশাখী কর্ম্ম-আহবে
উদ্দাম, চঞ্চল!
বিদ্যুদ্গতি
মহারথী
দলি' বাধার বিন্ধ্যাচল
হাঁকিলে—চল্‌রে চল্
অমৃতের সুত শাশ্বত তোরা
অমর যাত্রিদল!
আজি ছুটে চল্,
ওরে ছুটে চল্ অবিচল!
অগ্নিহোত্রী পুরোহিত তুমি
মুক্তি-গায়ত্রীর।
তুমি সন্ন্যাসী! তুমি বীর!
শান্তি-সৌধ রচিলে বিশ্বে
সাম্য ও মৈত্রীর!
তুমি বীর।

আজি কী বেদনা জননীর—
জাগো ভারতের ভাগ্য-বিধাতা
ত্রাতা এ দুর্গতির;
জাগো বীর।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও শাঙ্কর বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

অদ্বৈতবাদী প্রথমঃ পদাব্জ
বাদী প্রভুশ্চ প্রতিভৈক সিন্ধুঃ।
তৌ ভক্তসেব্যৌ বহু দীর্ঘকালং
বদাবদৈ নিস্তুতুবন্তথৈব ॥ ২৭

প্রতিভার একমাত্র সাগর পদাব্জবাদী (কৃষ্ণপাদ-পদ্মবিশ্বাসী) এবং অদ্বৈতবাদী প্রধান ও উভয়বিধ ভক্ত সেবিত প্রভু দীর্ঘকাল বাদ-বিচারের দ্বারা অন্যপ্রকারেই নির্ণয় করিলেন—

অথৈষ বিস্মেরমনা দ্বিজাগ্র্যো
হৃদাহৃদি ব্যাকুলিতা জগাদ।
ক এষ মৎপ্রাতিভখণ্ডনার্থ
মিহাবতীর্ণঃ কিমু গীষ্পতিঃস্যাৎ। ২৮

অতঃপর বিপ্রশ্রেষ্ঠ বিস্মিতমনা এবং অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "ইনি কে ? আমার *প্রতিভাবল খণ্ডন করিবার জন্য স্বয়ং বৃহস্পতি কি* এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন ?"

ইতীহ তর্কো মম সর্ব্বদাসীৎ
বৃহস্পতি র্মৎপ্রতিভা সমুদ্রে।
ন পারমাসাদয়িতা কদাপি
সদোদ্যতঃ সন্নপি বুদ্ধিনা বা। ২৯

এইরূপ তর্ক আমার সর্ব্বদাই হইতেছে। বৃহস্পতিও আমার প্রতিভাসমুদ্র কখনও অতিক্রম করিতে পারেন নাই—বুদ্ধিদ্বারা অথবা সদ্ বিচারের দ্বারাই হউক।

সার্ব্বভৌম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে "ইঁহাকে তো কিশোর বয়স্ক বালক বলিলেই হয়—ইহাতে কি-ই বা অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিয়াছেন! তাহা হইলে আমার শক্তি থাকা সত্ত্বেও উহা প্রকাশ পাইল না। অতএব ইনি যে নিজেই শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ ইহার চরিত্রে ও ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাইতেছি।" এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিয়া তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। অশ্রুবিগলিত চঞ্চলনেত্রে রোমাঞ্চিত কলেবরে সার্ব্বভৌম নানা স্তবস্তুতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রসন্ন করিতে রত হইলেন এবং একমাত্র করুণাসিন্ধু প্রভু তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন।

প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং
দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ।
ততোঽধিকং সোঽপি ননন্দ বিপ্র
স্ততোধিকঞ্চ স্তবমপ্যকার্ষীৎ। ৩৩

তখন সার্ব্বভৌম যে স্তব করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কবি কর্ণপুর বলিতেছেন—

যদ্‌যৎ স ভূমীসুরসত্তমুখ্যা
স্তুষ্টাব তুষ্টঃ সুমহা প্রগল্ভঃ।
তত্তন্ন বাচস্পতিরপ্য ভীক্ষ্ণং
প্রয়াসতোঽপি প্রস্তবেন্তুবিষ্ণুঃ। ৩৪

বিপ্রবর্গের শ্রেষ্ঠতম মহাপ্রগল্ভ সার্ব্বভৌম ভগবদ্ প্রভাবে তুষ্ট হইয়া যে প্রকার স্তব করিয়াছিলেন—স্বয়ং বৃহস্পতি চেষ্টা করিয়া সেরূপ করিতে সমর্থ হন না।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিছুদিন ৺নীলাচল ধামে বাস করিয়া দক্ষিণদেশে যাইতে মনস্থ করিলেন। কিয়দ্দূর তাঁহার ভক্তগণ পশ্চাদ্গমন

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গোপীনাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। গোপীনাথের হাতে একখানি স্তবের পুস্তক দেখিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার হাত হইতে প্রণয়ভরে উহা কাড়িয়া লইলেন। ভক্তগণ ইত্যবসরে তথায় আসিয়া জুটিলেন এবং মিষ্টালাপ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

ভক্তগণ চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া উক্ত পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌমের রচিত একটী স্তবের মধ্যে "কৃষ্ণ" শব্দ দেখিতে পাইয়া আগ্রহের সহিত পড়িতে পড়িতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—ব্যাকুলভাবে ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দুইনেত্রে অবিরল জলস্রোত বহিল। সে নয়নাশ্রুতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল। তিনি স্তব্ধ অবশভাবে থাকিলেন। এইভাবে তিনি অবশিষ্ট দিবাভাগ ও রাত্রিকাল সেই বৃক্ষমূলে শুইয়া রহিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে তিনি জাগরিত হইয়া বিহ্বলভাবে গদ্‌গদ্ বাক্যে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "হায়! হায়! সেই মহাভাবাঢ্য সার্ব্বভৌমের নিকট আমার বহু অপরাধ হইয়াছে।" পথ চলিতে চলিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে "অহো! সেই মহাভাবাঢ্য সার্ব্বভৌমকে ছাড়িয়া আমি অজ্ঞানের ন্যায় অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইতেছি! না, না, আবার শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাই। ফিরিয়া গিয়া সেই মহানুভব পুরুষ সার্ব্বভৌমের সেবা করিব। শুদ্ধভাবে তাঁহারই কেবল সেবা করিয়া কাটাইব।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি এক প্রহরের মধ্যে আবার শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হইলেন। পুরীধামে আসিয়াই তিনি গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট একজন ভৃত্যকে পাঠাইলেন। বিস্ময়ে গোপীনাথ সেই ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি? তুই কি মিছে কথা বল্‌ছিস্? আমরা কাল তাঁকে অনেক দূর নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি! আজ হঠাৎ কেন তিনি আবার ৺পুরীতে ফিরে আসবেন? তুই সত্যি করে বল্—মহাপ্রভু কি ৺পুরীধামে আবার ফিরে এসেছেন?" ভৃত্য বিনীতভাবে বলিলেন, "ঠাকুর! এ মিছে কথা বলায় আমার লাভ কি? সত্য সত্যই মহাপ্রভু এখানে ফিরে এসেছেন। এসেই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। তাঁর আদেশে আমি আপনার কাছে এসেছি।" গোপীনাথ আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। গোপীনাথ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় প্রণত হইয়া বলিলেন, "প্রভু! একি আশ্চর্য্য? আপনি কিভাবে নীলাচলধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন আবার কি ভাবেই বা ফিরে এলেন?" অবাক বিস্ময়ে হৃষ্টমনে গোপীনাথ তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন। গোপীনাথের ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া মহাপ্রভু মধুর রসাপ্লুত বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, "গোপীনাথ! সার্ব্বভৌমের নিকট আমার মহাঅপরাধ হইয়াছে, কেননা—

> যতোঽহমেতং পরিহায় দম্ভা-
> ত্তীর্থাটনং কর্ত্তুমনা বভূব। ৫০

আমি দম্ভবশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে বাহির হইয়াছিলাম।

> অসৌ মহাত্মা ভগবৎস্বরূপো
> জগত্রয়ীত্রাণপরঃ সদীহঃ।
> যদস্য বক্ত্রাদুদভূৎ স কৃষ্ণ-
> নামানবদ্যং ললিতৈক পদ্যং। ৫১

এই মহাত্মা ভগবানের স্বরূপ—ত্রিজগতের ত্রাণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। কেননা ইঁহার বদন হইতে কৃষ্ণনামের সুললিত পদ্য বিনির্গত হইয়াছে।

> তদস্য সেবৈব ময়া বিধেয়া
> মমস্ত্বিয়ং কেবলমীশসেবা।

ইত্থং বিচিন্ত্যার্থমহং গতোঽপি
তীর্থপ্রয়াণে পুনরাগতশ্চ। ৫২

অতএব ইহার সেবা করা আমার বিধেয়। কেবল ইঁহার সেবাই আমার পক্ষে ঈশ্বরের সেবা। এইরূপ চিন্তা করিয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া গোপীনাথ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "পরম কারুণিক প্রভুর দীনজনের প্রতি এত করুণা। ইঁহার দুর্গম মাহাত্ম্য কে বুঝিবে? আমরা তো ছার সাধারণ জীব! সার্ব্বভৌম পরম ভাগ্যবান, তাই ইঁহার প্রতি তাঁহার এত করুণা উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাগ্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের পক্ষেও দুর্ল ভ।

বেদান্তিনাং মণ্ডল-সার্ব্বভৌমঃ
স সার্ব্বভৌম গতভক্তিগন্ধঃ।
দৈবেন পদ্যোদ্গাত কৃষ্ণনামা
বভুব যুষ্মৎ করুণাধি পাত্রং। ৫৩

বৈদান্তিক মণ্ডলীর মধ্যে—যিনি সার্ব্বভৌম বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত সেই সার্ব্বভৌমের তো ভক্তির গন্ধমাত্র নাই। তাঁহার রচিত পদ্যে দৈবাৎ কৃষ্ণনাম উল্লিখিত হইয়াছে—তাই তিনি আপনার এত অধিক করুণার পাত্র হইলেন, গোপীনাথ বিস্ময়োৎসাহে মহাপ্রভুকে স্পষ্টই ইহা বলিয়া ফেলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত গোপীনাথকে বলিলেন, "তুমি এইরূপ কথা আর বলিও না। সম্প্রতি ইঁহার সেবাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।" পরদিন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদান্ন লইয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। সার্ব্বভৌমের জনৈক ভৃত্য সার্ব্বভৌমকে জানাইতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত সার্ব্বভৌমের শয্যাগৃহের প্রান্তে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সার্ব্বভৌম অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগরিতভাবে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছেন। পার্শ্বপরিবর্ত্তন কালে সার্ব্বভৌমকে "শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে তিনি শুনিলেন। কিয়ৎপরেই সার্ব্বভৌম সম্পূর্ণ জাগরিত হইয়া সম্মুখে সমুজ্জ্বল হেমকান্তি যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তকে দেখিয়া ত্বরায় শয্যাত্যাগপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। উভয়ে মহাকৌতুকে মধুর আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে মহাপ্রভু বস্ত্রাঞ্চল হইতে মহাপ্রসাদান্ন লইয়া সার্ব্বভৌমকে দিয়া বলিলেন, "আপনি নিত্যকৃত্য শেষ করিয়া—এই মহাপ্রসাদ ভোজন করিবেন।" সার্ব্বভৌম অমনি গাত্রোত্থান করিয়া অত্যন্ত স্পৃহার সহিত হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রসাদান্ন লইলেন। অমনি তাঁহার মনে হইল—

প্রসাদলব্ধৌ যদি চেদ্বিলম্বঃ
কৃতং কৃতংতৎ খলু বিজ্ঞতাভিঃ। ৭১

প্রসাদ লাভে যদি বিলম্ব করা যায় তবে সে বিজ্ঞতারই ফল কি? ইহা মনে চিন্তা করিয়া আনন্দচিত্তে পুলকিত কলেবরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া তাঁহাকে দুই বাহু-দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। তখন উভয়ে অশ্রুজলে ও স্বেদবারিতে সিক্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ও উল্লাসে প্রেমানন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। উভয়ের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, নেত্র বিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল, তিনি জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গ হইলে সার্ব্বভৌম সেইদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের শ্রীচরণে আপনাকে বিকাইয়া দিলেন। প্রত্যহ শ্রীশ্রীজগন্নাথের ধূপ-আরতি দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতেন। একদিন তিনি মহাপ্রভুকে বিনীত ভাবে বলিলেন—

ব্যাখ্যা হি ভো মধ্যমুকম্পয়েশ
পদ্যৈকমেতদ্গদিতুং বিভেমি।

ব্যাখ্যায়তেঽস্মাভিরিদং ন চাত্র
হৃৎপ্রত্যয়ঃ কোঽপি চ সংপ্রতি স্যাৎ। ৭৯
ইত্যুচিবান্ পদ্যযুগং প্রমোদা-
দেকাদশস্কন্ধ ভবং পপাঠ।
নিশম্য তৎ কারুণিকাগ্রগণ্যো
ব্যাখ্যাং চকারাতি সুদুর্গমার্থাং। ৮০
পৃথক্ পৃথক্ত্বান্নবধা চকার
ব্যাখ্যাং সপদ্যদ্বিতয়স্য শশ্বৎ।
অষ্টাদশার্থাননুভয়ো র্নিশম্য
মহাবিমুগ্ধোঽভবদেষ বিপ্রঃ। ৮১

হে প্রভু। আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া একটী পদ্য শ্লোক ব্যাখ্যা করুন। যদিও আমরা শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, তবুও সম্প্রতি হৃদ্বোধ হইতেছে না। "ইহা বলিয়া সার্ব্বভৌম একাদশস্কন্ধের দুইটী পদ্য শ্লোক তাঁহার নিকট পাঠ করিলেন। করুণা-সাগর তাহা শুনিয়া অতি দুরূহ অর্থে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটী শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা তিনি করিলেন। উভয় শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন যে, "আপনার মহানুভবতা যে এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারি নাই, ইহার কারণ আমার পশুত্ব বা অজ্ঞানতা।" এইরূপ বহু প্রকার স্তবস্তুতি করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জনৈক অন্তরঙ্গ পার্ষদকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে স্বগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জন্য মহাপ্রসাদান্নসহ একটী পত্রীতে দুইটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ইতিপূর্ব্বে সেই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। উক্ত পত্রী পাঠ করিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মুকুন্দ দত্ত সেই পত্রীর লিখিত শ্লোক দুইটী ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ ভিত্তিতে ঐ দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া মণিরত্নহারের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিলেন।

ক্রমশঃ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

গত ২৩শে নবেম্বর (১৯৩৭), বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গিরিডিতে হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনিয়া পার্কসার্কাসের 'ক্রিমেটোরিয়ামে' ভস্মীভূত করা হইয়াছে। ভস্মাবশেষ বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরে তদীয় পিতা এবং মাতার ভস্মাবশেষের পার্শ্বে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল উনআশী।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্র বসু একজন সঙ্গতিসম্পন্ন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই পুত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগদীশচন্দ্র সেন্‌জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং এই কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮১ সালে ইংলণ্ড গমন করেন এবং কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে

ভর্ত্তি হ'ন। সেখানে চারিবৎসর অধ্যয়ন করিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, ট্রাইপস্ উপাধি লাভ করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস্, সি উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতবাসী অধ্যাপকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশনেল সার্ভিসে' প্রবেশ করিবার সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার প্রথম এবং প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ। সেখানকার লেবরেটরী সেকালে অতি সাধারণ ধরণের ছিল। ভারতীয় দ্বারা উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে সম্ভবপর, তাহা তদানীন্তন দেশীয় এবং বিদেশীয় কাহারও কল্পনার মধ্যেই ছিল না। নানা প্রকার যন্ত্রসম্ভারে সজ্জিত উচ্চাঙ্গের লেবরেটরীতে বসিয়া প্রসিদ্ধ জর্ম্মান বিজ্ঞানবিদ হারৎজ্ ১৮৮৭ সালে তড়িৎ চুম্বক-তরঙ্গের সন্ধান পান। হারৎজ্ যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্ষুদ্র গবেষণাগারে, দেশীয় কারিগরদ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া জগদীশচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে সকল পরীক্ষাই করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃএ এই সম্বন্ধে তিনি 'রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব বেঙ্গলে' একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, ইহাতে ভারতবর্ষের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টি প্রথম এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের উপর নিপতিত হয় এবং ১৮৮৬ খৃঃ তিনি ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি ক্ষুদ্র তড়িৎ চুম্বক-তরঙ্গ উৎপাদন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করেন যে এই সকল তড়িৎতরঙ্গ আলোক-তরঙ্গেরই অনুরূপ। হারৎজের আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কণি বেতার-টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন করেন। জগদীশচন্দ্রও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া একই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। তাই বিশ্বজগতের নিকট আজ মার্কণি 'বেতার টেলিগ্রাফের' আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত; আর আমাদের দরিদ্র দেশের জগদীশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা অন্ধকারে লুক্কায়িত! আন্তর্জাতিক পদার্থ বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ১৯০০ খৃঃএ প্যারিস্ প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিত হ'ন। এই প্যারিস্ প্রদর্শনীতেই স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন, জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্ দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি —এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতির বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহুগৌরবপূর্ণ প্রতিভ মণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল

করেন—বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন করেন। ধন্ত দম্পতি।”

অতঃপর আর একটী বিষয়ের সন্ধানে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। উদ্ভিদের মধ্যেও যে চেতনাশক্তি বর্ত্তমান, অন্তান্ত জীবের স্তায় যে তাহাদেরও বেদনা এবং আনন্দ অনুভব করিবার শক্তি আছে, তাঁহাই আবিষ্কার করিবার জন্ত তাঁহার অবশিষ্ট জীবন নিয়োজিত হয়। লজ্জাবতী লতার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোনপ্রকারে বৃক্ষের মৃত্যু ঘটাইতে পারিলে অন্তান্ত জীবের স্তায় উহারও মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুভূতি হয়। এই উদ্দেশ্তে তিনি আশ্চর্য্যজনক যন্ত্রাদি বাহির করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে উদ্ভিদের মধ্যেও স্নায়ুচক্র রহিয়াছে।

১৯০৭ সালে তিনি পুনরায় বিদেশ গমন করেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া ১৯০৯ সালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১৪ সালে তিনি পঞ্চমবার পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন। ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া তিনি আমেরিকায় যা'ন এবং ফিরিবার পথে জাপানে অবতরণ করিয়া বক্তৃতাদি দান করেন। ১৯১৯ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপে গমন করেন এবং অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন। এবাডিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে এল্, এল্, ডি উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৮ সালে জেনিভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মেলনে যোগদান করেন। ইহা তাঁহার সপ্তম পাশ্চাত্য অভিযান।

১৯১৭ সালে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আজীবন সঞ্চিত অর্থ এই বিজ্ঞান মন্দিরের সেবায় এবং অন্তান্ত দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়ের জন্ত তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় স্থাপিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গৃহ সম্পূর্ণ হিন্দুআদর্শে নির্ম্মিত। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আজ ইহ জগতে নাই, কিন্তু 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের দেশবাসী জগতের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া, আচার্য্যের স্মৃতিরক্ষা করিবে এই আশা করি।

মাতৃভাষার প্রতি জগদীশচন্দ্রের প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার গবেষণাগুলি প্রথম বাঙ্গালা ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁহার আবিষ্কারের যন্ত্রগুলির নামকরণ করিয়াছেন তিনি দেশী ভাষায় যথা 'বৃদ্ধিমান,' 'কুঞ্চনমান' ইত্যাদি। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'অব্যক্ত', বাঙ্গালীর পক্ষে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বুঝিবার অপূর্ব্ব সামগ্রী।

১৯১৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঐ কলেজেই অবৈতনিক অধ্যাপক ভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি নাইট্ উপাধি লাভ করেন। ১৯২০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

ভগ্নী নিবেদিতার সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ভগ্নী নিবেদিতার ১৭নং বসু পাড়া লেনস্থ গৃহে বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, কলাশিল্প ইত্যাদি আলোচনায়, আচার্য্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। ভগ্নী নিবেদিতার ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে জগদীশচন্দ্র ছিলেন প্রধান সহায়। ভগ্নী নিবেদিতার অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ হয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দার্জ্জিলিং-এর বাটীতে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষভাগে নিবেদিতার পরিকল্পিত বজ্রচিহ্ন শোভা পাইতেছে এবং প্রাঙ্গণে তাঁহার মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে নিবেদিতার স্মৃতিকল্পে বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে জগদীশচন্দ্র একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্যা মিসেস্ সেভিয়ার বসু-দম্পতীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে বসু-দম্পতী গ্রীষ্মকালে কয়েকবার আমাদের হিমালয়স্থ মায়াবতী আশ্রমে গমন করিয়াছেন। হিমালয়-বক্ষে এই নিভৃত আশ্রমটী জগদীশচন্দ্রের অতি প্রিয় স্থান ছিল। হিমালয়ের শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি এই বৈজ্ঞানিক ঋষির হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিত; কারণ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অনুভূতি লাভই ছিল তাঁহার জীবনের অক্লান্ত সাধনা। মায়াবতীর নিভৃত দেবদারু কুঞ্জের মধ্য দিয়া এক মনোরম পথে আচার্য্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া প্রত্যহ একাকী পরিভ্রমণ করিতেন। আশ্রমবাসীরা আজও এই রাস্তাটীকে 'ডক্টর বসুজ্ ওয়াক্' বলিয়া অভিহিত করেন।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

দুইটি পক্ষ উঠাইয়া প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই দোষ দেখাইতেছেন :—

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥৪৯

অন্বয়। সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য অবস্তুতা স্যাৎ। (দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন)— নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বম্ ন দৃষ্টম্ ন চ সম্ভবি।

অনুবাদ—মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তুটি সবিকল্পক অর্থাৎ নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু হইলে তাহা অবস্তু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না (কেননা নাম প্রভৃতি কল্পনামাত্র এবং তাহা যাহার ধর্ম্ম তাহা অনিত্য)। আবার সেই বস্তুটি নির্ব্বিকল্পক হইলে লক্ষ্য হইতে পারে না, (অর্থাৎ যাহাতে নাম জাতি প্রভৃতি বিকল্পদ্বারা লক্ষ্যত্বরূপ ধর্ম্মই নাই, তাহা কিপ্রকারে লক্ষ্য হইবে?)

টীকা—"সবিকল্পস্য"—বিকল্প শব্দের অর্থ যাহা বিপরীতরূপে (এবং সেইহেতু বিবিধরূপে) কল্পিত হয়, (যেমন রজ্জুর স্বরূপ হইতে বিপরীতরূপে এবং সেইহেতু নানারূপে কল্পিত সর্প, দণ্ড, ভূমির ফাট্, ষাঁড়ের মূত্র, ইত্যাদিকে বিকল্প বলা যায়, অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে বিপরীত অর্থাৎ খণ্ডিত অসৎ ইত্যাদিরূপে কল্পিত নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মও সেইরূপ বিকল্প।) সেই নাম, জাতি ইত্যাদিরূপ বিকল্পের সহিত যাহা বর্ত্তমান তাহা সবিকল্প, সেই বস্তুর "লক্ষ্যত্বে"—মহাবাক্যের অর্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জানিবার যোগ্যতা স্বীকৃত হইলে "লক্ষ্যস্য"—মহাবাক্যের অর্থরূপে জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্ম বস্তু তাঁহার, "অবস্তুতা স্যাৎ"—মিথ্যাত্ব অনিবার্য্য হইবে, কেননা নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ঘটাদি সকল বস্তুরই মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আবার "নির্ব্বিকল্পস্য"—নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মরহিত বস্তুর "লক্ষ্যত্বম্"—লক্ষ্যতারূপ ধর্ম্ম, সংসারে "ন দৃষ্টম্" কোথাও দেখা যায় নাই, "ন চ সম্ভবি"—সিদ্ধ করাও যাইতে পারে না, কেননা লক্ষ্যতারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুকে নির্ব্বিকল্পক বলিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটে। [কোনও বস্তুকে 'লক্ষ্য' বলিয়া মানিলে, তাহাকে লক্ষ্যতাধর্ম্মরূপ বিকল্প-বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাহাকেই আবার নির্ব্বিকল্প বলিলে, 'আমার মুখে জিহ্বা

নাই' অথবা আমার পিতা বাল-ব্রহ্মচারী এইরূপ আপনার বচন দ্বারাই আপনার বচনের বাধা বা ব্যাঘাতদোষ ঘটে।] ৪৯

ইহাই হইল মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ লইয়া পূর্ব্বপক্ষীর দোষারোপ।

[মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এই যথার্থ সিদ্ধান্ত লইয়া উক্তরূপ ফাঁকি বা অসৎ প্রশ্ন উঠাইলে, অনুরূপ অসৎ উত্তর ভিন্ন অন্য প্রতীকার নাই। যে উষ্ট্রচালক চাবুক ব্যবহার করে না, তাহার উষ্ট্র দুর্দ্দান্ত হইলে সে যেমন তাহারই পৃষ্ঠের বোঝা হইতে একখানা চেলা কাঠ লইয়া তাহার সংশোধন করে, সেইরূপ সেই অসৎ উত্তরও প্রতিপ্রশ্নস্বরূপ অর্থাৎ প্রতিবাদীর উপর প্রত্যভিযোগ বা প্রত্যারোপ বা পাল্টা প্রশ্ন করা। সেইরূপ প্রত্যভিযোগ দ্বারা প্রতিবাদীর উক্তরূপ ফাঁকি অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, এই হেতু] সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তোমার অসৎ প্রশ্নের অনুরূপ অসৎ উত্তর ('জাতি'—উত্তর) থাকিতে তোমার ঐরূপ বিস্ময়কর প্রশ্ন চলিবে না। এই হেতু প্রতিবাদীর মতো সিদ্ধান্তীও বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন :—

বিকল্পো নির্ব্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ।
আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রানবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥৫০

অন্বয়। বিকল্পঃ নির্ব্বিকল্পস্য বা সবিকল্পস্য ভবেৎ ? আদ্যে ব্যাহতিঃ, অন্যত্র অনবস্থাদয়ঃ।

অনুবাদ—এই যে বিকল্প করিলে (একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইলে) তাহা নির্ব্বিকল্পের (অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম বিষয়ে) বিকল্প করিলে, অথবা সবিকল্পের (সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে ? প্রথম পক্ষে (অর্থাৎ যদি বল নির্ব্বিকল্পের বিকল্প, তাহা হইলে) তুমি যে ব্যাঘাত দোষ আমার উপর চাপাইলে, তাহা তোমার স্কন্ধে পড়িবে, কেননা নির্ব্বিকল্পের আবার বিকল্প কি ? দ্বিতীয় পক্ষে, আত্মাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি (চারিটি) দোষ ঘটিবে। (টীকা দ্রষ্টব্য)।৵

টীকা—হে প্রতিবাদী, 'মহাবাক্যের দ্বারা লক্ষিত যে ব্রহ্ম, তাহা নির্ব্বিকল্প কিম্বা তাহা সবিকল্প ?—এইপ্রকারে যে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ও সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক 'বিকল্প' করিলে—একই বিষয়ে বিতর্ক বা মতভেদ উঠাইলে, তাহা কি নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে হইবে অথবা সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে হইবে ? অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিষয়ে একেবারেই বিকল্প নাই, তদ্বিষয়ে অথবা যাহাতে বিকল্প আছে এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ে ?* তন্মধ্যে যদি বল নির্ব্বিকল্পের বিকল্প করিয়াছি, তাহা হইলে এই প্রথম পক্ষে যে নির্ব্বিকল্পের বিকল্পের কথা বলিলে তাহা উক্ত ব্যাঘাতদোষযুক্ত, কেননা যাহাকে নির্ব্বিকল্প বলিতেছ, তাহারই আবার বিকল্পের কথা বলিতেছ। আবার যদি দ্বিতীয় পক্ষই আশ্রয় কর অর্থাৎ যদি বল সবিকল্পেরই বিকল্প করিয়াছি, তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়', 'অনবস্থা' প্রভৃতি চারিটি দোষ ঘটে।

আত্মাশ্রয় দোষ অর্থাৎ আপনার সিদ্ধির জন্য আপনারই অপেক্ষা, তাহা কি প্রকারে ঘটে দেখ 'সবিকল্প ব্রহ্মেরই বিকল্প' এই বাক্যে সবিকল্প শব্দের অর্থ কি তাহা শ্রবণ কর। 'বিকল্পেন (তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত) সহ বর্ত্ততে' [যঃ তস্য বিকল্পঃ (প্রথমা বিভক্ত্যন্ত)]। বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান সেই সবিকল্প ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মী বা আশ্রয় (অর্থাৎ অধিকরণ

* সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্ন অন্যায্য নহে। প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তু সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প ? তাহার অর্থ সেই বস্তু নাম জাত্যাদিবিশিষ্ট অথবা তদ্রহিত ? সিদ্ধান্তীর পাল্টা প্রশ্ন 'তুমি যে বস্তু লইয়া এই বিকল্প', অর্থাৎ একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইতেছ, তাহা সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে বিকল্প আছে তাহা অথবা যাহাতে বিকল্প একেবারেই নাই তাহা ? আমাকে আগে বল। প্রতিবাদীর 'বিকল্প' শব্দের অর্থ ও সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্নে 'বিকল্প' শব্দের অর্থ ঠিক এক নহে। (অবশ্য নাম জাত্যাদি ধর্ম্ম লইয়াই মতভেদ।) বিকল্প শব্দের অর্থ নাম জাত্যাদিই হউক অথবা মতভেদই হউক [illegible] কিছুই আসিয়া যায় না, কেননা বিকল্প শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক নহে।

বা অনুযোগী) সেই সবিকল্প ব্রহ্ম যে বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান, সেই বিকল্প এই প্রসঙ্গে তৃতীয়ান্ত "বিকল্পেন" এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। আর তুমি যে সেই সবিকল্প ব্রহ্মে বিকল্প করিলে, সেই বিকল্প এস্থলে প্রথমান্ত "বিকল্পঃ" এই পদদ্বারা উক্ত হইল। এক্ষণে বল, তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত "বিকল্পেন"-পদ দ্বারা এবং প্রথমান্ত "বিকল্পঃ"-পদ দ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলে অথবা দুইটি পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইলে ? যদি বল 'উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত 'বিকল্প' শব্দ দ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলাম, তাহা হইলে, সেই একই বিকল্প, বিকল্পের আশ্রয় যে সবিকল্প ব্রহ্ম তাঁহার বিশেষণ হওয়াতে, আপনিই আপনার আশ্রয় হইল, অর্থাৎ তোমার প্রথমান্তরূপ যে বিকল্প তাহার আশ্রয় যে সবিকল্প ব্রহ্ম, তাঁহার বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত বিকল্প, তাহাই তোমার প্রথমান্ত বিকল্পের আশ্রয় হইল। যদি বল 'কি প্রকারে' ? তবে বলি, নিয়মই রহিয়াছে যে কোনও বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট বস্তুতে, যে ধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহা সেই বিশেষণেও বিদ্যমান; যেমন 'খড়্গী আসিতেছে' এই বাক্যে আগমনক্রিয়ারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা যেমন সেই খড়্গধারী পুরুষে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার বিশেষণীভূত খড়্গেও বিদ্যমান, যেহেতু যেমন সেই 'খড়্গী'পুরুষ আসিতেছে, সেইরূপ সেই খড়্গও (তৎসঙ্গে) আসিতেছে; সেইরূপ তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প'রূপ বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম প্রথমান্ত'বিকল্প'রূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়াতে, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' তাহাও সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হইল, কিন্তু তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত বিকল্পকে ও প্রথমান্ত বিকল্পকে একই বিকল্প বলিয়া বুঝাইয়াছ সুতরাং একই বিকল্প, বিকল্পাশ্রয় ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়াতে প্রথমান্তরূপ আপনার আশ্রয় হইল। তাহা হইলে আপনার স্থিতির জন্য আপনারই অপেক্ষা থাকাতে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হইল।

আর যদি বল, 'উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত 'বিকল্প' শব্দ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইতেছি,' তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইল অর্থাৎ পরস্পরের সিদ্ধির জন্য পরস্পরের অপেক্ষা ঘটিল; তাহা কি প্রকারে ঘটিল দেখ। সেই তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' যেহেতু বিকল্প, এবং তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম যেহেতু 'সবিকল্প', সেই হেতু সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ কোনও বিকল্প অবশ্য মানিতে হইবে, অর্থাৎ তুমি যখন সবিকল্পের বিকল্প হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন যাহাই বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে তাহাই সবিকল্প আশ্রয়ে বিদ্যমান হইবে—নির্ব্বিকল্প আশ্রয়ে নহে। যেমন তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্প, সবিকল্প আশ্রয়ে বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল বিকল্পই সবিকল্প আশ্রয়ে বর্ত্তমান হইবে। এই হেতু যেমন তোমার প্রথমান্ত-রূপ বিকল্পের স্থিতির জন্য, তৃতীয়ান্ত বিকল্প দ্বারা আশ্রয় ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীকে সবিকল্প করিলে, সেইরূপ সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য কোনও বিশেষণরূপ বিকল্পদ্বারা আশ্রয়কে সবিকল্প করা চাই। তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয়ের বিশেষণরূপ যে বিকল্প তাহার নাম দাও 'বিশেষণীভূত বিকল্প'। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প কি সেই প্রথমান্ত রূপ বিকল্প ? অথবা সেই প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প ? যদি বল তাহা সেই প্রথমান্ত রূপ বিকল্প, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'অন্যোন্যাশ্রয়'-রূপ দোষ হয় —কেন না প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা এবং তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের অর্থাৎ সেই প্রথমান্ত বিকল্পের অপেক্ষা।

আবার যদি বল, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প উক্ত প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প, তাহা হইলে চক্রিকা দোষ

(স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ গ্রহকত্ব) হয়, অর্থাৎ চক্রের ন্যায় ভ্রমণরূপ দোষ ঘটে। কেন না সেই তৃতীয় বিকল্প 'বিকল্প' বলিয়া, এবং সেই বিশেষণী-ভূত বিকল্পের আশ্রয় ব্রহ্ম সবিকল্প রূপ হওয়াতে, সেই ধর্ম্মী ব্রহ্মের বিশেষণীভূত অন্য এক বিকল্প অঙ্গীকার করিতেই হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই অপর বিকল্পটি অর্থাৎ ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পটি কি সেই প্রথমান্ত বিকল্প রূপই হইবে অথবা সেই প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক চতুর্থ বিকল্প হইবে ? যদি তাহাকে সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই বল, তাহা হইলে উক্ত 'চক্রিকা' দোষ ঘটে, কেননা দুইটি প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য বিশেষণীভূত তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের স্থিতির জন্য অন্য বিশেষণরূপ ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পের অপেক্ষা। আর তুমি স্বীকার করিয়াছ সেই অন্য বিশেষণরূপ বিকল্পটি প্রথমান্ত রূপই। তাহা হইলে সেই প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য আবার সেই তৃতীয়ান্তের অপেক্ষা, সেই তৃতীয়ান্তের স্থিতির জন্য আবার তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তাহার স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার সেই প্রথমান্তের অপেক্ষা, এইরূপে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া উক্ত 'চক্রিকা' দোষ ঘটে।

আবার যদি বল, সেই ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পটি, প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন একটি চতুর্থ বিকল্প, তাহা হইলে, যেহেতু সেই অন্য বিশেষণরূপ চতুর্থ বিকল্পটি একটি বিকল্প, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্য কোনও বিশেষণরূপ এক পঞ্চম বিকল্প অঙ্গীকার করা আবশ্যক। আবার সেই পঞ্চম বিকল্পও যেহেতু 'বিকল্প', সেই হেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্য কোনও বিশেষণরূপ আর এক ষষ্ঠ বিকল্পকে মানিতে হয়। এইরূপে তাহার স্থিতির জন্য পরে সপ্তম বিকল্প মানিতে হয়; এইরূপে সেই প্রমাণরহিত ধারা চলিতেই থাকিল। তাহার নাম অনবস্থা দোষ, ইহা মূলের বিনাশক।

কণিকা

শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

কে ব'লে গো মানুষ ছোট
বদ্ধ তারা এ সংসারে।
দেখনা চেয়ে সবার মাঝে,
মুক্ত যে সেই বিরাজ করে॥

সমালোচনা

Sri Ramakrishna & Modern Psychology :—স্বামী অখিলানন্দ প্রণীত। প্রকাশক, বেদান্ত সমিতি, ২২৪, ম্যান্‌জেল ষ্ট্রীট, প্রভিডেন্স, আর্‌-আই, ইউ-এস্‌-এ।

প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ববাদিগণ ধর্ম্মের অনুভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানবাদের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রভিডেন্স বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ তাঁহার এই সুচিন্তিত পুস্তিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনালোকে ধর্ম্মের বিপক্ষে মনস্তত্ত্ববাদীদিগের অভিমত নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাত্র ৩১ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকায় এই জটিল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এই সুলিখিত পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি যে, ভবিষ্যতে গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জন বিধান করিবেন। পুস্তিকার ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

শব্দ ও উচ্চারণ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম্‌-এ প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থ-নিকেতন, ১৯২ ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯৩ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক বেশী নাই। বর্ত্তমান পুস্তকখানি সেই অভাব কতক পরিমাণে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। বাংলা বানান সম্বন্ধেও গ্রন্থকার বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে অনেকেই আজকাল বানান সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি উক্ত আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সম্বন্ধে লেখক যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। বাংলায় রেফযুক্ত সমুদয় ব্যঞ্জনই অপেক্ষাকৃত জোরের সহিত উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি তর্ক, বলি তর্ক। সুতরাং ধ্বনিতত্ত্বের অজুহাতে প্রচলিত কয়েকটি বর্ণের দ্বিত্ব অনুমোদন করা যায় না। রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববর্জনই সমীচীন।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কথা একখানা ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। গ্রন্থকার এই বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রযত্ন করিতেছেন দেখিলে আমরা সুখী হইব।

শান্তিপুর পরিচয় (প্রথম ভাগ)—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। লীলাবাস, ১-১৪ রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সাধু অঘোরনাথ রায় গুপ্ত, প্রাণনাথ মল্লিক, ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীচৈতন্যদেব, জলেশ্বর শিবের মন্দির, উমেশচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, তোপখানার মসজিদ, বনমালী ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ, রাসযাত্রা, কবি হরিমোহন প্রামাণিক, সুরগাথা প্রভৃতি পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ-পঞ্জীতে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। শান্তিপুরের তথা সমগ্র বাংলার নিকট পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

লেখকের লেখন-ভঙ্গি এবং সহজ সরল বানান আমরা প্রশংসা করি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ১০ খানা চিত্র গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

পরলোকে ডাক্তার রামলাল ঘোষ

গত ২০শে নবেম্বর রাত্রি ২-৩৪ মিনিটের সময় হাওড়ার প্রবীনতম চিকিৎসক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত ডাঃ রামলাল ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। গত ১৯শে তারিখে তিনি হাওড়া রওনা হন। পথে জোসিডি ও মধুপুরের মধ্যস্থলে ট্রেনেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং হাওড়ার কয়েকটি পাটের ও ময়দার কলের চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি আজীবন দরিদ্র দেশবাসীকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অর্থ দান করিয়াছেন। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

সংবাদ

বেদান্ত সোসাইটি, লস্ এঞ্জেলিস, হলিউড, আমেরিকা—গত নবেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ নিম্নলিখিত চারিটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

জড় ও চৈতন্য, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ, যোগ, তন্ত্র।

এতদ্ব্যতীত সমাগত শিক্ষার্থিগণের নিকট তিনি নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন :—

গীতার দার্শনিক তত্ত্ব, বেদ ও উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি, জৈন-মতবাদ, বৌদ্ধ-মতবাদ, ষড় দর্শন, দর্শনের ইতিহাস ও বেদান্ত ধর্ম্ম।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি, লণ্ডন—অধ্যক্ষ স্বামী অব্যক্তানন্দ গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

চিন্তার যৌগিক প্রণালী, যোগ-সাধনায় আবেগের স্থান, ইচ্ছাশক্তি ও তাহার প্রকাশ, যথার্থ কল্পনা শক্তি, বৈদান্তিক শিক্ষার মতবাদ, বৈদান্তিক শিক্ষার সাধন, সহজাত জ্ঞানকে যুক্তিযুক্তকরণ, আত্ম-শিক্ষা, সাম্যসমস্যা, স্বাধীনতা-সমস্যা, মৈত্রী-সমস্যা।

আগামী ২১শে ডিসেম্বর তিনি 'বৈদান্তিক সমাজ' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্-ফ্রান-সিস্কো—গত নবেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী

অশোকানন্দ সেঞ্চুরী ক্লাবে এবং বেদান্ত সোসাইটিতে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন :—

জননী কালী, কুণ্ডলিনী ও সপ্তভূমি, রাহস্থিক প্রতীক, দেব মন বনাম মানব-মন, ব্রহ্মবিদ্যা বা দেব-বিজ্ঞান, একাগ্রতা সাধনের প্রণালী, আমরা কেন দুঃখ পাই ? সর্ব্বভূতে ভগবদ্-দর্শন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি-হলে সমাগত ভক্তদিগকে তিনি ধ্যান ধারণাদি ও বেদান্ত-তত্ত্ব-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম, কনখল

—১৯৩৬ সালে কনখল রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমের ষড়্‌ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ণ হইল। উক্ত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

সেবাশ্রমের অন্তর্ব্বিভাগে ১৯৩৬ সালে মোট ৮৫৮ জন রোগী স্থান লাভ করিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইয়াছে। গড়ে প্রত্যহ ২৬.১২ জন রোগী অন্তর্ব্বিভাগে ছিল। রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থযাত্রী, সাধু, বিদ্যার্থী এবং স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসী।

সেবাশ্রমের বহির্ব্বিভাগে এই বৎসর মোট ২৫২৩৫ জন (১০৮৫৭ নূতন + ১৪৩৭৮ পুরাতন) রোগী ঔষধ ও চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভাগে রোগীর গড়পড়তা প্রত্যহ ৬৮.৯৫। ঔষধ ভিন্ন ২৬০ জন রোগীকে পথ্য ও আবশ্যক বস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

স্থানীয় দরিদ্র বালকদের জন্য আশ্রমে একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩০। একজন বেতনভোগী শিক্ষক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। বালকদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেবাশ্রমে একটি পুস্তকালয় আছে। সেবাশ্রমের কর্ম্মিগণ এবং কনখল, মায়াপুর, হরিদ্বার, জাওলা-পুর প্রভৃতি অঞ্চলের সাধু সন্ন্যাসী ও বিদ্যার্থিগণের অনেকেই ঐ পুস্তকালয়ের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। ১৯৩৬ সালের শেষভাগে পুস্তকালয়ে পুস্তকসংখ্যা ছিল ১৭৩৫। ইহাতে সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষার গ্রন্থাদি আছে। ১৩ খানা মাসিক, ১ খানা দৈনিক ও একখানা সাপ্তাহিক এই বৎসর পাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রায় এক সহস্র দরিদ্র-নারায়ণকে ক্ষীর, পুরী, তরকারী প্রভৃতির দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৯৪৪৯৷৵১১ পাই সহ এই বৎসরের মোট আয় ২৩৫২৩।৶৬ এবং মোট ব্যয় ১৬০২৪।৶৮ পাই।

রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ

—১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমের ২২শ. বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ দুই বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য দুই বৎসরে সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ১৫৫৮৬৬ জন রোগী ঔষধ ও চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪২৭৫৩ জন নূতন রোগী।

৮ জন বিপন্না ভদ্রবংশীয়া বিধবা এবং ৬ জন অক্ষম বৃদ্ধকে সেবাশ্রম হইতে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৮৪ জন দুঃস্থ লোককে নানারূপে সাময়িক সাহায্য দান করা হইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বালকগণের জন্য সেবাশ্রমে একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৩। অসমর্থ বালকগণকে পুস্তক ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি বিনামূল্যে প্রদান করা হইয়াছে।

সেবাশ্রমে একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার আছে। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুস্তকাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৬৬৪। মোট ১১১৮ খানি পুস্তক

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে পাঠকগণ কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। পাঠাগারে মোট ১৩খানা মাসিক এবং ৩খানা সাময়িক পত্র আছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৩২১৬৵৩ পাই সহ ১৯৩৫ সালের মোট আয় ৬২৭৮৷৵২ পাই এবং মোট ব্যয় ২৭৭৩৸৵০। ১৯৩৫ সালের উদ্বৃত্ত ৩৫০৪৸২ পাই সহ ১৯৩৬ সালের মোট আয় ৮১১৩৷১ পাই এবং মোট ব্যয় ৪৩৬৪৴৯ পাই।

হিন্দু সৎকার সমিতি, কলিকাতা—কলিকাতায় হিন্দু সৎকার সমিতি অতি সুন্দর কাজ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের ১৯৩৬ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

আত্মীয় বান্ধববিহীন হিন্দুর মৃতদেহের সৎকারের জন্য ১৯৩২ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পুলিশ, জেল, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠান হইতে সমিতি ১৯৩৬ সালে মোট ১৪৫০টি শবদেহের সৎকার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৫৭টি নানা বস্তি ও সহরের বহির্ভূত অঞ্চল হইতে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১৮৩০।৵৯ পাই সহ এ বৎসরের মোট আয় ১৫৪৬৮।৩ পাই এবং ব্যয় ১১৪৭৮৸৵৫ পাই। আমরা আশা করি, সমিতি হিন্দু-সমাজের সর্ব্ববিধ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রম, কাশী—গত ২৮শে কার্ত্তিক শুভ উত্থান একাদশী তিথিতে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও বিশেষ ভোগরাগাদির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রায় দুইশত ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। সায়ংকালে শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তন বেশ সমারোহের সহিত সমাধা হইয়াছে।

২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার স্বামী শুদ্ধানন্দজীর আগ্রহাতিশয্যে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমে ভজন-সঙ্গীতাদির বন্দোবস্ত ও উক্ত মহাপুরুষের পবিত্র জীবনী আলোচিত হইয়াছিল। স্বামী সদাশিবানন্দ সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। অনেকে তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে নানাদিক হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন। সভায় তাঁহার একটী চিত্তাকর্ষক জীবনী পঠিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি উৎসব

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, ৯ই পৌষ, শুক্রবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পঞ্চাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে।